বনফুল রচনাবলী

দশম খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :

ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬০

প্রকাশক :

মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :

শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

আনন্দরূপ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

উপন্যাস

কষ্টিপাথর

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

অসিতের পত্রাবলী

১

রাত্রি প্রায় বারোটা। চারিদিক নিস্তব্ধতন্দ্রায় আচ্ছন্ন! বাইরে অবিরাম ঝিল্লিধ্বনি। জোনাকিদের ফুলঝুরি উৎসব দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। আকাশে মেঘ। চারিদিকের অবস্থা তোমাকে চিঠি লেখবার মতোই স্বপ্নময়। কিন্তু কি লিখি? কথা তো অনেক আছে, কিন্তু তারা এত বিচলিত যে লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ করা যায় না। কারও চোখে অশ্রু, কেউ লজ্জায় সঙ্কুচিত, কেউ বিষণ্ণ, কেউ গম্ভীর। কাগজের বুকে সারি বেঁধে দাঁড়াবার মতো সুবিন্যস্ত পরিচ্ছদ কারও গায়ে নাই। জোর করে তাদের প্রকাশ করতে গেলে অসম্বদ্ধ প্রলাপের মতো শোনাবে।

তোমাকে আমার এই প্রথম চিঠি। কত কি লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত "প্রথম" জিনিসের মতো আমার এই চিঠিখানিও প্রকাশের অফুরন্ত আকুলতা নিয়ে অস্ফুট অসমাপ্তিতেই শেষ হবে বোধ হয়। এর জন্য তোমার দুঃখ হবে কি না জানি না, কিন্তু আমার দুঃখের আর শেষ নাই। তবে আশা করি, আমার প্রাণের সুস্পষ্ট বাণী একদিন শুনতে পাবেই তুমি। আর একজনও শুনবে বলে আশা করে আছে।

…হরিটা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বেচারী ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, দাদা রাত-দুপুরে উঠে বৌদিকে চিঠি লিখছে। আচ্ছা, তুমি যে বার বার বললে তোমার রূপ নেই, গুণ নেই, আমি তোমাকে দয়া করে বিয়ে করেছি (সত্যি না কি?) কিন্তু তোমার সঙ্কোচভাব কিছু দেখছি না তো। উপরন্তু তোমার সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। রূপ-গুণহীনা দয়ার পাত্রী তুমি, কোথায় সসঙ্কোচে সরে' থাকবে, তা নয়, অবলীলাক্রমে সহজে ও সপ্রতিভভাবে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ ক'রে এমন অপূর্ব তালে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে দোলা দিয়েছ যে আমার বিগত অতীত, এমন কি, বিস্মৃত পূর্ব-জন্ম পর্যন্ত সেই দোলায় আন্দোলিত হচ্ছে। এই কি রূপগুণহীনা দয়ার পাত্রীর শোভন ব্যবহার? এত সাহস এত স্পর্দ্ধা কোথায় পেলে তুমি? আমার মতো গম্ভীর লোককে ভয় হয় না? বিয়েই না হয় করেছি, তাই বলে আমার সমস্ত দিনরাত্রি সমস্তক্ষণ সবটা অধিকার ক'রে থাকবে! বেশ আব্দার তো।

…ট্রেনে তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে কেবলই এসেছ। হঠাৎ উঠে বসেছি, পাশে দেখি সেই ফয়জাবাদ-যাত্রী মুসলমান ভদ্রলোকটি প্রচুর গোঁফদাড়ি নিয়ে আমার দিকে

চেয়ে আছেন। ট্রেনটা একটা পুলের উপর উঠেছে। আবার শুলাম—আবার একটু ঘুমের ঘোর, আবার তুমি, "না, পাখাটা আমায় দাও, আমি বাতাস করব, আমার হাত কিছু ব্যথা করছে না, আঃ ছাড় না—লাগছে বড্ড," সেই দুষ্টু হাসি। আবার ঘুম ভাঙল, আবার সেই লোমশ মুসলমান ভদ্রলোক। ট্রেন স্টেশনে এল। সমস্ত ব্যাপারটার উপর বীতরাগ হয়ে কেলনারে গিয়ে চা খেলাম। উপর্যুপরি দু' কাপ। বাকি রাস্তাটা আর ঘুম হল না। এমনি ক'রে জ্বালাতন করবে নাকি?

মা তোমাকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন। মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। টাকার জন্য কিছু ভেবো না। টাকার জন্য পৃথিবীতে কখনও কিছু আটকায় না যদি মনের জোর থাকে। আমার চাবি পাঠাও অবিলম্বে। কাপড়-জামা সব বন্ধ যে—এই শ্লথ-স্মৃতি স্বামীটিকে নিয়ে মুশকিল হবে তোমার।

উষা কেমন আছে?

তোমার যা-কিছু দরকার হবে আমাকে জানিও। লজ্জা কোরো না লক্ষ্মীটি।

অনেক রাত হোলো। তুমি নিশ্চয়ই এখন সুখে ঘুমোচ্ছো। বিরক্ত করবার কেউ নেই তো। আমিও এবার শুই। আসবে নাকি স্বপ্নে করি ভয়? ইতি—

তোমারই অসিত

২

শ্রীমতী হাসি দেবীর খবর কি?

সেদিন হাসিকে একটা চিঠি লিখেছি, আজও তার জবাব পেলাম না। জবাব না পাওয়ার হেতু নানারকম হতে পারে, কিন্তু আমার উপর তার ফল হয় মাত্র একটি—চিন্তা। হাসির জন্য চিন্তিত আছি। সেদিন অত রাত্রে ঘুমের ঘোরে কি যে লিখেছিলাম মনেও নেই ভালো। নিশ্চয়ই এমন কিছু কর্কশ লিখিনি যার জন্য হাসির মনোকষ্ট হতে পারে। কি জানি! যে মন এখনও পাইনি তার কিসে কষ্ট হয়, কিসে হয় না, তা তো এখনও অজানা। সুতরাং সে গবেষণা করে লাভ নেই কোনও।

হাসি এখন কোথায় আছে এবং কেমন আছে এইটুকু খবর পেলেই আপাতত সন্তুষ্ট থাকব। হাসি যেন এ খবরটুকু জানাতে দেরি না করে। শুধু শুধু একজনকে উৎকণ্ঠিত ক'রে কি লাভ তার।

মা হাসিকে পড়বার অনুমতি দিয়েছেন এ খবর তো সে আগেই পেয়েছে। সে অনুমতি যে আন্তরিক এ খবরটাও তার জানা দরকার। তা না হলে হয়তো

সে স্বস্তি পাবে না। অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। পিতামাতার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও শুভকার্যও যে শ্রীমণ্ডিত হয় না এ সহজ জ্ঞান আমার আছে। অতএব হাসির কোনও প্রকার দুশ্চিন্তা অনাবশ্যক।

মা খেতে ডেকেছেন, খেয়ে আসি। খেয়ে এসে শেষ করব চিঠিটা। হাসির খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণ। কি করছে সে?

…খাওয়াটা প্রচুরই হল। মায়ের খাওয়ানো। পরশু থেকে আবার চলবে মেসের সেই সনাতন ঠাকুর-সেবা। কাল লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। একথাও হাসির জানা ভাল। কি জানি, হঠাৎ যদি দরকার হয় কিছু। ঠিকানাটা আলাদা একটা কাগজে লিখে দিলাম।

খেতে খেতে একটা জিনিস মনে হচ্ছিল। প্রণয়-ব্যাপারের সঙ্গে যদি কোনও খাদ্যদ্রব্যের তুলনা রীতিবিরুদ্ধ না হয় তা হলে তুলনাটা মাছের সঙ্গে, বিশেষত ইলিশ মাছের সঙ্গে, দিলে বেশ খাপ খায়। হাসি না কি ইলিশ মাছ পছন্দ করে? বেশ মুখরোচক মাছ—ভারী সুস্বাদু। ইলিশ মাছ ধরা কিন্তু ভারী শক্ত। তা ছাড়া, এত কাঁটা-বহুল যে প্রতি গ্রাসেই কণ্ঠ-কণ্টক হবার আশঙ্কা। কণ্ঠ-কণ্টক অর্থাৎ গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলে যে কি অস্বস্তি তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাছের সুস্বাদ রসনায় নেই অথচ তার বেদনাময় স্মৃতিটি কণ্ঠে বর্তমান। মিলন-অবসানে বিরহের মতো। হাসি হয়তো পাতলা ঠোঁটটি উলটে বলবে—আহা, উপমার কি শ্রী! হাসি যেমন খুশি ঠোঁট উলটে যা খুশি বলুক কিন্তু আমার মনে হয় যদি কোনও বিরহী বলে—"আমার মনের গলায় বিরহের কাঁটা লেগেছে—উঠতে বসতে সর্বদাই খচখচ করছে—ঢোক গিলতে পারছি না—কাউকে দেখাতেও পারছি না," তাহলে তার বর্ণনাটা মেঘদূতের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও নিতান্ত বাজে হবে না। আমার মতে—কিন্তু না, নিজের মত নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে হাতাহাতি হবে হয়তো শেষটা। কারণ হাসি ক্রমশ চটে যাচ্ছে সে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু মুচকি হাসি উঁকি মারছে, তাও দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু থাক, দরকার কি!

…এই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে হাসিকে কাছে পেলে এখন ভালই লাগত। মনে হচ্ছে ঘুমুলে বোধ হয় সে আশা সফল হতে পারে।…

জাগরণের সূর্য যখন অস্ত যায় তখন তন্দ্রার সন্ধ্যায় স্বপ্নের মেঘগুলি কল্পনার রঙীন আকাশে লীলায়িত হয়ে ওঠে। কি সুন্দর স্বপ্নলোকের সেই ক্ষণিক দেখা-শোনা!

হাসির বাবা-মা কি দেশে ফিরে গেলেন ? আশা করি, সে রবীন্দ্রনাথের "যেতে নাহি দিব" পড়েছে। ইতি—

তোমারই অসিত

৩

আজ তোমার এই প্রথম চিঠি পেলাম।

সত্যি হাতের লেখা এতই বিশ্রী যে চিঠিখানি পড়তে প্রায় পুরোপুরি তিন মিনিট সময় খরচ হয়ে গেল। তা ছাড়া, ভাব ও ভাষা এত লঘু যে চিঠিটা একবার পড়ে তৃপ্তি হয় না, বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। অতএব লজ্জা করাটা তোমার পক্ষে ভারী সুসঙ্গত হয়েছে। তা বলে' যা লিখেছ তা যেন করে ফেল না—লজ্জায় মরে যেও না—তাহলে একটু নিদারুণ রকম বাড়াবাড়ি হবে।

দেখ, আলঙ্কারিকেরা বিনয় ও লজ্জাকে মানুষের ভূষণ বলেছেন। অস্ত্র বললে আরও ঠিক হত। অতি-বিনীত ও অতি-লাজুক লোকের কাছে সকলেই হার মানতে বাধ্য। তোমার এই সরমস্নিগ্ধ নম্রনত সংগ্রামে আমি সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করছি বিনা শর্তে (বিনা শর্তে করব কিনা ভাবছি)—তুমি বিনয়বাণ নিক্ষেপ ক'রে আর আমাকে ক্ষতবিক্ষত কোরো না।

সমস্ত চিঠিখানি যেন তোমার একখানি 'ফোটোগ্রাফ'। ভাষাময়ী হাসি, বিনয়-অভিমান-লজ্জা-অনুনয়-আশা-আকাঙ্ক্ষা-খচিত শ্রীমতী হাসি দেবীর জীবন্ত মানস যেন। মাঝে মাঝে এমন বিশ্রী চিঠি দু'একখানা লিখো।

আমার প্রথম চিঠিতে যার কথা লিখেছিলাম—যে আমার বাণী শোনবার আশায় কান পেতে আছে—সে কে, মেয়ে না পুরুষ, তুমি জানতে চেয়েছ। অসতর্ক মুহূর্তে কথাটা লিখে ফেলেছিলাম। সত্যি কথা বলব ? রাগ করবে না তো ? সে মেয়ে। কেমন দেখতে ? খুব চমৎকার। কিন্তু, না থাক, এর বেশি আর বলব না এখন।

আপাতত কোলকাতা যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। বিনা দরকারে যাই কি ক'রে বল। তুমি থাকতে কোলকাতাটা লোভনীয় কিন্তু দুর্গম হয়ে উঠল। তোমারই লজ্জা আছে আমাদের বুঝি সে সব থাকতে নেই ?

এখানকার খবর ভালই। নিশ্চিন্ত ঘুমের কথা লিখেছ না ? তুমি যখন কাছে থাকতে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে জেগে থাকা যেত। এখন তুমি কাছে নেই, ঘুম যদি বা আসে নিশ্চিন্ত হতে পারি কই !

কলমটা খুব খারাপ। খুব উদার লোকও এটাকে চলন-সই বলতে কুণ্ঠিত হবে। অক্ষরগুলো কেমন যেন শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে।

শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখ। তোমার টনসিল খুব খারাপ। সুযোগ পেলেই ওর একটা বন্দোবস্ত করব। 'কডলিভার অয়েল' খেও। এবং···।

নাঃ, এ কলমে আর লেখা যায় না। থামলাম। চাবি পেয়েছি। ফটো পাবে।

অসিত

৪

এ তো আচ্ছা জবরদস্তি তোমার! তুমি ছাড়া আর কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ থাকতে পারে না আমার? এ যুগে? কোনও যুগে কি সম্ভব ছিল? নূতন আলাপ করবার বেলায় না হয় তোমার কথা ভেবে সংযত হতে চেষ্টা করব কিন্তু যাদের সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই আলাপ আছে তাদের কি ক'রে বিদায় ক'রে দিই! ভারী হিংসুটে তো! না, বলব না তার নাম। নাম ঠিকানা বলে' দিই আর তুমি তার সঙ্গে গিয়ে চুলোচুলি কর! কিন্তু একটা কথা জেনে রাখা ভাল, তার সঙ্গে চুলোচুলি করা যায় না। অতুল এসেছিল নাকি তোমার খোঁজে? আসতে বলেছিলাম তাকে আমিই! দরকার হলে তোমার টনসিল আর দাঁতের জন্য তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ভিজিটার্স লিস্টে ওর নাম আমিই দিয়েছি। ওর চেহারাই অমনি রোগা-রোগা। বুভুক্ষু চোখের দৃষ্টি আর উঁচু উঁচু গালের হাড় দুটো দেখে ভয় করবারই কথা। কিন্তু আসলে ও ভীতিকর নয়। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরা যেমন তেমনি, চলতি বাংলায় ছুং ছুং করা যাকে বলে—তাই ক'রে বেড়ায়। এদিকে পণ্ডিত লোক। সাহিত্য নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয় যদি কখনও বুঝতে পারবে। আমার আর একটি বন্ধু মহেন্দ্রও হয়তো আসবে মাঝে মাঝে। ভিজিটার্স লিস্টে তারও নাম দিয়েছি।

নির্জন একটা কোণের ঘরে বসে' তোমায় চিঠি লিখছি! তুমি নিশ্চয় ঘুমুচ্ছ এখন। আমার কিন্তু ঘুম হবে না কিছুতে। চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেলে কি যে করব এখন সেইটেই সমস্যা। বই পড়তে ভাল লাগবে না। নিজের মনের সঙ্গে আলাপ করব তার উপায় নেই। মনের দুয়ারে শ্রীমতী হাসি টক্‌টকে লালপাড় শাড়ী পরে' পাহারা দিচ্ছেন, হাসি চাহনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। মনের মধ্যে কারও প্রবেশ নিষেধ, এমন কি আমারও। কিন্তু—না, থাক এরপর যে কথাটা মনে হচ্ছে লিখব না।

খিল বন্ধ ক'রে দিয়েছি। খিল খুলে রাখার দরকার তো নেই আর। ঠাণ্ডা কনকনে হাত-পা নিয়ে কেউ আমার লেপের মধ্যে আজ তো আর ঢুকে পড়বে না। যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি যে হাসি আমার পাশটিতে শুয়ে আছে। আর ঠিক তেমনি ক'রে বলছে—"উঁ—ভারি ঘুম পেয়েছে সত্যি"—কি মজাই হয় তাহলে··· বালিশে চুলের গন্ধ রয়েছে এখনও। মনে পড়ছে কবি করুণানিধানের কবিতার লাইন ক'টা—

তারই চুলের গোলাপ ফুলের
শুষ্ক ধূসর পাঁপড়ি এই
সেই উপাধান শয়ন শিথান
শূন্য আধেক সে আজ নেই—

কি করছ তুমি এখন? উঃ, এত দেখতে ইচ্ছে করছে। সত্যি বল না কেন এত খারাপ লাগে?

ক্রমাগত লিখে গেলে সময়-সমস্যার সমাধান হয় বটে কিন্তু মনের অবস্থা এত বিশৃঙ্খল যে বেশি কিছু লেখা অসম্ভব।

অনেক আদর জানাচ্ছি···

শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখো লক্ষ্মীটি। উত্তর দিতে দেরি করো না। ইতি—

তোমার অসিত

৫

১০।২।৪৯

দেহটাকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছেছি কোনক্রমে, মনটা কিন্তু এখনও পৌঁছয়নি। সে কলেজ স্কোয়ারের কাছাকাছি কোথাও ঘুরছে এখনও। তাকে ধ'রে বেঁধে পাঠিয়ে দাও তো লক্ষ্মীটি। সে না এলে পড়াশোনা করব কি করে?

বুঝলে, ধরা পড়িনি কিন্তু। বাইরের কারও কাছে ধরা না পড়লেও নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছি। তুমি যখন লিখেছিলে 'এসো', আমি তখন ভেবেছিলাম 'যাব না'। নানাবিধ নৈতিক যুক্তি চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, খবরদার। কিন্তু হঠাৎ চলে গেলাম এবং তখন (মানে, যাবার অব্যবাহত পূর্বে) মনকে বোঝালাম যে, বোর্ডিংয়ে 'সীট' পেয়েছে কি না, কোথায় আছে, কেমন আছে, ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী হিসেবে আমার একটু খোঁজ-খবর করা উচিত। নিজের কাছে নিজের চুরি ধরা পড়ে' গিয়ে বেশ মজা লাগছে এখন। খুব খারাপও লাগছে

কিন্তু, আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে নয়, চলে এসেছি বলে'। মনে পড়ছে মেঘদূতের শ্লোক—

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্‌বিয়োগঃ শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।

রাত্রে আমার জন্য মন কেমন করবে না কি তোমার? বিরহী যক্ষ এ বিষয়ে যতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ততটা হবার সাহস হয়নি আমার এখনও।…দিনের কোলাহল থেমে গেছে। একা ঘরে পুরাতন সঙ্গী দুটিকে নিয়ে শুয়ে আছি—কম্বল আর বালিশ। এরা যেন আমার উপর অভিমান করেছে বলে' মনে হচ্ছে। এদের মনের ভাবটা যেন, আজ আমাদের ভাল লাগছে না, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন—ইত্যাদি। বেচারারা নিতান্তই জড়পদার্থ কি-না, জীবন্ত প্রাণের মনস্তত্ত্ব তাই বুঝতে পারছে না। কিংবা হয়তো পারছে (আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা মানলে) কিন্তু বলছে না কিছু। হিংসেয় জ্বলে' মরছে নীরবে। তা যদি হয় তা হলে সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্তু। যাদের ওপর মাথা রেখেছি, অঙ্গ প্রসারিত করেছি, তারা যদি নীরবে নেপথ্যে ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে তা হলে—তা হলে কি হতে পারে বল তো? ওদের দাঁত কিম্বা নখ নেই যে আঁচড়ে কামড়ে দেবে, বড় জোর, গরম হয়ে উঠতে পারে। তাতে খারাপ না হয়ে ভালই হবে এই শীতকালে। কিন্তু ওরা আমার মনের কথাটা বুঝবে না এই বা আমি ধরে নিচ্ছি কেন? হয়তো সব বুঝছে এবং নিজেদের ভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করছে, আমি বুঝতে পারছি না। সবই সম্ভব, মানে কল্পনায়।

…পৃথিবীর গোলমাল থেমেছে। মুখের এবং মনের উপর লৌকিকতার যে ছদ্ম আবরণটুকু ছিল তা সরে গেছে। নির্জন নিশীথে মনের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একাধিক স্তর আছে। এক স্তরে সে নিতান্তই সাধারণ মানুষ। খায়, বেড়ায়, ঘুমায়, সংসারধর্ম প্রতিপালন করে। অত্যন্ত বাস্তব। অন্য স্তরে সে কিন্তু খুবই অসাধারণ। সেখানে সে স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। তার কল্পনা, তার স্বপ্ন একান্তভাবে তার নিজস্ব! সেখানে কারও সঙ্গে তার মিল নেই। সেই অসাধারণ বেখাপ্পা কল্পনাকে সে মূর্তও দেখতে চায় বাস্তব জীবনে এবং সেইখানেই বাধে বিরোধ। বিরোধ বাধলেই সে কিন্তু থেমে যায় না, কারণ তার স্বপ্নজীবনকে বাস্তবে রূপ দেওয়াটাই তার মনুষ্যত্ব, বৈশিষ্ট্য। তাই কখন চুপিচুপি, কখন সোরগোল ক'রে প্রত্যেক মানুষই ওকাজ করেছে। স্বপ্নকে বাস্তবে যারা রূপ দিতে পেরেছে জীবনে তারাই সুখী, তারাই কৃতী। যারা পারেনি, তারা দুঃখী, জীবন তাদের অধন্য। অধিকাংশ লোকই কিন্তু পারে

না। টাকা রোজগার করতে পারে, খ্যাতির শিখরে উঠতে পারে, কিন্তু স্বপ্নকে রূপ দিতে পারে না। তাই বোধ হয় অধিকাংশ লোকই অসুখী।

সেদিন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল—সে ভদ্রকন্যার কাল্পনিক জগতের স্বামী ছিলেন সুশ্রী, সুধী, সুগায়ক। বাস্তব জীবনে হয়েছে কিন্তু তার বিপরীত। বাস্তব স্বামীর না আছে শ্রী, না আছে ধী, না আছে গান। ভদ্রমহিলার মনোকষ্টের অবধি নেই। কষ্ট তো হবেই। নিজের কল্পনা অপরের মধ্যে ষোল আনা সফল হবে এটা আশা করা অন্যায়, কারণ উক্ত 'অপর' ব্যক্তিরও নিজস্ব একটা সত্তা আছে তো!

জীবনে অহরহই এরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি চিরকালই কাল্পনিক। কত কল্পনাই করি। অধিকাংশ কল্পনাই সফল হয় না। হঠাৎ একটা কল্পনা মূর্তিমতী হয়েছে মনে হচ্ছে। ভয়ও হচ্ছে, পাছে উবে যায়। এ পৃথিবীতে যা-কিছু সুন্দর তাই নাকি ক্ষণভঙ্গুর। ভারী ভয় হয় তাই। তুমি 'কডলিভার' কিনেছো তো? যা বলে' এসেছি কোরো ঠিক ঠিক। অতুল গলায় লাগাবার ওষুধটা দিয়ে গেছে আশা করি। লাগিও ঠিক মত। এতে লজ্জার কি আছে? অসুখ হয়েছে ওষুধ দিচ্ছ, শখ তো আর নয়।

এখন এত ইচ্ছে করছে তোমায় কাছে পেতে। কোলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌ কি আর এমন দূর? এস না চলে', মনোরথে চড়ে' স্বপ্নকে সারথি ক'রে। রূপকথায় যা সম্ভব, বাস্তব জীবনে তা অসম্ভব কেন? সত্যি, কি মজাই হয় হঠাৎ যদি এসে শুয়ে পড় পাশটিতে, কম্বলে কুট কুট করবে যদিও তোমার, তবু ভাল লাগবে।

কত কি লিখতে ইচ্ছে করছে। সেই মেয়েটি জানালার ছোট্ট ফুটোতে চোখ রেখে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হাসছে মুচকি মুচকি। সেই মেয়েটি যার কথা বলব না বলেছি।...এবার আসি। রাত্রি একটা বাজে। হাসি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় এখন! তার শুক্‌নো বিষণ্ণ মুখখানি দেখতে পাচ্ছি। বোর্ডিংয়ে যাওয়ার কতদূর কি হোলো জানিও। উঃ, অনেক রাত হ'ল—আসি এবার। ডট ডট ডট। অর্থাৎ...

অসিত

৬

২৫-২-৪৯

কাল তোমার পোস্টকার্ড এবং আজ তোমার খাম পেলাম। পোস্টকার্ড পেয়ে হতাশ হয়েছিলাম, খাম পেয়ে তবু খানিকটা খুশি হলাম, অবশ্য অতি অল্পই। চার পৃষ্ঠায় আর কত কি লেখা যায় বল। কবিতায় চিঠি লিখতে মানা করেছ কেন?

সময় নষ্ট হবে? সময় তো নষ্ট করার জন্যেই, পয়সা যেমন খরচ করার জন্যেই। বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ নেই, শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায়ও না।

বোর্ডিং-এ স্থান পেয়েছ জেনে আশ্বস্ত হলাম। মন দিয়ে লেখাপড়া কর এবার। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের উপদেশগুলো ঝালিয়ে নাও আর একবার। এত কাণ্ড করার পর ফেল হলে সে ভারী বিশ্রী হবে। আমি ফেল করতে পারি এবং আমার ফেল করবার সঙ্গত কারণও আছে একাধিক। প্রথম কবিতা, দ্বিতীয় তুমি, তৃতীয় ড্যাশ, চতুর্থ ডট্ ডট্ এবং ইত্যাদি এট্ সেটরা অনেক আছে। আমি তোমায় ফেল করাব? সে রকম ভাগ্য আমার নয়। তুমি পাশ করবেই জানি, তবু স্বামী হিসেবে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য তাই একটু দিলাম। মেয়েরা কখনও ফেল করে না। পরীক্ষায় নম্বর পাবার নানা কৌশল তাদের আয়ত্তাধীন। নানাদিক বাঁচিয়ে সংসার-সমুদ্রে পানসিটুকু মাত্র সম্বল ক'রে যারা পাড়ি জমাতে পারে তাদের দক্ষতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। যে সব মেয়ে ফেল করে তারা মেয়ে নয়, তাদের মধ্যে পুরুষ উহ্য হয়ে আছে জানবে।

তুমি আমাকে যে পরিমাণ বিরক্ত করছ তার সিকিও আমি তোমাকে করি না নিশ্চয়। কাল কি কাণ্ড করেছ জান? কাল যখন পড়ছিলাম (খুব বীভৎস জিনিসই পড়ছিলাম। একটা মড়া কেমন করে পচে পচে অবশেষে কদাকার দুর্গন্ধ গলিত পিণ্ডে পরিণত হয় তারই বিশদ বর্ণনা) তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতার মিল খুঁজছি। যে কবিতা কাল তোমায় লিখে পাঠাব সেই কবিতার! গলিত মাংসপিণ্ডের উপর ভেসে উঠছে হাসিভরা তোমার চোখ দুটি। বারম্বার এই কাণ্ড। কতবার ঠিক গুনিনি কিন্তু অনেকবার।

বিরক্ত হয়ে শেষে প্যাথোলজি নিয়ে বসলাম, সেখানেও দেখি তুমি হানা দিয়েছ। এবং বেশ একটু বিচিত্র রকমে। একরকম পোকার কথা পড়ছিলাম, নাম তাদের সিস্টোশোমাম্ (Schistossomum), এরা যতদিন বড় না হয় ততদিন আলাদা থাকে। কিন্তু যখন সাবালক হয় অমনি পুরুষদের পেটের তলায় খাঁজ হয় আর মেয়ে পোকাটি সেই খাঁজে ঢুকে পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং এই ভাবেই বরাবর থাকে। এরা দেখতে খুব ছোট ছোট কেঁচোর মতো। সেই প্রেমিক পোকাদের বাস মানুষের রক্তে, কখনও বা শামুকের পেটে। যে মানুষের রক্তে এরা সঞ্চরণ করে, রক্তস্রাব করতে করতে ইহলীলা সম্বরণ করতে হয় সে বেচারাকে। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল, আহা, আমরা মানুষ না হয়ে যদি ওই রকম পোকা হতুম, বেশ হ'ত তা হলে! মন কেমন-করা প্রভৃতির কোন উৎপাত থাকত না। বোঝ! পোকা হতে ইচ্ছে করছিল।...এমন ক'রে বিরক্ত করবে নাকি তুমি আমাকে! কি

কাণ্ড! সামনে 'ফোটো'তে বসে' বসে' সমানে যে হেসে যাচ্ছ মুচকি মুচকি! ...অবিলম্বে চিঠির উত্তর যদি না দাও, ফের চলে যাব বলছি! তোমার মন খারাপ লাগে, আর আমিই বুঝি পাষাণ?

অতুল একশিশি লজেনজ দিয়ে গেছে তোমাকে? বেশ তো, খেয়ে ফেল। চুষে চুষে খেও, লজেনজ গিলে খেতে নেই, গলায় আটকে যেতে পারে।

অতুলের জন্য দুঃখ হয় বড়। রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, কোটরগত চক্ষু, মাথায় নানাবিধ 'ইজমে'র আগুন, পেটে খিদে।

বিবিধ সমস্যায় আকুল বেচারা। অথচ, একটাও সমাধান করবার সামর্থ্য নেই। অথচ গান গাইতে পারে, ভালো ছবি তুলতে পারে, লিখতেও পারে, পেটে বিদ্যেও আছে, তবু কিছু করতে পারছে না। কেন জান? চরিত্র নেই। তাজমহল গড়বার সমস্ত উপকরণ হাতের কাছে আছে, নেই কেবল সিমেন্ট-জাতীয় জিনিস যা সমস্ত জিনিসটাকে গড়ে তোলে, ধরে রাখে। কথার ঠিক নেই, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হরদম ক'রে চলেছে, সংযম নেই, মাত্রা বোধ নেই। সুতরাং কষ্ট পাচ্ছে। সত্যি বড় দুঃখ হয় ওর জন্য।...কিন্তু এ আমি করছি কি! দুটো বাজে। সুতরাং ইতি। এবং—

অসিত

৭

পদ্য ক'রে পত্র লেখা নয়কো তত মন্দ কাজ
ভদ্রভাবে ভাষার গায়ে পরিয়ে দিলে ছন্দ সাজ
একটু যেন ভালই লাগে, করছি নাকো অহঙ্কার,
দেখায় না কি তোমায় ভালো পরলে কিছু অলঙ্কার?
ছন্দধারা তৃপ্ত করে নন্দনিয়া কর্ণমূল
যেমন আঁখি তৃপ্ত করে তোমার দুটি স্বর্ণ-দুল।
বলতে পারো—'পরীক্ষা যে'—সত্যি কথা, জানছি সব
সময় কিছু নষ্ট হবে—হবেই হবে—মানছি সব।
যুগের শেষে কিন্তু সখি আসবে জেনো যুগান্তর
নষ্ট কিছু হয় কি কভু? হয়তো শুধু রূপান্তর।

মনের মাঝে পাগল আছে খেয়াল হল আজকে তার
হঠাৎ মোরে বলছে এসে, কেতাব রাখ বাঁধ সেতার।
ছন্দ-ভরে মেলছে পাখা আজকে মন-পক্ষী মোর।
রাগ কোরো না, রাগ কোরো না, রাগ কোরো না লক্ষ্মী মোর।
এতটা কাল বাস করেছি গহন বনে পুস্তকের
কল্পলোকে ছিলাম নিয়ে অসুস্থ ও সুস্থদের,
মধ্যে মাঝে সময় পেলে নানা রকম পত্রিকায়
খেয়াল খুশি যেতাম নিয়ে ছন্দ-ভরা ছত্রিকায়।
খুশির করতালের সাথে বাজিয়ে নিজ ছন্দ বীণ
স্বপ্ন-মেঘ-মালার দেশে যেতাম ভেসে বন্ধহীন।
হৃদয়-নিয়ে চর্চা কত করেছিলাম কল্পনায়
অলস-নিশি স্বপ্নঘোরে জ্যোৎস্নাময়ী জল্পনায়।
এসেও ছিল বস্তু কিছু ওজন দরে কয়েক মণ।
গয়না-টাকা-রূপের-বোঝা-সমন্বিতা কয়েকজন
সেমিজ-শাড়ী-ব্লাউজ-পরা পায়ে রঙীন অলক্তক,
(রঙীন জুতা কিম্বা কারও) নখের থেকে অলক তক্
সবই ছিল যেমন থাকে মুখোশ-পরা নকল মুখ
চোলাই করা মিষ্টি হাসি ঢালাই করা পাষাণ বুক।
রুগ্ন মোটা শুক্‌নো তাজা উর্বশী ও রম্ভাগণ
এসেছিলেন হেসে হেসে করেছিলেন সম্ভাষণ।
ভেবেছিলাম এ সব নিয়ে বীণার তারে তুলবো তান
এমন সময় হঠাৎ তুমি মাল্য দিলে মূল্যবান।
আচম্বিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফাল্গুনেরি লগ্ন মোর
মূর্ত হ'ল, সফল হ'ল এতকালের স্বপ্ন মোর।
শেষকালেতে বিয়েই হ'ল (উলু দেওয়া হিন্দু মত !)
লজ্জাভরে সবান্ধবে হয়ে গেলাম বিন্দুবৎ।
লক্ষ্ণৌ তো নিঝুম এখন চতুর্দিকে অন্ধকার—
আকাশ-ভরা কাজল মেঘে সবার ঘরে বন্ধদ্বার।
ভাবছি বসে' একলা ঘরে (ভাবলে সময় নষ্ট হয় ?)
ভাবছি বসে অনেক যা-তা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়।...

ভাবছি অনেক ভাববো আরো—স্বপ্নভরা চিন্তা জাল
(সকাল সকাল ভোরে আবার উঠতে হবে কিন্তু কাল)
রঙিন কথা সঙীন কথা অনেক কথা অবান্তর
লিখতে পারি, লিখবো নাকো ঘটবে শেষে মনান্তর ?
ছন্দে যাহা মিলছে নাকো গদ্যে সেটা করছি পেশ
মিল মিলিয়ে লিখতে গেলে আজকে হবে রাত্রি শেষ।

অর্থাৎ—রোজ কডলিভার অয়েল খেও।
রোজ ডিম খেও।
রোজ টন্‌সিলে ওষুধ দিও।
নিয়মিত চিঠি লিখো।

অসিত

৮

তোমার চিঠি পেলাম। মানে, পেয়েই উত্তর দিতে বসেছি। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল তো কে বেশি চিঠি লিখেছে। আমি তো আজ পর্যন্ত মাত্র পাঁচখানি চিঠি পেয়েছি তোমার। গুণে দেখো। অনেক বেশি লিখেছি। নিশ্চয়ই। তুমি যখন নিজে চিঠি না লিখে চুপচাপ বসে থাক তখন বুঝি এসব কথা মনে থাকে না। নিজের বেলায় আঁটিসাটি। আমার চিঠি লিখতে একদিন দেরি হয়েছে অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে অস্থির। বেশ তোমরা।

তোমায় বিয়ে ক'রে আমি অনুতপ্ত কি না জানতে চেয়েছ। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কোরো ঠিক জবাব পেয়ে যাবে। এত দুষ্টু কেন তুমি ? আমার মনে কষ্ট দিলে বেশ একটু তৃপ্তি পাও বোধ হয়, তা না হলে এরকম কটু কথা লিখতে না।

তোমার গলার ঘা সারছে না কেন ? হোস্টেলের ডাক্তারকে দেখাও। গরম জলে নুন বা ফটকিরি দিয়ে গার্গল কোরো রোজ। লিস্টারিন ব্যবহার করতে পার। আশা করি, 'কডলিভার অয়েল' খাচ্ছ। পারগেটিভও নিও মাঝে মাঝে। সকাল বেলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেলো রোজ খালি পেটে।

ডাক্তারি কথা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছ, নয় ? কিন্তু গলার ঘা থাকলে কত রকম বিপদ হতে পারে এ কথা তোমার যদি জানা থাকত এবং তোমার একমাত্র বউটির যদি গলায় ঘা থাকত এবং তিনি যদি বোর্ডিং-বাসিনী হতেন তা

হলে তুমিও এই করতে। এর চেয়ে অনেক বেশি করতে। দু'দিন চিঠি না পেয়েই মেজাজ যা গরম হয়েছে তার থেকেই বুঝতে পারছি। চিঠি তো নয় যেন এক টুক্‌রো 'লু'!

আজ তোমার ঝুনু মাসীর চিঠি পেলাম। অনেক ঠাট্টা করেছে। আমার সব চিঠিগুলো তাকে দেখিয়েছ? স—ব? আচ্ছা, কি ভাবলে সে? তোমার কলেজের বান্ধবীরা চিঠি দেখেন না কি? আমার কোন আপত্তি নেই যদি তোমার লজ্জা না করে, পুরুষরাই নির্লজ্জ শুনেছি। আমি কিন্তু তোমার চিঠি দেখাতে পারব না কাউকে। এমন কি, অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না।

আমাকে এইবার উঠতে হবে। তুমি হপ্তায় ক'খানা চিঠি পেলে খুশি থাকবে জানিও আমায়। তুমিও উত্তর দেবে তো? মুচকি মুচকি হাসছ দেখতে পাচ্ছি। না, তুমি না লিখলে আমি লিখব না।

হঠাৎ সত্যেন দত্তর একটা কবিতার একটা লাইন মনে পড়ে গেল। কবিতাটার নাম 'সাড়ে চুয়াত্তর'। "একটি তোমার চুমার লাগি পরান কাঁদে হায়।" ইতি—

অসিত

৯

ভাই অসিত,

কাল তোমার স্ত্রী শ্রীমতী হাসির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছি হোস্টেলে গিয়ে। সিনেমায় ভাল একটা বই হচ্ছে, নিয়ে যেতে চাইলাম, রাজী হল না। এর আগের দিনেও ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম গলাটা দেখাবার জন্যে, যেতে চায়নি। কেন যেতে চাইছে না জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না, চোখ নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসে খালি। অথচ দেখ—না থাক—তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কত ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে তোমার কাছে অন্তত বক্তৃতা করতে চাই না। উইল ইউ প্লীজ ডু ওয়ান থিং? তোমার তো লেখবার শক্তি আছে জানি। (যদিও তা কারো মত পরিবর্তন করতে পারে কি না এ প্রমাণ এখনও পাই নি), সে শক্তিটা তোমার বিবাহিতা পত্নীর উপর প্রয়োগ ক'রে দেখতে পার? আমি যে বাঘ-ভাল্লুক গণ্ডার জাতীয় কোনও হিংস্র প্রাণী নই, আমি যে বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত যুবক একজন এবং সর্বোপরি তোমার বন্ধু, এ কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবে কি? অবশ্য যে পারিপার্শ্বিকে তুমি তাকে ফেলেছ সেখানে যদি শান্তি রক্ষা

ক'রে চলতে হয়, তা হলে হাসি যে রাস্তা ধরেছে তা-ই একমাত্র রাস্তা। ও ইয়েস! ওই শ্লেট-মাসীমা-দারোয়ান—হেল! ওরকম পরিস্থিতিতে মনে যাই থাক, বাইরে চোখ নীচু ক'রে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে 'না' বলা ছাড়া উপায় নেই। এর প্রতিকার একমাত্র তুমিই করতে পার, কারণ তুমি তার স্বামী—লিগাল হাস্‌ব্যাণ্ড। উইল ইউ প্লীজ ট্রাই? তোমাদের ফোটো এখনও হয় নি। হলেই পাবে। ইতি—

অতুল

১০

অতুল ডাক-যোগে তোমার কাছেও হানা দিয়েছে নাকি? আমিও তার চিঠি পেয়েছি একটা। উত্তরও দিয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। সে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে একটু আধটু বেরোতে চায়। যাওয়া না-যাওয়া অবশ্য তোমার ইচ্ছা। আমি কোন আপত্তি বা অনুরোধ করছি না। কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর শ্রদ্ধাটা আমার আন্তরিক। মৌখিক নয়। কার সঙ্গে তুমি কথা বলবে, কার সঙ্গে বেড়াবে, কি পাড়ের শাড়ী বা কোন্ ছিটের জামা পরবে তা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। চিঠির উত্তর দিও তাকে। যা লিখবে ভেবে-চিন্তে সাবধানে লিখ। কারণ লোকটি একটু বাঁকা ধরনের, সহজ কথা সহজ ভাবে নিতে পারে না। মহেন্দ্র ঠিক একেবারে উল্‌টো। মহেন্দ্র কি এসেছিল তোমার কাছে? আসবে ঠিক একদিন। মহেন্দ্রর বউ চিত্রা সেদিন চিঠি লিখেছিল একটা। লিখেছিল, "উনি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে' হাসির খোঁজ নিতে পারেন নি। সময় পেলেই যাবেন।" আসবে একদিন ঠিক। মহেন্দ্র অতুলের ঠিক উল্‌টো। অতুলের নিন্দা করছি না আমি, ও কি রকম তাই শুধু বলছি। তা বলে তুমি যেন ওর সঙ্গে অভদ্রতা কোরো না। সুসঙ্গত শিষ্টাচার সকলেরই প্রাপ্য।

কাল আমার শরীরটা ভাল ছিল না। সারা দিন-রাত শুয়েই কেটেছে। একবার তোমাকে চিঠি লিখব ভাবলাম। কিন্তু তোমার চিঠি এল না বলে' লিখলাম না। গত বৃহস্পতিবার চিঠি পেয়েছি তোমার। আজ রবিবার। এ অবস্থায় শ্রীমতী হাসি একদা যা লিখেছিল তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—"এখনও কোন চিঠি লিখলে না কেন? ইচ্ছে করে না বুঝি! এর মধ্যেই ভুলে গেলে?...চিঠি না পেলে ভয়ানক মন খারাপ লাগে, পড়াশোনা মোটেই হবে না তা হলে বলে দিচ্ছি। যদি লিখতে ভাল না লাগে তবে লেখবার দরকার নেই। মিছি-মিছি একজনকে বিরক্ত করতে

চাই না। তুমি যাতে শান্তিতে থাক আমার তাই করা উচিত। দুঃখ তো দিতে চাই না। কেমন আছ? শরীর ভাল আছে তো? খাওয়ার কোনও অযত্ন কোরো না, তা হলে আমি দুঃখিত হব। চিঠি লিখ লক্ষ্মীটি। বিয়ে যখন করেছ আমার মতো বিশ্রী লোককে, দুঃখ ক'রে আর কি করবে বল। গতস্য শোচনা নাস্তি। ...সত্যি ক'রে লিখো তো আমাকে পেয়ে তোমার অনুতাপ হয়েছে কি-না। ...ভয়ানক খারাপ লাগে।"

অসিত

১১

এইমাত্র লাইব্রেরি থেকে ফিরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার কাশি সারছে না কেন? বড় চিন্তার কারণ হলো তো। তুমি অতুলের সঙ্গে যাও না হয় একবার ডাক্তারবাবুর কাছে। গলাটা দেখিয়ে এস। আমি রোজ রাত জেগে পড়ি এ খবর কে দিলে তোমাকে? ঠাকুরপোরা? তা পড়ি। না পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। দিনের বেলায় পরীক্ষার পড়া পড়ি। রাত্রে পড়ি নিজের পড়া। কিন্তু তোমার কাশি সারছে না কেন বল ত? কডলিভার অয়েল খাচ্ছ কি-না?

কলেজের ঘন্টা পড়ে গেল, চললুম ক্লাসে। বেশি কিছু লেখা হ'ল না আজ।

অসিত

১২

উপর্যুপরি তোমার দুটো চিঠি পেলাম। ভারী বদান্য যে! কাশি সেরেছে শুনে নিশ্চিন্ত হলাম না কিন্তু। মনে হচ্ছে, আমাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যেই তুমি ও-কথা লিখেছ বোধ হয়। টনসিল অত সহজে সারে না। অতুলের সঙ্গে ডাক্তার বন্ধুর ওখানে যাওয়াটা এড়াবার জন্যেই এ কৌশল করলে না কি? অতুল ফোটো দিয়ে গেছে জেনে সুখী হলাম। ফোটো সম্বন্ধে মেয়েদের মতামত ওরকম তো হবেই। মেয়েরা পুরুষদের সুন্দর দেখে আর পুরুষেরা মেয়েদের সুন্দর দেখে—এই তো চিরন্তন নিয়ম। অন্যরকম হলেই আশ্চর্য হতুম। আশ্চর্য হয়েছি কিন্তু আর একটা ব্যাপারে। আমার এই কড়া-পড়া লম্বা পায়ে এমন কি 'শ্রী' হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে একেবারে শ্রীযুক্ত ক'রে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ ক'রে বসেছ! বরং

তোমাদের পায়ের শ্রী আছে। আল্‌তাপরা নূপুর-বাজা নাগরা-ঢাকা সুশ্রী সুন্দর সুকোমল, জয়দেবের ভাষায় 'পদপল্লব-মুদারম্‌'। আমাদের শ্রীহীন পা'কে শ্রীচরণ বললে উপহাসের মতো শুনতে হয়। নিজেদের পা দু'টি না হয় চরণারবিন্দ, তা ব'লে আমাদের পা নিয়ে ঠাট্টা করবে? অত অহঙ্কার ভাল নয়।

আচ্ছা, অতুলের বাপারে অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? তোমাকে সাবধানে চিঠি লিখতে বলেছি বলে' এমন কিছু ইঙ্গিত করিনি যে তুমি ইতিপূর্বে তাকে অসাবধানে চিঠি লিখেছ। চিঠি লিখেছ কি না তাও তো জানি না। তুমি লিখেছ —'আমি তোমার কোনও বন্ধুদের মাঝখানে থাকতে চাই না', কিন্তু আমার কোন বন্ধু যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের মাঝখানে এসে পড়তে চায় তা হলে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো। তাকে যদি প্রশ্রয় দিতে না চাও তা হলেও তো ভদ্রভাবে সেটাকে দাঁড় করাতে হবে। একেবারে জিভ কেটে ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়াও যদি তা হলে ভারী হাস্যকর হবে যে। দু-চারটে কথার পর একটি ছোট্ট নমস্কার ক'রে বলতে হবে—"আপনি আসাতে খু-উ-ব খুশি হয়েছি! কিন্তু এখন তো বসতে পাচ্ছি না বেশিক্ষণ। কাজ আছে একটু। আচ্ছা নমস্কার"—এই হল কায়দা। আমিই বা অতুলকে কি বলে' বলি, হাসি তোমাকে পছন্দ করছে না, অতএব তফাৎ যাও। সে আমি পারব না। এখন সাতটা বাজতে কুড়ি মিনিট। আমার সাতটার সময় একজনের সঙ্গে পড়তে যাবার কথা। উঠছি এখন। আজ রাত্রে এসে শেষ করব চিঠিখানা।

*   *   *   *

…পড়া শেষ ক'রে ফিরে এলাম। সাড়ে ন'টা বেজেছে। এখুনি খেতে হবে। অতুলের কথা হচ্ছিল তো? সেইটে শেষ করে দি। অর্থাৎ বক্তৃতা দেব। প্রস্তুত হও। আগের একটা চিঠিতে দিয়েওছি কিঞ্চিৎ। মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমাকে ভুল বুঝো না। যার সঙ্গে খুশি তোমার আলাপ করতে পার (সে আমার বন্ধু শত্রু যাই হোক), আমি আপত্তি করব না একটুও। আমি তো কত লোকের সঙ্গে আলাপ করি, তুমি তো আপত্তি কর না। তুমিও যেমন আমাকে বিশ্বাস কর, আমিও তেমনি তোমাকে বিশ্বাস করি। কোন রকম জবরদস্তি চালাবার ইচ্ছে নেই তোমার উপর। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার রুচি শোভন হবে বলেই আশা করি। শিক্ষার দরকার তো ঐখানেই। পৃথিবীতে বাস করতে গেলে সব রকম জীবের সংস্পর্শে আসতেই হবে। তার মধ্যে ভালো মন্দ, কিছুভাল, কিছুমন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে। মন্দ লোকের সংসর্গ থেকে আমরা আত্মরক্ষা করি

শিক্ষার সাহায্যে। তুমি যখন শিক্ষাবর্মাবৃত (বৃতা ?) তখন রণস্থলে যেতে ভয় পাও কেন ? নেহাৎই যদি ভয় হয়, সঙ্গে তো আমি আছিই, কেউ বলাৎকার করলে রক্ষা করব। আমার তূণে বাণও আছে, বাহুতে শক্তিও আছে। সুতরাং মা ভৈঃ।

১৩

ভাই অসিতবরণ,

গতকল্য তোমার স্ত্রীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে চিত্রাকে লইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপিস হইতেই পাড়ি দিয়াছিলাম বলিয়া তাহা আর হইয়া উঠে নাই। একটা কাণ্ড করিয়াছি। চিত্রা আপিসে আমার খাওয়ার জন্য গোটা দুই মুড়ির লাড়ু ও কয়েকটা পিঠা দিয়াছিল। সেগুলি তোমার বউকে দিয়া আসিয়াছি। শুধু হাতে যাইতে মন সরিল না। তোমার স্ত্রীকে একটু রোগা দেখিলাম, খুস খুস কাশিও আছে। এ সব খবর তুমি নিশ্চয় জান। ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়াছ। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। তোমার স্ত্রীটি একটু বেশি লাজুক দেখিলাম। কলেজে-পড়া মেয়ে আর একটু 'ডাঁটো' হইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে লজ্জাবতী লতাকেও হার মানাইয়া দেয়। আমাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। যদি যায় চিত্রা নিজে আসিয়া লইয়া যাইবে। তোমার আশা করি আপত্তি নাই। তোমার যে আপত্তি নাই এই মর্মে তুমি হাসিকে এবং হোস্টেলের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে পত্র দিও। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

মহেন্দ্র

১৪

তুমি হয়তো ভাবছ আমি রাগ করি নি। তবে তোমার চিঠির কয়েকটা কথায় একটু ব্যথা পেয়েছি বই-কি। রাগ আর ব্যথা ঠিক এক জিনিস নয়।

তুমি লিখেছিলে—"মহেন্দ্রর বাড়ী আমি যাব না এ কথা বলার যদিও আমার 'রাইট' নেই কিন্তু এটা বোধ হ[illegible] বলতে পারি, তার বাড়ীতে আমার যেতে বিশেষ ইচ্ছে নেই।"

উপরোক্ত বাক্যটি লিখে তুমি আমাকে এবং নিজেকে উভয়কেই অবনত করেছ। নিজেকে করেছ এই হিসাবে যে, যা করবার ইচ্ছে নেই তা জোর ক'রে বলবার 'রাইট'ও নেই যেন তোমার। অর্থাৎ তুমি যেন সর্বতোভাবে দাসী। আর আমাকে ছোট করেছ, এই হিসেবে, যেন আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে, তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করবার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত হরণ ক'রে বসে আছি। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি তাই ?

মহেন্দ্র নানা দিক দিয়ে হয়তো সভ্য সমাজের অনুপযুক্ত। তার না আছে রূপ, না আছে অর্থ, না আছে বিদ্যা। ম্যাট্রিকুলেশন-পাশ কেরানী মাত্র সে। কিন্তু তার যে জিনিসটার পরিচয় আমি পেয়েছি তা তার হৃদয়। অতবড় হৃদয়বান লোক বড়-একটা দেখিনি। অনেক দুঃখের দিনে অনেক বেদনাময় সন্ধ্যা-প্রভাতে তার যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা তুমি করনি। তোমার যদি করবার ইচ্ছে না থাকে কোরো না। এতে আমার রাগ বা দুঃখ হবে কেন ? তুমি যে পরিবারে মানুষ এবং তদনুসারে তোমার মানসিক গঠন যে প্রকার হয়েছে তাতে মহেন্দ্রদের সঙ্গে তোমার হয়তো খাপ খাবে না। চিত্রার খাচ্ছে না। সে বড়লোকের মেয়ে। মহেন্দ্রদের বাড়ীর দারিদ্র্যজনিত অনিবার্য নোংরামি সে সইতে পারছে না। এবং এই নিতান্ত বাহ্যিক কারণে তার অসহিষ্ণুতা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, আসল মহেন্দ্রকে 'ও চিনতেই পারবে না হয়তো কখনও। জলন্ত ঘুঁটের ভিতরও যে খাঁটি আগুন আছে এ খবর হয়তো কোন দিনই পৌঁছাবে না ওর কাছে। ধোঁয়াকে গাল পাড়তে পাড়তেই ওর জীবন কাটবে।

আমার কি মনে হয় জান ? পৃথিবীতে যত খাপ খাইয়ে চলতে পার ততই সুবিধা। ইচ্ছা এবং উদারতা থাকলে সর্বস্থানেই নিজের একটা আসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। এমন কি, মহেন্দ্রর বাড়ীতেও। অবশ্য ইচ্ছা থাকা চাই। তোমার যখন সেইটেরই অভাব তখন আর কথা কি।

'ফিলজফি' তুমি বুঝতে পারছ না ? লতিকার দাদা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চান ? বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। লতিকা আর তুমি এক ঘরেই থাক ? তা হলে তো তিনি আমার সতীন। লতিকার দাদার চরিত্র কতটা বিশুদ্ধ তা নিয়ে অত লম্বা বক্তৃতা করার কোন দরকার ছিল না। তাঁর কাছে পড়তে যদি তোমার নিজের আপত্তি না থাকে, আমার আপত্তি নেই। আমি তোমাদের মাসীমাকে চিঠি দিয়ে দিলাম এই সঙ্গে, তিনি যেন তোমাকে বিজয়বাবুর কাছে পড়তে দেন।

দেখ, বাইরে তুমি যত লোকের সঙ্গেই মেশ না কেন আমার কিছু ভয় নেই কেন জান ? আমি নিশ্চিন্ত আছি যে। যে অন্তরের অমরাবতী তুমি আলো

ক'রে আছ সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা। সেখানে একাকিনী অন্তঃপুরিকা তুমি। আর কেউ নেই, কেবল তুমি আর আমি। তাই আমার কোন ভাবনা নেই। এত সাহস আছে তোমার ?

এর পর 'চুমু নাও'টা বড় খেলো শোনাবে তাই আর লিখলাম না। ইতি—

অসিত

১৫

ভাই অসিত,

তুমি খবরের কাগজের যে 'কাটিং'টা পাঠিয়েছিলে তা দেখে দরখাস্ত করেছিলাম একটা তোমার অনুরোধে। ফল কি হয়েছে শোন। সে যুগে কুলীন ব্রাহ্মণরা যেমন পৈতেকে আস্ফালন করতেন এ যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা তেমনি ডিগ্রীটা আস্ফালন করি। আমার মনের কথা যদি শুনতে চাও, আমার লজ্জা করেছিল ওগুলো পাঠাতে। তবু তোমার অনুরোধেই পাঠিয়েছিলাম। 'ইণ্টারভিউ' করবার আহ্বান এল। গেলাম। কি জিজ্ঞাসা করলে জান ? আমার বংশ-পরিচয়। অর্থাৎ শুধু ডিগ্রী থাকলেই চলবে না, পেডিগ্রীও চাই। আমরা পেডিগ্রী দেখে জামাই করব, কুকুর পুষব, কেরানীও রাখব। আমার পেডিগ্রী নেই, সুতরাং আমার হল না। আমাকে এই অপমানজনক অবস্থায় ফেলেছিলে বলে' আই কার্স ইউ। প্রাইভেট ট্যুশনি ক'রে দোকানের বিজ্ঞাপন লিখে বেশ তো চলছিল আমার। একটা পেট চালিয়ে নিতাম এবং নেবও কোনক্রমে। একাধিক উদরের চিন্তা ইহজীবনে করবার আর সম্ভাবনা নেই। যখন অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণ ছিলাম, যখন নব-বধূর কল্পনা-বিলাসে সমস্ত মন মেতে উঠত, তখন বহু নির্বাচনের পর যে মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল তাকে আমি পাইনি। বাদ সেধেছিল কুষ্ঠি। অর্থাৎ সে-ও এক রকম পেডিগ্রী, অদৃশ্য পেডিগ্রী, যার উপর আমার কোন হাত নেই, আমার পুরুষকার বিচলিত করতে পারে না যাকে, অথচ যা আমার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে ! উঃ কি দেশেই জন্মেছি ! কবির কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য—'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি।'

আর একটা কথা। তোমার বউ কিছুতে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে যেতে রাজী নয়। তুমি যে তাকে যেতে বলেছ এ কথাও তার মুখে শুনলাম। এর পর আর কি করা যায় বল ! ডাক্তার বোসের সঙ্গে অবশ্য আমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁকে

অনুরোধ করলে তিনি হোস্টেলে গিয়েই হাসির গলাটা দেখে আসবেন—ও ইয়েস, বললে নিশ্চয়ই আসবেন—কিন্তু তাঁকে অনুরোধ করব কি না ভাবছি। তোমার বউ আমার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছে তার সিকির সিকিও যদি ডাক্তার বোসের সঙ্গে করে, মর্মান্তিক হবে সেটা আমার পক্ষে। তোমার চিঠিতে যদি ভরসা পাই যে, হাসি ভদ্রভাবে ডাক্তার বন্ধুকে তার গলাটা দেখাবে, তা হলে হোস্টেলেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করব তাঁকে। চিঠির উত্তর দিতে দেরি কোরো না, অবশ্য যদি উত্তর দেওয়ার মতো কিছু থাকে তোমার। হোয়াট আই মীন ইজ দিস্—এটা মনে কোরো না যেন আমি তোমাকে উত্তর দিতে বাধ্য করছি। তোমার যদি নিজের উত্তর দেওয়ার তাগিদ না থাকে দিও না। ইতি—

অতুল

১৬

তোমাকে গত চিঠিতে অনেক বাজে কথা লিখেছি বলে আমি লজ্জিত, নির্জন ঘরে বসে যা মনে এল লিখে গেলাম অনর্গল। কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি। তুমিও তো কম বাজে কথা লেখনি। আচ্ছা, তুমি বার বার লেখ কেন বল তো যে, তোমার রূপগুণ কিছু নেই। তোমার রূপ যে কত তা তোমাকে বোঝাব কি করে। মৈমনসিংয়ের এক গ্রাম্য কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—আমার চক্ষু নিয়্যা তুমি নয়ন ভইর‍্যা দেখ। পণের টাকা দাওনি বলে তোমার লজ্জা হয়েছে? তোমার বাবার টাকা নিয়ে বিলেত গেলে আমার গৌরব বাড়ত এই তোমার বিশ্বাস? ছি, ছি, আমাকে তুমি এত ছোট ভাব?

কাল রাত্রে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখলাম, তুমি যেন কাঁদছ সেই চিঠিটা পড়ে। সত্যি কেঁদেছ না কি।…ইচ্ছে করছে এ সময় তোমাকে কাছে পেতে। কবে পাব জানি না। পূজোর সময় সত্যিই এবার যাওয়া হবে না। এই সময় এই নির্জন ঘরে এস না একবার। সত্যি যদি চোখে জল থাকে মুছিয়ে দি।

আমার হাসি—আমার নয় তো কার? আমার—আমার—নিশ্চয় আমার—কারও নয়। সন্দেহ আছে নাকি? তুমিই ভাল করে বলতে পার তুমি আমার কি না। আমার না? আমারই। নয় বই-কি!

মনের ভিতর এত অজস্র কথা রঙীন হয়ে ফুটে উঠছে যে লেখনীর সাধ্য নেই তাদের বর্ণনা করে। লেখনীর মুখে তাদের আনতেও ভয় করে। সস্তা কথার সাজ পরে মানাবে না তাদের। সত্যিই তারা অবর্ণনীয়।

তুমি বর্ষার কথা জিজ্ঞাসা করেছ। এখানেও বর্ষা নেমেছে বই-কি। তুমি 'মেঘদূত' পড়েছ? "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘমেদুর অম্বর পরিব্যাপ্ত ক'রে, বিরহী কবির যে মর্মবেদনা বাণীমূর্তিতে সেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল আজ তা আমাকেও পীড়িত করছে। আজ সত্যিই অনুভব করছি মেঘদূত কেন রচিত হয়েছিল।

নাঃ—চিঠিতে এসব কথা লিখতে ভাল লাগছে না। কেন বর্ষার কথা তুলেছ তুমি? নিজে দূরে সরে থেকে বর্ষার বিষয়ে খোঁজ করা হচ্ছে। দুষ্টু! দেখি, মুখ দেখি। হাতটা সরাও না···।

অসিত

পুনশ্চ। আবার তুমি 'শ্রীচরণেষু' লিখেছ? 'প্রাণেশ্বর' বা 'জীবনবল্লভ' লেখার দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে একেবারে শ্রীচরণেষু! আমার পদযুগলকে পদে পদে এমনভাবে অপদস্থ করবার মানে? সে বেচারারা তো কোন পদবীর প্রত্যাশা করে না। ফের যদি শ্রীচরণেষু লেখ তা হলে সত্যি বলছি, আমি মাথা কামিয়ে টিকি রেখে দেব, পাঞ্জাবির বদলে নামাবলী গায়ে দেব এবং প্যাথলজি পড়া ছেড়ে পুরোহিত-দর্পণে মন দেব। ইতি—

অসিত

১৭

কালকের চিঠিতে তোমায় একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। অতুল লিখেছে, সে তার একজন বন্ধু ডাক্তার বসুকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে হোস্টেলে। ডাক্তার বসু একজন থ্রোট স্পেশালিস্ট। যদি নিয়ে যান গলাটা দেখিও তাঁকে। অভদ্রতা কোরো না যেন। তোমার মাসীমাকেও এই মর্মে চিঠি দিচ্ছি। আচ্ছা, হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে তোমরা মাসীমা বল কি ক'রে? লজ্জা ক'রে না? আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে মেসোমশায় ব'লে ডাকবার কথা ভাবতেই পারি না আমরা।

···হাসি এখন কি করছে? আমার হাসি? এখন সাড়ে দশটা রাত। হোস্টেলের আলো নিবে গেছে নিশ্চয়। গল্প করা হচ্ছে, না ঘুম? এখানে এখন কি কাণ্ড হচ্ছে জান? তুমুল কাণ্ড। বৃষ্টি হচ্ছে। খুব আকাশ ভেঙে মুষলধারা তা নয়, তবু কিন্তু তুমুল। অবিশ্রান্ত রিম ঝিম শব্দ, ভিজে হাওয়ার ঝাপটায়

ছিটকিনিহীন জানলার কপাটটা খুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে আর তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি তিমির-অবগুণ্ঠনে ঢাকা বিরহিণীর রূপ, অবলুপ্ত হয়ে গেছে গ্রহ-নক্ষত্র সব, অন্ধকারের বুকে গুমরে উঠ্‌ছে কান্না। একা ঘরে বসে আছি…।

একটা মশা এসে ভারি বিরক্ত করে তুলেছে। বার বার তাড়িয়ে দিচ্ছি, তবু বার বার কানের কাছে এসে তান তুলছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটের উপরও বসতে চাইছে। 'মশকদূত' পাঠিয়েছ না কি? তোমার ঠোঁট থেকে কিছু চুরি করে এনেছে, আমার ঠোঁটে সেটা রেখে যেতে যায়? যদিও পড়েছি যে মশা এক মাইলের বেশি উড়ে যেতে পারে না, কোলকাতার মশার পক্ষে লক্ষ্ণৌ উড়ে আসা অসম্ভব, তবু এই অসম্ভবটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে। ইতি ডট ডট ডট। পুনশ্চ ড্যাশ।—

অসিত

১৮

আজ কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি। আশা করেছিলাম, তোমার চিঠি পাব। বিস্কুটের টিনটি খালি দেখে হতাশ হলাম, একেবারে খালি অবশ্য ছিল না, তোমার বান্ধবী পাখী স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে চিঠি লিখেছেন একটি। বিস্কুটের টিন বুঝতে পারছ না নিশ্চয়। একটি তোবড়ানো বিস্কুটের টিন আমাদের লেটার বক্স। তাতেই পিয়ন তোমাদের চিঠি দিয়ে যায়। পাখীর সঙ্গে তুমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে সেবার, সেই জোরেই চিঠি লিখেছেন তিনি। স্বল্প পরিচয়ে ঠিক বুঝতে পারিনি ইনি কোন্ জাতের পাখী। পাখী অনেক রকম হয় তো। যথা—শিকারী পাখী (বাজ), বাহারে পাখী (হীরামন), বাচাল পাখী (কাকাতুয়া), গায়ক পাখী (শ্যামা, দোয়েল), দুষ্টু পাখী (বউ কথা কও), উপকারী পাখী (শকুনি), গৃহস্থ পাখী (শালিক), ডাকাত পাখী (কাক), নোংরা পাখী (কাদা খোঁচা), সুখের পাখী (পায়রা) ইত্যাদি, ইত্যাদি। তোমার বন্ধুটি কোন্ জাতের পাখী? এখনও ছাড়া আছেন, না কোন পিঞ্জর আলো করেছেন? বিশেষ কিছুই জানি না তাঁর সম্বন্ধে, তবে একটা জিনিস আন্দাজ করছি, তিনি আমার হিতৈষিণী একজন। লিখেছেন, লতিকার দাদা বিজয়বাবুর সহায়তায় তোমার ফিলজফি জ্ঞান বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা ক'রে আমি নাকি খুব বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। কারণ লতিকাগ্রজটি একটু নাকি বাতিকাতুর। প্রেমে পড়ার বাতিক আছে। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে একটা উত্তর দিয়ে দিলাম এবং লিখে দিলাম যে বিজয়বাবু হাসিকে ফিলজফি পড়াবেন কি না তা হাসি নিজেই ঠিক করবে। এ

বিষয়ে আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে হাসিকেই বলবেন। এ ছাড়া আর কি লিখতে পারি বল।

অনন্ত ভালবাসার নিদর্শন অসংখ্য চুম্বন পাঠাবার অদম্য ইচ্ছা অকুতোভয়ে ব্যক্ত করছি। এর বেশি আর কিছু করবার উপায়ও নেই আপাতত।

অসিত

১৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশা করি ভাল আছেন। কাল হাসি আমাদের বাড়ী এসেছিল। আমরা তো অপ্রস্তুতের এক শেষ। একে তো আমরা গরীব মানুষ, আপনার বউকে যথাযোগ্য খাতির করবার অবস্থাই তো আমাদের নয়, তাও যদি আগে থাকতে জানা থাকত, যা-হোক কিছু ব্যবস্থা করে রাখতাম। উনি যেদিন আনতে গেলেন সেদিন হাসি এল না। গলায় ব্যথা না কি হয়েছিল। আজ বিকেলে তিনটার সময় হঠাৎ লতিকার সঙ্গে এসে হাজির। সঙ্গে লতিকার দাদা বিজয়। লতিকা যদিও পড়ার জন্য হোস্টেলে থাকে কিন্তু ওদের বাড়ি আমাদের পাড়ায়। বাড়িতে পড়ার অসুবিধা বলে' লতিকার স্বামী তাকে খরচ দিয়ে হোস্টেলে রেখেছে। লতিকার বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল নয়, আমাদেরই মতো। দেখুন, বকর বকর ক'রে কি যা-তা বাজে কথা লিখে যাচ্ছি। হাঁ, যে কথা বলছিলাম। হাসি আসাতে আমরা তো অপ্রস্তুত। উনি তখনও অফিস থেকে ফেরেন নি। আমি ময়লা চিরকুট একটা কাপড় পরে' কলতলায় বসে' বাসন মাজছি। ঠিকে ঝিটা ক'দিন থেকে কামাই করছে। কলে জল আবার বেশিক্ষণ থাকে না, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে না নিলে মহা আতান্তরে পড়তে হয়। কি করি, হাসিকে খালি বারান্দার উপরেই ভাঙা মোড়াটার উপর কম্বলের আসন পেতে দিলাম এবং বাসন মাজতে মাজতেই গল্প করতে লাগলাম তার সঙ্গে। আমরা মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়ার ধার তো কখনও ধারিনি, হাসির সঙ্গে ঘর-কন্নার গল্পই করলাম। লতিকাদের গল্পই করলাম অনেক। লতিকা আর বিজয়বাবু হাসিকে আমাদের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে নিজেদের বাড়ী চলে গেল। লতিকার দাদা বিজয়বাবু ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল শুনেছি। তার বিয়ে নিয়ে কিছু গোল হয়েছে। বিজয়ের মনোগত ইচ্ছে লেখাপড়া জানা একটি সুন্দরী বউ হোক। কিন্তু লেখাপড়া জানা

সুন্দরী মেয়েদের বাপেরা ওরকম ঘরে মেয়ে দেবে কেন, আপনিই বলুন। বিজয় ছেলে ভালো হতে পারে কিন্তু অবস্থা যে খুব খারাপ। ভাগ্যে লতিকা মেয়েটি দেখতে ভালো, ম্যাট্রিক পাশ, তাই প্রায় বিনা পণে একটি বড়লোকের বিদ্বান ছেলে তাকে বিয়ে করেছে। বিজয়ের অবস্থা খারাপ, তাই ভাল মেয়ে পাচ্ছে না। তা ছাড়া, বিজয়ের বাপের ভিরকুটিও আছে কিন্তু। তাঁর মনোগত ইচ্ছে, বেশ মোটা পণ নেওয়া, তা সে মেয়ে যেমনই হোক। কালো কুচ্ছিৎ একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকটা ঠিক হয়েছে শুনলাম। বিজয় কিন্তু খুব আপত্তি করছে নাকি। আপনার হাসির সঙ্গে এইসব গল্পই করলাম অনেকক্ষণ ধরে। খুব ভালো লাগল হাসিকে। চমৎকার মেয়ে। মুচকি হেসে হেসে অনেক গল্প করলে আমার সঙ্গে। লেখাপড়া জানে বলে লতিকার হাবে ভাবে যেমন একটু অহঙ্কারের ভাব আছে, হাসির তা মোটে নেই দেখলুম। বাড়ীতে মুড়ি আর শসা ছিল। তাই দিলাম। একটি জামবাটি মুড়ি পার করলাম দুজনে মিলে শসা আর আচারের চাক্‌না দিয়ে। গলাটা এখনও সারেনি তেমন। খুক্ খুকে কাশি রয়েছে একটু। গরম গরম ঘি আর গোলমরিচ খেতে বলেছি। আমার ইচ্ছে ছিল রাত্তিরটা আমাদের এখানে থেকে চারটি মাছ ভাত খেয়ে যায়। কিন্তু হোস্টেলে ছুটি নিয়ে আসেনি। একটু পরেই বিজয় এসে নিয়ে গেল। ওঁর সঙ্গে আর দেখা হল না। খুব ভাল লেগেছে হাসিকে আমার। ওঁকে বলব আর একদিন সময় ক'রে নিয়ে আসতে। আপনি হোস্টেলে ছুটির বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। আমার প্রণাম নিন।

চিত্রা

২০

যে-মেয়েটির নাম কিছুতে বলব না বলেছি, তার নাম জানবার এত আগ্রহ কেন? তার নাম না বললে ওষুধ খাবে না? ডাক্তার দেখাবে না? এ তো মহা আবদার দেখছি তোমার। না গো না, তুমি যা ভাবছ মোটেই তা নয়। চিত্রা আমার সম্বন্ধে যত উচ্ছ্বসিতই হোক, তুমি যা আন্দাজ করছ তা ভুল। চিত্রা সত্যিই পতিব্রতা নারী। তুমি যা ভাবছ তা যদি হত তা হলে সে অত উচ্ছ্বসিত হত না, চুপটি ক'রে থাকত। যাক, তোমার সন্দেহ বাড়িয়ে আর লাভ নেই। শেষকালে কি একটা ক'রে বসবে! যা বোকা তুমি। আচ্ছা, শোন তবে।

কল্পনা মেয়েটির নাম। শুধু আমি নয়, পৃথিবীর সমস্ত কবিরা এর প্রেমে

পড়েছে। একে সম্বোধন ক'রেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।' কি দুষ্টু দেখ! রবীন্দ্রনাথের মতো লোককেও ভুলিয়ে ভালিয়ে নৌকোয় তুলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিল। আমারও আনাচে আনাচে ঘুরে বেড়ায় প্রায়ই। সেদিন রাত্রে শোবার আগে জানলা খুলে দেখতে গেলাম আকাশের কি অবস্থা। দেখলাম, সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। হঠাৎ সরে গেল খানিকটা মেঘ, পরদা সরে গেল যেন, জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠল দুটো তারা, দুটো চোখ যেন। তার চোখ। মিট মিট ক'রে আমার দিকে চেয়ে বললে, আসবে এখানে? এস না, বেশ মজা হয় তা হলে! চলে গেলাম নিমেষে। মেঘের পিছনে রহস্যময় যে নক্ষত্রলোক আছে, সেইখানে ঘুরে বেড়ালাম ছায়া-পথে-পথে, সাঁতার কাটলাম আকাশ-গঙ্গায়, জ্যোতির্ময় হাঁসের পিঠে চড়ে বীণা-মণ্ডলের কাছাকাছি হয়েছি, এমন সময় হঠাৎ দড়াম ক'রে বন্ধ হয়ে গেল জানলার কপাট দুটো! ফিরে এলাম মর্ত্যলোকে, আবার লক্ষ্ণৌ শহরের মেসে।……

তোমরা আমাকে 'অসিত' বলেই জান, ও কিন্তু আর একটা নাম দিয়েছে আমার। বিন্দুসাগর গুপ্ত। বিন্দুসাগর গুপ্তর লেখা 'জনয়িত্রী' গল্পটা তোমার ভাল লেগেছিল শুনেছিলাম।

এইবার হল তো? উঃ কি হিংসুটে তুমি। আচ্ছা, তুমি কি ক'রে ভাবতে পারলে যে, আমি তোমাকে ছেড়ে এখন অন্য মেয়েকে ভালবাসছি।

তোমাকে কোন সম্বোধন করি না বলে তোমার বান্ধবীরা হতাশ হয়েছেন না কি! তোমার বান্ধবীদের হতাশা নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে নেই তত। তবে তুমিও যদি হতাশ হয়ে থাক তা হলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে বই-কি। সত্যি তুমি চাও না কি যে আমি তোমাকে সম্বোধন করি কিছু একটা? নিরামিষ 'কল্যাণীয়াসু' নিশ্চয়ই চাও না, যদিও তোমার 'শ্রীচরণেষু'র পালটা জবাবই হচ্ছে ওই। কিন্তু তুমি কিম্বা তোমার বান্ধবীর দল এতে খুব খুশি হবেন মনে হয় না; 'আমার প্রাণের হাসি', 'আমার দুষ্টু হাসি', 'আমার সফল স্বপ্ন', 'ওগো আমার মনের কথা', 'ওগো আমার সই'—এসব চলবে কি? কিম্বা আরও থিয়েটারি ধরনের যদি চাও, 'প্রাণেশ্বরী', 'প্রিয়তমে', 'প্রাণাধিকে', 'জীবিতেশ্বরী'—তাও লেখা যেতে পারে যদিও বানানগুলো একটু কটমট। অনেকে দেখেছি শরীরের মোক্ষম মোক্ষম অংশগুলির সঙ্গে প্রেয়সীর উপমা দিয়ে সুখ পান। 'আমার হৃদয়-রানী', 'আমার নয়ন-মণি' ইত্যাদি। কিন্তু হৃদয় ও নয়ন ছাড়া শরীরের মোক্ষম (অর্থাৎ vital) স্থান আরও তো অনেক আছে। তাদের আশ্রয় নিলে নূতনত্বও হবে কিছুটা। দেখা যাক কেমন শোনায়। 'ওগো আমার লিভার', 'হে আমার লাংস্',

'অয়ি থাইরয়েড'—না: তেমন শ্রুতিমধুর শোনাচ্ছে না তো। ইংরেজি বলে কি? আচ্ছা বাংলা তর্জমা ক'রে দেখা যাক, মোলায়েম হয় কি না। ধর যদি বলা যায়, 'ওগো আমার ফুস্‌ফুস্‌-রানী,' কিম্বা 'ওগো আমার যকৃৎ-মণি'—কেমন লাগবে? রাগ করছ না কি। হুঁ, নিশ্চয় করছ। বেশ দেখতে পাচ্ছি হাসির ঠোঁট দুটি ফুলে উঠেছে। তোমার উপযুক্ত কোন সম্বোধন আমার মাথায় এখন পর্যন্ত আসেনি, এইটেই হল আসল কথা। আমার হাসিকে একটা সম্বোধনের কারাগারে বন্দিনী ক'রে ফেলতেও মন সরে না। তার যে অনেক রূপ বিচিত্র বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে মনের উপর। দু-একটা কথা দিয়ে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আর যারই থাক, আমার নেই। ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছেও নেই। তুমি অসম্বোধিতাই থাক।

তোমার চিঠি আমার কেমন লাগে বার বার একথা জিজ্ঞাসা কর কেন? বলেছি তো অনেক বার—খুব, খু-উ-ব ভাল লাগে। সত্যি বলছি, ভারি মিষ্টি। একেবারে সহজ সুন্দর স্বচ্ছ। তোমার চিঠির ভিতর তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। ভাষার আয়নায় যেন তোমার ছবিখানি। চিঠিতে বাজে কথা লিখবে না তো কি লিখবে আর? বাজে কথা বলেই তো অত সুন্দর লাগে। বুটের ডালের দর কত, কার্পাস তুলোর চাষ কখন করা উচিত, লংক্লথ বেশি মজবুত, না টুইল বেশি মজবুত—এই ধরনের কাজের কথা তোমাকে লিখতে হবে না। বাজে কথার রঙীন বুদ্‌বুদ্‌ই ফুটিয়ে তোল তুমি অনর্গল।

কাজের কথার কচকচিতে
কাজিয়া লড়াই চলছে অনুক্ষণ
তুমি ওতে আর যেতো না
বাজে কথায় বাজুক তোমার মন।

অনেক 'আদর' পাঠিয়েছ দেখছি। কতগুলো? কাছে যখন ছিলে তখন তো একটুও দিতে না। কত খোশামোদ করতে হয়েছে। দুষ্টু!

আমি কিন্তু যা পাঠাতে চাই তা পাঠানো যাবে না, এমন কি 'ইন্‌সিওর্‌ড্‌' পার্শেলেও না। কাছে না থাকলে তা দেওয়া যায় না।

রাত দুটো এখন। এবার শোয়া উচিত। কি বল? তুমি পাশ করতে পারবে না এ ভয় হচ্ছে কেন তোমার? নিশ্চয়ই পাশ করবে, নিশ্চয়ই। ঠিক দেখো!

কিছু 'আদর' আমিও পাঠাচ্ছি। আদর মানে কি জানো তো? 'দর পর্যন্ত'। তার বেশি নয়।

অসিত

৭-৪-৪৭

এবার তোমার চিঠি পেয়ে চমকে গেছি।

"তোমার চিঠি আমার খুব ভাল লাগে"—আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করনি লিখেছ। লিখেছ ওটা হয় আমার অতিশয়োক্তি, না হয় ভদ্রতা। কিন্তু এ ছাড়াও আর যে সব কথা লিখেছ তাতে রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। তুমি লিখেছ, "আমি হয়তো কোনও দিনই তোমাকে সুখী করতে পারব না কোন দিক দিয়েই। এমন কি, চিঠি লিখেও যে তোমাকে আনন্দ দিতে পারব সে ভরসা নেই। যদিও তোমার সুরে সুর মিলিয়ে চিঠি লিখতে চেষ্টা করি, চিঠি না পেলে রাগ করি, অভিমানও করি কিন্তু সত্যি বলছি সমস্তটাই মেকি মনে হয়। মনে হয় যেন কর্তব্য ক'রে যাচ্ছি। চিঠি পেলে উত্তর দিতে হয়, তাই উত্তর দিই, ঠিক আন্তরিক প্রেরণা যেন পাই না। শুধু তোমার বেলাতেই নয়, সকলের বেলাতেই এই ব্যাপার। বাবা-মা ভাই-বোন সকলের সঙ্গেই আমি চিরকাল আইনসঙ্গত নিখুঁত আচরণ ক'রে এসেছি। জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সকলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি'টা আছে তাকে কেউ খোঁজেনি কোন দিন। ভেবেছিলাম তুমি খুঁজবে কিন্তু তুমিও খুঁজলে না। তুমিও নিতান্ত মামুলি রঙীন কথার ফুলঝুরি কেটে বাইরের লেফাপাটাকেই মুগ্ধ করতে চাইলে চিরাচরিত প্রথায়। আর আমিও তার উত্তরে নিতান্ত 'মেকি' যে সব ফুলঝুরি কাটছি তাও নাকি তোমার খুব ভাল লাগছে। বিশ্বাস করলাম না একথা। 'মেকি' জিনিসকে 'মেকি' বলে সত্যি যদি না ধরতে পেরে থাক তাহলে বুঝবো তোমার ভালবাসাটাও ভান মাত্র।"

তোমার এই নিদারুণ উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পারছি না একটুও। ঠাট্টা করছ, না, ভয় দেখাচ্ছ, না, সত্যিসত্যিই আত্ম-আবিষ্কার করেছ বুঝতে পারছি না ঠিক। তোমার লেফাপার ভিতর যে "তুমি" বাস করছে তার সন্ধান তোমার বাবা-মা পর্যন্ত যখন পাননি তখন আমার পেতে একটু দেরি হবে বই-কি। সবে মাত্র তো আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে। তা ছাড়া, তোমার লেফাপাটাই বা কি কম সুন্দর? সেইটের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হতে যদি কিছুদিন কেটে যায় তাতেই বা ক্ষতি কি! কিন্তু তোমার হঠাৎ কি হল বল দিকি। এমন একটা খাপছাড়া সুর ধরলে কেন?

আচ্ছা, তুমি কি ক'রে ভাবলে বল দেখি যে, এমন একদিন আসতে পারে যেদিন আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব, তোমাকে আর মনে পড়বে না।

এসব কথা কেন মনে হচ্ছে তোমার ? কি হয়েছে খুলে লিখো সব, লিখো লক্ষ্মীটি। সামনে পরীক্ষা, এসব কি যা-তা কথা ভাবছ এখন ?

কাল সমস্ত দিন কবিতা লিখেছি বসে বসে। বলা বাহুল্য কবিতার বিষয় 'হাসি'। এই সঙ্গেই পাঠাতাম কবিতাগুলো, কিন্তু তুমি রঙীন কথার ফুলঝুরি পছন্দ কর না লিখেছ, তাই সে বাসনা পরিত্যাগ করলাম। একজন বন্ধু বলেছে কবিতাগুলো ভালো হয়েছে, মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিতে। পাঠিয়ে দিলেই যে ছাপা হবে তার কোন স্থিরতা নেই ; যদিই বা হয়, তা হলেও আর একটা পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। ধর, যদি দেখি যে আমার কবিতা ছাপান হবার এক বৎসর পরে সেই মাসিক পত্রগুলো কোন মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর সেই মুদি আমার কবিতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে মশলা বিক্রি করছে, তা হলে ? তার চেয়ে কবিতাগুলো আমার বাক্সেই বন্ধ থাক আপাতত। এমন দিনও তো আসতে পারে যখন রঙীন কথার ফুলঝুরিই তোমার ভালো লাগবে। তখন তোমাকে দেওয়া যাবে সেগুলো।

…অনেক রাত হয়ে গেছে। শুই এবার। লেফাপার কাছেই আদর পাঠাচ্ছি অনেক। ভাল কথা, লেফাপাটার অন্তরালে যে 'আমি'টি আছেন কি প্রমাণ পেলে বুঝবে যে আমি তাঁরও নাগাল পেয়েছি একটু আধটু ? সত্যিই কি কোনও প্রমাণই পাওনি ? আশ্চর্য লাগছে কিন্তু ! প্রমাণ দেবার জন্যে বিশেষ কোনও চেষ্টা যদিও করিনি আমি তবু আমার বিশ্বাস, নিজের অজ্ঞাতসারেই অনেক প্রমাণ তোমাকে দিয়েছি। দিইনি ?

সত্যি খুব খারাপ লাগছে আমার। কেন এসব লিখেছ, কেন তোমার হঠাৎ মনে হচ্ছে সব মেকি, সব মিথ্যে ! আমি খুবই চিন্তিত শুধু নয়, অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করছি। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। তোমার চিঠি না আসা পর্যন্ত পড়াশুনা কিচ্ছু হবে না। কেন এমন একটা ভুল ধারণার কুয়াশা তোমার মনকে আচ্ছন্ন করেছে তা জানাতে দ্বিধা কোরো না একটুও, যত রূঢ় তা হোক না কেন, আমি শুনতে প্রস্তুত আছি। ইতি—

তোমারই

অসিত

২২

১৪-৪-৪৯

ভাই অসিতবরণ,

গতকাল আমি চিত্রাকে সঙ্গে লইয়া তোমার স্ত্রীর হোস্টেলে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি তোমার স্ত্রী তখনও হোস্টেলে ফেরেন নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম—প্রায় ঘন্টাখানেক—তখনও তিনি ফিরিলেন না। তখন হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেন্টকে আবার খবর পাঠাইলাম। তিনি বলিলেন যে, হাসি তাঁহার নিকট হইতে ছুটি লইয়া তাহার বাবার সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। হয়তো ফিরিতে দেরী হইবে। তাহার বাবার ঠিকানাটা জানিয়া লইলাম। শুনিলাম তিনি অল্প কয়েকদিনের জন্য এখানে আসিয়াছেন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানাটা জানিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য—হাসিকে গিয়া সেখানেই ধরিব এবং একটা দিন ঠিক করিয়া পুনরায় আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইব। এই ফাঁকে তোমার শ্বশুরের সহিতও আলাপটা হইয়া যাইবে। তাঁহাকে তো দেখি নাই কোনও দিন। তোমার শ্বশুরের ঠিকানায় গিয়া তোমার শ্বশুরের দেখা পাইলাম কিন্তু হাসিকে ধরিতে পারিলাম না। তোমার শ্বশুর বলিলেন তোমার হুকুম অনুসারেই সে নাকি তোমার কোন বন্ধুর সহিত ডাক্তারের নিকট গলা দেখাইতে গিয়াছে। গলা দেখাইয়া হোস্টেলে ফিরিয়া যাইবে। ঠিক করিয়াছি আগামী শনিবার দিন আবার যাইব। তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়া চিত্রার মনে খুবই ক্ষোভ হইয়াছে। রবিবার দ্বিপ্রহরে হাসিকে খাওয়াইব মনঃস্থ করিয়াছি। তুমি যদি ইতিমধ্যে চিঠি লেখ, কথাটা তাহাকে জানাইয়া দিও। সুপারিনটেণ্ডেন্টকেও লিখিও। তোমার শ্বশুর মহাশয় ভারী চমৎকার লোক দেখিলাম। কথা কহিতে কহিতে আর একটা কাজের কথা বাহির হইয়া পড়িল। আমাদের অফিসের বড়বাবু সদানন্দ চক্রবর্তী নাকি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। আমার সুবিধাই হইয়া গেল। তোমার শ্বশুর নিজে হইতেই বলিলেন যে বড়বাবুকে আমার কথা বলিয়া দিবেন। বড়বাবু আমার উপর যদি একটু নেক্ নজর করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমার প্রমোশন হইয়া যাইবে। মাহিনাটা কিছু বাড়িলে সর্বাগ্রে একটা ভদ্রগোছের বাসা ভাড়া লইব। এই বাসাটাতে চিত্রা বেচারীর সত্যিই বড় কষ্ট হয়। বড়লোকের মেয়ে তো। কপাল-গুণে না হয় আমার হাতে পড়িয়াছে কিন্তু আমার তো দেখা উচিত তাহাকে যতটা সুখে রাখিতে পারি। তুমি আবার কথাটা যেন চিত্রার কানে তুলিয়া দিও না—যা মুখ-আলগা লোক তুমি। চিত্রাকে সুখে রাখিবার জন্য যে আমি প্রাণপণ

করিতেছি এ খবর শুনিলে সে আবার অত্যন্ত চটিয়া যাইবে। এমন কাজটি করিও না। আশা করি তোমার পড়াশোনা বেশ ভাল মতো হইতেছে। এইবার ফাইনাল তো ? আর ভাবনা কি। ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। চিঠির উত্তর যেন পাই। ইতি—

মহেন্দ্র

২৩

আজও তোমার কোন চিঠি এল না। মনে হচ্ছে যেন আট-দশ বছর তোমার কোন খবর পাই নি। তুমি যেন অত্যন্ত দূরে চলে গেছ। বিশেষত, তোমার শেষের চিঠির সুরটা যেন একটা অসুরের মত সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। কি হয়েছে যদি জানাতে তা হলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতাম। সামনে পরীক্ষা না থাকলে সোজা চলে যেতাম ঠিক। কিন্তু তুমি চিঠি লিখছ না কেন ? হয়েছে কি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সবটাই তোমার দুষ্টুমি, আমাকে নাকাল ক'রে মজা দেখছ দূর থেকে। আবার মনে হচ্ছে তোমার চিঠির সুরে যে আন্তরিকতা বেজে উঠেছে তা যদি অভিনয়ই হয় তা হলে তোমাকে প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টের সম্মান দেওযা উচিত। সম্মান দিতে আপত্তি নেই (বরং আমি খুশিই হব খুব) কিন্তু ব্যাপারটা আগে জানা চাই। দোহাই তোমার, এমনভাবে চুপ ক'রে থেক না। মহেন্দ্রের চিঠি পেয়েছি একখানা। তার চিঠিতে খবর পেলাম তুমি ডাক্তার বোসের কাছে গিয়েছিলে গলা দেখাতে। অতুলের সঙ্গে গিয়েছিলে ? মহেন্দ্র লিখেছে, তোমার বাবাও কোলকাতাতে এসেছেন নাকি। তিনিই মহেন্দ্রকে বলেছেন যে তুমি নাকি আমার হুকুমে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেছ। মহেন্দ্রর চিঠি পড়ে মনে হল যে তোমার গলার ঘায়ের সম্বন্ধে তোমার বাবার যেন কোনও দুশ্চিন্তা নেই, আমার হুকুমে বাধ্য হয়ে তুমি যেন একটা বাজে কাজ করতে গেছ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না দূর থেকে। তোমার বাবা এখন এলেনই বা কেন হঠাৎ ? তোমার মাও এসেছেন কি ? সব খবর দিয়ে চিঠি লিখো। তোমার চিঠি না পেয়ে খুবই চিন্তিত আছি আমি।

কল্পনা, মানে সেই মেয়েটি, আমার কানে কানে বলছে, "তুমি রূপকথা-লোকের মানুষ, যদি অসম্ভব কিছু ঘটেই যায় তা হলে চমকে উঠবে কেন ? এইটেই তো রূপকথা-লোকের বৈশিষ্ট্য। সেখানকার ফুল হঠাৎ যদি পরীতে রূপান্তরিত

হয়ে পাখা মেলে আকাশে উড়ে যায় তাতে বিস্মিত হবার কি আছে, সেখানকার রানী তো হরদম রাক্ষসী হয়ে যায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তোমার হাসি যদি এক ফোঁটা অশ্রুই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত তাতেই বা কি। ভাবছ কি অত? দেখ না মজাটা।"

মজাটা উপভোগ করবার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। তার কারণ বোধ হয়, যে-দূরত্ব থাকলে মজা উপভোগ করা যায়, তোমার সম্পর্কে সে দূরত্বটা হারিয়েছি। বস্তুত, মনের দিক থেকে আমার সঙ্গে তোমার কোনও দূরত্ব যেন নেই। আমার নিজের কোনও আকস্মিক আমূল পরিবর্তন কল্পনা করতে আমি যেমন ভয় পাই, তোমার সম্বন্ধেও তেমনি ভয় পাচ্ছি। আমার ভয়টা যে ভিত্তিহীন তা অবিলম্বে প্রমাণ কর। খুব খারাপ লাগছে। ডাক্তার বোস কি বললেন তাও লিখো। অনেক অনেক আদর জানাচ্ছি এবং প্রত্যাশাও করছি।

ইতি—

তোমারই

অসিত

২৪

ভাই অসিত,

বন্ধু-কৃত্যটা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছি, কিন্তু তা ক'রে খুব যে একটা আনন্দ পেয়েছি তা বলতে পারি না। তোমার স্ত্রীকে ডাক্তার বসুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু শি হ্যাজ মেড মি ফীল যেন আমি কোনও অন্যায় কাজ করেছি। যতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল একটিও কথা বলেনি, নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড, একেবারে যাকে বলে 'মাম'। কিন্তু নীরব ছিল বলেই যে তার মনোভাব অপ্রকাশিত ছিল তা মোটেই নয়। তার মৃদু হাসি, আনত দৃষ্টি, ভব্য মুখভাবের অন্তরালে মেঘান্তরালবর্তী বিদ্যুতের মতো এমন একটা বিদ্রোহ প্রচ্ছন্ন ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত, যা ভাষায় প্রকাশ করলেই অভদ্র হয়ে যাবে। "তোমরা আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন, প্লীজ লেট মি অ্যালোন, আমাকে বিরক্ত কোরো না, দয়া ক'রে তোমরা কেবল তফাতে সরে' থাক, ইউ মেডলিং সোয়াইন"—এই হল তার বাচনিক রূপ, ভাষায় এর চেয়ে ভদ্ররূপ তাকে আর দেওয়া যায় না। কিন্তু এটাই তার সম্পূর্ণ রূপ নয়, তাও বলে দিচ্ছি। তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করছি হ্যাভ ইউ আণ্ডারস্টুড হার? আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার স্ত্রীকে বুঝতেই পারনি

এখনও। এত অল্প দিনের মধ্যে বুঝতে পারার কথাও নয়। ক'দিনই বা ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশেছ ওর সঙ্গে। বেশি দিন মিশলেও যে পারবে, সে ভরসাও আমি করি না। আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু শুধু বলতে পারি, ওর নাম হাসি না হয়ে অসি হলে বেশি মানাত। অধিকাংশ সময়ই খাপের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকবে হয়তো কিন্তু আত্মপ্রকাশ যখন করবে তখন সাবধান! ওর খাপছাড়া মূর্তির একটু আভাস সেদিন পেয়েছিলাম! আমি যখন হোস্টেলে ওকে আনতে গেলাম, শুনলাম ও বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। এটা প্রত্যাশা করিনি। ওর বাবা যে কোলকাতায় আছেন তাই জানা ছিল না আমার। সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে ঠিকানাটা ছিল, হাসিই ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল, বলে গিয়েছিল যে আমি এলে এই ঠিকানায় যেন যাই। আমি যে আসব তা ও জানত, কারণ আমি সকালেই সে কথা ফোনে জানিয়েছিলাম। ওর বাবা যে কোলকাতায় আছেন, তাঁর কাছে ওর যে বিকেলে যাওয়ার কথা আছে এ সব কথা কিন্তু কিছু বলেনি আমাকে ফোনে। সেই জন্যে মনে হচ্ছে, তোমার শ্বশুর মশায় হঠাৎই এসেছেন কোলকাতায়। যাই হোক, আমি যখন গেলাম তখন গলার আওয়াজ থেকে বুঝতে পারলাম, বাইরের ঘরে হাসি কার সঙ্গে যেন কথা কইছে। বারান্দায় উঠলাম, পায়ে কেডস থাকাতে শব্দ হল না কোনও। উঠেই শুনতে পেলাম হাসি বলছে, "তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? সারাজীবন আমার সঙ্গে এত বড় একটা ভণ্ডামি করেছ একথা ভাবতেই পারছি না আমি!" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ক্ষণিকের জন্য আমি খাপ-খোলা তলোয়ারটাকে দেখতে পেলাম। পরমুহূর্ত্তেই আবার খাপে ঢুকে পড়ল সে। আমার দিকে চেয়ে ভদ্রভাবে নমস্কার ক'রে বললে, "ও, আপনি এসেছেন, চলুন যাই।"

নীলাম্বরবাবু, মানে, তোমার শ্বশুরও বেরিয়ে এলেন। "কোথা যাচ্ছ," জিগ্যেস করলেন তিনি।

"ডাক্তারের কাছে"—এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে হাসি নেমে পড়ল রাস্তায়, একটিও কথা হয়নি তার সঙ্গে। আমি কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম দু-একবার। কিন্তু উত্তর না পেয়ে আমাকেও শেষটা চুপ করে যেতে হল। সে আমার প্রত্যেক কথার উত্তরে মুচকি হেসেছিল বটে কিন্তু তার চোখের চাহনিতে প্রতি মুচকি হাসির সঙ্গে যে জিনিসটা চকচক্ ক'রে উঠছিল—মাই গড—তা রীতিমত 'রিপেলিং' তার অর্থ, "কেন বাজে বক বক করছেন!"

ডাক্তার বসু তোমার স্ত্রীর গলা দেখে বললেন, রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। রক্ত নিজেই নিয়ে নিয়েছেন তিনি ল্যাবরেটারিতে পাঠিয়ে দেবেন বলে'। রক্ত

পরীক্ষার ষোল টাকা ফী আমি দিয়ে দিয়েছি তাঁকে। রক্তের রিপোর্ট তিনি হাসির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। এ সব সম্বন্ধে হাসির সঙ্গেই তাঁর 'কন্‌ফিডেনশ্যাল' কথাবার্তা হয়েছে, হাসি তোমাকে জানিয়েছে নিশ্চয়। ডাক্তার বসু যদিও আমার বন্ধুলোক, তবু আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইলেন না। কেবল বললেন, কেবল গলার নয়, জিবে এবং তালুতেও (টাগরায়) ঘা হয়েছে না কি। হাসিকে তিনি একটা রিপোর্ট লিখে দিয়েছেন তা এতদিনে পেয়েছ তুমি নিশ্চয়।

তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে কথাটা আমার বিশেষভাবে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, শি ইজ এ মডার্ন গার্ল। সত্যিকার আধুনিকা হবার উপাদান ওর মধ্যে আছে। সত্যি বলছি, প্রচলিত বিধিনিষেধ প্রাচীর-পরিখা লঙ্ঘন ক'রে যাবার শক্তি তোমার তন্বী বউটির আছে বলে মনে হল এবং আমার এই ধারণা তোমাকে না জানালে 'এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড' তোমার কাছে অপরাধী হতে হবে বলেই তোমাকে এত কথা লিখলাম।

তুমি যদি জেরা কর, কেন আমার এসব কথা মনে হল, জবাব দিতে পারব না। আই কান্‌ট্‌। এইটুকু শুধু বলতে পারি, শি হ্যাজ ইনটারেস্টেড মি। না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়—নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল—তার বেশি নয় কিছু। আজকাল পথেঘাটে ট্রামেবাসে অজস্র মেয়ে দেখতে পাই, কিন্তু হাসির চোখে সেদিন যে দীপ্তি দেখেছি তেমনটি আর কোথাও দেখেছি বলে' মনে পড়ছে না। সুতরাং এখন থেকে হাসির হোস্টেলের আনাচেকানাচে যদি ঘোরাফেরা করি, রাগ করো না যেন। যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারি জানাব তোমাকেও। ইউ মে রিলাই অন্ মি।

চাকরি এখনও জোটেনি। ভ্যারেণ্ডাই ভেজে চলেছি। হেল্‌!

ভালবাসা নাও। ইতি—অতুল।

২৫

৪-৫-৪৯

দশ দিন কেটে গেল। আজও তোমার চিঠি পেলাম না। কি হল তোমার? চিঠির উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার শরীর কেমন আছে জানাবার জন্যে তোমাদের মাসীমাকে চিঠি লিখেছিলাম একখানা। তিনি উত্তর দিয়েছেন যে, তোমার শরীর ভালই আছে। এমনভাবে চুপ ক'রে থাকবার মানে কি তাহলে?

এখন অনেক রাত। কিছুক্ষণ আগে একটা বেজে গেছে। কিছুতেই ঘুম এল না, তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। মনে হচ্ছে, অভিমান করেছ তুমি, তোমার স্ফুরিত অধরের কম্পনটা দেখতে পাচ্ছি যেন। কি হয়েছে, বলবে না? অনেক দিন আগে তুমি আমাকে পাঞ্জাবির একটা মাপ পাঠাতে লিখেছিলে। পাঠানো হয় নি। তাই রাগ হয়েছে? আচ্ছা, এবার তোমার চিঠি পেলে ঠিক পাঠাব। দরজির কাছে গিয়ে পাঞ্জাবির মাপটাপ দেওয়া হাঙ্গামের ব্যাপার, তাই হয়ে ওঠেনি। এবার ঠিক পাঠাব। এবার তোমার চিঠি পাওয়া মাত্র পাঠাব।

মনের ভিতর কত কথা যে জমে আছে। কিন্তু তা প্রকাশ করা যাবে না। ঠিক যেন মেঘের মতো। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে। কখনও স্তূপীকৃত, কখনও বিসর্পিত। সন্ধ্যার সোনা, ঊষার আবীর, জ্যোৎস্নার জরি, বর্ষার অশ্রু, বিদ্যুতের চমক—সব কিছুরই স্পর্শ লাগছে তাতে। দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, কিন্তু প্রকাশ করা যাবে না ভাষায়। সত্যি কি তুমি বুঝতে পার না একটুও? আজ আবার চাঁদ উঠেছে, জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে—" হেমচন্দ্রের কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে। সেই সেদিনের কথাটাও মনে পড়েছে। সেই যে ছাতে! চাঁদের আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। "দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে" সত্যিই যেন সেদিন এসেছিল তোমার মনে। ...একদল মেঘ এসে চাঁদটাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। বিশেষত দু-একটা কালো মেঘ একেবারে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেতে চায় না! হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমি যেন ওই কালো মেঘ, জোর ক'রে অধিকার করতে চাইছি নির্বিকার তোমাকে!

...তোমার পুরোনো চিঠিগুলো ওলটালাম। একটা চিঠিতে দেখছি তোমার বান্ধবীরা নাকি আমার তুলনায় তোমাকে তুচ্ছ মনে করেছেন। কেন, আমার কবিতা পড়ে'? তাঁদের একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে। এক রাজকন্যার এক ফুলের বাগান ছিল। একদিন তিনি সখী-সমভিব্যাহারে বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন, তাঁর চাঁপাগাছের ডালে কে যেন একটি সোনার জাল টাঙিয়ে রেখে গেছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, জালটা সোনার নয়, পশমের মতো সুতো দিয়ে বোনা, সূর্যের আলো পড়ে' সোনালী দেখাচ্ছে। কারুকার্য দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সখীকে বললেন, কে ভাই এমন নিপুণ শিল্পী! সখী উত্তর দিলেন, কে তা জানি না, কিন্তু তিনি যে-ই হোন তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি উঁচুদরের লোক, তাঁর কাছে তুমি আমি তুচ্ছ। পরে খোঁজ ক'রে জানা গেল শিল্পীটি মাকড়শা। তোমার বন্ধুদের রসবোধের প্রশংসা করতে পারলাম না। সত্যি, এত খারাপ লাগছে তোমার চিঠি না পেয়ে। কি হয়েছে তোমার? নিশ্চয়ই কিছু

হয়নি। আমাকে ভাবাবার জন্যে দুষ্টুমি ক'রে চিঠি লিখছ না। পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত আছ না কি? প্রিপারেশন কিছু হয়নি মনে হচ্ছে নিশ্চয়। আমারও হচ্ছে। কিন্তু ওটা, মানে ওই রকম মনে হওয়াটা, একটা ভাল লক্ষণ শুনেছি। নিউটন কি বলেছিলেন জানো তো? সমুদ্রতীরে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করেছি। সক্রেটিসও বলেছিলেন না কি যে, আমি জানি যে আমি অজ্ঞ, তাই আমাকে সবাই বিজ্ঞ বলে। সুতরাং কিছু জানি না মনে হওয়াটা আশাপ্রদ ব্যাপার।

...তোমার চিঠি না পেয়ে একটুও ভাল লাগছে না সত্যি। লিখতেও ভাল লাগছে না, অথচ থামতেও পারছি না, নিজের মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি। বিরাট একটা দেশ যেন। এত বিরাট যে তার আদি অন্ত পাওয়া মুশকিল। তার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা আরও শক্ত। এই তার আকাশে রোদ হাসছিল, হঠাৎ সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার ঘিরে এল। আকাশে তারার ছড়াছড়ি। দেখতে দেখতে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশে মেঘ ছেয়ে আসে আবার। তারা ঢেকে যায়। ঘনিয়ে আসে নিস্তব্ধতা। ভীষণ বজ্রপাত, সচকিত হয়ে ওঠে আবার চতুর্দিক। তাও আবার থাকে না। উষার অরুণিমা দেখা দেয় একটু পরেই। রামধনু ফুটে ওঠে কালো মেঘে। এই বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে বসে' তোমার কথা ভাবছি। কত বাসনা ফুলের মতো ফুটে ফুলের মতোই ঝরে যাচ্ছে। একটা খামখেয়ালী হাওয়া ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব। মনে হচ্ছে তুমিই যেন সেই হাওয়া। আমার কাছে কি চাইছ এসে বুঝতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছেই বসে আছ। তোমার একটা হাত যেন আমার পিঠে ঠেকে আছে, তোমার চুড়ির ঠাণ্ডা যেন আমার গায়ে লাগছে। তোমার নিশ্বাসের বাতাসও যেন অনুভব করছি। মনে হচ্ছে যেন তোমার চোখ দুটি ছল ছল করছে। কি হয়েছে তোমার, সত্যি বলবে না?

দিনের সমস্ত কর্ম কোলাহল নীরব হয়ে গেছে, সমস্ত দেহ পরিশ্রান্ত, মন কিন্তু উন্মুখ বিনিদ্র। সে বলছে অমৃত চাই। যখন তুমি ছিলে না তখন এই অমৃতের সন্ধানে বহু স্থানে ঘুরেছি। কবি, গ্রন্থকার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, খোলা মাঠ, উদার আকাশ, সিনেমা, থিয়েটার। এখন মনে হচ্ছে তুমিই এসেছ সুধাভাণ্ড নিয়ে। হয়তো আর এক হাতে বিষভাণ্ডও আছে। সেই বিষের জ্বালাতেই হয়তো জ্বলছি এখন, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে সুধাভাণ্ডও তোমারি অন্য হাতে আছে। বঞ্চিত করবে না তুমি আমাকে তার থেকে।

অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে একটা। মানুষ না হয়ে তুমি যদি গান হতে বেশ হ'ত তা হলে। একেবারে কণ্ঠস্থ ক'রে রেখে দিতাম। আর আজীবন সাধনা ক'রে তাতে নানারকম ভাল সুর দিতাম। গাইতাম কখনও বেহাগে, কখনও ভৈরবীতে, কখনও

মুলতানে। একই গানে কখনও বর্ষার কাজরী, কখনও শরতের আগমনী বেজে উঠত। মেঘমল্লারে নিবিড় হয়ে আবার খেয়ালে ভেসে যেতে। ছাড়াছাড়ির দুঃখটা পেতে হত না তা হলে। সব সময় গলায় থাকতে গানের তানে তানে। যদিও তোমার মধ্যে সব সুরের মাধুর্যই আছে, কিন্তু হায়, তবু তুমি কেবলমাত্র গান নও, গান ছাড়াও তুমি আরও কিছু, তুমি মানুষ। সীমার মধ্যে অসীমা, ধরার মধ্যে অধরা। তাই তোমাকে সীমার মধ্যে পাওয়া যাবে না, হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। তবু তোমাকে পেতে চাই, কেন যে চাই জানি না। মনে হয়, এই যে বিরহ—এই যে না পাওয়া—এই তো মরণ…

ভালো লাগছে না এইসব লিখতে। অথচ এইসব কথাই মনে হচ্ছে খালি।…

…মনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই যে সর্বদা স্বপ্নে জাগরণে তার কথা ভাবছ, সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর চিঠি লিখতে বসেছ এ আগ্রহ কি এমনিই থাকবে তোমার চিরকাল ?"

মন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল—"থাকবে।"

"কি ক'রে ! ছেলেবেলা থেকে তোমার তো অনেক জিনিসেই এমনি উৎসাহ দেখা গেছে। প্রজাপতির পিছনে ঘোরা থেকে শুরু ক'রে সাহিত্য বিজ্ঞান চর্চা পর্যন্ত কোনটাতেই তোমার আগ্রহের অভাব তো ছিল না। আজও কি সে আগ্রহ অটুট আছে ? আজ তারা সব কই, তোমার সেই প্রজাপতি পাখি-কুকুর পোষার নেশা, বাগানে ফুলফোটানর শখ, তোমার সেই প্রিয় কবির দল, কই সে সব আজ ! এদের কথা তো তোমার মনে আর তেমন আকুলতা আনে না, আগে যেমন আনত। এদের চিন্তায় বিভোর হয়ে রাতের পর রাত জাগতে, এখন তো আর জাগ না। এতদিনকার পরিচিত এদের সম্বন্ধে যখন তোমার এমন অনাগ্রহ জেগেছে তখন এই অপরিচিতাটিকে যে চিরদিন সমান আগ্রহে ধরে রাখতে পারবে তার নিশ্চয়তা কি ! তোমার কত বন্ধুবান্ধব তোমায় প্রাণভরে' ভালবাসত, এখনও হয়ত বাসে, তুমিও একদিন তাদের কম ভালবাসনি, কিন্তু তবু তারা আর স্মৃতিমাত্র। তোমার হাসিরও যে সেই দশা হবে না তার প্রমাণ কি ?"

মন আবার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আবার ইতস্তত ক'রে বলল—"প্রমাণ দিতে পারব না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, এর প্রতি আমার আগ্রহের শেষ হবে না, কারণ ও আমার একার, আর কারও নয়। আর যা কিছুকে ভালবেসেছি তা সকলের ছিল। ওরা আমাকে যে আনন্দ দিয়েছে অপরকে ঠিক তেমনই আনন্দ দিয়েছে। আমার প্রতি ওদের এতটুকু পক্ষপাত নেই। প্রজাপতি, পাখি, কুকুর, বাগান, ছবি, কাব্য,

বন্ধু-বান্ধব—এরা আজও আমার প্রিয় কিন্তু ওরা আমার অন্তরতম হতে পারেনি, কারণ ওরা সকলের। হাসিকে যদিও এখনও ভাল ক'রে চিনি না, তবু মনে হয় ও আমার নিজস্ব। ভাল মন্দ যা-ই হোক আমার একার। বিশ্বের হাটে ওর দাম যাচাই করারও প্রয়োজন নেই। ও আমার একার এই বোধটুকুই যথেষ্ট। এই মমত্বই অমরত্ব দেবে আমার আগ্রহকে। হাসি আমার, আমার, আমারই, আর কারও নয়—এই আনন্দে তাই পরিপূর্ণ হয়ে আছি আমি। তা ছাড়া ও মানুষ, ওর রহস্য শেষ হবার নয় সহজে। তাই মনে হয়, ওর সম্বন্ধে কৌতূহল শেষ হবে না কখনও।"

"হঠাৎ যদি কোনও দিন আবিষ্কার কর যে, ও তোমার একার নয়, তা হলে?"

"তা অসম্ভব।"

"কি ক'রে বুঝলে?"

"বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে—"

মন হেসে বললে—"বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দরকার।"

গভীর রাত্রে একা নির্জন ঘরে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করছি তুমি কাছে নেই বলে। তুমি থাকলে তোমার সঙ্গেই বোঝাপড়া করতাম। এতকাল শোয়ার সময় ঘুম ছাড়া আর কিছু কাম্য ছিল না। এখন এ কি হয়েছে! আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল তো চিঠি লিখছ না কেন, কি হয়েছে তোমার! হঠাৎ মনে হল, শেষ চিঠিতে তুমি যা লিখেছিলে তার সুরটা ইবসেনী। Doll's House পড়েছ না কি ইদানীং?

"জন্মাবধি একটা অদৃশ্য লেফাপার ভিতর যেন মোড়া আছি। সেই লেফাপাটাই সকলের কাছে পরিচিত। লেফাপার ভিতর যে 'আমি' টা আছে তাকে কেউ খোঁজে নি কোন দিন।..."

চিন্তাটা খুব আধুনিক নয়, নিতান্ত সেকেলে। উপনিষদেও এই ধরনের কথা আছে। অতুল লিখেছে, সে তোমার মধ্যে আধুনিকতার উপাদান দেখেছে না কি। সে কি দেখেছে তা জানি না, আমি কিন্তু দেখেছি। আধুনিকতা কতকগুলো চমকপ্রদ বুলির কপচানিমাত্র নয়; দুর্জয়কে জয় করবার প্রয়াস এবং সাহসই আধুনিকতা। তোমার মধ্যে এ সাহস দেখেছি আমি। প্রমাণও পেয়েছি খানিকটা। আমাকে জয় করেছ তো! অনেক দিন আগে একটি আধুনিকার চিত্র এঁকেছিলাম আমি। পাঠাচ্ছি কবিতাটা এই সঙ্গে।

…কবিতাটা পড়ে কেমন লাগল জানিও। যদিও মেয়েটির আচরণ আমি সমর্থন করি না, ওর মতের সঙ্গে আমার মতের মিলও নেই, কিন্তু তবু ও যে আধুনিকা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেক রাত হয়েছে। রাত শেষই হয়ে গেল বোধ হয়; শুই একটু। চিঠি লিখো লক্ষ্মীটি। ইতি—

অসিত

মেয়েটি সত্যিই আধুনিকা।
ভাব-ভঙ্গিতে চাল-চলনেই নয় কেবল,
মনে প্রাণেও।
পোশাক-পরিচ্ছদে পছন্দ করে না
বিদেশী নকলের সস্তা চাকচিক্য,
অপরের মনে ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে
গয়না-কাপড় ঝকমকিয়ে বেড়ায় না কখনও,
যখন-তখন যেখানে-সেখানে
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির ক'রে
আসর জমাবার প্রবৃত্তিও নেই।
চাল দিয়ে কথা বলে না,
এমন কি
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে যে সে,
তা বোঝবার উপায় নেই,
ইংরেজী বুকনি মুখ দিয়ে বেরোয় না কখনও।
যেসব জিনিষ থাকলে
অহঙ্কারে মটমট করা স্বাভাবিক,
সেসব জিনিস থাকা সত্ত্বেও
তার অহঙ্কার নেই।
বরং তার সঙ্কোচ হয়,
মনে হয় এগুলো বাধা,
বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, ঐশ্বর্য,
চারটে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন
আড়াল ক'রে রেখেছে তাকে,

বঞ্চিত করেছে আর পাঁচজনের সঙ্গে থেকে।
সত্যিই লজ্জা করে তার।
এই লজ্জা জিনিসটা তার মজ্জাগত
বাইরে প্রকাশ নেই।
আপাতদৃষ্টিতে তাকে নির্লজ্জ ব'লেই মনে হয়।
জিব কেটে
ঘাড় হেঁট ক'রে
মুচকি হেসে
লাল হ'য়ে
ঘোমটা টেনে
লজ্জা বস্তুটাকে নয়নলোভন দৃশ্য ক'রে তুলতে
আরও বেশি লজ্জা করে তার।
সুতরাং তার জীবন
নীরব এবং নিঃসঙ্গ।
বেশি কথা বলতে পারে না,
মিশতে পারে না কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে।
তার সঙ্গে মেশবার সুযোগই দেয় না সে কাউকে।
দিলেও যে খুব বেশি লোক জুটত
মনে হয় না তা।
কারণ যে জিনিসটি থাকলে
পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে মেশবার উৎসাহ পায়,
সে জিনিসটির অভাব আছে তার।
রূপসী নয়।
স্বাস্থ্যবতী অবশ্য।
কেরিজ, পায়োরিয়া, চশমা কিচ্ছু নেই,
নিখুঁত টিউব,
নীরোগ অ্যাপেন্ডিক্স,
মজবুত কবজি,
পুষ্ট পেশী,
ফিট হয় না।

টেনিস খেলা
বাইক চড়া
ড্রাইভ করা
সমস্তই পারে অনায়াসে।
কিন্তু রূপ নেই,—
দুধে-আলতা রং
পটল-চেরা চোখ
তিল-ফুল নাসা
মেঘবরণ চুল
শুধু যে নেই তা নয়,
নেই ব'লে দুঃখও নেই।
যৌবন আছে।
কিন্তু সে যৌবনকে
শাড়ি-কাঁচুলির কৌশলে উদগ্র ক'রে
লোক-লোচনবর্ত্তী করবার প্রবৃত্তি
মোটেই নেই তার।
সুতরাং সে যৌবনও অপ্রকাশিত।
মাথার চুল 'বব' ক'রে ছাঁটা,
ঢিলে পাজামা পরার শখ আছে,
বাইক চড়ার সময় ব্রিচেস পরে,
হঠাৎ দেখলে পুরুষ ব'লেই ভ্রম হয়।
প্রণয়ী জোটে নি সুতরাং—
সাহস নয়, প্রেরণাও পায় নি অনেকে।

প্রণয়ী না জুটলেও
বিবাহার্থী জুটেছিল একাধিক!
কালো, সাদা,
বেঁটে, লম্বা,
সুরূপ, কুরূপ,
ফোঁপরা, শাঁসালো,

বিদ্বান্, মূর্খ,
নানা রকম।
ভাল চাকরি-খালির বিজ্ঞাপন দেখলে
প্রার্থী আসে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে,
ঠিক তেমনি।
একমাত্র কন্যা সে
বিপত্নীক ধনী পিতার।
বিশাল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।
কিন্তু গোল বাধল।
এতগুলি ভদ্রসন্তানের
অরূপ-সাধনার অন্তরালে
যে সহজিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল,
তা সহজেই প্রকট হয়ে পড়ল।
পিতা দেখলেন,
তাঁর কন্যাটিকে সকলেই চাইছেন
সহধর্মিণী হিসাবে ততটা নয়,
তাঁর লোহার সিন্দুকের চাবি হিসাবে যতটা।
পুত্রী দেখলেন,
স্বামী হিসাবে লোভনীয় নয় একজনও।
মোটা, রোগা, বোকা, চালিয়াত,
ন্যাকা, হাঁদা, ধূর্ত, ধড়িবাজ,
উদ্ধত, মিনমিনে,
নানা জাতীয় আবর্জনা
টাকা-ঘূর্ণির টানে
নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে তার চতুর্দিকে।
ভাল ছেলে জুটল না।

দেশে যে একেবারে ভাল ছেলে নেই তা নয়,
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়
বিবাহ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভাল ছেলেরা
কিংবা তাদের অভিভাবকেরা

বেশি মর্যাদা দেন
সেই ছুটো জিনিসকেই,
যা স্বকীয় সাধনায় অর্জন করা অসম্ভব,
যা ভাগ্যবলে দৈবাৎ মেলে—
রূপ এবং বংশ-গৌরব।
স্বোপার্জিত বিদ্যা অথবা অর্থ
লোভনীয় নয় মোটেই এঁদের কাছে।
সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী চান এঁরা।
বাবা মারা গেলেন হঠাৎ একদিন।
শোকে-তাপে
আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যাগমে
শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে
কাটল কিছুদিন।
আত্মীয়-স্বজনেরা চমকে গেলেন
শ্রাদ্ধের নূতনত্ব দেখে।
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায়
এলেন বেদজ্ঞ পুরোহিত
কাশী থেকে ,
ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এলেন
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণও ,
জাত-ব্রাহ্মণ নয়,
গুণ-ব্রাহ্মণ,
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী।
তার মধ্যে ছিলেন
দুইজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থও।
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে
অভ্যর্থনা করলে সে গুণীদের,
শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা দিলে
স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র, মাল্য-চন্দন এবং গ্রন্থ।

স্থানীয় লোকেরাও বাদ গেলেন না,
আপামরভদ্র সবাই
যোগ দেবার সুযোগ পেলেন একদিন
বিরাট ভূরিভোজনের মহোৎসবে।

বছরখানেক কাটল।
কর্তব্যবোধেই সম্ভবত
আত্মীয়-স্বজনেরা আর একবার এলেন,
চেষ্টা করলেন বিয়ের।
সে সংক্ষেপে বললে,
বিয়ে করব না আমি।
কেন?
রুচি নেই।
রুচিবিকার-সংশোধনে অসমর্থ ব'লে নয়,
লক্ষাধিক টাকার মালিক
বি. এ-পাস এই মেয়েটা
তাঁদের শাসনসীমা-বর্তিনী হতে
রাজী হ'ল না বলে
নিরস্ত হলেন তাঁরা।
আধুনিক শিক্ষাকে গাল পাড়তে পাড়তে
মুক্তকচ্ছ কম্পিতগুম্ফ হিতৈষীর দল
একে একে
অন্তর্দ্ধান করলেন আপন আপন বিবরে।

কাটল আরও বছর দুই।
অন্য কেউ হ'লে
এম. এ. দেবার চেষ্টা করত হয়তো,
নিতান্ত পক্ষে কিংবা
সময় কাটাবার জন্যেও অন্তত
শিক্ষয়িত্রীগিরি যোগাড় ক'রে নিত একটা।
এ কিন্তু করলে না কিছুই

নোট-বই প'ড়ে
বাঁধা-ধরা নিয়মের পরীক্ষা পাস করাকে
চিরকালই সে
খোঁটায় বাঁধা গরুর
জাব খাওয়ার সঙ্গে উপমিত করেছে।
হাস্যকর নিয়মের খাঁচায় বন্দী হয়ে
মাস্টারি করার ছুতোয় তোতাগিরি করাটাও
চিরকাল অপছন্দ তার,
তাই ওসব করলে না কিছুই।
পড়া-শোনা অবশ্য বন্ধ রইল না।
তার 'মিন্টো' বুক-কেসগুলোতে
ওয়ালনাট-টেবিলে
মেহগিনি-আলমারির তাকে তাকে
জমতে লাগল নানা বই নানা ধরনের।

কিন্তু—
হ্যাঁ,
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ
মস্ত বড় একটা 'কিন্তু'।
মন ভরে না কেবল বই প'ড়ে
উপন্যাস যত ভালই হোক,
ক্লান্তিকর শেষ পর্যন্ত।
উপন্যাস ছেড়ে ধরল ইতিহাস—
ভারতের, চীনের, জাপানের,
রোমের, গ্রীসের, জার্মানীর, ইংলণ্ডের,
রাশিয়ার।
নাঃ,
মরা মানুষের মরা কাহিনী সব—
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা
তাও অনিশ্চিত।

কিনলে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই
কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জুওলজি ;
ভাল লাগল না।
কান্ট, হেগেল, এমার্সন,
রামায়ণ, মহাভারত, জাতক,
গীতা, উপনিষদ—
তাও বিস্বাদ।
পাঞ্চ, ষ্ট্র্যাণ্ড, নেচার,
লিটারারি ডিজেস্ট, প্যারেড,
ধর্মতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি
কিছুই ভাল লাগে না আর,
এমন কি
হার মানলেন
হ্যাভ লক এলিস, বাৎস্যায়ন পর্যন্ত।
নানা রকম ক্যাটলগ ওলটাতে ওলটাতে একদিন
উদ্দীপ্ত হ'ল কল্পনা—
ফলে
হাজার কয়েক টাকা বেরিয়ে গেল।
ক্রোমিয়মের ডিনার-সেট,
অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার টেবিল,
বাসন নানারকম দামী চিনেমাটির,
নতুন মডেলের
কার, ক্যামেরা,
রেফ্রিজারেটার, রেডিও,
অভিনব খাঁচায়
অভিনব বর্ণের ক্যানারি এক ঝাঁক,
অভিজাত বংশের
অ্যাল্‌সেশিয়ান, স্প্যানিয়েল, পুড্‌ল।
কাটল কিছুদিন।
মনে হ'ল তারপর

কেন এসব ? কার জন্য ?
মনের ক্ষুধা তো মিটল না !

ছবি আঁকবার চেষ্টা করলে,
কিন্তু সার হ'ল সরঞ্জাম কেনাই।
তুলি, রং, কাগজ পেলেই হয় না শুধু,
প্রতিভা চাই।
ছবি হ'ল না।
ছেলেবেলায় একবার
কণ্ঠ এবং যন্ত্রযোগে রীতিমত
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল সে
সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করবার,
সফলকাম হয় নি।
সেদিক দিয়েও গেল না সুতরাং।

মনে হ'ল একদিন,
বাগান বানালে কেমন হয় ?
ফুল নিয়ে কবিত্ব করার শখ
কোন দিনই তার ছিল না অবশ্য,
ফুল-চাঁদ-মলয়-মেঘ-মূলক কবি-বৃত্তিকে
প্রশ্রয় দেয় নি সে কোন দিনই।
আকাশের চাঁদ দেখে সে যতটা না মুগ্ধ হ'ত,
তার চেয়ে ঢের বেশি মুগ্ধ হ'ত
বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতিটা দেখে।
কি উজ্জ্বল আলো তার,
গঠনে কি বর্ণ-বৈচিত্র্যশোভা !
বেশি আবিষ্ট করত তার মনকে
সিনেমার দৃশ্য
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে,
গহন বনের সৌন্দর্যের চেয়ে
বেশি অভিভূত করত

বিরাট ফ্যাক্টরির সৌন্দর্য।
সেকেলে কবিদের নকল ক'রে
যন্ত্রকে—
মানব-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে
দানব ব'লে উপহাস করতে
সঙ্কুচিত হ'ত সে।
মনে হ'ত
ওই জাতীয় উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে
পলায়নী মনোবৃত্তি,
অক্ষমতার শূন্য আস্ফালন।
তাই তার বাগানের শখ
মূর্ত হ'ল
নানা রকম সারে, যন্ত্রে,
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।
ফুল ফুটল নানা রকম দেশী-বিদেশী,
ফসলও ফলল বহুবিধ
শাক-সবজি তরি-তরকারির,
বামন গাছ
অর্কিড,
সিজ্‌ন-ফ্লাওয়ার হরেক রকমের
হরেক রকমের পরীক্ষা
গাছেদের বর্ণ-সঙ্করত্ব নিয়ে,
পরাগ-বিনিময়
কলম-তৈরি
বাকি রইল না কিছুই।
তবু কিন্তু মন ভরে না।
মনে হয় ক্ষুধিত আছি,
মনে হয় আসল জিনিস পাওয়া যায় নি,
যাবেও না কখনও বোধ হয়।
ক্ষতি কি হয়েছে তাতে?
মনকে জোর ক'রে বোঝাতে হয়।

সুখেই ত আছ ;
জোর ক'রে মানতে হয়,
হ্যাঁ সুখেই আছি।
কিছু ওই ছোট কুঁড়েঘরে
মালীর সদ্যোজাত শিশুটা যখন কেঁদে ওঠে,
তখন ঝন ঝন ঝনাৎ ক'রে
আর্তনাদ ক'রে ওঠে
মনের সমস্ত তারগুলো যেন।
এ কি অত্যাচার !
মাতৃত্ব কামনা করি ব'লে
ধরা দিতেই হবে পুরুষের বাহুপাশে ?
ফুলকে তো ধরা দিতে হয় না,
সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে
পতঙ্গের পাখায় পাখায় বাহির হয় সৃষ্টির বীজ।

মানুষ এখনও এত বর্বর ?
জলের কুঁজোটাকে বিয়ে না করলে
পিপাসার জল পাব না ?

নিঃশব্দে পাখা ঘুরছে।
নিঃশব্দে জলছে সুদৃশ্য-ডোমে-ঢাকা বিদ্যুৎ-বাতিটা,
সামনের থাবা দুটোয় মুখ রেখে
নিঃশব্দে ব'সে আসে স্প্যানিয়েলটা,
সে পদচারণা ক'রে চলেছে নিঃশব্দে।
ভাবছে, অশোভন হবে কি
ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটা ?

সব শুনে বললেন ডাক্তার,
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি কেন ?
রুচি নেই।
রুচি বদলান।

বদলাবার ইচ্ছে নেই,
নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে চাই না
একদিনের জন্তেও ;
কিন্তু ছেলে চাই,
উপায় নেই কোন ?
উপায় আছে বই-কি,
টেস্ট টিউব বেবি—
বিজ্ঞানের যুগ এটা
সবই সম্ভব।

সম্ভব হ'লও !
প্রত্যক্ষ-ভাবে পুরুষ-সংস্রবে না এসেও
সন্তান-সম্ভবা হ'ল সে।
গভীর রাত্রে হঠাৎ একদিন
ঘুম ভেঙে গেল তার।
ম্যুরিলোর আঁকা
ইম্‌ম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন ছবিখানা
স্বপ্নে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট সে।
অনন্ত আকাশের বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী জননী
পদ-প্রান্তে সরু একফালি চাঁদ,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা সব—
দেবশিশুরা
ভিড় ক'রে আছে চারিদিকে
কেউ স্পষ্ট, কেউ অস্পষ্ট।
মনে পড়ল কুন্তীর কথা
জবালার
সীতার
দ্রোণের,
মনে পড়ল ইসাডোরা ডান্‌কান—
টং ক'রে একটা বাজল।

অস্পষ্ট ঘর্ঘরধ্বনি ভেসে এল যেন কোথা থেকে—
বিমান-পোতে কে আসছে এত রাত্রে !

বার্তা চাপা রইল না বেশিদিন।
যথানিয়মে
হিতৈষী আত্মীয়েরা এলেন আবার অনাহূতভাবেই।
যথানিয়মেই
ফুসফুস-গুজগুজও হ'ল,
ধাত্রী-বিদ্যা-পারদম মহাপুরুষও একজন সম্ভব হলেন
ধর্মসংস্থাপনার্থায়।
টলল না কিন্তু সে ;
বললে স্থিরকণ্ঠে,
পাপ করি নি কিছু,
নারীজীবনের চরম-সার্থকতা যে মাতৃত্ব
তাই অর্জন করতে যাচ্ছি
আধুনিক পদ্ধতিতে
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নিয়ে
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে।
আপনারা আমাকে রেহাই দিন।

টাকা আছে প্রচুর,
রেহাই দিতে হ'ল সুতরাং।

ছ' মাস কাটল।
ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন একদিন,
চমকে গেলেন :
আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা
আগে লক্ষ্য করেন নি তিনি,
পেল্ভিস ভয়ানক ছোট
স্বাভাবিক প্রসব অসম্ভব।

অপরিণত শাবকটিকে ধ্বংস না করলে
মায়ের জীবন-সংশয় !
মুখ শুকিয়ে গেল তার ।
অন্য কোন উপায় নেই ?
আছে—সিজারিয়ান সেক্‌শন ।
পেট কেটে ছেলে বার করা যেতে পারে,
কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা !
সে বিপদের সম্মুখীন হবে—
আত্মরক্ষা ও আত্মবিনোদনই আধুনিকতা নয়,
দুর্জয়কে জয় করবার সাহসই আধুনিকতা ।

অবশেষে এল সেই দিন ।
ঠিক করাই ছিল সব—
রবার-প্যাড দেওয়া অপারেশন-টেবিল,
আরও দুটো টেবিলে
তোয়ালে, ক্যাথিটার, কাঁচি, লোশন,
টাওয়েল, ফর্‌সেপ্‌স্—সারি সারি ওষুধ
জল গরম করবার ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ,
সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্নানের টব,
ইলেক্‌ট্রিক রেডিয়েটার একটা,
হাই-পাওয়ার বাল্‌ব চারটে,
ত্রুটি ছিল না কিছু ।
ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গেই
এসে পড়লেন ডাক্তারেরা
একজন সার্জন—দুজন সহকারী
নার্স দুজন আগেই এসেছিল
প্রাক-অপারেশন ব্যবস্থা করবার জন্যে ।
ডাক্তারদের সঙ্গে এল
গোটা চারেক বড় বড় ড্রাম
কোনটাতে যন্ত্রপাতি
কোনটাতে ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো

কোনটাতে ডাক্তারদের পোশাক
স্টেরিলাইজড্ আধুনিক পদ্ধতিতে
স্পাইনাল অ্যানিস্থিসিয়া দেওয়া হ'ল।
ডাক্তাররা হাত ধুলেন,
পরলেন তাঁদের অদ্ভুত অটোক্লেভ্‌ড পোশাক—
লম্বা গাউন পা পর্যন্ত,
নাক-মুখের আচ্ছাদন,
মাথায় টুপি,
হাতে রবারের দস্তানা।

চুপ ক'রে শুয়ে রইল সে মুখ বুজে,
মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

জ্বলে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্‌গট ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর
শুরু হ'ল অপারেশন।
করকর ক'রে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেলাম দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।
ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জেনের গাউনে এক পিচকিরি রং দিয়ে দিলে যেন কেউ,
কট কট কট—
আর্টারি ফরসেপ্‌স্ চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ
নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল।

বাইরেও তখন ফিনিক ফুটছিল জ্যোৎস্নায়।
চন্দ্রমল্লিকার স্তবকে স্তবকে
রজনীগন্ধার গুচ্ছে গুচ্ছে

চামেলী-কুঞ্জে
যূথিকা-বনে
ঝিল্লির অশ্রান্ত একটানা সঙ্গীতে
জ্যোৎস্না-ধবল মেঘমালায়
মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেই চিরন্তন সত্য—
সৃষ্টি কি সুন্দর!

সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে
সচকিত হয়ে উঠল চতুর্দিক।
সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক
সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে
প্রবেশ করল আধুনিক জগতে
চির-পুরাতন চিরনূতন শিশু।

২৬

ভাই অসিত,

তোমার স্ত্রী কি তোমার কাছে বা তোমাদের বাড়ীতে ফিরে গেছে? চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় চিঠি আমি লিখি না। হাসির হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে বিস্মিত (এবং একটু বিচলিতও) হয়েছি বলে লিখছি। হোস্টেলের মাসিমা বললেন, হাসি কাউকে কিছু না বলে' হোস্টেল থেকে চলে গেছে। তোমার শ্বশুর মশায়ের ঠিকানাটা জানা ছিল। সেখানে গেলাম। খবরটা শুনে তিনি রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। হাসির হঠাৎ হোস্টেল ত্যাগ করার কোনও সদর্থই করতে পারলেন না ভদ্রলোক। আম্‌তা আম্‌তা করলেন একটু, মুচকি মুচকি হাসলেন দু-একবার—এ ফানি সর্ট অব জেন্‌টল্‌ম্যান হি সিম্‌ড্‌—এক্‌স্‌কিউজ মি—যা মনে হয়েছে সরলভাবে বলে ফেললাম। শেষকালে বললেন, "না, আমি তো কিছুই জানি না। হয়তো অসিতের কাছে গেছে, কিম্বা অসিতের বাপমায়ের কাছে, ঠিক জানি না—"

খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। বোর্ডিংয়ের দারোয়ানের কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হল—এক্‌স্‌কিউজ মি ইফ্‌ আই হার্ট ইওর ফীলিংস্‌—মনে হল হাসি আত্ম-আবিষ্কার করেছে। ও যে করবে তা ওকে একদিন দেখেই আমি

বুঝেছিলাম। যে খাঁচায় মোহ আমাদের সকলকে সম্মোহিত করে রেখেছে তা ওকে ভোলাতে পারে নি। অজানা আকাশ থেকে যে মুহূর্তে ও সত্য ডাকটি শুনেছে সেই মুহূর্তেই ও ডানা মেলে উড়ে গেছে। বিয়ের মন্ত্র ওর পায়ের শিকল হয়ে উঠেনি। প্লীজ স্ট্রেচ ইওর ইম্যাজিনেশন—তুমি কবি, সত্যকার দ্রষ্টা হও, তাকে বোঝ, হা-হুতাশ কোরো না।

অন্ধকার 'সেলে,' পচে মরছি, তিলে তিলে মরছি, হঠাৎ যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছে উল্কার মতো, সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে সমস্ত গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে। দিস্ ইজ্ অ্যান ইভেন্ট, এ গ্লোরিয়াস ইভেন্ট···

এই পচা-ধসা সংস্কারের শ্যাওলা-পড়া সমাজের মুখে লাথি মেরে হাসি যে চলে যেতে পেরেছে এর জন্য তাকে নমস্কার করি। তোমার সৌভাগ্য যে তুমি অমন একটি মেয়েকে সহধর্মিণীরূপে পেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে তোমার মধ্যে সহধর্মীকে খুঁজে পেল না। পাবার কথাও নয়। তুমি ভদ্র, তুমি দয়ালু, তুমি ধনবান, তুমি তথাকথিত সভ্যসমাজের শোভন পুতুলটি। ঝড়ের রাতে যার অভিসার তার যোগ্য সঙ্গী হবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? অনেক কথা লিখে ফেললুম। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। যা লিখতে যাচ্ছি তাতেই যেন উলটো সুর বেজে উঠছে। আমার সমস্ত কল্পনা জুড়ে যে উদ্দাম অর্কেষ্ট্রা বাজছে এখন তার সঙ্গে তোমার মনের সুর মিলবে না। নেভার মাইণ্ড, চীয়ার আপ।

অতুল

২৭

ভাই অসিত,

তোমার পত্র পাইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। চিন্তার কথা তো বটেই। তোমাকে পূর্বপত্রে জানাইয়া ছিলাম যে, শনিবার দিন অফিস-ফেরত গিয়া হাসিকে লইয়া আসিব। দুইটা নাগাদ হোস্টেলে পৌঁছাইয়া খবর পাঠাইলাম। একটু পরে স্বয়ং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বাহির হইয়া আসিলেন। ভদ্রমহিলার চোখে মুখে বেশ একটু রুক্ষ ভাব লক্ষ্য করিলাম। আমার দিকে একনজর চাহিয়া বলিলেন, "হাসি হোস্টেলে নাই।" তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, কোথায় গিয়াছে, কখন ফিরিবে? "জানি না", বলিয়া তিনি গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে কি বেশ একটু অপমানিতই বোধ করিয়াছিলাম। কাল তোমার চিঠি পাইয়া ভিতরের কথা

বুঝিতে পারিলাম। চিত্রা তো আকাশ হইতে পড়িয়াছে, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। খানিকক্ষণ হতভম্ব হইয়া অবশেষে উঠিয়া পড়িতে হইল। একটা খোঁজ তো করিতে হইবে। আবার হোস্টেলে গেলাম। দারোয়ান বাবাজীকে একটি টাকা ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করিলাম যদি গোপন কোনও খবর বাহির করিতে পারি। পারিলাম না। সে বলিল—একটি ছোট সুটকেশ হাতে করিয়া হাসিদিদি একটা ট্যাক্সি চড়িয়া একাই চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে সে তাহা জানে না। শতমুখে সে হাসির প্রশংসা করিল। কহিল—একদিনও তাহার কোনও বেচাল সে দেখে নাই। দেখিবার কথাও নয়। চিত্রা বলিল, হাসি হয়তো হোস্টেলের মাসীমার সহিত ঝগড়া করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কথাটা মনে লাগিল। হাসির বাবা নীলাম্বরবাবুর সহিত কয়েকদিন পূর্বে দেখা হইয়াছিল তাহা তোমাকে পূর্বে জানাইয়াছি। তাঁহার বাসার ঠিকানাটা জানা ছিল। সোজা সেই ঠিকানাতেই চলিয়া গেলাম। আশা ছিল হাসিকে হয়তো সেইখানেই দেখিতে পাইব। কিন্তু ভাই, হতাশ হইতে হইল। হাসি তো সেখানে ছিলই না, নীলাম্বরবাবুও ছিলেন না। শুনিলাম—ঐ বাসার লোকেরাই বলিল—তিনি কয়েকদিন পূর্বে একাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে স্টেশনে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন যে হাসি তাঁহার সঙ্গে যায় নাই; তখন ভাবিলাম হাসি হয়তো একাই বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আজকাল অনেক মেয়েই তো একা একা সর্বত্র যাতায়াত করে। ইহার পর কি করিব ভাবিয়া পাইতে ছিলাম না। চিত্রা বলিল, আমাদের সদানন্দবাবুকে (অফিসের বড়বাবু) সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি হয়তো কোনও সৎ পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষ করিয়া তিনি নীলাম্বরবাবুর বাল্যবন্ধু বলিয়া আমি আরও উৎসাহিত হইয়া সেখানে গেলাম। খবরটা শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"এই রকম যে কিছু একটা হবে তা আমি আগেই জানতাম, নীলাম্বর শেষ রক্ষা করতে পারলে না তাহলে!" বুঝিতেই পারিতেছ এই ধরনের বাঁকাচোরা কথা শুনিয়া আমি-বেশ একটু অস্বস্তি ভোগ করিতে লাগিলাম। বলিলাম, "ব্যাপারটা কি আমাকে যদি খুলে বলেন আমি অসিতকে জানিয়ে দিতে পারি। অসিত বেচারা বড়ই চিন্তিত হয়েছে।" আমার কথা শুনিয়া বড়বাবু উঠিয়া গেলেন এবং আলমারি হইতে একটা চিঠির বাণ্ডিল বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। বলিলেন—"এই চিঠির বাণ্ডিলটা তোমার বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দাও, তাহলেই সে সব বুঝতে পারবে"—তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন—"লিখে দাও চিঠিগুলো পড়ে' যেন পুড়িয়ে ফেলে। ও

আমাকে ফেরত দিতে হবে না।" বড়বাবুর মুখটা কেমন যেন থম্ থম্ করিতে লাগিল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, বাণ্ডিলটি লইয়া চলিয়া আসিলাম। বাণ্ডিলটি আজ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। বড়বাবু যেমন সীল্ড্ দিয়াছেন তেমন পাঠাইয়াছি। বিশ্বাস কর, খুলিয়া দেখি নাই। সীল দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। খুবই কৌতূহল হইতেছিল কিন্তু ভাবিলাম গুরুতর কোনও বাধা যদি না থাকে তুমি নিজেই আমাকে জানাইবে। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম। ভয় করিও না, ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি—

মহেন্দ্র

নীলাম্বরবাবুর পত্রাবলী

১

ভাই সদানন্দ,

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছ সামাজিক দিক হইতে তাহার মূল্য আছে স্বীকার করি। আমরা সামাজিক জীব, সামাজিক নিয়মাবলীও যতটা সম্ভব আমাদের মানিয়া চলা উচিত একথা অস্বীকার করিতেছি না। আমি কেবল একটি প্রশ্নই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। আমরা কি কেবল সামাজিক জীবই। এতদপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপকতর পরিচয় কি আমাদের নাই? উপনিষদ আমাদের যে সত্তার কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা কি বিশেষ কোন সমাজের সত্তা? তাহা কি সর্বমানব সম্বন্ধেই সত্য নয়? উপনিষদের ঋষির বাণী—'আমি আমার মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের মধ্যে আমাকে উপলব্ধি করিব।' লিলির সম্বন্ধে এ-বাণীর অন্য অর্থ যদি করি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমাদের উপনিষদ পাঠ ব্যর্থ হইয়াছে। তোমার অধরে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, মানস-নেত্রে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি করিব বল, যাহা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছি তাহা তোমার নিকট অন্তত ব্যক্ত না করিয়া পারিতেছি না। উপনিষদের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, নিছক বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টি লইয়াই যদি বিচার করি, তাহা

হইলেও লিলিকে অপাংক্তেয় মনে করিবার কোনও হেতু খুঁজিয়া পাই না। তুমি যে সমাজের দোহাই পাড়িতেছ দুইশত বৎসর পূর্বে সে সমাজের যে চেহারা ছিল আজ তাহা আর আছে? এখন কি আর সতীদাহ চলিবে? কিন্তু যে সকল তত্ত্ব ডারবিনের বিবর্তনবাদকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার রূপ পরিবর্তিত হয় নাই। সামান্য ইতর-বিশেষ হয়তো হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক কাঠামোটা ঠিক আছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়াও যদি ভাব লিলিকে অযোগ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। কুলশীলের পরিচয় জানা না থাকিলেই কি তাহাকে কুলটা বা দুঃশীলা মনে করিতে হইবে? লিলির চোখে মুখে কি তাহার আভিজাত্য পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই? আমার বিশ্বাস সে যদি কথা কহিতে পারিত তাহার প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাইতাম। কাগজে বারম্বার বিজ্ঞাপন দিয়াও যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, থাকিলেও তাহারা দায়িত্ব লইতে চায় না। এ অবস্থায় কি করা উচিত? আমার মনে হয় দায়িত্ব আমাদেরই। কুম্ভ মেলায় গুণ্ডাদের হাত হইতে আমরা যখন তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি তখন উহার ভার আমাদেরই লইতে হইবে। তুমি শেষে যে কথাটা লিখিয়াছ তাহা পড়িয়া হাসি পাইতেছে। লিলি নামটাতে তোমার এত আপত্তি কেন? লিলির মতো সুন্দর দেখিতে বলিয়াই আমি লিলি নাম দিয়াছিলাম। তুমি বলিতেছ হিন্দু নাম রাখা উচিত, লিলি নামটাতে বিলাতী গন্ধ আছে। তোমার যে এ ধরনের শুচি-বায়ু আছে তাহা জানিতাম না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—উহার লিলি নাম পরিবর্তন করিয়া যদি কালী বা দুর্গা নাম রাখা যায় তাহা হইলে কি সমস্যার সমাধান হইবে? যদি হয় নাম পরিবর্তন করিতে আমার আপত্তি নাই। পরিশেষে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তোমার পত্র পড়িয়া সন্দেহ হইতেছে তুমি কি সেই সদানন্দ যে একদা সাহেবী হোটেলে বসিয়া মহানন্দে বীফস্টিক চর্বণ করিয়াছিলে? রাগ করিও না ভাই, যাহা মনে হইল লিখিলাম। লিলির সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি ঠিক করিলে তাহা জানাইবে। অদ্য মনিঅর্ডার যোগে তোমাকে পঞ্চাশ টাকাও পাঠাইলাম। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

২

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে সব মরাল লেকচার দিয়াছ তাহাতে কোনও সার বস্তু নাই, কেবলই ফেনা। সোডা ওয়াটারের বোতলে, অর্ধশিক্ষিতদের সভায় অথবা সস্তা প্রেমের উপন্যাসে ফেনা বেমানান নয় কিন্তু যে গুরুতর সমস্যা লইয়া তুমি আলোচনার ভান করিয়াছ তাহাতে উচ্ছ্বাসের স্থান নাই। যে ব্যক্তি জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করে তাহার ঘুম ভাঙান শক্ত। তুমি যদি মেয়েটির দায়িত্ব না লইতে চাও, লইও না। না লইবার বহুবিধ সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে, দুই-একটা কারণ তুমি উল্লেখও করিয়াছ। তোমার বাড়ীর লোক, বিশেষ করিয়া তোমার বাবা, মেয়েটিকে আর তোমার বাড়ীতে রাখিতে চান না, আমি তো মনে করি এই একটা কারণই যথেষ্ট। তিনি যদি তাঁহার বাড়ীতে কোন অজ্ঞাতকুলশীলাকে আশ্রয় না দিতে চান তাঁহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না। তুমি যদি এই কথাটাই কেবল লিখিতে আমার কিছুই বলিবার থাকিত না। কিন্তু তুমি এমন একটা ভাব দেখাইয়াছ যেন ব্যাপারটা যদি তোমারও বিবেকসঙ্গত হইত তাহা হইলে তোমার বাবার মত অগ্রাহ্য করিয়াও লিলিকে তুমি তোমাদের বাড়ীতে রাখিতে। বিবেকের স্বপক্ষে নানারূপ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া তুমি যে ধরনের ওকালতি করিয়াছ তাহা কোনও অশিক্ষিত গ্রাম্য পুরোহিতের মর্ম হয়তো স্পর্শ করিতে পারে, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে তোমার পত্রটি পঠিত হইলে প্রবীণ সমাজপতিদের হাততালিও হয়তো তুমি লাভ করিবে, কিন্তু ওসব কথা বলিয়া আমাকে তুমি ভুলাইতে পারিবে না। আমাকে তুমি কি চেন না? তবে কেন বৃথা কালি, কাগজ, শক্তি ও সময়ের অপব্যয় করিয়াছ? তোমার পত্র পড়িয়া একটা কথা আমার মনে হইতেছে। মনে হইতেছে যে তোমার বিবেক আমারই পক্ষে আছে। কিন্তু তুমি ভীতু। তুমি পিতার বিরাগ, সামাজিক গোলমাল প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে ভয় পাও, শুধু তাহাই নয়, তুমি যে ভয় পাও একথা আমার নিকট অকপটে স্বীকার করিতে তোমার লজ্জাও হয়। তাই তুমি ওই সব-রাবিশ মরাল লেকচার দিয়াছ।

এইবার কাজের কথা পাড়ি। তুমি তো জান বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ীটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমার নিজের বলিতে আপাতত কেহ নাই, সে জন্য বাড়ীরও দরকার নাই। কলিকাতায় গেলে মেসে থাকি, দেশে আসিলে

মন্থু মাসী আমাকে আশ্রয় দেন। আমার নিজের বাড়ী থাকিলে লিলিকে নিশ্চয়ই সেখানে আশ্রয় দিতাম। মন্থু মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনিও আশ্রয় দিতে রাজী নন। তুমিও যখন অপারগ হইয়াছ তখন মেয়েটিকে রাস্তায় বাহির করিয়া দেওয়া ছাড়া আর একটি মাত্র উপায় আছে। আমি নিজে তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়া অন্য কোথাও তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। সে রকম ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে সে চিন্তাও আমি করিয়াছি। প্রথম এবং প্রধান কথা টাকা, তাহা আমি ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি তাহাকে মূক-বধিরদের স্কুলে ভরতি করিয়া দাও। শুনিয়াছি, সেখানে থাকিবার বোর্ডিং আছে। সেই বোর্ডিংয়ের কর্তৃপক্ষদের সহিত দেখা করিয়া লিলির সেখানে থাকিবার বন্দোবস্তটুকু আশা করি তুমি করিয়া দিতে পারিবে। ইহাতে আশা করি তোমার সনাতন হিন্দুধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। লিলির কাপড় চোপড় এবং ট্রাঙ্ক কিনিবার জন্য ইতিপূর্বে তোমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইয়াছি। অদ্য পুনরায় একশত টাকা পাঠাইলাম। যদি আরও লাগে পাঠাইয়া দিব। এই অজ্ঞাত কুলশীলার জন্য আমি কেন এত টাকা অনর্থক খরচ করিতেছি এ প্রশ্ন তোমার যদি জাগে তাহা হইলে তোমার সম্পর্কে আমার নিজের আচরণের কথা স্মরণ করিও, তাহা হইলেই উত্তর পাইবে। রেসের মাঠে তোমার হইয়া টিকিট খরিদ করিবার কোনও সদর্থই কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি করিতে পারিবেন না। আমার কাছে কিন্তু ইহার একটি সহজ অর্থ তখনও ছিল, এখনও আছে। আমি সুখ পাইয়াছিলাম। আশা করি লিলির একটা সুব্যবস্থা তুমি করিয়া দিতে পারিবে। আমি জ্বরে শয্যাগত আছি, তাহা না হইলে আমি নিজেই চলিয়া যাইতাম। আমার ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ।

ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

৩

ভাই সদানন্দ,

লিলিকে মূক-বধিরদের বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দিয়াছ জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যে ফর্মগুলি তুমি সহি করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছ তাহা এই সঙ্গে পাঠাইয়া দিলাম। তুমিই যদি উহার গার্জেন হইয়া ফর্মগুলিতে সহি করিয়া দিতে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হইয়া যাইত? আমি যখন টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি নিশ্চয়ই দিব। আচ্ছা লোক তো তুমি! হঠাৎ এমন সাবধানী হইয়া উঠিলে কেন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি লিখিয়াছ, "লিলির সহিত যে আমার কোনও সম্পর্ক আছে, বা কোনওকালে ছিল তাহার কোনও প্রমাণ কাগজে কলমে আমি রাখিতে চাই না। তুমিই যখন তাহার সমস্ত ভার লইতেছ, তখন তুমিই তাহার গার্জেন হও।" আইনত কথাটা ঠিকই, কিন্তু তোমার মতির এরূপ গতি হইল কেন ভাবিয়া পাইতেছি না। আমাদের বন্ধু যোগেন ডাক্তারকে দিয়া তোমার ব্লাড প্রেসারটা মাপাও। আর একটা কাজের কথাও তোমাকে লিখিতেছি। তুমি এখন হিসাবী লোক হইয়াছ, আশা করি ইহার একটা সুব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমার ব্যাঙ্কে নগদ টাকা বিশেষ কিছু নাই। যাহা ছিল তাহা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি। আমার ইচ্ছা আমার মায়ের ঠাকুমার দিদিমার এবং আরও অনেকের যে সব গহনা উত্তর-অধিকার-সূত্রে আসিয়া আমার সিন্দুকে জমিয়া আছে সেগুলিকে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিই। সমস্ত বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশেক টাকা নিশ্চয় হইবে। তুমি যদি ব্যবস্থা করিতে পার ভাল হয়। আমি এসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোথায় গিয়া কাহার সহিত কথাবার্তা কহিলে সুবিধা হইবে আমার জানা নাই। তোমারও জানা আছে কি-না জানি না, কিন্তু তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, তাই তোমাকে লিখিলাম। তোমার আজকাল মরাল লেক্‌চার দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে জানিয়াও লিখিলাম। তুমি হয়তো লিখিবে, মা, দিদিমা, ঠাকুমার স্মৃতিচিহ্নগুলি এমনভাবে নষ্ট করা বর্বরতা। হয়তো আমি বর্বর। আমার সহজ বুদ্ধি কিন্তু আমাকে বলিতেছে যে অতগুলি গহনা অকারণে বাক্সে পুরিয়া রাখার কোনই সার্থকতা নাই। ওগুলিকে যথোচিত সাবধানতা সহকারে রাখিবার সামর্থ্যও আমার নাই। মনু মাসীর বাড়ীতে যদি ডাকাতি বা চুরি হয় (কিছুই বিচিত্র নয়) তাহা হইলে

আমার কিছুই বলিবার থাকিবে না। ওগুলি বিক্রয় করিয়া টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখাই নিরাপদ। তা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি আমার টাকার দরকার! আর এম. এ. পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা নাই। একটা এম. এ. ডিগ্রি তো আছে, ডবল এম. এ. হইয়া আর কি হইবে? চাকরি করিবার বাসনা নাই। কোনও ব্যবসায় করিব। কিন্তু কিসের ব্যবসায় কোথায় করিব তাহা এখনও অনিশ্চিত। মনু মাসী বলিতেছিলেন, মেসোমশায়ের কাশীতে যে জুয়েলারি দোকানটি আছে লোকাভাবে এবং দেখা-শোনার অভাবে সেটি নাকি তেমন চলিতেছে না। আমি যদি সেটির ভার লই তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। মেসোমশাই যখন বাঁচিয়াছিলেন তখন দোকানটির নাম ডাক ছিল। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন। মনু মাসীর জামাইটি সম্বল। মেয়ে বাঁচিয়া থাকিলে জামাই আপনজন হইত, হয়তো ঘর-জামাই হইতে পারিত, কিন্তু এখন তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া পর-জামাই হইয়া গিয়াছেন। মনু মাসী বলিতেছেন যে, দোকানটি আমি যদি চালাইতে পারি আমাকেই তিনি লেখা-পড়া করিয়া সমস্ত স্বত্ব দান করিয়া দিবেন। আমি যে জহুরী লোক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—অহেতুক বিনয় আমি করি না—কিন্তু মুশকিল হইয়াছে, আমার জহুরীত্ব যে ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তাহার মধ্যে জুয়েলারী দোকানের স্থান নাই। শেক্‌স্‌পীয়র মিলটন গ্যেটে কালিদাস ভবভূতি রবীন্দ্রনাথ হইতে শুরু করিয়া উদীয়মান কবি কাজি নজরুলের পর্যন্ত স্থান সেখানে আছে, কিন্তু জুয়েলারী দোকানের নাই। কিন্তু মনু মাসীর কথা শুনিয়া লোভ হইতেছে। কি করি বল দেখি? নূতন ধরনের এই রেস খেলায় ঝাঁপাইয়া পড়িব নাকি! বাজে ঘোড়াকে ব্যাক করিয়া জীবনে অনেক রেসে হারিয়াছি, আর একবার হারিতেও লজ্জা নাই। মনু মাসীকে কিন্তু বাজে ঘোড়া বলিয়া মনে হয় না। তুমি নিশ্চয় চটিয়া এতক্ষণ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছ। আমি ভাই অসহায় ব্যক্তি, আমার উপর রাগ করিয়া শক্তিক্ষয় করিও না। ভালবাসা লও। আশা করি কুশলে আছ। লিলির কাছে আর গিয়াছিলে কি? মাঝে মাঝে খবর লইও। ইতি

তোমারই

নীলাম্বর

ভাই সদানন্দ,

আমি কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিতে পারি নাই, কারণ একটি টেলিগ্রাম পাইয়া আমাকে পরের ট্রেনেই দিল্লী চলিয়া আসিতে হইয়াছে। টেলিগ্রাম কে করিয়াছিল জান? চুনী। চুনীকে মনে পড়িতেছে না? আমাদের সেই বেনেটোলার বেণী-দোলানো চুনী, যাহার বাবা চাকরির লোভে খৃস্টান হইয়াছিলেন। এইবার আশা করি মনে পড়িয়াছে। সেই চুনী হঠাৎ এতদিন পরে আমাকে বাড়ীর ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়াছিল—অন ডেথ বেড, প্রে কাম ওয়ান্স। মনু মাসী সেই টেলিগ্রাম কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কি কাণ্ড দেখ! টেলিগ্রামের ওই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যেই রোমান্সের গন্ধ আসে। রোমান্সই। চুনীকে ঘিরিয়া অনেকের মনেই একদা রোমান্স জাগিয়াছিল, আমারও জাগিয়াছিল। তোমার মনের সঠিক খবর জানি না, কিন্তু তুমি যে তাহাকে ভুল বাংলায় শেলী কীটস ব্রাউনিংয়ের কবিতার রসাস্বাদন করাইবার চেষ্টা করিতে এই খবরটি আমার অজ্ঞাত ছিল না। চুনী আমাকে একদিন বলিয়াছিল। তোমার অনুবাদ আমাকে দেখাইয়াও ছিল, সেই জন্য সন্দেহ হয় যে তুমিও হয়তো মজিয়াছিলে। একটা কথা কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না। চুনী আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। এখন হইলে বোধ হয় তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তখন বাবা বাঁচিয়াছিলেন। বাবার চটিজুতা দুই-একবার পৃষ্ঠস্পর্শ করিয়াছিল, সে স্মৃতিও মনে জাগরূক ছিল। সুতরাং সাহস করি নাই। চুনীর আবেগময় উক্তির উত্তরে যে কথা বলিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার মনে আছে। বলিয়াছিলাম—"দেখ চুনী, ক্ষমতা থাকিলে আমরা দুইজনে প্রজাপতি হইয়া অনন্তের উদ্দেশে পাশাপাশি উড়িয়া যাইতাম। সে ক্ষমতা যখন নাই তখন এস আমরা মনে মনে উড়ি, বিবাহের লাগাম দিয়া প্রজাপতিকে অচল করিয়া দিবার চেষ্টা করিও না। গুড বাই।" তাহার পর আর চুনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র অবশ্য চলিত। এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল এ খবরও পাইয়াছিলাম। তাহার পর অনেক দিন আর কোনও খবর পাই নাই। সহসা এই টেলিগ্রাম। তোমাকে বলিয়া আসিবার সময় ছিল না। দিল্লীতে আসিয়া দেখিলাম একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধা

মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চক্ষু কোটরগত, মাথার সম্মুখ দিকটা টাক-পড়া, ক্রমাগত কাশিতেছে। যে ঘরে শুইয়া আছে সে ঘরটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে।

আসবাবপত্র সাহেবী ধাঁচের, কিন্তু খুব ময়লা এবং জীর্ণ। তাহার ঘরে বৃদ্ধ বকাকৃত একটি সাহেব বসিয়াছিলেন, তিনিই মিস্টার জোন্‌স্, চুনীর স্বামী। আমাকে দেখিয়া চুনী বলিল, "আপনি এসেছেন নীলাম্বরবাবু? আশা করিনি যে আপনি আসবেন। আপনাকে একবার শেষ দেখা দেখবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল, তাই ধার করেও এই টেলিগ্রামটা করেছিলাম। কিন্তু আশা করতে পারিনি যে আপনি আসবেন। আমার কি দশা হয়েছে দেখুন নীলাম্বরবাবু"—ছোট খুকীর মতো সে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মিস্টার জোন্‌স্ বকের মতো নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটি কথা পর্যন্ত বলিলেন না। পরে জানিয়াছি লোকটি বদ্ধ কালা। কানের ভিতর ঘা হইয়া কালা হইয়া গিয়াছেন এবং এই জন্য চাকরিও গিয়াছে। চুনীর উপর্যুপরি চারটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। চুনির হইয়াছিল যক্ষ্মা। শুনিলাম অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না। আমাকে অবশ্য চুনী ডাক্তার ডাকিতে বলে নাই। মিস্টার জোন্‌স্ কেবল মধ্যে মধ্যে ধীর কণ্ঠে বলিতেছিলেন, "দি সিচুয়েশন ইজ ভেরী ভেরী ডেসপারেট।" আপন মনে বলিতেছিলেন, আমাকে কিছু বলেন নাই। আমি কিন্তু ভাই, নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারিলাম না, ডাক্তার ডাকিলাম। ভাল ডাক্তারই ডাকিলাম একজন। তিনি বলিলেন, "বাঁচিবার কোনও আশা নাই। তবে যে কয়দিন বাঁচেন, কষ্টটগুলা কমাইবার জন্য ঔষধ দিতে পারি। এ রোগ সারিবে না।" আমি আসিবার পর চুনী পাঁচদিন মাত্র বাঁচিয়াছিল। কাল সে মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে সে আমাকে বলিয়া গেল, "জীবনের শেষ ক'টা দিন আপনি অমৃতে পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন নীলাম্বরবাবু। এই আনন্দের স্মৃতি যদি মৃত্যুর পরও থাকে তা হলে তারই জোরে আমি অনন্ত স্বর্গলাভ করব, আমার আর কোনও ক্ষোভ নেই। আমি জীবনে একমাত্র আপনাকেই চেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল অসম্ভবকে চেয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও সম্ভব হল। এখন আপনাকে যেমন ক'রে পেলাম তেমন ক'রে বোধ হয় কেউ পায়নি আপনাকে।" ইহাই আমার সহিত তাহার শেষ কথা। চুনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বকটি উড়িয়া গেল। তাহার শেষকৃত্যও আমাকেই করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোন্‌স্ কোথায় যে উড়িয়া গেলেন বুঝিতে পারিলাম না। তিনি শবানুগমন পর্যন্ত করেন নাই। চুনীকে গোর দিবার সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করিতে হইয়াছে। মিস্টার জোন্‌সের যে দুই-একজন আত্মীয় পাশাপাশি ছিলেন তাঁহারা

অবশ্ত কায়িক সাহায্য যথেষ্ট করিয়াছেন, আর্থিক দিকটা আমাকেই সামলাইতে হইয়াছে। এমন কি, চুনীর যে সব ধার ছিল তাহাও শোধ করিয়াছি। ছয় মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি ছিল, বাড়ীওয়ালা আসিয়া আমাকেই ধরিল। বলিল, মিস্টার জোন্‌স্ বলিয়া গিয়াছেন যে আমি নাকি তাঁহার দূর-সম্পর্কের বড়লোক আত্মীয়, আমিই সব মিটাইয়া দিব। বাক্যব্যয় না করিয়া সব মিটাইয়া দিলাম। জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছিলাম, অন্য উপায় ছিল না। সমস্ত ব্যাপার যখন মিটিয়া গিয়াছে তখন মিস্টার জোন্‌সের সহিত হঠাৎ একদিন দেখা হইল একটা চায়ের দোকানে। তিনি বকের মতো বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা আকৃতির নানা জাতের একদল লোক দাঁড়াইয়াছিল। আমি কাছে গিয়া দেখিলাম তিনি লিখিয়া লিখিয়া সকলের সহিত কথাবার্তা বলিতেছেন। সকলে লিখিয়া লিখিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে এবং তিনি লিখিয়া লিখিয়া উত্তর দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, মাত্র চারি আনা পয়সার বিনিময়ে তিনি সকলকে রেসের 'টিপ' দিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি নাকি খুবই পারদর্শী। আমার অন্তরে কৌতুক ও কৌতূহল যুগপৎ জাগরিত হইল। আমি আগাইয়া তাহার সম্মুখে গেলাম। টিপের চিন্তায় তিনি এত তন্ময় ছিলেন যে আমাকে প্রথমে দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইবামাত্র কিন্তু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করমর্দন করিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি তখন একটি কাগজে লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে আমিও একটি 'টিপ' চাই। মিস্টার জোন্‌স্ উত্তরে লিখিলেন, 'ওয়েট এ বিট।' আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! সকলে যখন চলিয়া গেল তখন মিস্টার জোন্‌স্ একটি ঘোড়ার নাম লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই ঘোড়াটিতে তাঁহার নিজের খেলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে। আমি যদি খেলি, সিওর লাক্। আমি একটি সিকি বাহির করিয়া তাঁহাকে দিতে গেলাম, কিন্তু জিব কাটিয়া তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। মনে হইল, ডিকেন্সের উপন্যাস হইতে একটি চরিত্র যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়াছে। ডিকেন্সের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই একখানা চেয়ার টানিয়া মিস্টার জোন্‌সের পাসে বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা লিখিলে তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে। সংক্ষেপে দরকারী কথাটুকু কেবল জানাইতেছি। মিস্টার জোন্‌সের পরামর্শ অনুযায়ী দুইদিন রেস খেলিয়াছিলাম। পাঁচশত টাকা হারিয়াছি। আমাকে কিছু টাকা, অন্তত হাজারখানেক টি. এম. ও. করিয়া অবিলম্বে পাঠাইয়া দাও। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, রেস খেলিয়াই ওই পাঁচশত টাকা উদ্ধার করিব। তোমার যাহা মনে হইতেছে এবং যাহা তুমি পত্রযোগে বলিবে তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে

পারিতেছি। তোমার যাহা বক্তব্য তাহা তুমি বল, আমি আপত্তি করিব না। তোমার পত্র যত দীর্ঘই হোক, আস্ত পড়িব—এ প্রতিশ্রুতিও দিতেছি, কিন্তু টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইবে। গহনা বিক্রয় করিয়া যে টাকাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই আমি হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছিলাম, বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা করিয়া আসিয়াছি। এই সঙ্গে একটা হাজার টাকার চেকও পাঠাইলাম তোমার নামে। টাকাটা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিও। অমি কলিকাতায় আর এক কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় টেরও পাইয়া গিয়াছ। একটা ছোট বাসা ভাড়া করিয়া লিলিকে সেইখানেই রাখিয়া আসিয়াছি! বোর্ডিং হাউসে বেচারার বড় কষ্ট হইতেছে দেখিলাম। একটা ঠাকুর এবং হোলটাইম ঝি-ও বাহাল করিয়া দিয়াছি। যখন তাহার ভারই লইতে হইল তখন ভদ্রভাবেই তাহা লওয়া উচিত। আমি এখান হইতে দেশে ফিরিব। মনু মাসীর কাছে দিনকতক থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। কাশীতে যাইতে পারি, মানে, সেই জুয়েলারি দোকানের সম্পর্কে। আমার ভালবাসা জানিবে। আশা করি কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

৫

প্রিয় সদানন্দ,

সানন্দে সুসংবাদটি জানাইতেছি। এবার ভগবান মিস্টার জোন্সের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। তাহার শেষের টিপ তিনটি ফলপ্রদ হইয়াছে। যাহা হারিয়াছিলাম তাহা পুনরুদ্ধার করিয়াছি। উপরন্তু কিছু লাভও হইয়াছে। কিছু টাকা লিলিকে পাঠাইয়া দিলাম। তুমি আর তাহাকে টাকা দিও না। মাঝে মাঝে খবর লইও। আমি কাশী চলিলাম। ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার

নীলাম্বর

ভাই সদানন্দ,

কাশী হইতে তোমাকে পত্র দিতে পারি নাই। হীরা জহরতের ব্যাপারে এতই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল যে সময় ছিল না। এতদিন দোকানটি যে লোকের হাতে ছিল তাঁহার নাম অভয় মিত্র। কিন্তু এমন ভয়ানক ও শত্রুভাবাপন্ন লোক আমি আর কখনও দেখি নাই। লোকটি একচক্ষু, কৃষ্ণকান্তি, মুখময় বসন্তের দাগ, মাথায় কদম ছাঁট চুল। অতিশয় স্বল্প-ভাষী। একটিমাত্র বাক্য তাঁহার মুখ দিয়া বার বার নির্গত হইতে শুনিলাম, তাহা এই—"আজ্ঞে, আমি তো কিছুই জানি না, আপনি যা করতে চান করুন।" মনু মাসী আমাকে যে সব জিনিসপত্রের লিস্ট দিয়াছিলেন, গণনায় এবং আকৃতিতে সবগুলি ঠিকই আছে। কিন্তু পরীক্ষা করাইয়া দেখিলাম একটি পাথরও আসল নয়, সমস্তই নকল। অভয় মিত্র বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না।" দোকান চালাইবার জন্য মাসে তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা বেতন পান, কিন্তু একটি ত্রিতল বাড়ী হাঁকাইয়াছেন দেখিলাম। মোট কথা, দোকানে একটি মাত্র খাঁটি রত্নই দেখিতে পাইলাম—সেটি শ্রীযুক্ত অভয় মিত্র। অগাধ সমুদ্র হইতে পুলিশ এ বস্তুটি সংগ্রহ করিতে পারিবেন কি-না জানি না। কিন্তু আইনত তাহারাই ডুবুরি, সুতরাং তাহাদের হস্তেই সমস্ত ব্যাপারটা সমর্পণ করিয়াছি। মনু মাসী বলিলেন, প্রায় এক লক্ষ টাকার জিনিস দোকানে ছিল। যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্য দুই-শত টাকার অধিক নয়। মনু মাসীর নির্দেশ অনুসারে ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। মাল যদি উদ্ধার হয় আমিই তার উত্তরাধিকারী হইব—মনু মাসী এই মর্মে একটি উইলও করিয়াছেন। উপস্থিত আমাকেই মোকদ্দমার খরচ চালাইতে হইবে, মনু মাসীর হাতে নগদ টাকা তেমন কিছু নাই। জমিজমা হইতে সংসার চলে। একটা বিধবার কতই বা খরচ। মোট কথা, আমি এখন গহ্বরস্থ হইয়াছি। শেষ পর্যন্ত তলাইয়া যাইব কি-না কে জানে। তুমি যদি কিছু বুদ্ধি দিতে পার দিও। এখানে আসিয়া লিলির একটি পত্র পাইলাম। অত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছি। দুই-একটা বানান ভুল আছে, "কৃতজ্ঞ" কথাটা ঠিক লিখিতে পারে নাই, অক্ষরগুলিও বড় বড়, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে লিখিতে পারিয়াছে এইটাই তো বড় কথা। তুমি তাহার নিকট অনেক দিন যাও নাই লিখিয়াছে। তোমার এ ঔদাসীন্য কি ইচ্ছাকৃত ? লিলির সম্বন্ধে

তুমি তোমার মতলবটা কোন দিনই খুলিয়া বল নাই। সম্মুখে ওঁই গাঁই কর, চিঠির মারফৎ মরাল লেকচার দাও। অথচ লিলির ব্যাপারে তোমার আমার দায়িত্ব সমানই হওয়া উচিত। আমরা উভয়েই তাহাকে গুণ্ডার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি না হয় তাহার আর্থিক দিকটার ভার লইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া নৈতিক দায়িত্বটা কি তুমি এড়াইতে পার ? যদিও তোমার সহিত অনেক বিষয়ে আমার মতের অমিল আছে কিন্তু তুমি যে আমার একমাত্র বন্ধু তাহাতেও সন্দেহ নাই। অন্যান্য বহু বিষয়ে তোমার স্পষ্ট মতামত আমার জানা আছে এবং তদনুযায়ী আমি চলিয়া থাকি কিন্তু লিলির ব্যাপারটা তুমি ঠিক কি আলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার মরাল লেকচারগুলি যে ভাঁওতামাত্র তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি ?

ভালবাসা লইও। আশা করি সুস্থ শরীরে আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

৭

ভাই সদানন্দ,

প্রায় একমাস পূর্বে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহার কোনও উত্তর এ পর্যন্ত পাইলাম না। লিলিরও কোনও পত্র আসে নাই। তাহাকে তাহার খরচের টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। আমিও তোমাদের কোনও চিঠি লিখিতে পারি নাই, কারণ দারুণ গ্রীষ্মে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছি। মনু মাসীর শরীরটাও ভাল নাই। পেটের অসুখে ক্রমাগত ভুগিতেছেন। এখানকার ডাক্তারেরা এখনও হাল ছাড়েন নাই। যদি ছাড়িয়া দেন তাহাকে লইয়া কলিকাতায় যাইব। লিলির কাছেই উঠিব। লিলির আলাদা বাসার কথা মনু মাসীকে বলিয়াছি। আশঙ্কা হইয়াছিল, মনু মাসী হয়তো রাগ করিবেন। কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন, "তোমাকে আর কি বলব বাবা। বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, একটি কথা শুধু বলছি, দেখো মেয়েটির যেন কোনও অসম্মান না হয়। অনাথকে আশ্রয় দিয়েছ খুবই ভাল কথা, কিন্তু দেখো তার দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" তুমি আমাকে যে সব মরাল লেকচার দিয়েছিলে

মনু মাসীর কথাগুলি তদপেক্ষা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী। মনে হইতেছে, কথাগুলি তাঁহার মর্ম হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার আর একটা কথা মনে হইল। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা আমাদের চরিত্রগত দোষ—দুর্বলতা কুসংস্কার স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে না, পুষ্ট করে। নিমগাছ সার পাইয়া পুষ্টতর নিম ফলই ফলায়। সার না পাইলেও আমের গাছ যে ফল ফলাইবে তাহা আমই হইবে, নিম হইবে না। মনে হইল, মনু মাসী সেই আম গাছ। আমরা চতুর্দিকে সুপুষ্ট নিম গাছের বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাহারা বিদ্বান, কিন্তু নিম।

হ্যাঁ, তোমাকে আর একটা সুসংবাদও দিবার আছে। কাশী হইতে পুলিশ সংবাদ দিয়াছেন যে, হয়তো তাঁহারা লুপ্ত রত্নোদ্ধার করিতে পারিবেন। অভয় মিত্র নাকি বামাল সুদ্ধ ধরা পড়িয়াছেন। অভয় মিত্রের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি পত্র ও রসিদ আবিষ্কার করিয়াছে। সেই পত্র ও রসিদগুলির সাহায্যে মিরাট, কলিকাতা ও বোম্বের কতকগুলি জহুরীরও সন্ধান মিলিয়াছে। পুলিশ আশা করিতেছে যে, তাহারা টাকা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া লইবে। আমার মন-মার্জার উচ্চকর্ণ হইয়া আছে যদি শিকাটা ছিঁড়িয়া পড়ে। ছিঁড়িবে কি? যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই আমি জুয়েলারির দোকান ফাঁদিব। ব্যবসায়ের পক্ষে কলিকাতাই সর্বোত্তম স্থান। যাঁহারা ব্যাক টু ভিলেজের লেকচার দেন তাঁহারাও দেখি সকলেই কলিকাতাবাসী। অর্থ উপার্জন করিতে হইবে, খরচও করিতে হইবে, ইহার কোনটি বাদ পড়িলে আমাদের মতো লোকের জীবন ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। উভয় ব্যাপারের পক্ষেই কলিকাতা শহর প্রশস্ত স্থান। সাধু-সন্ন্যাসীরা পর্বতে গুহায় অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে গিয়া থাকুন, তাঁহাদের সে শক্তি আছে। যাঁহারা খুব ধনবান তাঁহারাও পর্বতে গুহায় অরণ্যে বা পল্লীগ্রামে (মানে নিজেদের জমিদারিতে) গিয়া সুখে থাকিতে পারেন, কারণ অর্থের বিনিময়ে যে-কোনও প্রকার স্বাচ্ছন্দ্য যে-কোনও স্থানে মিলিতে পারে, সাহারা মরুভূমিতেও রেফ্রিজারেটার লইয়া গিয়া আইসক্রীম ভক্ষণ করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে কলিকাতাই ভাল। সুতরাং যদি টাকাটা পাই কলিকাতাতেই যাইব। তুমি একটু নজর রাখিও কোনও ভাল জায়গায় যদি দোকান করিবার মতো ঘর খালি থাকে। মনু মাসীকে লইয়া যদি কলিকাতা যাইতে হয় তোমাকে টেলিগ্রাম করিব। তুমি সত্যই শেষে চাকরির চেষ্টা করিতেছ না কি! এত লেখা-পড়া করিয়া শেষ পর্যন্ত কেরানীগিরি করিবে? আহা, দুর্ভাগ্য! তুমি তোমার গত পত্রে ইহার আভাস মাত্র দিয়াছিলে, তাহার পর আর কোনও খবর দাও নাই

বলিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, তুমি ইতিমধ্যে হয়তো কোনও অফিসে ঢুকিয়া পড়িয়াছ এবং খবরটা আমার নিকট গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতেছ। যদি ঢুকিয়াই থাক গোপন করিবার প্রয়োজন কি ?- শেষ পর্যন্ত গোপন থাকিবেও না। এবার কিন্তু পত্রোত্তর দিতে দেরি করিও না। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর। আশা করি ভাল আছ। লিলির খবর একটু লইও। ইতি—

নীলাম্বর

৮

ভাই সদানন্দ,

একটু আগে তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। মন্নু মাসীকে লইয়া আমি পরশু সকালে লুপ এক্স্প্রেসে কলিকাতা পৌঁছিব। তুমি স্টেশনে একটা ইনভ্যালিড চেয়ার বা স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত রাখিও। লিলিকে বলিও, দ্বিতলের বড় ঘরটি যেন পরিষ্কার করাইয়া রাখে, মন্নু মাসীকে সেই ঘরে রাখিব। যদি সম্ভব হয় একজন ভাল ডাক্তারের সহিত পূর্বেই এনগেজমেন্ট করিয়া রাখিও। আমরা দশটা নাগাদ বাড়ীতে পৌঁছিব। তিনি যদি বারোটা নাগাদ আসিয়া পড়েন সেই-দিনই চিকিৎসার একটা বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে। লিলিকেও আমি আলাদা পত্র দিয়াছি, তবে সে আমার টানা হাতের লেখা পড়িতে পারিবে কিনা জানি না। তুমি যদি এই পত্র যথাসময়ে পাও, লিলির সহিত দেখা করিও। অভয় মিত্রের আর কোন খবর পাই নাই। অধিক আর কি। ভালবাসা লও। ইতি—

নীলাম্বর

৯

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইলাম। তুমি যা লিখিয়াছ তাহা যে সদিচ্ছা প্রণোদিত সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার প্রকৃত হিতৈষী একথাও আমি জানি। কিন্তু আমাকে এতদিন দেখিয়াও তুমি আমাকে চেন নাই ? আমি যাহা করিব ঠিক করিয়াছি তাহা করিবই। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা খুবই যুক্তি-যুক্ত। মন্নু মাসীর শ্রাদ্ধে কলিকাতায় যখন একবার কাঙালী ভোজন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে

তখন মুঙ্গেরে আবার ও ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেখ, আমরা অহঙ্কারবশত একটা জিনিস প্রায়ই ভুলিয়া যাই এবং আমরা নিজেদের নিক্তিতেই সকলকে ওজন করি। যিনি নিজে চরিত্রহীন তিনি সকলকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন, যিনি নিজে চরিত্রবান তিনি সকলকেই সাধু মনে করেন। যে দরিদ্র সে ভাবে মোটরের প্রয়োজন কি? যিনি মোটর-বিহারী তিনি বলেন অনর্থক হাঁটিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? নিজের মোটর কিনিবার যদি সামর্থ্য না থাকে ট্রামে চড়। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের শ্যামদা হাঁটিতেই ভালবাসিতেন। শ্যামবাজার হইতে বালিগঞ্জ পর্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যাইতেন অর্থাভাবে নয়, মনের আনন্দে। তুমি যেটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছ, আমার নিকট তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানকার দীন-দুঃখীদের খাওয়াইয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব। মনু মাসীর আত্মা যদি কোথাও বাঁচিয়া থাকেন তিনিও তৃপ্তিলাভ করিবেন। হাজার দুই তিন টাকা কি ইহার চেয়ে বেশি মূল্যবান? তা ছাড়া অতগুলি টাকা তো মনু মাসীর জন্যই পাইয়াছি একথা ভুলিয়া যাওয়া কি উচিত? তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া চেকটি ভাঙাইয়া যে সব জিনিস আমি কিনিয়া পাঠাইতে বলিয়াছি—বিশেষ করিয়া ভীম নাগের সন্দেশ ও নবীন ময়রার রসগোল্লা—প্রচুর পরিমাণে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। পাঁচশতের বেশি লোক হইবে না। পাঁচশত লোককে খাওয়াইতে (মানে, ভাল করিয়া খাওয়াইতে) যত লাগে ততই পাঠাইবে। আরও টাকার যদি প্রয়োজন মনে কর লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

আর একটি কথা, তুমি কলেজ স্ট্রীটের উপর সেই বাড়ীটি যেন হাতছাড়া করিও না। বৌবাজারে যদি তেমন সুবিধা মতন বাড়ী না পাওয়া যায় ওইখানেই দোকান খুলিব। আর একটা অপব্যয় করিব ঠিক করিয়াছি। অভয় মিত্রের যাহাতে জেল না হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অমন একটি গুণী লোককে জেলে পুরিয়া বেরসিক অপবাদ লইতে চাই না! তাহার ছেলেকে আমি চিঠি লিখিয়াছি টাকা দিয়া যতটা সাহায্য করা সম্ভব আমি করিব। সে যেন ভাল উকিল নিযুক্ত করে।

লিলির সম্বন্ধে তুমি যে সন্দেহ করিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করিব। তোমার অফিসের কাজ কেমন চলিতেছে? তোমাকে আমি যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহা আর একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিও। আমি দোকানের অর্ধেক শেয়ার তোমাকে দিতে রাজী আছি তুমি যদি দোকানটির দেখা-শোনা কর। চাকরিতে যাহা পাইতেছ তদপেক্ষা বেশি পাইবে সন্দেহ নাই। ভাবিয়া দেখিও। ভালবাসা লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—তোমারই

নীলাম্বর

ভাই সদানন্দ,

তোমার প্রেরিত মিষ্টান্নগুলি যথাসময়ে ভালভাবে পৌঁছিয়াছিল। ভোজও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তুমি কোনও পত্র লিখিতেছ না কেন? ক্রমাগত তোমার পত্রের অপেক্ষা করিয়া শেষে নিজেই লিখিতে বসিলাম। বুঝিতে পারিতেছি, তোমার মনে বিবিধ রকম জিলাপী পাক খাইতেছে এবং তুমি দার্শনিক হাসি হাসিতে হাসিতে ভাবিতেছ, "আমি আগেই জানিতাম এই রকম একটা কিছু ঘটিবেই।"

সুতরাং তোমাকে সমস্ত কথা খুলিয়াই লিখিতেছি। তোমার নিকট আজ পর্যন্ত কিছুই গোপন করি নাই, ইহাও করিব না। মনু মাসীর মৃত্যুর মাস খানেক পরেই আমি লিলিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিলে সত্য কথাটা আরও স্পষ্ট হয়। হ্যাঁ বাধ্যই হইয়াছি।

তোমার চরিত্রের যে অংশটুকু মরাল লেকচার দিবার জন্য সদা সর্বদা উদ্যত হইয়া থাকে তাহার নিকট জবাবদিহি করিবার কোনও প্রয়োজন আমার দিক হইতে নাই। তবুও আমার বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি এই কারণে যে, যদি তাহা শুনিয়া সেই অংশটুকুর কোনও উপকার হয়, যদি তাহা অমানুষিক স্তর হইতে নামিয়া আসিয়া মানুষের দৃষ্টিতে মানবসুলভ দুর্বলতাগুলি বিচার করিবার মতো সহৃদয়তা লাভ করে।

একটা কথা ভুলিয়া যাইও না যে আমি স্বাভাবিক মানুষ। অমানুষ বা অতি-মানুষের মাপকাঠি দিয়া যদি আমার আচরণ মাপিতে যাও তোমার অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে এবং সে ভুলের জন্য দায়ী তুমি, আমি নই। পুরাণকারেরা দেবতাদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও অনেকাংশে মানবীয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরদের বারম্বার তপোভঙ্গ হয়। তোমার নৈতিক আদর্শ শুধু যে নিষ্ঠুর তাহা নয়, তাহা হাস্যকর, তাহা অসম্ভব, তাহা অস্বাভাবিক। সে আদর্শ মানুষকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছে, জলকে লক্ষ্য করিয়া তাহা যদি বলিত তাহা হইলে এই রকম শুনাইত, "হে জল, তুমি গড়াইও না, তুমি যে পাত্রে থাকিবে সে পাত্রের আকার ধারণ করিও না, তোমার মধ্যে ভগবৎ প্রেম ছাড়া আর কিছুই যেন না প্রতিফলিত হয়। রৌদ্রে তুমি উত্তপ্ত হও কেন? বায়ু তোমাকে তরঙ্গাকুল

করে কেন ? তুমি স্থির, ধীর অচঞ্চল হও।” তোমাদের এই উপদেশ শুনিয়া জল বেচারা যদি জমিয়া বরফ হইয়া যায় তাহা হইলেও তোমরা খুশি হইবে না, কারণ বরফ অবস্থাতেও সে তোমাদের উপদেশ ষোল আনা মানিতে পারিবে না। তোমাদের উপদেশ কেহ ষোল আনা মানিতে পারে না বলিয়াই তোমাদেরও কেহ মানে না। কারণ তোমরা অকবি, তোমরা বেরসিক। প্লেটো তাঁহার কল্পরাজ্য হইতে কবিদের বাদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কল্প, বাস্তব কোনও রাজ্য হইতেই কবিরা বাদ পড়েন নাই, বাদ পড়িয়া গিয়াছেন প্লেটো নিজে ! পরীক্ষার্থী ছাড়া প্লেটো কেহ পড়ে না, অবশ্য দুই একজন বাতিকগ্রস্থ পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা সবই পড়েন। শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের চাহিদা কিন্তু চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তাঁহারা চিরকাল মানব-মানবীর হৃদয় লোকে বিরাজ করিবেন, প্লেটোরা বিরাজ করিবেন শেল্‌ফে। কবিরা কখনও মানুষকে দুমড়াইয়া কোনও একটা বিশেষ নীতি বা ইজমের ছাঁচে পুরিতে চেষ্টা করেন না, কারণ তাঁহারা যে জীবন-রসিক। সন্ধ্যায় মেঘে বর্ণ-লীলা দেখিবার সময় তাঁহারা যেমন চিন্তা করেন না যে বর্ণগুলি কোন্ জাতের, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাদের পরিচয় কি, তেমনি প্রণয়-ব্যাপারেও তাঁহারা মাথা ঘামান না যে উহা বৈধ না অবৈধ, বিশেষ একটি সমাজে বিশেষ নিয়মাবলীর মধ্যে উহা খাপ খাইবে কিনা। তাঁহাদের কাছে সত্য-অসত্য শিব-অশিব সুন্দর-অসুন্দরের যে প্রভেদ তাহা কোন বিশেষ সমাজের বিশেষ নীতির নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট নয়। তাঁহারা তাহার নির্দেশ পান বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য হইতেই। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অলঙ্কৃত মানব জীবনই তাঁহাদের দেবতা, তাঁহাদের নিয়ামক। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই—একমাত্র কবিই একথা বলিতে পারেন। শুচিবায়ুগ্রস্ত নীতিবাগীশদের মতো তাই তাঁহারা ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নাক সিঁটকাইয়া বা নাকে কাপড় দিয়া পথ চলেন না। জীবন-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া জীবনকে তাঁহারা উপভোগ করেন। সমাজ বা সমাজের নিয়ম সীমাবদ্ধ, জীবন কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনাময়। কবিরা সমাজে বাস করেন বটে, কিন্তু উপাসনা করেন জীবনের। আমি যদিও উল্লেখযোগ্য কোনও কাব্য রচনা করি নাই কিন্তু মনে-প্রাণে আমি কবি। তুমি অক্ষর গুণিয়া গুণিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়াছ (এখনও লেখ কি-না জানি না) কিন্তু তোমার আচরণ দেখিয়া মনে হয় তুমি অকবি। অতিশয় বেরসিক লোক তুমি। কাটখোট্টা নও, কারণ কাটখোট্টাদেরও একটা জীবনাবেগ আছে, তাহা রুদ্র রুক্ষ, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। তুমি মোমবাতির মতো। কেহ যদি তোমাকে দয়া করিয়া জ্বালিয়া দেয়, আইনত যতটুকু জ্বলিবার ততটুকু জ্বলিয়া অবশেষে তুমি

নিবিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র খদ্যোতেরও যে স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি আছে তোমার তাহা নাই। ময়ালিটির সঙ্কীর্ণ দাঁড়ে বসিয়া তুমি কতগুলি বাঁধা বুলি কপচাইতেছ মাত্র। সত্যই তোমার জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। ভাই সদানন্দ, এখনও সময় আছে, এখনও ত্রিশের কোঠায় বয়স আছে, এখনও ফিরিতে পার।

লিলির সহিত আমার যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মানসিক দুর্বলতা বশতই ঘটিয়াছিল ইহা অস্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলিব, ওই দুর্বলতাটুকুর জন্যই মানব-জীবন সুন্দর, দুর্বলতাটুকু আমার মধ্যে ছিল বলিয়াই আমি লিলিকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

...যেদিন ঘটনাটা ঘটিয়া গেল সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত ঘটনাও ঘটিল। মনে হইল, মনু মাসীর সেই কথাগুলি আবার যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, "দেখো বাবা, মেয়েটির যেন কোন অসম্মান না হয়, দারিদ্র্যের জন্য যেন তার মাথা হেঁট না হয়।" আমার কানের কাছে মনু মাসী নিজে যেন কথাগুলি বলিয়া গেলেন।

...সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। লিলিকে একটা কাগজে লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কিনা। লিলিও লিখিয়া উত্তর দিল, আপনার যাহা খুশি করুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। সেই মূক ও বধিরের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিন্তু আমি আরও স্পষ্টতর উত্তর পাইলাম। তাহা দ্ব্যর্থক নয়।

পরদিন আমি আইনত রেজেষ্ট্রি করিয়া লিলিকে বিবাহ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, তোমাকেও এ বিবাহের সাক্ষী করি, কিন্তু তোমার মতিগতি দেখিয়া সে বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলাম। এ বিবাহে সাক্ষী হইয়াছে মহেশ, চুনীর দাদা। তাহার সহিত দিল্লিতে দেখা হইয়াছিল, আবার কলিকাতাতেও দেখা হইয়া গেল। তাঁহারই সাহায্যে শুভকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন লিলিকে ঘৃণার বা কৃপার চক্ষে দেখিবার কোনও অজুহাতই তোমার থাকা উচিত নয়, কারণ আইনত সে এখন আমার বিবাহিতা পত্নী। লিলির আচরণে যাহা লক্ষ্য করিয়া তুমি সন্দিগ্ধচিত্তে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলে তাহা আশা করি এখন তোমাকে আনন্দিত করিবে। আমিই আমার পত্নীকে গহনা, কাপড় এবং প্রসাধন সামগ্রী কিনিয়া দিয়া আসিয়াছি। উহা তাহার নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ নয়।

দোকান ঘরটির সম্বন্ধে কি স্থির করিলে? মল্লিক মহাশয় বৌবাজারের যে ঘরটির কথা বলিয়াছিলেন সেটির সম্বন্ধে আর কিছু শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক তাহা হইলে কলেজ স্ট্রীটের ঘরটাই ভাড়া করিয়া ফেল। কলিকাতাতে গিয়াই

নব-জীবন আরম্ভ করা যাক! আমার ইচ্ছা তুমি চাকরিটা ছাড়িয়া দাও, আমার দোকানের অংশীদার হও। টাকা-পয়সা কিছুই তোমাকে দিতে হইবে না, তুমি দোকানটি চালাইবে এবং বিনিময়ে অর্ধেক লাভ পাইবে। রাজী হইয়া যাও। আমি এখানকার ব্যাপারটা মিটাইয়া যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতা যাইব। মনু মাসী এখানকার বাড়ীটাও আমাকেই দিয়া গিয়াছেন। একজন খরিদ্দার জুটিয়াছে, বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিব ঠিক করিয়াছি। হাজার কুড়ি টাকা ব্যাঙ্কে থাকিলে আমার ঢের বেশী সুবিধা হইবে, কি বল?

অবিলম্বে উত্তর দিও। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

পুনশ্চ। অভয় মিত্র ছাড়া পাইয়াছে।

১১

ভাই সদানন্দ,

তুমি যাহা লিখিয়াছ সাধারণ যে কোনও লোক তাহাতে দমিয়া যাইত কিন্তু আমি দমিবার পাত্র নই। কলিকাতায় আমাদের পরিচিত সমাজ যদি লিলিকে সম্মানের আসন দিতে সম্মত না হয় তা হইলে সে সমাজ আমি ত্যাগ করিব। প্রয়োজন হইলে কলিকাতাই ত্যাগ করিব। পৃথিবীতে কলিকাতা ছাড়া আরও শহর আছে। কলিকাতা ত্যাগই করিতে হইবে। কারণ কোনও স্থানে পরিচিত ব্যক্তিদের উপহাস বা উপদেশের লক্ষ্যস্থল হইয়া বাস করা শক্ত। আমি হয়তো গা বাঁচাইয়া চলিতে পারিব, কিন্তু লিলি পারিবে না। লোকে বাড়ী বহিয়া আসিয়া তাহাকে অপমান করিয়া যাইবে। সুতরাং কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। মুঙ্গেরে হয়তো থাকিতে পারিতাম, কিন্তু বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। তা ছাড়া, এখানেও উপহাসদক্ষ উপদেষ্টার অভাব নাই। এমন স্থানে বাস করিতে হইবে যেখানে কেহ আমাদের চেনে না। তুমি সুভাষিণী নাম্নী যে মেয়েটি আমার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলে লিলিকে বিবাহ না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে আমি বিবাহ করিতাম। তুমি হয়তো মনে করিতেছ যে, মেয়েটির রং কালো এবং তাহার বাবা গরীব বলিয়া আমি এড়াইয়া গেলাম। বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে আমি সচেষ্ট

হইয়া কিছুই করি না। আমাকে কেন্দ্র করিয়া যাহা ঘটিবার তাহা আপনিই ঘটিয়া যায়। কেন ঘটে, ঘটা উচিত কি-না—এসব লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি অপারগ। রূপ ক্ষণিকের এবং বংশ মর্যাদাই যে নির্ভরযোগ্য জিনিস ইহা লইয়া তুমি অনেক কথা লিখিয়াছ। আমি একটি কথারও প্রতিবাদ করিতেছি না, কারণ প্রত্যেকটি কথা সত্য। কিন্তু সত্যকে পাইতে হইলে যে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথের পথিক হইতে হয় সে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম পথে আমি চলিতে শিখি নাই। রূপ ক্ষণিকের, ইহা জানিয়াও আমি রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হই, বংশমর্যাদা নির্ভরযোগ্য জিনিস, ইহা মানিয়াও সব সময় তাহাকে মর্যাদা দিতে পারি না। তোমাকে শুধু এইটুকুই বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, লিলির সহিত জড়াইয়া না পড়িলে নিশ্চয় আমি তোমার মনোনীতা পাত্রী সুভাষিণীকেই বিবাহ করিতাম। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবের দীনতা বাধাসৃষ্টি করিতে পারিত না, তাহাদের বংশমর্যাদাই যে বিশেষভাবে আমাকে আকৃষ্ট করিত তাহাও নয়। তাহাকে বিবাহ করিতাম তোমার অনুরোধে। যাক, এখন ওসব লইয়া আর মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই।

চাক্‌রির স্বপক্ষে তুমি যে যুক্তিগুলি দিয়াছ, তাহা বেশ ভালই লাগিল। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ। চাকরিতে একটি বা বড় জোর, দুইটি মনিবকে খুশি রাখিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত। ব্যবসায়ীকে বহু লোকের মন রাখিতে হয়। চাকরিতে দশটা-পাঁচটা অফিস করিয়া বাকী সময়টুকুও যথেচ্ছ ব্যবহার করা যায়। দোকান করিলে সব সময়ে দোকানে বসিয়া থাকিতে হইবে। ছুটিও নাই। ছুটি লইলে নিজেরই ক্ষতি। তুমি সাবধানী লোক, তোমার যুক্তিগুলি তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। খাঁচার পাখীরাও বোধ হয় ওই ভাবেই চিন্তা করে। তা ছাড়া, এখন তো সবই গোলমাল হইয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আমি যে এখন কোথায় যাইব তাহারও স্থিরতা নাই। সুতরাং জুয়েলারি দোকান করিয়া বড়লোক হইবার বাসনা আপাতত ত্যাগ করিলাম। তুমিও ত্যাগ কর। কোথাও একটা আস্তানা ঠিক করিতে পারিলে লিলিকে গিয়া লইয়া আসিব। আপাতত সে যেমন আছে থাক। তোমার দূরদর্শিতা ও সাবধানতা, তোমার নৈতিক নিক্তি এবং সারবান যুক্তি, হয়তো তোমার নৌকাটিকে সর্ববিধ ঝড়ঝাপটা হইতে বাঁচাইয়া একদিন কোনও নিরাপদ বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে, কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও, অদূরদর্শিতা অসাবধানতা যথেচ্ছ-নীতি এবং অসার যুক্তি জীবনকে যে বিচিত্র স্বাদ দান করে সে স্বাদ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। তোমার জীবন জ্যামিতির ছবির ন্যায় প্রাণহীন, কিন্তু আমার জীবন নদীর মতো বেগবান। তাহাতে হয়তো আবিলতা আছে কিন্তু তাহা জীবন্ত। তুমি বন্দরে পৌঁছিবে, আমি পৌঁছিব সাগরে।

আর হয়তো তোমার সহিত দেখা হইবে না। তবে যেখানেই থাকি মাঝে মাঝে চিঠি লিখিব। ভালবাসা লও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

১২

পাটনা

৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

বহুদিন পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি। লিলিকে লইয়া যেদিন কলিকাতা ত্যাগ করি সেদিন ইচ্ছা করিয়াই তোমার সহিত দেখা করিয়া আসি নাই। দেখা হইলেই তর্ক হইত এবং তর্ক তিক্ততার সৃষ্টি করিত। তুমিও বদলাইতে না, আমিও পথ বদলাইতাম না। নূতন করিয়া সংসার পাতিবার মুখে বন্ধুর সহিত কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। আমি এখন কোথায় আছি জান? অভয় মিত্রের বাড়ীতে। পাটনা শহরেও মিত্র মহাশয় একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমিই খরচ পত্র করিয়া তাঁহাকে জেল হইতে বাঁচাইয়াছিলাম। এ ধরনের কাজ আমার পক্ষে নূতন নয়। পরোপকার করিবার জন্য নয়, খেয়ালের বশবর্তী হইয়া অনেকবার আমি এবম্বিধ কার্য করিয়াছি। কিন্তু মিত্র মহাশয় যাহা করিলেন তাহা আরও অভিনব। তিনি বোধ হয় এ ধরনের কাজ জীবনে আর কখনও করেন নাই। তিনি আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আমাকে কেন আপনি রক্ষা করলেন। আমি পাপী, আমি বিশ্বাস-ঘাতক, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত।" একটা নূতন ধরনের মুশকিলে পড়িয়া আমি বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলাম। শেষে একটা কথা বলাতে ভদ্রলোক কতকটা যেন প্রকৃতিস্থ হইলেন। বলিলাম, "দেখুন পদস্খলন সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। ফলে কলকাতার বাস উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। মুঙ্গেরেও থাকা যাবে না।" অভয় মিত্র বলিলেন, "আমার পাটনার বাড়ীটা খালি পড়ে আছে, আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন না। ও তো আপনারই বাড়ী।"

তাহার পর হইতে মিত্র মহাশয়ের সহিত বেশ মাখামাখি হইয়াছে। লোকটিকে ক্রমশ ভাল লাগিতেছে। ফলে কাশীতেই পুনরায় জুয়েলারি দোকানটি স্থাপিত করিয়া ওই অভয় মিত্রকেই তাহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছি।

মোটামুটি এই আমার সংবাদ। তুমি আশা করি সুবোধ বালকের মতো কর্তব্যপথে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতেছ। ইতিমধ্যে কোনো বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছ কি? হ্যাঁ, তোমাকে আর একটি সুসংবাদ দিতেছি। তোমার কাছে ইহা দুঃসংবাদ বলিয়া মনে হইবে কি না জানি না। আমার একটি মেয়ে হইয়াছে। লিলি তাহার নাম রাখিয়াছে হাসি। লিলি এখনও কথা বলিতে পারে না। লিখিয়াই আমাদের কথাবার্তা হয়। বেশ একটা নূতন ধরনের দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতেছি। আশা করি সব কুশল। তোমার বাবা কেমন আছেন? আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

১৩

পাটনা

১১-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার কথা যে প্রায়ই তোমার মনে হয় এই সংবাদে সত্যই বলিতেছি আমার মনের একটি নীরব তন্ত্র যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তুমিও বিবাহ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আমার ঠিকানা জানা থাকিলে আমাকে যে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে একথা তোমার লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমি তাহা জানি। কিন্তু তুমি নিমন্ত্রণ করিলেও আমি যাইতাম না। আমি সামাজিক জীব নই, সমাজের কোথাও আমি ঠিক খাপ খাই না, সেই জন্য সামাজিক ক্রিয়াকর্ম হইতে যথাসম্ভব দূরে সরিয়া থাকি। আমার মতো লোকের হোটেলে বাস করাই উচিত। যদিও বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার যোগ্যতা আমার নাই। লিলির সম্বন্ধে তুমি যেসব প্রশ্ন করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। লিলিকে আমি ভালবাসি কি না, তাহাও ঠিক জানি না। কারণ রোমান্টিক ভালবাসার স্বাদই আমি কখনও পাই নাই। কাব্যে তাহার যে সব লক্ষণ পড়িয়াছি তাহার সহিত আমার মনের অবস্থা একটুও মেলে না। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, লিলিকে খারাপ লাগে না খুব। ও যদি কথা বলিতে পারিত তাহা হইলে হয়তো আর একটু ভাল লাগিত। অনেকদিন আগে আমি জিমি নামে একটি কুকুর পুষিয়াছিলাম। মনে আছে তোমার? জিমির সম্বন্ধেও

আমার ঠিক এই কথাই মনে হইত। ভাবিতাম, আহা, জিমি যদি কথা বলিতে পারিত, কি চমৎকারই না হইত! লিলির সহিত জিমির তুলনা করিলাম ইহাতে হয়তো তুমি চটিবে। কিন্তু সত্য বলিতেছি, লিলিকে দেখিয়া আমার জিমির কথা মনে পড়ে। জিমি যেমন আমাকে ভালবাসিত লিলিও তেমনি ভালবাসে। কিন্তু তাহা রোমান্টিক প্রণয় নয়, আদর্শ পতিভক্তিও নয়, তাহা কেমন যেন একটা অন্ধ কৃতজ্ঞতা। লিলিকে তাহার অতীত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে কোনও উত্তর দিতে চায় না। একদিন লিখিয়াছিল—যাহা আমি সম্পূর্ণ-রূপে ভুলিয়া যাইতে চাই তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এ অনুরোধ আমাকে করিও না। আমিও আর অনুরোধ করি নাই। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি। লিলি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, উঠিয়া দেখিলাম কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিল। তাহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলাম ক্রন্দনের হেতুটা কি, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না। তাহার হাঁটুটা ফুলিয়াছে, হয়তো তাহারই যন্ত্রণায় কাঁদিতেছিল। একজন ডাক্তার ডাকাইয়া দেখাইয়াছি! লিলি ডাক্তারকে হাঁটু দেখাইতেও আপত্তি করিতেছিল, কিন্তু তাহার আপত্তি আমি শুনি নাই। লিলির সম্পর্কে একটা জিনিস আমাকে বড়ই বিব্রত করিতেছে। সে আমাকে অত্যন্ত বেশি সমীহ করিয়া চলে। তাহার কুণ্ঠা আমি কিছুতেই ঘুচাইতে পারি না। সর্বদা সে যেন কৃতজ্ঞতার ভারে নুইয়া আছে। মনে হয়, আমাকেও ভয় করে। সুতরাং সে আমার গৃহিণী, সচিব বা সখি কোনটাই হইতে পারে নাই। তবে একটা জিনিস হইতে পারিয়াছে—জননী। হাসিকে লইয়া তাহার অধিকাংশ সময় কাটে, আমাকে লইয়া নয়। হাসি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। চোখ দুইটি তো অবিকল মায়ের মতো। তুমি লিখিয়াছ, তোমার বউ গহনা-কাপড় সমন্বিতা জীবন্ত 'ডামি' বিশেষ। ওই 'ডামি' যখন mummy হইবে তখন দেখিবে তাহার আলাদা রূপ খুলিয়াছে। লিলির মাতৃমূর্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ম্যাডোনার সেই ছবিটা মনে পড়িয়া যায়। আড়ালে ছবিটা দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমাকে দেখিলেই লিলি কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কেন বল দেখি? তোমার ভগিনীটি বিধবা হইয়া তোমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে লিখিয়াছ। ভাগিনেয়ীটি কি বিবাহ-যোগ্য? ভাগিনেয়টি কত বড়? কোন্ ক্লাসে পড়ে? তোমার আয় পরিমিত, ব্যয়ের মাত্রা যদি একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায় মুশকিলে তো পড়িবেই। আমি তোমাকে এই সঙ্গে হাজার টাকার একটি চেক্ পাঠাইলাম। দিবার সঙ্গতি আছে বলিয়াই পাঠাইতেছি। ইহা লওয়া না লওয়া তোমার ইচ্ছাধীন। সুদীর্ঘ

মরাল লেক্‌চার দিয়া যদি ইহা ফেরত দাও বিস্মিত হইব না। শুধু অনিবার্য ভাবে একটি কথা মনে হইবে—আমি তোমার পর হইয়া গিয়াছি। আশা করি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৪

পাটনা
১৯-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

আমার এই পত্র পাইয়া তুমি হয়তো আবার একটি দার্শনিক হাসি হাসিবার সুযোগ পাইবে। মনে মনে হয়তো বলিবেও, অজ্ঞাত কুলশীলাকে বিবাহ করিবার ফল এইবার ফলিতেছে। লিলির হাঁটু ফুলিতেছে এ সংবাদ তোমাকে পূর্বেই দিয়াছি। সাধারণ ঔষধে ব্যাধির উপশম না হওয়াতে ডাক্তারবাবু তাহার রক্ত পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। পরদিন আসিয়া খবর দিলেন যে রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমারও রক্ত লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমার রক্তে কিছু পাওয়া যায় নাই। ডাক্তারবাবুর সন্দেহ, লিলির পিতৃ বা মাতৃকুল হইতে হয়তো রক্তে এই বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে। ব্যাপারটা জটিল ঠেকিতেছে। তোমাকে এসব সংবাদ জানাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কেবল বন্ধু হিসাবে তোমাকে আনন্দের কিছু উপকরণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই এই সব লিখিতেছি। আশা করিতেছি, সংবাদটা পাইয়া তুমি বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। বহুকাল পূর্বে একজন ডাক্তার-বন্ধুকে এই জাতীয় আনন্দে উল্লসিত হইতে দেখিয়াছিলাম। আমরা বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম, এমন সময় একটি মৃত্যু-সংবাদ আসিল। ডাক্তারবাবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "মারা গেছে! সত্যি? আমার ডায়াগনোসিস ঠিক হয়েছে তা হলে! রমেশ ডাক্তার বলেছিল বেঁচে যাবে। মারা গেছে? সত্যি বলছ?" তোমার ডায়াগনোসিসও সফল হইয়াছে। ন্যায়ত তুমি আনন্দ করিতে পার তবে আনন্দের আতিশয্যে একথা যেন মনে করিও না যে, আমি দুঃখিত অন্তঃকরণে অনুতাপ করিতেছি। জীবনটা আমার নিকট খেলা মাত্র! একটানা একটা খেলাও নয়, বহু খেলার সমষ্টি। ক্রিকেট খেলায় অনেকবার আউট হইয়াছি, অনেকবার আউট করিয়াছিও, কোন্‌টা কতবার

করিয়াছি তাহার হিসাব রাখি নাই, সব মনেও নাই। লিলির ব্যাপারটাও অনুরূপ একটা খেলা মাত্র। তুমি বিশ্বাস করিবে কি-না জানি না, কিন্তু ভারী মজা লাগিতেছে। মনে হইতেছে যেন অদৃশ্য কোনও 'বোলার' আমাকে আউট করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে এবং আমি ক্রমাগত তাহাকে ঠেকাইয়া চলিয়াছি। 'রান'ও করিয়াছি মন্দ নয়। তোমার মত হিসাবী হইলে হয়তো সংখ্যাও বলিয়া দিতে পারিতাম।

ডাক্তারবাবু আগামী কল্য হইতে লিলির চিকিৎসা শুরু করিবেন। তিনি বলিলেন, ভবিষ্যতে হাসিরও রক্ত পরীক্ষা করিতে হইবে, আপাতত ভয়ের কোন কারণ নাই।

আমার শরীর ভাল আছে। অভয় মিত্র এবার সার্থকনামা হইয়া উঠিতেছেন মনে হইতেছে। দোকানে বেশ লাভ হইতেছে। বেশ একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠাইয়াছেন।

তুমি কেমন আছ? তোমার মতো হিসাবী লোক খারাপ থাকিতে পারে না, তোমার সম্বন্ধে এ ধারণা আমার নাই। কারণ তোমরা তোমাদের হিসাবের খাতা হইতে এমন অনেক জিনিস বাদ দাও যাহা আকস্মিক ধূমকেতুর মতো আসিয়া সমস্ত হিসাব ওলট পালট করিয়া দিতে পারে। সুতরাং জানাইও কেমন আছ। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

১৫

পাটনা

২৫-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

এবার সত্যই 'আউট' হইয়া গিয়াছি, আনন্দে হাততালি দিতে পার। লিলি পরশু হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিয়া দেখি হাসি বিছানায় একা ঘুমাইতেছে, লিলি কাছে নাই। এঘর ওঘর ঘুরিয়া দেখিলাম কোথাও নাই। ভাবিলাম হয়তো বাথরুমে গিয়া থাকিবে। ছোঁড়া চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। সে বলিল একজন কাবুলিওলার সহিত মাঈজী বাহিরে গিয়াছেন। সে আরও বলিল, কাবুলিওলাকে দেখিয়া মাঈজী কেমন যেন অবাক হইয়া

গিয়াছেন। ইহার বেশি সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। আমি অনেকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পরে হঠাৎ লিলির চিঠিটা দেখিতে পাইলাম। সে বড় বড় অক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছে তাহা এই। 'টু কপি' পাঠাইতেছি।

শ্রীচরণেষু,

আমি চলিলাম। জীবনে আর কখনও দেখা হইবে না। আমি একটা কথা তোমার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, বাধ্য হইয়াই করিয়াছিলাম। আমি যে বিবাহিতা সে কথা তোমাকে বলি নাই। আমার ধারণা ছিল আমার স্বামীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, কারণ একটি সাহেবকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। আমার স্বামীর ভাই একটি দুরাত্মা। সে আমাকে বিক্রয় করিবার জন্য কুম্ভমেলায় লইয়া আসিয়াছিল। সেই সময় আমি কয়েকটি গুণ্ডার পাল্লায় পড়ি। তুমি ও সদানন্দ-বাবু আমাকে গুণ্ডাদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলে। তাহার পর হইতে সমস্ত ঘটনা তুমি জান। আমার স্বামী অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পাইয়া গিয়াছেন এবং খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাকে বাহির করিয়াছেন। কি করিয়া তিনি এখানে আমার সন্ধান পাইলেন তাহা জানি না। তিনি কেবল বলিলেন, গত ছয় মাস হইতে তিনি আমাকে প্রতি শহরে শহরে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। আমার সহিত যে তোমার বিবাহ হইয়াছে একথা তাঁহাকে বলি নাই। আমি তোমার নিকট তোমার স্ত্রীর চাকরানী হইয়া আছি এই কথাই তাঁহাকে বলিয়াছি। তোমার নিকট যেমন ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছিলাম, রহমনের নিকটও তেমনি ভয়ে সত্য গোপন করিয়াছি। আমরা অসহায়, আমরা ভীতু, সত্যপথে চলিবার সাহস আমাদের নাই। আমাকে ক্ষমা করিও। রহমন যদি তোমার কাছে কখনও আসে আমাকে রক্ষা করিও। সে বড় বদমেজাজী লোক, হয়তো আমাকে খুন করিয়া ফেলিবে। হাসিকে ছাড়িয়া যাইতে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, কিন্তু কি করিব উপায় নাই। ইতি—

লিলি

চিঠিখানি হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। চমক ভাঙিল হাসির কান্নায়! উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, দমিলে চলিবে না। তৎক্ষণাৎ দুধ ও ফিডিং বট্‌ল্ কিনিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া গেলাম। কিছুতেই ফিডিং বট্‌ল্ ধরিতে চায় না, মহা মুশকিলে পড়িয়াছি। কি করি বল তো? মনে করিতেছি, কাল হইতে একটি ওয়েট নার্স নিযুক্ত করিব। কিন্তু 'ওয়েট' মানেই পিছল। আবার না পা হড়কাইয়া যায়।

হ্যাঁ, কাল সকালে রহমন আসিয়াছিল। বেশ বলিষ্ঠ কাবুলী একটি। আসিয়া কি বলিল জান? বলিল, তাহার বিবির তিন মাসের মাহিনা বাকী আছে, পাওনাটা আমি মিটাইয়া দিলে সে দেশে চলিয়া যাইতে পারে। বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তাহাকে একশত টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া দিলাম। বলিলাম, উহার মধ্যে বকশিশও আছে। রহমন সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমি এখন কি করি বল তো? একটু পরেই ডাক্তার ইনজেক্‌সন দিতে আসিবে, তাহাকেই বা কি বলিব? তা ছাড়া, চাকর-চাকরানীর কাছেই বা মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব কিরূপে? এ ধরনের মানসম্ভ্রমের যদিও বিশেষ কোনও মূল্য নাই কিন্তু চল্‌তি নোটের মতো এগুলির বাজার-দর আছে, পকেটে না থাকিলে জীবনযাত্রাই অচল হইয়া যায়।

যদি বেগতিক বুঝি, হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া আসিব। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে একবার কাশীও যাইতে হইবে। ভাবিতেছি কলিকাতা হইয়া হাসিকে তোমাদের কাছে রাখিয়া কাশী যাইব। তোমার ইহাতে যদি আপত্তি থাকে অবিলম্বে জানাইবে। তোমার নিকট হইতে নিষেধাত্মক কোন পত্র বা টেলিগ্রাম না আসিলে আমি হাসিকে লইয়া রওনা হইয়া যাইব। আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৬

কাশীধাম
৩০-১২-২৯

ভাই সদানন্দ,

শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের বাসায় বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতেছি। একটা অদ্ভুত প্রেরণার বশবর্তী হইয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। হাসির জন্য মন কেমন করিতেছে। যদিও জানি, তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার মা, তোমার বোন, তোমার ভাগনী সকলেই সর্বান্তঃকরণে হাসির যে যত্ন করিবে তাহা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তবু অস্থির হইতেছি। যদিও তাহাকে কোলে লইতে গিয়া প্রতিবারই একটা না একটা বিপদ হইয়াছে, তবু কি আশ্চর্য, তাহাকে বার বার কোলে লইতে ইচ্ছা করিতেছে। হাসির ভার তোমার উপরে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত-চিত্তে কাশীবাস করিব

ভাবিয়াছিলাম কিন্তু এখন দেখিতেছি বাবা বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি আজই হয়তো কলিকাতা রওনা হইয়া যাইতাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত অভয় মিত্রের অনুরোধে আমাকে আরও দিন তিনেক এখানে অবস্থান করিতে হইবে। তিন দিন পরে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে মন সরিতেছে না। ৪ঠা জানুয়ারী আমি এখান হইতে রওনা হইয়া ৫ই সকালে কলিকাতা পৌঁছিব। কলিকাতায় পৌঁছিয়া যে কি করিব তাহা অবশ্য ঠিক করিতে পারি নাই। একটা জিনিস কেবল বুঝিতে পারিতেছি—হাসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তাহাকে আমার নিজের কাছেই রাখিতে হইবে। শুধু যে আমার মন কেমন করার জন্যই কথাটা বলিতেছি তাহা নয়, ইহার একটা অন্য দিকও আছে। হাসি যদি তোমার বাড়ীতে মানুষ হয়, ভবিষ্যতে তাহার একটা মানসিক বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া আমি ভীত হইতেছি। একটু জ্ঞান হইলেই সে বুঝিতে পারিবে যে সে পরের ঘরে মানুষ হইতেছে। তোমরা যে তাহার রক্ত-সম্পর্কিত নও একথাও ক্রমশ তাহার নিকট প্রকট হইয়া পড়িবে। স্বভাবতই তাহার মনে তখন প্রশ্ন জাগিবে, আমার বাবা এমন করিয়া আমাকে বন্ধুর বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? আমার মা কোথা? এই দুইটি প্রশ্নের যে উত্তর সে পাইবে তাহা ঠিক মতো তাহার মনের সঙ্গে খাপ খাইবে কি না তাহার উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করিতেছে। সত্য উত্তর অথবা মিথ্যা উত্তর কোন্‌টা যে এক্ষেত্রে খাটিবে তাহা বলাও শক্ত। তবে একটা জিনিস আমি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার মায়ের সত্য পরিচয় তাহাকে আমি দিব না। আমার বিশ্বাস, এ পরিচয় জানিলে তাহার চরিত্র সুস্থভাবে বিকশিত হইবে না। নিজেকে সে সর্বদাই হেয় মনে করিবে। এ অপমান হইতে যেমন করিয়া পারি তাহাকে আমি রক্ষা করিব। আমার নিজের খেয়াল বা বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহার সু বা কু ফল আমিই বহন করিব। হাসির গায়ে তাহার আঁচটি পর্যন্ত লাগিতে দিব না। আমার এই প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হইবে হাসিকে তোমাদের বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করা। শুধু তোমাদের বাড়ী হইতে নয়, আমার পরিচিত সমাজ হইতেই তাহাকে যথাসম্ভব দূরে রাখিতে হইবে। লিলির কাহিনী এক তুমি ছাড়া আর কেহ জানে না। তোমার বাবাও বোধ হয় ঠিক মতো জানেন না। তুমি তোমার স্ত্রীকে একথা বলিয়াছ কি? যদি বলিয়া থাক তাহা হইলে আরও অধিক লোকের জানিবার সম্ভাবনা। মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া কাহিনীটা শেষ পর্যন্ত কি আকৃতি ধারণ করিবে তাহা তো কল্পনাতীত। সেই পল্লবিত কাহিনী যদি হাসির কর্ণগোচর হয়

তাহা হইলে ব্যস্ত হইবে···আর ভাবিতে পারিতেছি না। হাসিকে স্থানান্তরিত করিতেই হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে তুমি একটু ভাবিয়া রাখিও, এ সব বিষয়ে তোমার মাথা খেলে ভাল। সাক্ষাতে সমস্ত আলোচনা করিব। ভালবাসা জানিবে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। ইতি—

তোমারই

নীলাম্বর

১৭

কাশীধাম

৭-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

হাসিকে ছাড়িয়া আসিতে খুবই কষ্ট হইয়াছে। তাহার কচি মুখ কচি কচি হাত-পা আমার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। অভয় মিত্রের টেলিগ্রাম না পাইলে হয়তো আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিতাম। তিনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনখানি বাড়ীর সন্ধান করিয়া ফেলিবেন তাহা আশা করিতে পারি নাই। ভদ্রলোক একটু অতিরিক্ত মাত্রায় করিৎকর্মা। আমি কলিকাতা যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি একটি বাড়ী কিনিতে চাই, একটু খোঁজ রাখিবেন। তিনি যে এত শীঘ্র তিনটি বাড়ীর খবর লইয়া আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া বসিবেন তাহা কে জানিত। যে কারণে তিনি জরুরি তার করিয়াছিলেন সে কারণটি অবশ্য খুবই সঙ্গত। একটি বাড়ীর সম্বন্ধে অবিলম্বে কথা পাকা করিয়া না ফেলিলে সেটি হাতছাড়া হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। আর একটি খরিদ্দার নাকি ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। বাড়ীটি কিনিয়া ফেলিয়াছি। শহর হইতে একটু দূরে···বেশ অনেকখানি হাতা-সুদ্ধ বাড়ী। দশ হাজার টাকায় ঠকা হয় নাই। বাড়ীটি আসবাবপত্র দিয়া সাজাইতে আরও হাজার দুই টাকা ব্যয় হইবে। অভয় মিত্র সে সম্বন্ধেও তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন।

সুভাষিণী সম্পর্কে তুমি যে প্রস্তাবটি করিয়াছ তাহা নানা দিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলাম। হাসিকে যদি নিজের কাছে রাখিতে চাই তাহা হইলে বাড়ীতে দ্বিতীয় আর একটি স্ত্রীলোক না থাকিলে যে চলিবে না সে সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। আমার দূর সম্পর্কের যে দুই-একটি বিধবা আত্মীয়া আছেন তাঁহাদের আহ্বান করিলে তাঁহারা এখনই হয়তো আসিয়া হাজির হইবেন। কিন্তু

তাঁহারা নিষ্ঠাবতী বিধবা, হাসির জন্ম-রহস্য তাঁহাদের নিকট গোপন রাখিয়া তাঁহাদের ধর্মচ্যুত করিতে মন সরিতেছে না। ইহাতে যে ধর্মচ্যুতি ঘটে ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা মনে করি না, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহা মনে করেন তখন একথা তাঁহাদের নিকট হইতে গোপন করা অন্যায় হইবে মনে করি। সব কথা খুলিয়া বলিলে আরও অন্যায় হইবে, কারণ, কালক্রমে হাসি তাহা জানিতে পারিবেই। হাসি তাহার জন্ম-রহস্য জানুক ইহা আমি কিছুতেই চাহি না। তা ছাড়া, হাসির সত্য পরিচয় পাইলে উক্ত বিধবারা হয়তো কিছুতেই আসিতে সম্মত হইবেন না, এমন কি, জোর করিলে যে মাসোহারা আমি তাঁহাদের দিয়া থাকি তাহাও হয়তো তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিতে পারেন, এ সম্ভাবনাও আছে। তৃতীয় অসুবিধা একটা বিধবাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার নানা হাঙ্গামাও আছে। সমস্ত বাড়ী জুড়িয়া একটা নিরামিষ আবহাওয়া গজাইয়া উঠিবে। তাহা আমার পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং ও চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওয়েট নার্স বা দাই রাখাও নিরাপদ নয়, বিবাহ করাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। সুভাষিণীকে বিবাহ করিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু—হাঁ, মস্ত বড় একটা "কিন্তু" আছে। সুভাষিণী দেখিতে ভাল নয়, তাহার বাবা অতি দরিদ্র, একটিমাত্র কন্যারও বিবাহ দিতে তিনি অপারগ—অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা তুমি বলিয়াছ সে সব কিন্তু আমার আপত্তির কারণ নয়। সুভাষিণী স্ত্রীলোক বলিয়াই আমি ভীত হইতেছি। সে কি হাসির নিকট হইতে সত্য কথাটা গোপন রাখিতে পারিবে? লিলির মতো সুভাষিণীও যদি বোবা হইত নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। লেখাপড়া যখন কিছুই শেখে নাই তখন লিখিয়াও কিছু জানাইতে পারিত না। মেয়েদের সর্বাপেক্ষা ভীতিকর অঙ্গ তাহাদের রসনা। কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো তাঁহার পুরুষ-চাকরেরও জিব কাটিয়া লইয়া তবে তাহাকে বাহাল করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার তো তাহা উপায় নাই, বিবাহ করিতে হইলে স-রসনা কোনও নারীকেই বিবাহ করিতে হইবে! সুতরাং কি করিব এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি নাই। আমার দিক হইতে বিচার করিলে সুভাষিণীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী, কারণ তাহার এক বাবা ছাড়া তিনকুলে আর কেহ নাই। সুভাষিণী এবং সুভাষিণীর বাবা যদি সত্য কথাটা গোপন করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে আমার ভাবনার বিশেষ কোনও কারণ থাকিবে না। সুভাষিণীর বাবা পুরুষ, তাঁহার কথার উপর তবু আস্থা স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু সুভাষিণী স্ত্রীলোক, তাহাকে কি বিশ্বাস করা চলিবে? বৃদ্ধ চাণক্য অভিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি অগ্রাহ্য করা উচিত? বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছি ভাই, চিন্তা করিয়া কোনও কূলকিনারা পাইতেছি না।

তুমিও আমার হইয়া একটু চিন্তা করিও। আমি এখানকার কাজ সারিয়া যত শীঘ্র সম্ভব আবার তোমার কাছে যাইতেছি। আমার ভালবাসা নিও। আশা করি ভাল আছ। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৮

কাশীধাম
১৭-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

তুমি যে চিন্তাশীল লোক তাহা তোমার পত্র পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ যে হাসির জীবনে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন হয় সত্য-কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে কিম্বা একটি ভদ্রসন্তানের উপর অবিচার করিতে হইবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যে একদিন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিবে, তাহার জন্য যে বর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে একথা আমার মনেই হয় নাই। তোমার সঙ্গে আমার এইখানেই মূলত প্রভেদ। তুমি দূরদর্শী লোক। তোমার পত্র পাইয়া আমি ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ভাবিয়া দেখিলাম। সুদূর ভবিষ্যতে হাসির শ্বশুর-বাড়ির লোকদের কি বলিব তাহা এখন হইতেই ঠিক করিয়া রাখা উচিত বই-কি। হাসিকে যদি ভালভাবে মানুষ করিতে পারি, সত্যিই যদি সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে কর্মে আচরণে ভদ্রঘরের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার সত্য পরিচয় গোপনই রাখিব। কারণ তাহার সত্য পরিচয় জানিয়াও তাহাকে ঘরে স্থান দিবে এরূপ আধুনিক মনোভাবাপন্ন ভদ্র গৃহস্থ আমাদের দেশে বিরল। আমাদের দেশে বিরল বলিয়াই যে হাসিকে জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে ইহাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। বরপক্ষীয়দের সহিত প্রতারণাই করিতে হইবে। প্রতারণা করিয়া কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করাই অন্যায়। হাসিকে যদি সত্যিই বরবর্ণিনী করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে তাহাকে যিনি লাভ করিবেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, লাভবানই হইবেন। আর হাসি যদি মানুষ না হয় তাহা হইলে আমি সচেষ্ট হইয়া তাহার বিবাহের বন্দোবস্ত করিব না। সে নিজে যাচিয়া যদি কাহারও সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায় তাহাতেও আপত্তি করিব না। এই বিবিধ সম্ভাবনার কথা মনে রাখিয়াই আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া মানেই যে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করা এই দুরতিক্রমণীয় যুক্তি আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমি যে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি তাহা মনে করিও না, সুভাষিণীর সম্বন্ধেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ভয় হইতেছে তোমার সুভাষিণীর রসনা নামক যন্ত্রটি আছে বলিয়া। তাহাকে বিবাহ করিলে সে যে নিশ্চয়ই হাসিকে একদিন সব কথা বলিয়া ফেলিবে এ আশঙ্কা আমার কিছুতেই দূর হইতেছে না। সে যদি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল লইয়া শপথ করে তাহা হইলেও হইবে না।

মহা সমস্যায় পড়িয়াছি। তুমি আমার হইয়া আর একটু ভাল করিয়া চিন্তা কর ভাই। কলেজ-জীবনে গণিতশাস্ত্রে তুমি পারদর্শী ছিলে, আমার অনেক অঙ্ক কষিয়া দিয়াছ, এ অঙ্কটাও করিয়া দাও। আমার সঙ্কোচটা যে কোথায় তাহা তোমাকে অকপটে বলিয়াছি, তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা রাস্তা আমাকেও বলিয়া দাও।

অভয় মিত্র আমার বাড়ীর আসবাবপত্র সব কিনিয়া ফেলিয়াছেন। গৃহ-প্রবেশের কয়েকটি শুভদিনও দেখিয়াছেন। আমি কিন্তু ভাই, মোটেই উৎসাহ পাইতেছি না। আশা করি ভাল আছ। বউ কেমন লাগিতেছে? প্রথম প্রথম কাহারও খারাপ লাগে না, আশা করি তোমারও লাগিতেছে না। ভালবাসা জানিবে এবং অবিলম্বে উত্তর দিবে। ইতি—

তোমারই
নীলাম্বর

১৯

কাশীধাম
২৮-১-৩০

ভাই সদানন্দ,

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় এত বিস্মিত হইতাম না। আমাদের দেশ যে এত অধঃপতিত হইয়াছে, নারীদের আত্মসম্মান যে এমন ভাবে ভূলুণ্ঠিত তাহা সত্যই আমার ধারণা ছিল না। তোমারও ভাই একটু দোষ আছে! আমার চিঠিখানি তোমার সাবধান করিয়া রাখা উচিত ছিল, কারণ ওই চিঠিতে আমি যেসব কথা লিখিয়াছিলাম তাহা কেবল তোমারই জন্য, অপর কাহাকেও আমি ওসকল কথা অমনভাবে লিখিতাম না। অবশ্য একথা তোমার পক্ষেও আন্দাজ

কথা অসম্ভব ছিল যে আমার ওই চিঠি পড়িয়া সুভাষিণী ক্ষুর দিয়া নিজের জিভটা কাটিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে মেয়েদের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে বল তো! তাহারা যে কোনও মূল্যে নিজেদের পুরুষদের হস্তে তুলিয়া দিতে প্রস্তুত। লিলি এবং সুভাষিণী একই অবস্থার দুই রূপ। আমি অভিভূত হইয়াছি, বেশি কিছু লিখিতে পারিতেছি নয়। আজ তোমার নামে টি. এম. ও. করিয়া আমি পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়াছি। সুভাষিণীর চিকিৎসার সুব্যবস্থা যেন হয়। প্রয়োজন হইলে আরও টাকা পাঠাইব, আর একথা লেখাই বাহুল্য যে, সুভাষিণী যদি বাঁচে তাহাকেই আমি বিবাহ করিব। সে যেদিন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইবে সেই দিনই করিব, অবশ্য ইহাতে তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে। কারণ পঞ্জিকায় ঠিক সেই দিনটিতে বিবাহের শুভলগ্ন না-ও থাকিতে পারে। যেদিনই হোক, তাহাকে বিবাহ করিব। আপত্তি করিবার আমার আর পথ নাই। অবিলম্বে জানাইবে সুভাষিণী কেমন আছে। সম্ভব হইলে একটা টেলিগ্রাম করিও। ভালবাসা লও।

ইতি—

তোমার নীলাম্বর

অসিতের পত্রাবলী

১

লক্ষ্ণৌ

৬-৭-৪৯

ভাই মহেন্দ্র,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলিও পড়লাম। চিঠিগুলি প্যাক করে আমার শ্বশুর মশায়ের নামে পাঠিয়ে দিয়েছি। হাসির কোনও চিঠি পাইনি। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তার উপর সামনেই পরীক্ষা। কি যে হবে জানি না। তুমি একটু খোঁজ কোরো। বিজয়বাবু নামে যে ছেলেটি ফিলসফি পড়াত তার খবর কি? বিজয়বাবু লতিকার ভাই, তোমাদের পাড়াতেই তার বাড়ি। তোমাকে একথা লিখতে সঙ্কোচ হচ্ছে, লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। কিন্তু আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সত্য যদি কঠোরও হয়, তাকে মানতে হবে, চিনতে হবে। স্বল্প পরিচয়ে যে হাসিকে যতটুকু আমি চিনেছিলাম সে আমার কল্পলোকের অমরাবতীতে অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু যে হাসিকে আমি চিনি না তার পরিচয়

জানবার কৌতূহলও হচ্ছে। তুমি যদি একটু আলোকপাত করতে পার উপকৃত হব। যদি কিছু জেনে থাক জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমি আমার বাড়ীতে এখনও কিছু জানাইনি। কি যে জানাব জানি না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি। বিজয়বাবুর সব খবর চিত্রা অনায়াসেই যোগাড় করতে পারবে। খবরটা অবিলম্বে আমাকে জানিও। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলো পড়ে আমি অবাক হয়ে গেছি। অবাক হবার অনেক উপকরণ আছে ওগুলোর মধ্যে, কিন্তু আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি আমার শ্বশুর মশায়ের সত্য পরিচয় পেয়ে। তাঁর সম্বন্ধে এতদিন আমার যা ধারণা ছিল তা একেবারে বদলে গেল। মনে হল, আমি যেন এতদিন কার্পেটের উলটো পিঠটাই দেখেছিলাম। তাঁকে একখানা চিঠিও লিখেছি, কোনও উত্তর পাই নি। তুমি উত্তর দিতে যেন দেরি কোরো না। ভালবাসা নাও। ইতি—

অসিত

২

৮-৭-৪৯

ভাই অতুল,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠিতে অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সান্ত্বনা নেই। তোমার চিঠির সুর থেকে মনে হল সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছাও যেন তোমার নেই। যদিও ভাষায় পরিষ্কার করে কোথাও তুমি লেখ নি, তবু আমার মনে হল তোমার চিঠিখানা যেন ভুরু নাচিয়ে বলছে—বেশ হয়েছে। আমার স্ত্রীর স্বপক্ষে ওকালতি করে যে সব যুক্তির তুমি অবতারণা করেছ সেগুলিই হাসির যুক্তি কি না তা তুমি জান না। তুমি ধরে নিয়েছ যে, হাসি আমাকে ত্যাগ করে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছে, এবং এই পালানোটাকেই তুমি আধুনিকতার একটা মস্ত লক্ষণ বলে প্রমাণ করবার জন্যে অনেকটা সময় নষ্ট করেছ। প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ থাকে। তোমার এই প্রচেষ্টারও একটা কারণ আছে, আমি জানি সে কারণটা কি, তাই তোমার উপর রাগ করতে পারছি না। তুমি অসুখী, সেই জন্যেই তোমার সকলেরই উপর রাগ। সমাজের উপর, গভর্নমেন্টের উপর, অতীতের উপর, বর্তমানের উপর, কারো উপর তুমি খুশি নও। এদের বিরুদ্ধে কেউ বিদ্রোহ করলে তুমি তাই সর্বান্তঃকরণে বাহবা দিয়ে ওঠ, অনেক সময় বিচার করতে ভুলে যাও যে বাহবাটা তার প্রাপ্য কি না, বাহবাটা দেওয়া শোভন হচ্ছে কি না। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীরা আদিমকাল থেকেই পালাচ্ছে, কেবল ওই পালানোর মধ্যেই কোন

আধুনিকতা বা নূতনত্ব নেই। তাকে গালাগালি দেব, না, বাহবা দেব, তা নির্ভর করছে পালানোর হেতুটার উপর। নিজের স্বার্থের জন্য যদি সে পালিয়ে থাকে তাহলে আমি অন্তত তাকে বাহবা দেবার প্রেরণা পাব না, কিন্তু পরার্থে সে যদি স্বামী-বর্জন করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে বাহবা দিতে হবে। স্বার্থপর পশু-মানব পরার্থপর হয়েই মনুষ্যত্ব লাভ করছে ক্রমশ। মনুষ্যত্বের দিকে তার প্রগতিও ওই একটিমাত্র মাপকাঠি দিয়েই মাপতে হবে। আত্মবিনোদন ও স্বার্থবিনোদনের যত আশ্চর্যজনক ব্যবস্থাই বর্তমান সভ্যতা করে থাকুক না কেন, আসল সভ্যতার বিচার হবে সেই সনাতন মানদণ্ডে অর্থাৎ আমরা কতটা পরার্থপর হতে পেরেছি তাই দিয়ে। তুমি হাসির অন্তর্দ্ধানের ওই একটি কারণই ঠিক করেছ কেন তাও আমার মাথায় এল না। সত্য কারণটা যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি তখন কল্পনাকে অবাধে ছেড়ে দিতে আপত্তি কি? হাসি কোন অচিন্ত্যনীয় উপায়ে পাখী হয়ে উড়ে গেছে একথা মনে করতে তোমার বৈজ্ঞানিক মন যদি সঙ্কুচিত হয়, হাসি কোন অচিন্ত্যনীয় উপায়ে মারা গেছে একথাও তো ভাবতে পারতে। তার অন্তর্দ্ধানের সহস্র রকম সম্ভাবনার মধ্যে ওই একটি সম্ভাবনাই তোমার মনকে অধিকার করে রেখেছে কেন বল তো? উত্তরে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বলব? রাগ করবে না তো? যে ক্ষুধিত তার কাছে অন্নের একটিমাত্র রূপই দেদীপ্যমান—যাকে চর্বণ করে সে গলাধঃকরণ করতে পারে। অন্নের যে অন্য সহস্রবিধ রূপ আছে তা দেখবার বা ভাববার মতো মানসিক স্থৈর্য তার নেই। হতে পারে আমার এ ধারণা ভুল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, পাশবিক ক্ষুধার জন্য সভ্য মানবমাত্রেই ঈষৎ বিব্রত (অনেক ক্ষেত্রে লজ্জিতও), সেই পাশবিক ক্ষুধার তাড়নায় তুমি এত কাতর যে তাকে কেন্দ্র করেই তোমার সমস্ত দার্শনিকতা ও বিজ্ঞান বিকশিত হতে চাইছে, ওই একটি শিখাকেই অনবরত প্রদক্ষিণ করছে তোমার কল্পনা-পতঙ্গ, সেই শিখায় পুড়ে মরতেও তার আপত্তি নেই।

আমি যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকতে চাই হাসির পক্ষে সে পারিপার্শ্বিক শ্বাসরোধকর এবং সেইজন্যই সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে এই সিদ্ধান্তে তুমি যে কি করে উপনীত হলে তা আমার ধারণাতীত। হাসিকে তুমি আমার চেয়ে অনেক কম দেখেছ। একবার—একদিনের বেশি দেখনি বোধ হয়—এত স্বল্পপরিচয় সত্ত্বেও তার মনের এত খবর জানলে কি করে তুমি বল তো? ভবিষ্যতে যদি প্রমাণিত হয় যে তুমি যা ভেবেছিলে তা ঠিক, তাহলে তোমার ওই তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিশ্চয়ই প্রশংসা করব।

আপাতত কিছু পারলাম না। তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু জেনেও পারলাম না। এখন মনে হচ্ছে তুমি স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, আমার এই নিদারুণ দুঃখটাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছ, তোমার দার্শনিক যুক্তিগুলো আমাকে যেন 'ছুয়ো' দিচ্ছে।

তুমি এখনও উপার্জনের কোনও ব্যবস্থা করতে পারনি জেনে দুঃখিত হলাম। বিশ্বাস কর, দুঃখটা আন্তরিক! তুমি লিখেছ, মেসের ম্যানেজার পাওনার জন্যে তোমাকে অস্থির করে তুলেছেন, কিছু টাকা তোমার অবিলম্বে প্রয়োজন। আমি পঁচিশটি টাকা আজ তোমাকে পাঠালাম। ঋণ-স্বরূপ নয়, এমনই পাঠাচ্ছি। টাকাটা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে গেছি। এক মাসিক পত্রের সহৃদয় সম্পাদক আমায় একটা লেখার জন্য পারিশ্রমিক পাঠিয়েছেন।

তোমাকে আরও অনেক কথা লেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল নয়, সময়ও হাতে নেই। রাত জেগে চিঠি লিখছি। এখন রাত প্রায় একটা। তা ছাড়া, আর একটা কারণেও থামছি। মনে হচ্ছে সমস্ত রাত্রি ধরেও যদি লিখে যাই আমার দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারব না। যে দুঃখ অবর্ণনীয় তাকে বর্ণনা করবার চেষ্টা না করাই ভাল। অবর্ণনীয় দুঃখ যে মন এমনিতেই বুঝতে পারে সে মনও তোমার নেই, সুতরাং থামলাম। ভালবাসা নাও। ইতি—

তোমারই

অসিত

৩

ভাই অসিতবরণ,

ইচ্ছা করিয়াই একটু বিলম্ব করিয়া উত্তর দিতেছি। অশুভস্য কাল হরণং— রাবণ রাজার এই উপদেশটি মানিতে ইচ্ছা হইল। মনে হইল অশুভ সংবাদটা তাড়াতাড়ি দিয়া লাভ কি। কিন্তু খুব বেশি দেরি করিতেও পারিলাম না। ভাবিলাম, খবরটা পাইলে তুমি হয়তো কোনও ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অফিসে যাইবার মুখে তোমার পত্রটি পাইয়াছিলাম। চিত্রা থাকিলে তখনই তাহাকে বিজয়বাবুর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগাইয়া দিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু চিত্রা বাপের বাড়ি গিয়াছে। আমিই একটা ছুতা করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছি।

বেচারী কাঁহাতক আর একনাগাড়ে দাসী বৃত্তি করে বল। প্রত্যহ বাসন মাজিয়া, ঘর মুছিয়া (এত কাজের মধ্যেও রোজ ঘর মোছা চাই, মানা করিলেও শোনে না) রান্না করিয়া, জামা কাপড়ে সাবান দিয়া বেচারী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে তো, এত হাড়ভাঙা খাটুনিতে অভ্যস্ত নয়। তাই যখন শুনিলাম যে তাহার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হইতেছে, তাহার বৌদিদি তাহাকে যাইতেও লিখিয়াছে তখন আমি আর আপত্তি করিলাম না, পাঠাইয়া দিলাম। আমার একটু কষ্ট হইবে, তা হোক। খরচও মন্দ হইল না, কিন্তু সে কথা ভাবিলে কি চলে? আমি নিজেই স্বপাকে কোনরূপে চালাইতেছি। এইসব কারণে তোমার পত্র পাইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিজয়বাবুর খোঁজ লইতে পারি নাই। আপিস হইতে ফিরিয়াই তাহাদের বাসায় গিয়াছিলাম। কিন্তু শুনিলাম তাহারা সকলে সিনেমায় গিয়াছে, রাত্রি বারোটার আগে ফিরিবে না। পরদিন সকালে উঠিয়াই তাহাদের বাসায় গেলাম, বিজয়বাবুর দেখা পাইলাম না। শুনিলাম ভদ্রলোক দ্বিপ্রহরে বাড়িতে থাকিবেন। তাহাদের বাড়িতে যে ছেলেটির সহিত দেখা হইয়াছিল কথায় কথায় সে বলিল যে বিজয়বাবু না কি কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। কবে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন প্রশ্ন করাতে ছেলেটি হিসাব করিয়া যে তারিখটি বলিল তাহাতে আমি মনে মনে চমকাইয়া উঠিলাম। ঠিক ওই তারিখেই শ্রীমতী হাসিও হোস্টেল ছাড়িয়া গিয়াছে। স্থির করিয়াছিলাম যে, দ্বিপ্রহরে আপিস হইতে ছুটি লইয়া আসিয়া বিজয়বাবুর সহিত দেখা করিব। কিন্তু বড়বাবু ছুটি দিলেন না। সন্ধ্যার সময় আসিয়াই বিজয়বাবুর বাড়িতে গেলাম। গিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বিজয়বাবুর ভগ্নী লতিকা বলিলেন—বিজয়বাবু বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। ট্যাক্সি করিয়া হাওড়া স্টেশনে গেলে হয়তো তাঁহার সহিত দেখা হইতে পারে। মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কথাগুলি বলিল বলিয়া আমার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। আমি একটি ট্যাক্সি করিয়াই হাওড়া স্টেশনের দিকে ছুটিলাম। বিজয়বাবুর সহিত দেখা হইয়াছিল, কিন্তু বেশি কথা বলিবার অবকাশ ছিল না। অবকাশ থাকিলেও বিজয়বাবু যাহা বলিলেন তাহার বেশি কিছু বলিতেন না। তিনি বলিলেন, হাসির সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানিতাম আপনাকে বলিব না, যদি প্রয়োজন বোধ করি অসিতবাবুকে জানাইতে পারি। তাঁহার ঠিকানাটা আমাকে দিয়া যান। ট্রেন ছাড়িতেছিল সুতরাং তাঁহার সহিত বেশি কথাও কহিতে পারিলাম না। বিজয়বাবু বলিলেন যে তিনি বিলাত যাইতেছেন পড়াশোনা করিবার জন্য। ভাই, সত্যকথা বলিতে কি, বিজয়বাবুর হাবভাব আমার মোটেই ভাল লাগে নাই।

আমি যতটুকু জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহা অকপটে তোমাকেই জানাইলাম। তোমার ঠিকানা বিজয়বাবুকে দিয়া আসিয়াছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে সুসংবাদই দেন।- আমি বিজয়বাবুর ঠিকানাও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন যে তাহার ঠিকানা এখনও অনিশ্চিত। কিছুদিন পরে তাঁহার বাড়ী হইতে তাঁহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে। আমি খোঁজ রাখিব এবং ঠিকানা পাইলেই তোমাকে পাঠাইয়া দিব। আশা করি ভাল আছ। আমার ভালবাসা লও। পূজ্যপদে প্রণাম দিও। ইতি—

তোমারই মহেন্দ্র

৪

ভাই মহেন্দ্র,

হাসির খবর পাইয়াছি। বাড়ী হইতে আজ মায়ের চিঠি পাইলাম। মা লিখিয়াছেন, "তুমি বোধ হয় জান যে বেয়াই মশাই বৌমাকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন।" লিখিয়াছেন, "হঠাৎ ঠিক হইয়া গেল, পত্র লিখিয়া আমাদের অনুমতি লওয়ার সময় ছিল না। আশা করি আমরা ইহাতে কিছু মনে করিব না। ইহাতে মনে করাকরির কিছু নাই, কিন্তু এটা বৌমার পরীক্ষার বছর, এ সময় কামাই করা কি ঠিক হইল ? যাক যাহা হইবার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, এখন ভালয় ভালয় ফিরিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বেয়াই মশাই, তোমাকেও আশা করি জানাইয়াছেন"—ইত্যাদি।

শ্বশুরমশাই আমাকে কিন্তু কিছুই জানান নাই। হইতে পারে জানাইয়াছিলেন চিঠিটা মারা গিয়াছে। মারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। যাই হোক, হাসির একটা খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হইলেও চিন্তাধারা একটা বিশেষ পথ পাইয়াছে। এতদিন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছি না।—হাসি আমাকে কোনও পত্র লিখিল না কেন। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হইতেছে। বিজয়বাবুর আচরণও বেশ রহস্যময়। তিনিও এখন পর্যন্ত কোন চিঠি দেন নাই। আমার মনে হইতেছে, তিনি তোমার সহিত একটু রসিকতা করিয়া গিয়াছেন। আসলে তিনি হাসির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, হাসি তাহার বাবার সহিত বেড়াইতেই গিয়াছে। পরীক্ষার সময় বেড়াইতে গেলে আমি পাছে রাগ করি সেইজন্য হয়তো আমাকে

কিছুই জানায় নাই। যাই হোক, এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া গত্যন্তরই বা কি আছে ? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। একটা মজার কথা শুনিবে ? বিপদে পড়িয়া আজকাল ভগবানের কথা মাঝে মাঝে মনে হইতেছে। আশা করি ভাল আছ। ভালবাসা লও। ইতি—

তোমারই অসিত

৫

ভাই অসিত,

তোমার টাকাটা ফেরত পাঠালাম আজ। মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর দি হেল্প্। টাকাটা এসে পড়াতে সত্যিই খুব উপকৃত হয়েছিলাম। সকলের পাওনা আজ শোধ করেছি, তোমারটাও করলাম। এখন অমি অঋণী। আমার যা-কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল সমস্ত বিক্রি করে দিয়েছি। একটি ছেঁড়া গেঞ্জি এবং ছেঁড়া লুংগি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। দুনিয়ার দিকে চেয়ে এবার বলতে পারি—নাউ, উই আর কুইট্স্। এবার সরে পড়তে চাই। এখানে কারও সঙ্গে খাপ খেল না আমার। এত তাড়াতাড়ি মরবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখছি, আমার মতো লোকের বাঁচবার স্কোপ নেই এখানে। গলায় দড়িটা লাগিয়ে ঝুলে পড়তে ভয় করছে কিন্তু। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হচ্ছে যে, শীতকালে ঠাণ্ডা জলের বালতিটা গায়ে ঢালবার আগেও ঠিক এইরকম ভয় করে, কিন্তু সাহস ক'রে ঢেলে ফেলতে পারলেই পরম আরাম। মৃত্যুর পরও হয়তো তাই। মনে পড়ছে হ্যামলেটের কথা—টু ডাই, টু স্লীপ, পারচান্স টু ড্রীম—

সেই স্বপ্নলোকের উদ্দেশেই যাত্রা করছি। তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমি আর থাকব না। তোমরা তোমাদের সনাতন মানদণ্ড দিয়ে নিজেদের জমিদারি জরিপ করতে থাক, আমি চললুম। যাবার আগে তোমার স্ত্রীর সঠিক খবরটা জেনে যাবার কৌতূহল ছিল। কিন্তু জীবনে অনেক কৌতূহলই মেটেনি, এটাও মিটল না। তবে মরবার আগে আশা ক'রে যাচ্ছি শি উইল প্রুভ হার মেট্ল্। আই নো শি উইল। তোমার সনাতন মানদণ্ডকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে সে একদিন তোমাকে বলবে—আমি মানুষ, আমিই আমার মানদণ্ড। তোমাদের সমাজে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই, হাসির প্রকৃত মূল্য তোমরা দেবে না, সনাতন মানদণ্ড নিয়েই মাথা ঘামিয়ে মরবে তোমরা, কিন্তু দ্যাট ডাজ নট্ অলটার দি ফ্যাক্ট দ্যাট শি ওয়াজ এ জেনুইন জেম। যাক্ চললুম। গুড বাই। ইতি—

তোমারই অতুল

হাসির চিঠি

শ্রীচরণেষু,

তুমি নিশ্চয় আমার আশা এতদিনে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছ। আমাকে ভুলে গেছ এ কথা লিখে তোমার স্মৃতিশক্তির অপমান করতে চাই না। আমি যদিও এতদিন আত্মগোপন ক'রে ছিলাম কিন্তু তোমার সমস্ত খবর আমি রেখেছি। তুমি যে পাশ ক'রে চাকরি নিয়েছ, সে খবরও আমি জানি, তুমি যে বিয়ে করনি তা-ও আমার অজানা নয়। তবে একটা কথা বিশ্বাস কর, তুমি যদি আবার বিয়েও করতে তা হলেও আমি তোমাকে এ চিঠি ঠিক এমনি ভাবেই লিখতাম। আর একটা অনুরোধও তোমাকে করছি, আমার এ চিঠি পড়ে আমার সম্বন্ধে আর যে ধারণাই তুমি কর, আমাকে উপযাচিকার পর্যায়ে ফেলো না।

নিজের স্বপক্ষে আমার বলবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণালের যে সব সুবিধা ছিল আমার সে সব কিছুই নেই। তোমাদের তরফের কোনও নির্যাতন আমাকে ঘর-ছাড়া করে নি। আমি পালিয়েছিলাম লজ্জায়!

যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই আমি অনুভব করেছি যেন আমার চারিদিকে অদৃশ্য একটা প্রাচীর রয়েছে। মনে হত, প্রাচীরের ওপারে যে জীবনযাত্রা চলছে তার সঙ্গে আমার যেন যোগ নেই। আমার বাবা, মা, দাদা-মশাইকে ঘিরে যেন একটা রহস্যকুহেলী আছে, তা যে কি আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমার মনে হত সবাই যেন আমার সঙ্গে পোশাকী ভদ্র ব্যবহার করছে। তোমার সুন্দর চিঠিগুলি যখন পেতাম তখনও ঠিক ওই কথাই মনে হত। ভাবতাম, কেউ আমাকে কখনও একটাও কড়া কথা বলে না কেন? কখনও কারো কাছে একটাও বকুনি খেলাম না, আমি সত্যই কি এতটা ভাল? মনে হত সমস্ত মেকি এবং মনে হওয়া মাত্র ভয় হত কেমন একটা! একটা কাঁচের ঘরে বাস করছি মনে হত। বাইরের সবই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বাইরের সঙ্গে যেন যোগ নেই। যে অপরাধ ক'রে আমার ভাই-বোনেরা মায়ের কাছে মার খেয়েছে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে, ঠিক সেই অপরাধ ক'রে আমি বরাবর রেহাই পেয়েছি। মা হেসেছেন, বাবা বড় জোর বলেছেন—ছি, ওরকম করতে নেই। দাদামশাই তো আমার সব কিছুই ভালো দেখতেন! আমি যেন কোনও ধনী জমিদার এবং তিনি যেন আমার বেতনভোগী মোসায়েব।

একদিন কিন্তু কাঁচের ঘরটা ভেঙে পড়ল এক অভাবিত উপায়ে। আমাদের কলেজের একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে দাদামশায়ের শ্বশুরকুলের কি রকম যেন

সম্পর্ক আছে একটা। দাদামশায়ের কাছ থেকে তিনি আমার জন্ম-রহস্যটা শুনেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমিও শুনলাম একদিন। অধ্যাপিকাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক মধুর ছিল না। কেন জানি না, তিনি আমাকে সু-নজরে দেখেন নি কোনও দিন। মেয়েরা বলত ওঁর স্বভাবই নাকি ওই রকম, রূপসী মেয়ে দেখলেই উনি তার উপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেন, কেউ ভাল শাড়ি পরলে সঙ্গে সঙ্গে চটে যান তার উপর। আমি রূপসী কি না জানি না, কিন্তু তোমাদের দৌলতে ভালো ভালো শাড়ির অভাব তো আমার ছিল না, সে সব পরতে কার্পণ্যও আমি করি নি কোনও দিন। মিস ঘোষ একদিন আমায় বললেন, "এমনভাবে সেজে আসতে লজ্জা করে না?" আমি বললাম, "লজ্জা পাওয়ার মতো সাজ করিনি তো। শাড়ি তো আমার মা আমাকে দিয়েছেন।" "তোমার মা?"—একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ফুটে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টিতে। তারপব বললেন, "এসো, আমার সঙ্গে।" আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "তোমার মাকে মনে পড়ে তোমার?" আমি তো অবাক। তারপর তিনি যা বললেন···

ঠিক তার পরদিনই বাবা এলেন কোলকাতায। বাবাকে গিযে অদ্ভুত গল্পটা বললাম। শুনে তাঁব মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, "যা শুনেছ তা সত্যি। কিন্তু ও নিয়ে এখন আব বেশি মাতামাতি ক'রে লাভ নেই।" আমাব পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন। ঠিক সেই সময় তোমার বন্ধু অতুলবাবু এলেন আমাকে ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ডাক্তার বোস আমার গলা দেখে সন্দেহ করলেন সিফিলিসের বিষ হযতো আমার রক্তে আছে। পরীক্ষা করবার জন্যে রক্ত নিয়ে নিলেন তিনি এবং পরীক্ষা ক'রে জানালেন যে বিষ আছে। আমাকে ইনজেকশন নিতে হবে।

প্রথমেই তোমার কথা মনে হল আমার। মনে হল, তোমাকে আমরা ঠকিয়েছি। তুমি আমাদের কথায় বিশ্বাস ক'রে খাঁটি সোনা বলে যা নিয়েছ আসলে তা গিল্টি করা পিতল। আমার সমস্ত আত্মসম্মান ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ল যেন। সব চেয়ে রাগ হল বাবার উপর। মনে হল, তিনিই প্রতারণা ক'রে আমার ও তোমার জীবনের মধ্যে যে প্রাচীর তোলবার আয়োজন করেছিলেন সেই প্রাচীরই এবার দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠল। ঠিক করলাম, বাবার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখব না। সমস্ত কথা অকপটে তোমাকে জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবার কথা আমার মনে জেগেছিল একবার, কিন্তু তাতেও বাধল। মনে হল, এ কথা শুনে হয়তো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তুমি ছুটে আসবে কেবল ভদ্রতার খাতিরে। সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য

নানা রকম মিথ্যারও আশ্রয় নিতে হবে হয়তো তোমাকে বাধ্য হয়ে। তাই ঠিক করলাম তোমাকেও কিছু জানাব না। মানে চুপি চুপি সরে পড়াই ভাল। তোমার মধ্যে যে বাধা দুস্তর হয়ে উঠেছে তা সরিয়ে দেবার শক্তি যদি নিজে কোনদিন সংগ্রহ করতে পারি তবেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করলে শুধু যে নিজেরই অপমান তা নয়, তোমারও অপমান। মনে হল তার চেয়ে মরণ ভাল।

তোমার আধুনিকা কবিতার সেই মেয়েটিকে আমার খুব ভাল লাগে নি। সে দুর্জয়কে জয় করেছিল নিজের সুখের জন্য, নিজের একটা বিশেষ খেয়ালকে চরিতার্থ করবার জন্য। তবু কিন্তু সেই মেয়েটিই উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে। রাত্রে ডাক্তার বন্ধুর চিঠি এবং রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টখানার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেছিলাম। গলাটা ব্যথা করছিল, মাথার ভিতর আগুন জলছিল, দপ দপ করছিল রগের শিরাগুলো। হঠাৎ একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল মানসপটে। চুলগুলি বব-করা, চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধি জ্বলছে, ময়লা ময়লা রং, ঘননিবদ্ধ যুগ্মভ্রূ, চোয়াল, চিবুক, অধর সবই সুপুষ্ট। আমার দিকে চেয়ে সে যেন বলল, "ভাবছ কি, বেরিয়ে পড়। প্রমাণ ক'রে দাও যে তোমার শক্তি আছে। অসুখের বিষ যদি শরীরে কোন রকমে ঢুকেই থাকে, তার প্রতিকার কর। এটা বিজ্ঞানের যুগ, প্রতিকার মিলবেই। ভেঙে পড়ছ কেন?" তোমার 'আধুনিকা' কবিতার সেই মেয়েটি আমার মনের মধ্যে যে এমন জীবন্ত হয়ে আবির্ভূত হবে তা ভাবতে পারি নি। তার কথাগুলো আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

·· ঠিক করলাম অবিলম্বে কোলকাতা ছাড়তে হবে। আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিল সম্বলপুরে। সে অনেকদিন থেকে প্রায় প্রতি চিঠিতেই আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছিল যে আমি যদি তাদের নূতন সংসারে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি তাহলে তারা খুশি হবে খুব। সম্বলপুরের উদ্দেশেই যাত্রা করলাম, অবশেষে। আমার তোরঙ্গ বিছানা পড়ে রইল। আমি আমার ছোট ব্যাগে সামান্য দুই-একখানি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সম্বলপুরে আমি দিন চারেক মাত্র ছিলাম। সেখান থেকেই একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে আমি দিল্লীতে চলে আসি।

···আমার প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির সুদীর্ঘ বর্ণনা ক'রে তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার মানসিক অবস্থার কথা বলেও কোন লাভ নেই। শুধু যে তা নিষ্প্রয়োজন তা নয়, তা বলার বিপদও আছে। মনে যা যা হয়েছে তার অকপট বর্ণনা শুনে তার সত্য মর্যাদা দিতে যদি তোমার দ্বিধা জন্মে তাহলে আমার নিজের কাছেই নিজের মুখ দেখতে লজ্জা করবে। সুতরাং ওসব কথা

থাক। কেবল যে কথাগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তাই তোমায় জানাচ্ছি।

আমি এতদিন ধরে' সুযোগ্য ডাক্তার দিয়ে নিজের চিকিৎসা করেছি, গলার ঘা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তিনবার রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি তিন জায়গায়। রক্তে আর কোন দোষ নেই। রিপোর্ট তিনটি পাঠালাম এই সঙ্গে। এখন আমার মনে হচ্ছে সেই বব্-করা আধুনিকাটি আমাকে যে প্রতিকারের সন্ধানে উৎসাহিত করেছিল সে বৈজ্ঞানিক প্রতিকার হয়তো মিলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, এ প্রতিকারের শেষ মূল্য যে সামাজিক সিন্দুকে বন্ধ আছে তার চাবি কোথায় সংগ্রহ করতে পারব?

তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস পেয়েছি আজ বাবার লেখা সেই চিঠিগুলো পড়ে। চিঠিগুলো সদানন্দবাবু তোমাকে দিয়েছিলেন এবং সেগুলো তুমি বাবার নামে ফেরত পাঠিয়েছিলে এ খবর পেলাম বাবাকে তুমি যে চিঠিখানা লিখেছিলে সেইটে পড়ে। সদানন্দবাবুর চিঠিগুলোর সঙ্গেই তোমার চিঠিটাও ছিল। বাবা বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন ভারতবর্ষের নানা শহরে। আমার বাক্সতে আমার বান্ধবীদের যত ঠিকানা ছিল প্রত্যেক জায়গায় তিনি গিয়েছিলেন। শেষে সম্বলপুরে আমার সন্ধান পান। মাস দুই আগে আমি অফিস থেকে ফিরছি, হঠাৎ পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'ফিরে চল।' কিন্তু অত সহজে ফিরে যাওয়ার পাত্রী আমি নই। বললাম তাঁকে সে কথা। আমার পিছু পিছু তবু আসতে লাগলেন তিনি। আমি ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি, ইক্‌মিক্ কুকারে নিজেই রেঁধে খাই। বাবা আমার বাসায় এসে অনেক সাধ্যসাধনা করলেন আমাকে। কিন্তু ফল হল না কিছু। উঠে চলে গেলেন শেষে। তার পরদিন সকালে দেখি আমার বাসার সামনে যে নোংরা হোটেলটা আছে তাতেই আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। রোজই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত আমার, রোজই তিনি আমাকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন। একদিনও কিন্তু তিনি নিজের দোষ স্খালন করবার চেষ্টা করেন নি, আমার প্রকৃত জন্ম-রহস্য যে কি তা-ও বলেন নি। মিস ঘোষ আমাকে আড়ালে ডেকে এনে যা বলছিলেন তার সার মর্ম এই যে, আমার বাবা যৌবনকালে একজন মুসলমানীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার গর্ভেই আমার জন্ম হয়েছে। এর বেশি তিনিও বোধ হয় আর কিছু জানতেন না। বাবাও আমাকে এর বেশি জানতে দেননি। তিনি বারম্বার একটি কথাই শুধু আমাকে বলেছেন—আমি দোষ করেছি, কিন্তু সে দোষের কি ক্ষমা নেই? বহুকাল পূর্বে সদানন্দবাবুকে তিনি যে

সব কথা লিখেছিলেন তা যদি আমাকে বলতেন তাহলে আমি হয়তো অত নিষ্ঠুর হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতাম না। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি। ঐ নোংরা হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন কেবল প্রত্যাশা করেছেন যে আমি তাঁকে ক্ষমা ক'রে আবার ফিরে যাব। ফিরে গেলে আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা আমাকে যাতে কিছু বলতে না পারেন সেজন্যে তাঁদেরও তিনি একটা চিঠি লিখেছেন যে আমাকে নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ করতে যাচ্ছেন। তোমাকে তিনি কোনও চিঠি লিখেছিলেন কি না জানি না, খুব সম্ভব লেখেন নি, কারণ তিনি বলতেন যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব। রোজই সকালে উঠে দেখতাম তিনি সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন আমার বাসার দিকে চেয়ে। আমি যখন অফিস যেতাম আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়েই দেখতাম দাঁড়িয়ে আছেন। আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। অফিসের দারোয়ানটার মুখে একদিন শুনেছিলাম সারা দুপুরটা তিনি অফিসের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান রোদে রোদে। এমনিভাবেই চলছিল। পরশু দিন সকালে উঠে আমার বাসার জানালা খুলে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাবা যেখানে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন সেখানে নেই। একটু ঝুঁকে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। অফিস থেকে ফিরবার সময় দেখলাম তিনি নেই। মনে হল আমার আশা ছেড়ে দিয়ে তিনি বোধ হয় চ'লে গেলেন। তবু বাসার কাছাকাছি এসে ইচ্ছে হল হোটেলে খোঁজ করি একটু। চাকরটা বললে কাল রাত থেকে তিনি অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। আমি যখন গেলাম তখন তাঁর শেষ অবস্থা। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকলাম একজন। তিনি এসে বললেন স্ট্রোক হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই। একটু পরেই মারা গেলেন। তাঁর ওই ঘরেই সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো আমি পাই, তুমি যে চিঠিটা তাঁকে লিখেছিলে সেটাও সেই সঙ্গে ছিল। চিঠিগুলো পড়ে' আমার আশা হ'ল। মনে হল, চিঠিগুলো তুমি যদি মন দিয়ে পড়ে' থাক তাহলে আমাদের সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা হয়তো তুমি করনি। তুমি এ যুগের শিক্ষিত ছেলে, কুসংস্কারের কলুষে তোমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিম্বা ঠিক জানি না, হয়তো যেগুলোকে আমি কুসংস্কার মনে করছি সেগুলো তোমার চক্ষে কুসংস্কার নয়। সে যাই হোক, তুমি সদানন্দবাবুকে লেখা চিঠিগুলো পড়েছ এইতেই আমি কেন জানি না সাহস পেয়েছি এবং তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি। বাবার হয়ে প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যদিও নিজের যুক্তি অনুসারেই তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন কিন্তু সে যুক্তি আমার কাছে খুব

জোয়ালো। মনে হল না, তোমার কাছেও হয়নি হয়তো! তাই ক্ষমা চাইছি। বিশ্বাস কর, তোমার এ ক্ষতি পূরণ করবার যদি কোনও উপায় থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তা করতাম। কিন্তু যে ঘটনা একবার ঘটে গেছে তার ঘটনাত্ব লোপ করবার উপায় আর নেই। ইচ্ছে করলে আমাকে এখন তোমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পার। যদি কর আমি নালিশ করব না। এটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলে মেনে নেব। ভাবব দুর্জয়কে জয় করার যে মন্ত্র সেই আধুনিক মেয়েটি আমাকে শিখিয়েছিল সে মন্ত্র আমার ক্ষেত্রে সফল হল না কারণ আমি যা চাইছি তা টেস্টটিউবের ভিতর বা সার্জিকাল টেবিলের উপর পাওয়া যাবে না কখনও। আমি কি চাইছি তা মুখ ফুটে বলব না কোনদিন। তবে একটি কথা আমাকে বলতেই হবে, তুমি যদি আবার আমাকে ফিরে যেতে বল আমি ফিরে যাব। আমাদের সমাজে যে আর্থিক কারণের জন্য বাধ্য হয়ে স্ত্রীদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীর কাছে ফিরে যেতে হয় সে কারণ যদিও আমার ক্ষেত্রে নেই, তবু যাব, কারণ তোমার মতো লোকের সহধর্মিণী হওয়া সৌভাগ্য বলে' মনে করি আমি। আমার স্পর্শে পাছে তুমি কলঙ্কিত হও তাই আমি তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তোমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে নিজেকে বিশুদ্ধও করেছি এতদিন ধরে'। ডাক্তাররাই আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে বলেছেন এবার তুমি নির্দোষ নীরোগ, এবার তুমি সমাজে ফিরে যেতে পার। তুমি আমাকে ফিরে নেবে কি? তোমার দিক থেকে যদি কোন কুণ্ঠা থাকে তাহলে আমি ফিরতে চাই না। দোহাই তোমার, অনুকম্পা ভরে আমাকে ফিরে যেতে বোলো না। কারণ, ঠিক যেখানটিতে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাই সেখানটি তোমার চক্ষে গ্লানিহীন না হলে আমি দাঁড়াতে পারব না। বাইরের বহুলোক কুৎসার কর্দমে আমাকে নাইয়ে দেবে জানি কিন্তু সব আমি হাসিমুখে সহ্য করতে পারব তুমি যদি আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত হও। আর একটা কথা। গোড়াতেই সে কথা তোমাকে বলেওছি একবার! আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার কাছে ফিরে যেতে চাই বটে কিন্তু জোর ক'রে তোমার ঘাড়ে চাপতে চাই না, ছলা কলা ক'রে বা কান্নাকাটি ক'রে তোমার মন ভোলাবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

আমার সম্বন্ধে তুমি কি কি শুনেছ তা জানতে কৌতূহল হয়। বিজয়বাবু তোমাকে কোনও খবর দিয়েছিলেন কি? আমি যে ট্রেনে সম্বলপুর রওনা হই বিজয়বাবুও সেই ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। বললেন একটা স্কলারশিপ যোগাড় ক'রে বিলেত যাওয়া তাঁর ইচ্ছে, সেই চেষ্টায় দিল্লী যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কোন কারণে কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি শ্বশুরবাড়ীর

লোকদের লুকিয়ে। তিনি যেন কথাটা কারও কাছে ফাঁস না ক'রে দেন। তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেবেন না। প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন কি না কে জানে। আমার এই দীর্ঘ বিদেশ বাসের সময় আর কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। সুতরাং আমার সম্বন্ধে সত্য খবর তোমাদের জানাবার সুযোগ কারো হওয়ার কথা নয়। তবে মিথ্যে খবর তৈরি করতে পারেন এরকম মাথাওলা লোক আমাদের দেশে অনেক আছেন। না জানি আমার সম্বন্ধে কি কি শুনেছ তুমি।

তোমার চিঠিগুলি এখনও আছে আমার কাছে। অনেকবার পড়েছি সেগুলো। প্রায়ই পড়ি। মনে হয়, তোমার চিঠিগুলির ভিতর তোমার যে সত্তা প্রকাশিত তাই যদি তোমার স্বরূপ হয় তাহলে আমার ভয় নেই। তোমার বিচারে যদি আমি বর্জনীয় হই তাহলেও আমার বলবার কিছু থাকবে না। মনে হবে, তুমি কবি, তুমি ঠিক বিচারই করেছ, ভুল হয়নি তোমার। এত বড় চিঠি তোমার কাছে আর কখনও লিখিনি। কে জানে এই হয়তো তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। আমার প্রণাম নাও। উত্তর দিতে দেরি কোরো না। ইতি—

হাসি

অসিতের উত্তর

কল্যাণীয়াসু,

হাসি, আমার টেলিগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। আমি দুদিনের ছুটি পেয়ে গেলাম হঠাৎ। সুতরাং নিজেই যাচ্ছি তোমাকে আনতে। প্লেনে যাব। তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখ। এ চিঠি পৌঁছবার আগেই আমি গিয়ে হয়তো পৌঁছব, তবু দু' কলম না লিখে পারলাম না। ইতি—

তোমারই অসিত

লক্ষ্মীর আগমন

উৎসর্গ

শ্রীমতী লীলাবতী দেবী

করকমলে—

এক

অবনীশের কথা

অদ্ভুত রকম যোগাযোগ হয়েছিল সেদিন।

স্বপ্নলোক নেমে এসেছিল সেই পড়ো ডাকবাংলোর বারান্দায়। জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছিল চতুর্দিকে, কোথায় যেন বাঁশী বাজছিল একটা। লণ্ঠনের আলোয় মৃদুলার কালো বেণীটা ভাষাময় হয়ে উঠেছিল। নিরু আর ফুলুর সঙ্গে গল্প করতে করতে সে তরকারি কুটছিল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। রাজু ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল ; মাঝে মাঝে নাক ডাকছিল তার, কিন্তু তাতে, ইংরেজিতে যাকে বলে জারিং নোট, তা ছিল না, মনে হচ্ছিল ঘুমন্তলোকের অস্পষ্ট কলরবের ঢেউ মাঝে মাঝে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে পরে একটা পোকা ডাকছিল 'চিপ্' 'চিপ্' 'চিপ্'।

গল্প বলছিল সুখেন্দু। কিন্তু গল্প বলার চেয়ে রান্নার দিকেই বেশী মন ছিল তার। সে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে তদারক ক'রে আসছিল মাংসের জলটা মরল কিনা। নামে রান্না করছিল শুকুল ঠাকুর, সুখেন্দুর নির্দেশ মতো সে কেবল খুনতি নাড়ছিল, মশলা গুলছিল, হাঁড়ি নাবাচ্ছিল-ওঠাচ্ছিল, আঁচ কমাচ্ছিল-বাড়াচ্ছিল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার রাশ ধরেছিল সুখেন্দু। সুখেন্দু চাটুজ্যে মুকুজ্যে বাড়ির ভাগনে, কিন্তু কর্তার মৃত্যুর পর সেই হয়ে উঠেছে সর্বময় কর্তা। অথচ সর্বময় কর্তা হবার মোটেই আকাঙ্ক্ষা নেই তার—নিজে বিয়ে করে নি, করবেও না—রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে তাদের বিষয়টি ভাল ক'রে বুঝিয়ে আর মৃদুলাকে একটি সৎপাত্রে সম্প্রদান ক'রে সে তীর্থ বাস করবে ঠিক করেছে। কিন্তু সকলেই জানে সে করবে না, করতে পারবে না। প্রথমত তার তীর্থবাস করবার বয়সই হয় নি (আমারই সহপাঠী সে, ত্রিশ কিম্বা বড় জোর বত্রিশ বছর বয়স হবে তার) দ্বিতীয়ত, রাজু, বিজু আর দ্বিজুকে ছেড়ে থাকাই অসম্ভব তার পক্ষে। তৃতীয়ত, তীর্থবাস করতে হলে যে পরলোকমুখী দৃষ্টি থাকা দরকার তা সুখেন্দুর নেই। ইহলোকের নিতান্ত তুচ্ছ সব খুঁটিনাটি নিয়ে ভরপুর হয়ে থাকাই ওর স্বভাব। যখন বাইরের বৈষয়িক কোন ঝামেলা থাকত না অর্থাৎ যেদিন মকোদ্দমার জন্যে সদরে যাওয়ার প্রয়োজন হ'ত না বা দ্বিজুর একটা ভাল চাকরির চেষ্টায় তদ্বির করবার জন্য ছুটোছুটি করবার সুযোগ থাকত না, কিম্বা নায়েব মশাইকে ডেকে নিয়ে এসে পলু পোকার চাষ বা মৌমাছি পালন বা কলেকটিভ ফারমিং বা

মোটর ট্রাক্টার বা ওইরকম কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করবার বাই চাগত না, সেদিন সুখেন্দু বসে বসে হয় দড়ি পাকাত কিম্বা উল বুনত। সুখেন্দুর বোনা সোয়েটার, ব্লাউস এবাড়ির আত্মীয়-স্বজন সবাই পরেছে। রাজুকে একটা কার্ডিগান পর্যন্ত বুনে দিয়েছে। সরু মোটা বেঁটে লম্বা রঙীন সাদা নানারকম দড়িও পাকিয়েছে সে জীবনে অনেক। সেগুলো হাটে বিক্রি করেছে এবং সেই টাকা জমিয়ে রেখেছে পোস্টাফিসে। আমাকে বলছিল একদিন সেই টাকা দিয়ে ও মৃদুলার প্রথম সন্তানকে গয়না গড়িয়ে দেবে একটা। সুতরাং তীর্থবাস করবার মনোভাব নয় ওর। নিতান্ত ইহলৌকিক এবং বৈষয়িক রসেই ওর চিত্ত নিষিক্ত। ওর মতে তাই বাজে কাজ যাতে সংসারের কোন সুবিধা হয় না।

এই যে পিকনিকটা এর মূলেও যে সুখেন্দুর একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা বুঝতে আমার খুব দেরি হয় নি। আমার মনে হয় যে গল্পটা ও আমাকে বলছিল সেটাও উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এসব উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত তখন পাই নি, পাওয়া সম্ভবই ছিল না। সেই পড়ো বাংলোয় সেই জ্যোৎস্নাকুল সন্ধ্যায় কোন কিছু বিশ্লেষণ ক'রে দেখতেই ইচ্ছে করছিল না আমার। আমার মনে হয় সুখেন্দু যদি গল্পটা আমার আপিসে আমাকে বলত আমি বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু সেই রহস্যময় পরিবেশে মনে হচ্ছিল জীবনের নিগূঢ় সত্যকে যেন প্রত্যক্ষ করছি, আমার জ্ঞানের পরিধি যে কতটুকু এবং বিদ্যার দৌড় যে কত স্বল্প এই নিগূঢ় সত্যটা সেদিন যেন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল নিজের কাছে, স্পষ্ট হয়ে উঠে অবিশ্বাসের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল "হ'তে পারে বই কি! কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বিনিদ্র ভক্তের সন্ধানে পৃথিবীতে সশরীরে নেমে আসেন এ কথা তো সুবিদিত। বিশ্বাসও করেন অনেকে। পুরোপুরি অবিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি আমার।"

এই আচ্ছন্ন মনোভাবের উপর লাগছিল জ্যোৎস্নার ঢেউ, লাগছিল দূরাগত বাঁশীর সুর, মৃদুলার বাঁকা বেণীটার অদৃশ্য স্পর্শ। অনেকক্ষণ পরে পরে যে পোকাটা 'চিপ্ চিপ্' ক'রে ডাকছিল, সে-ও যেন সাবধান করছিল আমাকে। বলছিল যেন, 'সাবধান, অবিশ্বাসের শ্যাওলায় পা দিলেই পিছলে পড়ে যাবে। সাবধান।' অনেকক্ষণ পরে পরে বলছিল, কিন্তু বলছিল।

সুখেন্দুর মন ছিল শুকুল ঠাকুরের দিকে, অথচ সে আমাকে গল্পটাও না শুনিয়ে ছাড়বে না। আমি আসতেই আমাকে বলছিল, "কি রকম জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ? আজ তোমাকে জ্যোৎস্না রাত্রিরই গল্প শোনাব একটা। গল্প নয়, সত্য কাহিনী। তুমি একটু বাগিয়ে ব'স দেখি। ওই কোণটায়। ম্ অনুপমকে চা দে

এক কাপ। চা খাবে, না কফি? ও শুকুল, মশলাটা খুব বেশী ভেজো না—এই মাটি করেছে"—সুখেন্দু ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। মৃদুলাকে সুখেন্দু 'মৃ' বলে' ডাকে। মৃদুলার হাতের তৈরি চমৎকার এক পেয়ালা চা খেয়ে মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম ওর সপ্রতিভতার কথা। বিদেশে ঘুরেছি অনেক। সপ্রতিভ মেয়ে অনেক দেখেছি। এদেশে, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে, লাজুক মেয়ে দেখব বলেই প্রত্যাশা করি, বিশেষ ক'রে সে যদি নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা হয়। আশা করেছিলাম মৃ এক পেয়ালা চা হাতে ক'রে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে আনত নয়নে আনত মস্তকে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির একটু আভা ফুটিয়ে আসবে এবং তেপায়ার উপর ঠক্ ক'রে পেয়ালাটা নাবিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আশা করিনি যে সে এসেই বলবে, "না, এখানে বসা চলবে না আপনার। ওই কোণের দিকটায় চলুন আপনি। তেপায়াটা নিয়েই চলুন। বড্ড সিগারেট খান আপনি। ফুলুর সিগারেটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য হয় না, কাশি আছে ওর—"

এ আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার নির্দেশ অনুসারে যে কোণটায় গিয়ে বসতে হল সেখান থেকে মৃদুলার শুধু বেণীটাই নয়, মুখের খানিকটাও চোখে পড়তে লাগল, আর তার ঠিক পাশাপাশি উনুনের আঁচের ঝলকানিটাও। মনে হতে লাগল, মৃদুলার ভিতর থেকেই বুঝি প্রদীপ্ত ঝলকটা বেরুচ্ছে। মৃদুলার কথাই ভাবছিলাম, তার সপ্রতিভতার কথা, কিন্তু হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চক্রবাল রেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যের মাথায় একটি রূপোর নৌকো ভাসছে যেন। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, ওটা জ্যোৎস্না-মাখা একটা মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু বুঝতে পেরে কষ্ট হল, যেন হতাশ হলাম। মনে হ'ল, আহা, ওটা সত্যিই যদি রূপোর ময়ূরপঙ্খী হ'ত আর সত্যই যদি ওটা ভাসতে ভাসতে এসে আমাদের বারান্দার নীচে থামত, আর তার থেকে নেমে আসত—এর পর ছবিটাকে স্পষ্ট করতে গিয়ে ছন্দপতন ঘটে গেল। মৃদুলা তো সর্বক্ষণ সামনেই বসে' রয়েছে, ও কি ক'রে নামবে ওই রূপোর ময়ূরপঙ্খী থেকে! কিন্তু ও ছাড়া আর কাউকে ওই ময়ূরপঙ্খী থেকে নামাতে ইচ্ছেও হল না। সুতরাং কল্পনাটা এলোমেলো হয়ে গেল। আরও হ'ল সুখেন্দুকে দেখে। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে মৃদুলার মুখের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের খানিকটা অংশ এবং উনুনটা দেখা যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলাম শুকুল ঠাকুরকে সরিয়ে সুখেন্দু নিজেই খুনতি চালাচ্ছে। সিগারেট কেসের উপর অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ ঠুকে আমি অবশেষে চতুর্থ সিগারেটটি ধরালাম। অদৃশ্য কীটটি পুনরায় টিপ্পনি কাটলে—চিপ্ চিপ্ চিপ্।

পড়ো বাংলো, জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন রাত্রি, জলন্ত চুল্লীর পটভূমিকায় মৃদুলার মুখের খানিকটা, মশলা ভাজার গন্ধ, সুখেন্দুর ব্যস্ততা, নিরু আর ফুলুর ফিস ফিস গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসি, মেঘের ময়ূরপঙ্খা, এই সমস্তই আবার চেতনায় ছাপ ফেলছিল, সাড়া তুলছিল, কিন্তু সবটা মিলিয়ে যা হচ্ছিল তা এদের কোনটার সঙ্গেই সম্পর্কিত নয় যেন্। শাদা রঙের শুভ্রতার মধ্যে সাতটা রঙের একটারও আভাস পাওয়া যায় না। আমি যে অবর্ণনীয় একটা বেদনা অনুভব করছিলাম, যা শুধু বেদনাই নয় যা আনন্দও তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের ·হয়তো সম্পর্ক ছিল, হয়তো ছিল না। কিন্তু আমি একা একা নিজের সেই অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম। সুখেন্দু যে কখন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তা আমি টের পাই নি। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠের 'রামধ—ন' ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, কিছু দূরে, বেশ কিছু দূরে, একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে সুখেন্দু চীৎকার করছে। রামধন কে ? রাজুর দিকে চেয়ে দেখলাম সে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। মৃদুলা রান্নাঘরে উঠে গেছে, ফুলু নিরুর কানে কানে কি যেন বলছে ফিস ফিস ক'রে। নিরুর মুখে মুচকি হাসি ফুটেছে। আশ্চর্য মেয়ে ওই নিরু। যদিও আমার সহোদরা বোন, কিন্তু ওকে যত দেখি তত আশ্চর্য হয়ে যাই। বেশ বুঝতে পারছি ওর মুখে যে মুচকি হাসিটা ফুটেছে সেটা পোশাকী হাসি, আটপৌরে হাসি নয়, ফুলু যে কথাটা রহস্যময়ভাবে তার কানে কানে বলছে তার জবাবে যতটুকু হাসি যেমন ভাবে হাসা উচিত, ঠিক ততটুকু হাসি তেমনিভাবে হাসছে ও। আমরা যে গরীব, ওকে যে স্কুলে চাকরি ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে হয়, তা কি ওকে দেখে বোঝবার উপায় আছে ? চমৎকার একখানি শাড়ি পরে', ছিমছাম হয়ে বসে আছে যেন রাজকন্যাটি। রুচির প্রশংসা করতে হয়। সুখেন্দুদের প্রতিবেশী শ্রীদাম সিংহির মেয়ে ফুলু যে ওর কড়ে' আঙুলের যোগ্যও নয় তা ও জানে, ইনজিনিয়ার শ্রীদামবাবুকে তোয়াজ করবার জন্যই যে সুখেন্দু তার ওই একমাত্র কন্যাটির প্রশংসায় গদগদ হয়ে ওঠে, যখন তখন নিমন্ত্রণ করে, এসব কথা নিরুর অবিদিত নেই, কিন্তু ফুলুর সঙ্গে ও এমনভাবে কথাবার্তা কইছে, যেন ফুলু ওর কত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

'রাম ধ—ন,' 'রাম ধ—ন', 'রাম—ধ—ন' সমানে চীৎকার করে চলেছে সুখেন্দু। রামধন ব্যক্তিটি কে এবং এখন এখানে তার প্রয়োজনই বা কি তা বোঝবার আমার উপায় ছিল না।

আমার যে সত্তাটা আমার মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল সুখেন্দুই তাকে হ্যাঁচকা মেরে তুললে আচমকা এসে।

"রাজু কি রকম নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে দেখেছ। ও বাহাদুরি ক'রে অনার্স

নিয়েছে বটে কিন্তু ওর যা ঘুমের বহর দেখছি তাতে আমি অন্তত ভরসা পাচ্ছি না। ওরে রাজু ওঠ না, তুই কি এখানে ঘুমিয়ে কাটাবি বলেই এসেছিস নাকি। বাড়িতে ঘুমোলেই পারতিস—"

এর উত্তরে রাজু পাশ ফিরে, মানে আমাদের দিকে পিছন ফিরে শুল। ফুলু মেয়েটি ঘাড় হেঁট ক'রে খিল খিল ক'রে হাসল। মৃদুলার গম্ভীর মুখশ্রীতে ভাবান্তর ঘটল না কোনও। আমি যেন ছায়াচিত্র দেখছিলাম গ্রহান্তরে বসে' বসে'।

সুখেন্দু হঠাৎ গল্পের প্রসঙ্গে উপনীত হল।

"আমি যে গল্পটা বলব সেটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। কিন্তু এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি, যে কোনও ভাল গল্প হার মেনে যাবে এর কাছে। সত্যি কিনা। তবে একটা কথা শুনিয়ে রাখি গোড়াতেই। এ গল্পের মর্ম বুঝতে হলে বিশ্বাসী মন চাই। নাস্তিক হলে চলবে না। তোমাদের সান্যালের ছেলেমানুষী অচল এখানে। কোন্‌খানেই বা চলে, বল। নীলা পাথরের কাণ্ড শুনেছ কখনও? নীলা যার 'সুট' করে তাকে রাজা করে দেয়, আর যার করে না তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। স্বচক্ষে এ ঘটনা দেখেছি আমি। জগৎকে তুমি তো চেন। একবার চুড়ির ব্যবসাতে ফেল মেরে তার সংসার অসচ্ছল হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর কে যেন তাকে বুদ্ধি দিলে তুমি নীলা পর, দেখতে দেখতে অবস্থা ফিরে যাবে। আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইলে। পরামর্শ চাইবার ছুতো করে এসেছিল অবশ্য, আসলে এসেছিল টাকা চাইতে। কোথায় যেন ভাল নীলার সন্ধান পেয়েছিল একটা—আসল রক্তমুখী নীলা—দাম আড়াই শ' টাকা। আমাকে বললে, টাকাটা ধার দাও আমাকে। আমার হাতে তখন টাকা কোথায়? মামা কিছুদিন আগেই মারা গেছেন, রাজুর পরীক্ষা সামনে, বিজুর পরীক্ষা সামনে, মামীর হার্টের অসুখ চলছে, মু-কে বোর্ডিংয়ে পাঠিয়েছি, আমি নিজেই তখন কই মাছের মতো ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছি টাকার জন্যে, কিন্তু জগু নাছোড়বন্দা। টাকা তার চাই-ই, নীলা তাকে পরতেই হবে। আমি তখন তাকে নিয়ে গেলাম আমাদের জুয়েলার পীতম্বরমের কাছে। সে বললে, বাবুজি, ভাল নীলা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নীলা পরবার আগে একজন ভাল জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া দরকার। জগু বললে, পরামর্শ নিয়েছি। ভগবানই জানেন কার কাছে ও পরামর্শ নিয়েছিল। নীলার আংটিটি পরে বাড়ি ফিরে এলেন বাছাধন। নীলার কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। নীলা পরার পর এক ঘণ্টাও কাটল না, ছোট ছেলেটা ছাত থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে অজ্ঞান। তাকে সামলাতে না সামলাতেই আদালত থেকে 'শমন' এসে হাজির, চুড়ির ব্যবসাতে যিনি ওর অংশীদার ছিলেন তিনি ওর নামে

জুয়াচুরির নালিশ করেছেন। আদালতের সিপাহী বিদেয় হতে না হতেই সাইকেল চেপে টেলিগ্রাফ পিওন দর্শন দিলেন। দেশে বাপ মর-মর, আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ করেছেন যাবার জন্য। জগৎ তখন আংটিটি খুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে। ফেলে দিয়ে বাঁচল। তোমার সায়্যান্স এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে? অথচ ঘটনাগুলো সত্যি, স্বচক্ষে দেখেছি।……”

সুখেন্দু হঠাৎ গেঞ্জিটা খুলে ফেলে পৈতে দিয়ে পিট চুলকোতে লাগল। কিন্তু পিঠের অজস্র ঘামাচি ওর মনকে যে একটুও অধিকার করে ছিল না তার প্রমাণ পেলাম যখন ও বলে' উঠল—“আমার মনে হয় কি জানিস? জ্যোৎস্না জিনিসটা শুধু চাঁদের আলো নয়, ওটা সামথিং এলস্। যদি বলি আমাদেরই মনের আলো তাহলেও ঠিক হয় না অবশ্য, কারণ ঠিক পূর্ণিমা তিথিতেই মনে এরকম আলো বেরুবার মানে কি? তুমি টপ ক'রে চেপে ধরবে জানি—কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের মনের সঙ্গে ওর এই প্রকাশটার ভীষণ যোগাযোগ আছে। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না, তবে ওই পাথরটা ঠিক আমাদের মতো জ্যোৎস্না উপভোগ করছে না এটা নিশ্চিত। আমাদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে শুধু আলো নয়, অনেক কিছু জড়িয়ে আছে, যেমন ধর চকোর—চকোর দেখেছিস কখনও? আমি কিন্তু দেখেছি, চকোর পাখী নয়, প্রজাপতি এক রকম—”

এমন সময় ন' দশ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল।

বলল, “বাবা এখন বাড়ি নেই। মাঠ থেকে ফেরেনি এখনও।”

“ও, তাই সাড়া পেলাম না। ফিরলে বলে দিস্ আমরা এসেছি। সমস্ত রাত থাকব। তোরা এখানে সবাই খাবি আজ। তোর ভাইটা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?”

“হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।”

“তোর মা?”

“মায়ের আবার শরীর খারাপ হয়েছে।”

“তুই তাহলে বাবার সঙ্গে আসিস্। কেমন?”

“আচ্ছা।”

জ্যোৎস্না প্রসঙ্গে সুখেন্দু যে আবোল-তাবোল আরম্ভ করেছিল, মেয়েটি এসে পড়াতে তার রং বদলালো বটে, কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত রকমে যে আমি একটু অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলাম।

“এই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে আমার ভাগ্য অদ্ভুতভাবে জড়িত। মা যেদিন মারা যান সেদিনও এমনি জ্যোৎস্না, বাবা যেদিন মারা যান সেদিনও। মামা যেদিন মারা যান সেদিন প্রথম রাত্রে চাঁদ ছিল না, কিন্তু ঠিক মারা যাবার

সময়টিতে দশদিক আলো করে চাঁদ উঠল। আর মামী যেদিন মারা যান সেদিন তো তুইও ছিলি কোলকাতায়, মনে নেই? কোলকাতার ভিতর বলে তত বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু নিমতলা-ঘাটে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে। রাত দুটো হবে তখন, মনে আছে তোর? মেস থেকে তোকে ডেকে নিয়ে গেলাম, সেই যে—"

"মনে আছে। সেদিনও পূর্ণিমা রাত্রি ছিল।"

"আশ্চর্য কাণ্ড। পূর্ণিমা রাত্রিতেই বেছে বেছে আমার জীবনে অন্ধকার এসেছে। অবশ্য একটি পূর্ণিমা রাত্রি ছাড়া। সেই গল্পটাই তোমাকে বলব আজ। নাম-টাম বলব না কিন্তু, তুমি জানতেও চেও না। ও কি, শুকুল আবার আসছে কেন?"

শুকুল ঠাকুর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সসঙ্কোচে বললে, "কালিয়ার ঝোলটা কি আর একটু মারব? আপনি যদি একবার দেখে যেতেন—"

"হুড় হুড় করে যে রকম জল ঢাললে তুমি ও মারতে গেলে আলুগুলো গলে' কাদা হয়ে যাবে! চল দেখি, আলু বেশ সেদ্ধ হয়েছে তো?"

"হয়েছে।"

সুখেন্দু উঠে গেল।

যখন ফিরল তখন দেখলাম সে একটা অঙ্ক কষছে।

"চুয়ান্ন মাইল আসতে ঘণ্টা চারেক লাগুক। পাঁচটায় যদি ছাড়ে নটা নাগাদ এসে পৌঁছে যাবে। কি বল?"

"কার কথা বলছ?"

"বিজুর। সে বলেছিল আসবে। তার মোটর বাইক আছে। আসবে খুব সম্ভবত। বিশেষত তুমি আসবে যখন শুনেছে—"

"বিজু আপিস করেছে বুঝি?"

"সে কি আর করেছে, আমি জোর ক'রে ক'রে দিয়েছি। নিজের কোলিয়ারি নিজেই দেখুক না, নিজের জিনিস নিজে না দেখলে চলে? দিনরাত খালি পলিটিকস্ আর খবরের কাগজ নিয়ে কাটালে সব যে উচ্ছন্ন যাবে। তুমি একটু বুঝিয়ে বোলো তো। এখনও মন বসেনি ওর ঠিক ক'রে।"

আমি অনেক দিন এদের কাছছাড়া। বিলেতেই চার বছর ছিলাম। তাই এদের পারিবারিক অনেক খবর জানা ছিল না।

"বিজু চাকরি করছে?"

"হ্যাঁ, প্রফেসারি। মাইনে বড্ড কম। তবু বসে' বসে' ভ্যারেণ্ডা ভাজার চেয়ে তো ভালো। খাবার পরবার অবশ্য অভাব নেই এদের, কিন্তু এরা এতো

কাছা-খোলা যে সামলে সুমলে দেবার মতো হুঁশিয়ার লোক যদি সংসারে না থাকে, তাহলে এদের বিষয় সম্পত্তি থাকবে কিনা সন্দেহ। তাই এদের প্রত্যেককেই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। কাজে লেগে থাকলে খানিকটা হুঁশ হয় তবু। বিজুটা সবচেয়ে বেশী অন্যমনস্ক। সেদিন গিয়ে দেখি বিজু একটা মোমবাতি জ্বেলে পড়ছে। আশ্চর্য হয়ে গেলুম। নিজে আমি বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন করিয়ে গেছি, মোমবাতি মানে! বিজুকে জিগ্যেস করতে সে কাচুমাচু হয়ে উত্তর দিলে, ইলেক্‌ট্রিক বিল দেওয়া হয় নি বলে বোধ হয় কানেকশন কেটে দিয়েছে। টাকার অভাব নয়, হুঁশের অভাব। ইচ্ছে হল কান ধরে ঠাস ক'রে একটা চড় মারি—"

ক্রুদ্ধ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল সুখেন্দু। যেন আমিই অপরাধী।

"কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান! চড় ওদের মারা যায় না। মারতে পারা যায় না। মারতে পারলে ওরা মানুষ হত। কিন্তু সেটি আর জীবনে পেরে উঠলাম না। আমিই তো ওদের মাটি করেছি। মামা তো সেই কবে মারা গেছেন আর মামী তো পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়েই রইলেন বরাবর। ভার তো ছিল আমার উপর। কিন্তু ওদের শাসন আমি কিছুতেই করতে পারলাম না।"

সুখেন্দু ঘন ঘন পা নাচাতে লাগল। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে বেশ খানিকক্ষণ পা নাচিয়ে টপ করে উঠে পড়ল আবার। বারান্দার অন্ধকার কোণটার দিকে গিয়ে হঠাৎ একটা ঝুড়ি বার করলে টেনে।

"ম্ব এই স্তাখ এইখানে রেখেছে মাটির গ্লাসগুলো। আমি তখন থেকে ভাবছি গ্লাসগুলো গেল কোথায়, আসবার সময় গাড়িতে তুলতেই ভুল হয়ে গেল, না কি হল—"

"ওগুলো এখন টেনে বার করছ কেন। আমিই তো ওখানে সরিয়ে রেখেছি, খাবার সময় বার করলেই হবে—"

"ধুতে হবে না?"

"ধুয়েই রেখেছি।"

সুখেন্দু আমার দিকে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে একবার। তারপর ঝুড়িটা আবার গিয়ে কোণে রেখে এল।

"শুরু কর এবার তোমার গল্প—"

"হ্যাঁ করছি।"

এসে বসে আবার পা নাচাতে শুরু করলে। তারপর একটা রহস্যময় হাসি হেসে বললে, "কোন্‌খান থেকে শুরু করি তাই ভাবছি। আচ্ছা, প্যাঁচা দেখেছিস তুই?"

"দেখেছি। ছবিতে—"

"জ্যান্ত প্যাঁচা দেখিস নি কখনও?"

"কি ক'রে দেখব। তবে চিড়িয়াখানায় মনে হচ্ছে দেখেছি—"

"কত বড় দেখেছিস?"

"ঠিক মনে নেই। তবে খুব বড় নয়।"

"রং কি রকম?"

একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। প্যাঁচা নিয়ে যে হঠাৎ সুখেন্দু জেরা শুরু করবে তা কে জানত!

বললাম, "যতদূর মনে হচ্ছে মেটে মেটে—"

"তাহলে কুটুরে প্যাঁচা দেখেছ।"

"তা হবে—"

"কিন্তু আমি সেদিন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে যা দেখেছিলাম তা ধবধবে শাদা। মনে হচ্ছিল, শাদা মখমল দিয়ে মোড়া তার গা। চোখ দুটি হীরের মতো জলছে। বেরালের চোখও অন্ধকারে জলে—দেখেছ নিশ্চয়—কিন্তু সে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। মনে হচ্ছিল চোখ দুটি হাসছে, আর তার থেকে যে আলো বেরুচ্ছে তা যেন জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাও যেন নয়, অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ একটা জ্যোতি, যা দেখে ভয় হয় না, ভরসা হয়। আমি তো প্রথম ওই চোখ দুটোই দেখেছিলাম—"

গল্পে বাধা পড়ল।

রামধন এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার মনে আছে, আমরা এই বাড়ি আর আশপাশের এই জমিগুলো কোন্ সালে কিনেছিলাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক আঠারো বছর আগে—"

সুখেন্দু আমার দিকে চেয়ে বললে—"মনে রেখ কথাটা—"

তারপর রামধনের দিকে ফিরে বললে—"এই কথাটাই জানতে চাইছিলাম। একটু পরে তোমার মেয়েকে সঙ্গে ক'রে এখানে এস। রাত্রে এখানেই খাবে।"

"যে আজ্ঞে।"

দণ্ডবৎ ক'রে রামধন চলে গেল।

অপস্রিয়মান রামধনের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সুখেন্দু বললে—"আমি যে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পটা বলতে যাচ্ছি তা এসেছিল ঠিক কুড়ি

বছর আগে। মানে আমার বয়স তখন ন' কিম্বা দশ। তোর সঙ্গে আমার আলাপই হয়নি তখন। ক্লাশ প্রমোশন পাইনি সেবার, মামার দৃষ্টি এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াই, চোখোচোখি হয়ে গেলেই মামা কটমট ক'রে তাকান আমার দিকে, আর আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা চলছে তখন…"

হঠাৎ চুপ ক'রে গেল সুখেন্দু। তারপর বললে, "মামীর মুখটা মনে পড়ছে। আশ্চর্য, একরোখা লোক ছিলেন। আমি স্বকর্ণে শুনেছি মামাকে বলতে—দেখ, সুকুকে কিছু বোলো না। ফেল ক'রে বেচারা মনমরা হয়ে আছে, তার ওপর আমাদের আশ্রিত, তুমি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিও না। এ বিষয়ে একটি কথাও বোলো না। মামা মুখ দিয়ে কিছু বলেন নি, বলেছিলেন চোখ দিয়ে। তাঁর সে কটমট চাউনি—বাপ্‌স্—জীবনে ভুলব না কখনও।"

সুখেন্দু জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে পা নাচাতে লাগল আবার।

তারপর আবার মুচকি হেসে বললে—"মামার ওই চাউনিটাই কিন্তু সারাজীবন ঠেলে ঠেলে ঠিক রাস্তায় নিয়ে গেছে আমাকে। এখনও নিয়ে যাচ্ছে। চাউনিটার কটমট ভাবটা কমেছে কিন্তু মনে হয়। মনে হয়, বুঝেছেন তিনি ব্যাপারটা এতদিনে। গেল বছরের ঘটনাটার পর বোঝা উচিত অন্তত। আহা, মামীও যদি থাকতেন তখন, ছিলেন নিশ্চয়ই কোথাও, আমি যদিও টের পাইনি সেটা। টের পেলে খুব ভালো লাগত। সারাজীবন মেয়েটাকে দাঁতে চিবিয়ে রেখেছিলেন তো—কিন্তু আসল কথা বুঝেছিলেন তিনি—"

পুনরায় চুপ ক'রে গেল সে। আকাশের দিকে চেয়ে রইল চুপ ক'রে। তার নীরবতাটা এমন একটা বিশেষ ধরনের নীরবতা বলে আমার মনে হল যে আমিও চুপ ক'রে রইলাম। কথা বলে তা ভেঙে ফেলবার প্রশ্নও জাগল না আমার মনে, নিতান্ত প্রয়োজন হলেও একটা দামী কাচের ফুলদানী ভেঙে ফেলবার কল্পনা করে না যেমন কেউ। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে অবাক হয়ে গেলাম আমি। কিছুক্ষণ আগে দিগন্তরেখায় ঘনকৃষ্ণ অরণ্যশীর্ষে যে ছোট মেঘের ময়ূরপঙ্খীটি ভেসে উঠেছিল, মনে হল, সেটি যেন বেশ বড় হয়েছে, ময়ূরের গলাটি আরও স্পষ্ট, আরও বড় হয়ে উঠেছে যেন…

সুখেন্দুই নীরবতা ভঙ্গ করল শেষে।

"গেল বছরের ঘটনাটা এতই অদ্ভুত যে যখনই মনে হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে হাত দিয়ে দেখ"—

সুখেন্দু আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখল। অনুভব করলাম, সত্যই সে রোমাঞ্চিত হয়ে বসে আছে।

"গেল বছরের ঘটনাটা কি—"

"সাংসারিক ঘটনাই, টাকাকড়ির ব্যাপার, কিন্তু অদ্ভুত—"

"কি রকম—"

"তুই তখন বিলেতে। কোথাও কিছু নেই মকোদ্দমা বেধে গেল একটা। মকোদ্দমা আমরা বাধাই নি, বাধালে আমাদের শত্রুপক্ষ মল্লিকরা। আমরা কিছুদিন আগে যে কোলিয়ারিটা কিনেছিলাম—যে কোলিয়ারির আপিসে হিজু আছে এখন—সেই কোলিয়ারিটা মল্লিকেরই নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু টপ ক'রে আমিই কিনে ফেললাম সেটা এদের নামে, সে-ও এক রোমাঞ্চকর ঘটনা, পরে বলব সেটা। মল্লিকের ছিল রাগ, সে এক দলিল বার ক'রে কোলিয়ারিটা ক্লেম ক'রে বসল। আমাদের উকিল ভজহরি সেন অভিজ্ঞ লোক। তিনি বললেন, মকোদ্দমা আমরা জিতবো, মকোদ্দমা লড়বার খরচ খরচাও উশুল হবে, লড়তে হবে কিন্তু। অর্থাৎ হাজার বিশ পঁচিশ টাকার দরকার। রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে গেলাম। তখন আমাদের হাতে শ' পাঁচেক টাকাও নেই। যাঁর কাছ থেকে কোলিয়ারি কিনেছিলাম, গেলাম তাঁর কাছে। তিনি সমস্ত শুনে হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন শুধু। মিনিট দু'তিন কোনও কথাই বললেন না। তারপর বললেন, "মল্লিকের কাছ থেকে আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার নিয়েছি, একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু কোলিয়ারি বাঁধা রেখে ধার নিয়েছি এ কথাটা মিথ্যে। কিন্তু—"

আবার হাসিমুখে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তারপর আর একটু হেসে বললেন, "মল্লিককে দিয়েই দিন না কোলিয়ারিটা, আপনারা যে টাকা দিয়ে কিনেছিলেন, তা সুদসুদ্ধ ফেরৎ পাবেন। ওর যখন ঝোঁক হয়েছে, নিতে দিন ওকে, তা না হলে আমাকে ও বিপদে ফেলবে। বলচে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম ওই কোলিয়ারির আশায়, আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু ও বলছে ওই মর্মে আমি নাকি চিঠি দিয়েছিলাম ওকে, আমার ঠিক মনে নেই অবশ্য···মে বি"

আমি খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম শেষ পর্যন্ত। প্রথমত, আমার আশ্চর্য লাগছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির কাহিনীর সঙ্গে কোলিয়ারি-মল্লিক-ভজহরি-মকোদ্দমা এসবের সম্পর্ক কোথায়—কিন্তু সুখেন্দুকে তা জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, বস্তুত ওর উৎসাহিত অনর্গল বক্তৃতায় বাধা দিতে মায়াই হচ্ছিল। ও এমনভাবে কথাগুলো বলছিল, ওর চোখে মুখে বলবার ভঙ্গিমায় এমন একটা তন্ময় ভাব ফুটে উঠেছিল যে মনে হচ্ছিল ও যেন গল্প বলছে না, স্তোত্র পাঠ করছে।

আমি মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে বা মুচকি হেসে 'ও' 'ও' বলে সায় দেবার ভান করছিলাম বটে কিন্তু বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গল্পের খেইও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে মজার আর আশ্চর্যের বিষয় খেই হারিয়েও যেন হারাই নি! আমার অন্যমনস্ক মন আমার অজ্ঞাতসারেই যেন খেইটা ধরেছিল। কানে যেটা ঢুকছিল না সেটা আমি যেন মনে ক'রে তৈরী ক'রে নিচ্ছিলাম। কেন জানি না, মনে আর একটা জ্যোৎস্নারাত্রির ছবি জাগছিল। অদ্ভুত সে ছবিটা।

···নির্মেঘ আকাশে অনাবিল জ্যোৎস্না উঠেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি নির্জন এক বিরাট প্রান্তরে। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। দিগ্বলয়ে যে সব তরুশ্রেণী সাধারণত তরঙ্গায়িত হয়ে দেখা দেয় স্থূল সূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ রেখায়, তাও যেন নেই। জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ সোজা যেন মাঠে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে! মাঠের মাঝখানে—ঠিক মাঝখানে অদ্ভুত স্তূপের মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। মনে হচ্ছে ভুবনেশ্বরের মন্দির। এখানে কোথা থেকে এল? তারপর মনে হল সেটা কখনও ছোট, কখনও বড় হচ্ছে। আনন্দময় জীবনের মাঝখানে একটা সন্দেহের মতো যেন কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে! হঠাৎ কালো মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল। আলোকিত হয়ে উঠল মন্দির-দ্বার। কালো মন্দিরের গায়ে আলোকের চতুর্ভুজ ফুটে উঠল—আর সেই চতুর্ভুজের বুকে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন রূপসী কিশোরী একটি···মনে হল লক্ষ্মী···

সুখেন্দুর একটা কথা কানের ভিতর ঢুকে হঠাৎ তীরের মত বসে গেল মনে।

"সেই মেয়েটি কেবল বললে কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে—"

"কোন্ মেয়েটি—"

"সেই যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেদিন রাত্রে—"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—"

ভান করলাম আবার। কোন্ মেয়েকে কখন সে কিভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিল তা আমি শুনিই নি মোটে, কিন্তু সে কথা সুখেন্দুকে বলতে পারলাম না।

সুখেন্দু বলতে লাগল—"আমি তার কথায় প্রথমে কানই দিইনি। এক অদৃশ্য হস্ত সেজন্য আমার কানটা মলে দিলে যখন ঘন্টা দুই পরে পিওন চিঠি নিয়ে এল। আশ্চর্য হলাম, আমেরিকা থেকে কে চিঠি লিখতে পারে! চিঠিটা খুলে পড়লাম—যদিও তখন সেই অদৃশ্য হস্ত কান মলছিল আমার—তবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তে হল। মনে পড়ল, আমার মামার এক দূর সম্পর্কের ভাই, আমেরিকা পালিয়েছিল বহুদিন আগে। সে ভিতরে ভিতরে কবে লক্ষপতি হয়েছে, কবে মারা গেছে, কিছুই জানতাম না। আমেরিকা থেকে তার উকিল আমাদের

জানাচ্ছে যে, সে মৃত্যুকালে দশলক্ষ টাকা রাজু, বিজু ও হিজুকে সমভাবে দিয়ে গেছে…। ঠুকে দিলাম মকোদ্দমা। জিতলামও। ভজহরি যা বলেছিল তাই হল।…"

"চিপ্ চিপ্ চিপ্" টিপ্পনি কাটলে সেই অদৃশ্য পোকাটা।

এই রহস্যময় কীটকে ঘিরে আমার মন নতুন একটা স্বপ্নলোক সৃজন করতে যাচ্ছিল কিন্তু পারল না। উপর্যুপরি বাধা পড়ল কয়েকটা। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে নৈশ নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে মোটর বাইকে চড়ে' হিজু হাজির হল এসে, আর তার সঙ্গে প্রফেসার বিজুও। হঠাৎ ভূমিকম্প হলে লোকে যেমন দাপাদাপি করে সুখেন্দু তাই করতে লাগল। রাজু ঘুমুচ্ছিল, উঠে বসল। এর সঙ্গে মিশল এসে একটা গন্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি মৃদুলা নেই। ফুলু নিরুও নেই। তারপর নজরে পড়ল বারান্দার কোণের দিকে তোলা উনুনে মৃদুলা কি যেন ভাজছে মোড়ায় বসে। কাটলেট সম্ভবত। গন্ধটা অন্তত সেইরকম ছেড়েছে।

"আরে বিজু, তুইও এসেছিস, ভালই হয়েছে। মানে, তোর ছুটি যদিও, তবু ভাবলাম পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত আছিস—তা বেশ হয়েছে। এ বাইকটা কার? তোরটাতে তো সাইড্কার ছিল না—"

প্রশ্নটা হিজুকেই করল সুখেন্দু। কিন্তু হিজু এমন ভাব প্রকাশ করল যেন সে বধির। নিপুণভাবে গাড়িটিকে বারান্দার একধারে তুললে, মালকোঁচা খুললে, তারপর আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে একবার। সুখেন্দুর দিকে চাইলেও না।

বিজু এগিয়ে এসে সম্বোধন করলে সুখেন্দুকেই।

"সুখেনদা, একটা ভারী মজার খবর আছে—"

"তুমিতো কেবল মজার খবর নিয়েই মশগুল আছ। কি খবর আনলে আবার!"

"সেদিন ইলেক্ট্রিক কানেকশন কে কেটেছিল জান? কোম্পানি নয়, ইঁদুর!"

"কি রকম—"

"আমি ওদের বিলটা আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে লিখে পাঠালুম যে কানেকশনটা ওরা যেন তাড়াতাড়ি করে দেয়। কলেজ থেকে ফোন করলাম একবার। ওরা বললে—ওরা কানেকশন কাটেনি। মানে ওরাও কাটতে ভুলে গেছল। তারপর একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এনে দেখি—একটা ইঁদুর চিলেকোটার ঘরটায় একটা তার কাটতে গিয়ে নিজেও মরেছে, আর ফিউজও করে দিয়েছে সব—"

"এখন ঠিক হয়ে গেছে তো।"

"হ্যাঁ—"

"বিজু, সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইকটা তুই কোথা থেকে আনলি! চেয়ে আনলি কারো—?"

সুখেন্দু ছাড়বার পাত্র নয়। দ্বিজু কিন্তু অন্যদিকেই চেয়ে রইল, যেন শুনতে পায়নি।

"চিপ্‌, চিপ্‌, চিপ্‌," মন্তব্য করলে পোকাটা আবার।

আমার স্বপ্নটা কিন্তু আর জমল না কিছুক্ষণের জন্য।

"বিজুদা যে আসবে তা আমি জানতাম। কাটলেটের আয়োজন আগে থেকেই ক'রে রেখেছি তাই—"

অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পিছন দিকে কথা কইল মৃদুলা। কথার সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে তার চুলের গন্ধও মিশল খানিকটা এসে। অচেনা গন্ধ, তবু মনে হতে লাগল চেনা-চেনা। জবাকুসুম? কেশরঞ্জন? লক্ষ্মীবিলাস? ম্যাকেসার? না, একটাও না। চেনা, অথচ অচেনা! সুখেন্দু কিন্তু না-ছোড়।

"দ্বিজু এ বাইকটা কোথা পেলি তুই?"

দ্বিজু মুখটা উঁচু ক'রে গলাটা চুলকোতে লাগল।

জবাব দিলে বিজু—"দাদা এটা নতুন কিনেছে।"

"নতুন কিনেছে? নতুন? মানে?"

দ্বিজু পিছন দিকের বারান্দায় চলে গেল।

"কি জানি। এটাতে সাইড্‌কার আছে বলে' বোধ হয়।"

"সাইড্‌কার নিয়ে কি হবে?"

"কি জানি—"

"টাকা কি খোলামকুচি? পুরোনো বাইকটা কি করলে?"

"বেচে দিয়েছে।"

"কততে—"

"সাড়ে পাঁচশ।"

"কিনেছিল ন'শ টাকায়। সাড়ে তিনশ' টাকা এমনভাবে লোকশান করার মানে—? কোথায় গেল দ্বিজু?"

দ্বিজুর পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলাও নিঃশব্দে চলে' গেছে।

"এটার দাম কত—"

"সাড়ে বারোশ'—"

"দ্বিজুই উচ্ছন্ন দেবে সংসারটা। এত টাকা ও পাচ্ছে কোথায়? ব্যাংকের

একাউন্ট তো আমার নামে। ধারে কিনেছে নিশ্চয়। স্বিজু, স্বিজু, কোথা গেলি তুই—"

সুখেন্দু ডাকতে ডাকতে পিছন দিকের বারান্দায় চলে' গেল। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সব। চেয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। একটা নীরব হাসিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যেন চারিদিক।

দুই

দ্বিজেনের কথা

নিরু ঠিক ভাবছে আমি ওর জন্যেই এসেছি। অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি ওর জন্যে আমি আসিনি। দাদার আপিসে যখন বিকেলে গেলাম তখনও জানি না যে এখানে আসব, সুখেনদা যে এখানে পিক্‌নিকের আয়োজন করেছেন, অবনদা যে নিরুকে নিয়ে এসেছেন, এসব কিছুই জানতাম না আমি। সুখেনদা আমাকে খবরটা কেন দেন নি কে জানে! অথচ দাদাকে দিয়েছেন। ভাগ্যে দাদার আপিসে গিয়েছিলাম, আর ভাগ্যে দাদা সাইড্‌কার-ওলা নতুন বাইকটা কিনেছে, তাই এখানে আসা হল। নিরু আসবে জানলে বইটা নিয়ে আসতাম। নিরু লিখেছিল ব্র্যাড্‌লের 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক' প্রবন্ধটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে। আমি যদি তাকে ব্যাপারটা সরলভাবে বুঝিয়ে দিই তা হলে উপকার হয় তার। অর্থাৎ সে আশা করেছিল চিঠি লিখে লিখে বুঝিয়ে দেব তাকে, কিন্তু আমার সময় কই চিঠি লেখবার। এখানে আসব জানলে বইটাই নিয়ে আসতাম। দাদার সাইড্‌কার-ওলা বাইকটাই নিয়ে এল আমাকে, আমি আসি নি। দাদা হঠাৎ সাইড্‌কার-ওলা বাইক কিনে ফেললে কেন? আর একটা কথাও মনে হচ্ছে, তখন লক্ষ্য করিনি এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি আসব বলাতে দাদা সোজাসুজি 'না' বলতে পারলে না যদিও, কিন্তু খুব খুশীও হয় নি। আমাকে বললে, "তুই যেতে চাইছিস, কাল সকালেই তোর কলেজ না? আমার তো ফিরতে ন'টা দশটা বেজে যাবে। তুই কলেজ যাবি কি করে!" আমি হেসে উত্তর দিলাম, "যাব না, না হয়। একদিন কামাই করলে আর কি হয়।" দাদা ভুরু কুঁচকে রইল, কোন উত্তর দিলে না। এখন মনে হচ্ছে, দাদা সাইড্‌কারটা কি মনে মনে আর কারও জন্যে রিজার্ভ ক'রে রেখেছিল নাকি!···চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ। 'চমৎকার' বলছি কারণ ওর চেয়ে ভাল কথা জানা নেই। ভাবতে

আশ্চর্য লাগে যে-রোদ আজ দিনে পৃথিবী পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাই চাঁদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে জ্যোৎস্নায় রূপায়িত হয়েছে। জিনিসটা একই কিন্তু প্রকাশ দু'রকম। একই বিষয় নিয়ে দু'জন কবি যেন দু'টো কবিতা লিখেছেন। নিরুকে এখন কাছে পেলে ভাল হ'ত, 'কবিতার জন্যই কবিতা'—ব্র্যাড্‌লের এই প্রবন্ধের মর্ম ওকে বুঝিয়ে দিতাম। চাকরটা বলল 'টুনটুনি' নদীর ধারে ফুলুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে। খাবার কত দেরি কে জানে! সুখেনদা এত রাত্রে আমার জন্যে পায়রা খুঁজতে বেরিয়েছে শুনলাম। পায়রার মাংস আমার খুব প্রিয় বটে, এ অঞ্চলে পাওয়াও যায় খুব শুনেছি, কিন্তু এতরাত্রে খোঁজাখুঁজির দরকার ছিল না। কিন্তু সুখেনদাকে মানা করবে কে! আমি টিলার উপর এসে বসেছি, ওরা আমাকে খুঁজে পাবে তো! চমৎকার টিলাটা কিন্তু। চারদিকেই ছোট বড় নানা রকম টিলা। এই টিলাটা সব চেয়ে চমৎকার। কে জানে এই সবের তলাতেই কোনও মহেঞ্জোদাড়ো আত্মগোপন ক'রে আছে হয় তো। সুখেনদা জায়গাটা যখন কিনেছিল তখন কিন্তু অনেকে মানা করেছিল। বলেছিল এটা নাকি কোন পাঠান-সেনাপতির আমলে কবরস্থান ছিল। তাঁর হারেমের হাজার কয়েক বেগম নাকি সমাধিস্থ হয়েছিলেন এখানে। সুখেনদা অবশ্য শোনেন নি কিছু। সুখেনদা কারও কথা শোনেন না। জায়গাটা ভালই। এখানে যখনই এসেছি ভাল লেগেছে। ভয় করে নি কখনও। একটা মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি যেন। হারেমের কবরখানা বলেই হয়তো মুক্তির আবহাওয়া চতুর্দিকে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। আকাশে কি উড়ছে ওগুলো? খুব ছোট পাখীর মতো। চকোর? চকোর বলে' সত্যি কোন পাখী আছে কি! আছে। নিশ্চয়, তা না হলে কবিরা লিখেছেন কেন। কিন্তু পরী আছে কি? ডানা-ওলা পরী? কবিরা পরীর কথাও কম লেখেন নি। কবিদের কাব্যলোকে এমন সব খবর থাকে যার বাস্তবে কোনও অস্তিত্বই নেই, অস্তিত্ব থাকবার দরকারও নেই, কিন্তু তবু তারা আছে, চিরকাল থাকবে। বাস্তব জগতে টেরোড্যাক্‌টিল্ ছিল এককালে, এখন নেই। পরীরা কিন্তু বরাবর আছে, বরাবর থাকবে। নিরু যদি থাকত এখন বেশ হত। টুনটুনি নদী কতদূরে এখান থেকে! ওকি, বাইকে চড়ে' দ্বিজুদা চলল কোথায় এখন। নিমাইবাবুর কাছে নাকি? নিশ্চয় নিমাই বাবুর কাছে। যাবে বলছিল…।

তিন

দ্বিজেনের কথা

মোটর বাইক জিনিসটার আর সবই ভালো, একটা দোষ ভয়ানক শব্দ করে। ওতে চড়ে' গোপনে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। বেরুবার মুখেই সুখেনদা ধরে ফেললে। সুখেনদা শুকুল ঠাকুরকে নিয়ে একগাদা পায়রা ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। গরম জল, পেট্রোম্যাক্স নিয়ে হৈ হৈ করছিল দক্ষিণ দিকের মাঠটায়, আমি ভাবলাম এই সময় সরে পড়ি, নিমাই ডাক্তারকে নিয়ে আসি, তারই মারফত কথাটা পাড়ব আজ সুখেনদার কাছে। নিমাই সেনের কথা সুখেনদা ঠেলতে পারবে না। কিন্তু বাইকে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন বিকট আওয়াজ হল—ছি—ছি—ছি—ছি! সুখেনদা ছুটে এলো।

"কোথা বেরুচ্ছিস এখন?"

"নিমাইকে নিয়ে আসি—"

"নিমাইকে পাবি কি এখন! তাছাড়া আমাদের কুলুবে কিনা, বিজু একস্ট্রা হয়েছে, রামধন আর তার মেয়েকে খেতে বলেছি, ফুলুর আসবার কথা ছিল না সে-ও এসে গেছে। শুকুল, কুলুবে তো?"

"মাংস পাঁচ সের আছে। পায়রা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়—আটটা আছে। পায়রায় কম পড়বে। ঘি-ভাতেও কম হবে।"

সুখেনদা অকারণে ধমকে উঠলেন শুকুলকে।

"ঘি-ভাত চড়িয়ে দাও এখুনি। রামধন পায়রা আনছে আরও। সুখিয়াদের বাড়িতে গেছে সে—কম পড়লেই হ'ল!"

"তাদের তো অনেক পায়রা—"

"তবে ভাবছ কেন?"

শুকুল জবাব না দিয়ে কর্তিত-কণ্ঠ পায়রাগুলোকে গরম জলে ডোবাতে লাগল।

সুখেনদা আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বেশী দেরি কোরো না যেন। পায়রার মাংস পনেরো মিনিটে হয়ে যাবে। যাবে আর আসবে।"

সাধারণত আমি মিছে কথা বলতে চাই না, তাই কোন উত্তর না দিয়ে বাইকে সোয়ার হলাম। নিমাইয়ের বাড়ি পৌঁছেই নিমাইকে টপ ক'রে তুলে নিয়ে চলে' আসব এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে হয় কোনও! নিমাই কি একটা

নির্জীব পদার্থ যে তাকে টপ ক'রে তুলে বাইকের পিছনে বেঁধে নিয়ে আসব ? সে ডাক্তার লোক, বাড়িতেই নেই হয়তো ! টেলিগ্রাফ করবার কিম্বা ফোন করবার সুবিধে থাকলে আগে থাকতে তাই করতাম, কিন্তু সে সুবিধে যখন নেই, তখন কপালের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে আজ পূর্ণিমা রাত্রি। পূর্ণিমা রাত্রিতে নিমাই কোথাও বেরুতে চায় না সাধারণত। ছাতের উপর বসে থাকে চুপ ক'রে। ঘুমোয় না শুনেছি। অথচ কবি নয়। আমার সঙ্গে এখানে আসতে চাইবে কি না কে জানে ! তবে জ্যোৎস্না উপভোগ করাই যদি ছাতে বসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে, এই মাঠে, সেটা, আরও ভালভাবে করতে পারবে। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে কি একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিল ও কিছুদিন আগে, তারপর থেকেই এইরকম হয়েছে শুনেছি। নিমাই কবি নয়। বরং একটু কাঠ-খোট্টা ধরনের। বিয়ে করেনি। কলেজে শুনেছিলাম একটা উড়ো খবর, কিন্তু সেটা উড়ো খবরই সম্ভবত। প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাবার ছেলে ও নয়, নামটা যদিও নিমাই। আমার ভয়, নিমাই হয়তো আমার প্রস্তাবে রাজিই হবে না। হয়তো বলবে, সুখেন্দু চাটুজ্যে আমার কথায় ওঠে-বসে বলেই যে তাকে ওঠ-বোস করাতে হবে এর কোন মানে নেই। সে আমাকে ভালবাসে বলেই ওঠ-বোস করে, ভালবাসাটাকে নির্যাতনের অস্ত্র করা উচিত হবে কি ? নিমাই যে ঠিক কি ভাবে জিনিসটা নেবে তা বুঝতেই পারছি না। হয়তো সোৎসাহে রাজি হবে যাবে, কিম্বা হয়তো বলবে, না ভাই, তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যে আমাকে টেনো না, জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে লম্বা বক্তৃতাও দিয়ে দিতে পারে, কিছু বলা যায় না। কিন্তু তাকে আমি রাজি করাবই। না করলে চলবে না। আমি কিছুতেই সুখেনদাকে বলতে পারব না। আর এক সমস্যা হচ্ছে মু। মু-র অভিমতটা কি হবে তাও অনিশ্চিত। নিরুর মারফত জানতে হবে সেটা। নিরু ফুলুকে নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেল, একজনকেও ধরতে পারলাম না। এই সুযোগে, মানে আজ রাত্রেই, মু-কেও কথাটা বলতে পারলে ভাল হয়। তার যদি আপত্তি থাকে তাহলেই তো মুশকিল। তার আপত্তির সঙ্গে সুখেনদার আপত্তি মিলিত হলে বিপত্তি হয়ে দাঁড়াবে সেটা। কিন্তু আন্দাজে মনে হয় মু আমার দিকে। সাইড্‌কার-ওলা মোটর বাইক কেনবার টাকাটা তা না হলে দিত না। টাকাটা দেবার সময় যে মিষ্টি মুচকি হাসিটা হেসেছিল তা সিগ্‌নিফিকান্ট ! আবার আশ্চর্য লাগে, মু টাকা পায় কোথা ! সুখেনদা দেয় নিশ্চয়। কিন্তু সুখেনদাকে যতদূর জানি বাজে খরচ করবার মতো অজস্র টাকা মুকে দেবে তা-ও তো মনে হয় না। মু-র কাছে কিন্তু টাকা চাইলেই পাওয়া যায়। রাজুকে ছ'টা সিল্কের পাঞ্জাবী করিয়ে দিয়েছে, মানে

প্রায় দু'শ টাকার ধাক্কা। সুখেনদা এ নিয়ে খুব চেঁচামেচি করছিল। কিন্তু মনে হ'ল করতে হয় বলে' করছিল, আসলে ম্-র ওপর চটা সুখেনদার পক্ষে অসম্ভব।

চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ কিন্তু। মনে হচ্ছে পৃথিবীর ভিতর থেকেই একটা আলো ফুটে বেরুচ্ছে, জোনাকীর গা থেকে যেমন ফুটে বেরোয়। ছি ছি, কি ভীষণ শব্দ করছে আমার এই গাড়িটা। ফুলুকে সাইড্‌কারে বসিয়ে এক চক্কোর দিয়ে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা আর হবে না দেখছি। অন্যান্য বাধা তো আছেই, ফুলুও রাজি হবে না। এই মাঠটা যদি সমুদ্র হ'ত আর এই বাইকটা হ'ত যদি মোটর-বোট তাহলে···টিলার উপর বসে' আছে একজন। ফুলু নয়, নির্জন মাঠে একা টিলার উপর বসে' থাকার মতো সাহস নেই ওর। কে ও? বিজু এসেছে বোধ হয়। কবি লোক কবিতার মিল খুঁজছে বোধ হয়। জ্যোৎস্নার সঙ্গে কিসের মিল হতে পারে? আমার জানা তো কিছুই নেই। তবে 'চাঁদিনী' বলে' একটা কথা আছে, তার সঙ্গে 'কাঁদিনি' 'বাঁধিনি' মেলান যায় অনায়াসে। কিন্তু সেটা কি সত্যি কথা হবে? সত্যি কথা হচ্ছে 'কেঁদেছি' 'বেঁধেছি'।

চার

নিরুর কথা

বিজুদা আসবে জানলে আমি অন্তত আসতাম না। উপর্যুপরি চারখানা চিঠি লিখেছি—দরকারী চিঠি—পড়া-শোনার ব্যাপারে—কিন্তু একটারও উত্তর দেয়নি। ইস্কুলে মাস্টারি করতে করতে প্রাইভেটে এম-এ দেওয়া যে কি ব্যাপার তা বিজুদার অন্তত বোঝা উচিত। একটারও উত্তর দিলে না কি বলে! 'আর্ট ফর আর্টস সেক্' 'পোইট্রি ফর পোইট্রিজ সেক্' সোজাসুজি সংক্ষেপে বোঝা যায়। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষককে আমার সেই সংক্ষেপে বোঝাটা বিস্তৃত ক'রে বোঝাই কি ক'রে! আর সেই বোঝানর উপরই নির্ভর করছে নম্বর, মানে ডিগ্রী। বেশ খানিকটা লিখতে হবে আর সে লেখাটা আবোল তাবোল হলে চলবে না। আসলে ওসব ব্যাপারে আবোল তাবোলই বকে সবাই কিন্তু সেটাকে এমন একটা ভদ্র চেহারা দিতে হয় যাতে লোকে মনে করে জ্ঞানগর্ভ কিছু বলা হল বুঝি। বিজুদাকে অত ক'রে অত বার লিখলাম যে সোজা ক'রে লিখে দাও কিছু, মুখস্থ ক'রে ফেলি। উত্তর দিলে না। ওর সামনে বসে' থাকা যায় কখনও? ফুলু আসাতে সুবিধে

হয়েছে। অসুবিধেও হয়েছে। ও এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করেছে যা দুরূহ ঠিক নয়, কিন্তু এখানে—এই টুনটুনি নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাত্রে বেমানান। কিন্তু ও ছাড়বে না। ব্যাগে করে নিয়ে এসেছে সব, এমন কি টর্চ পর্যন্ত। এত লোক থাকতে আমাকেই বা এ বিষয়ে পারদর্শী ঠাওরালে কেন ও কে জানে! ফুলুকে চটাতেও চাই না, ওর দাদার কাছ থেকে বই আদায় করতে হবে কয়েকখানা। ব্র্যাড্লের বইখানা ওর দাদাই দিয়েছে।

"দেখ না নিরুদি, তুমি কি ভাবছ বল দেখি জলের দিকে চেয়ে চেয়ে।"

ফুলু বই খুলে তার উপর টর্চের আলো ফেলেছে।

"আমি এই পানি-শঙ্খ প্যাটার্নটা করতে চাই। ভাল হবে না? গোট-বরফিট কিন্তু আরও ঠাস মনে হচ্ছে নয়?"

"কি করবে তুমি—"

"সোয়েটার। কাউকে বোলো না যেন।"

"তাহলে গোট-বরফি কর।"

"পানি-শঙ্খ নামটা কিন্তু বেশ। নামটার জন্যেই করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওটা। পানি-শঙ্খ বেশ নামটা, নয়?"

"হ্যাঁ, বেশ। পানি-শঙ্খও খারাপ হবে না—"

পানি-শঙ্খ খারাপ হবে কি হবে না, তা আমার জানা নেই, কখনও করিনি, দেখিনিও। কিন্তু ফুলুকে চটাতে চাই না।

"আচ্ছা, কি রং মানাবে বলতো? ফিকে সোনালী, না, ফিকে সবুজ? না বাদামী—"

"কে পরবে, মেয়ে না পুরুষ?"

ফুলু চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ, তার পরে বলল, "পুরুষ। বোলো-না যেন কাউকে"—মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপলে একটু।

"পুরুষদের বাদামী বা ছাই ছাই রঙ মানাবে—"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। বাদামীই করি তাহলে। কি বল?"

"কর। উল কেনা হয়েছে?"

"হয়েছে, তিন রকমই কিনেছি। সঙ্গে এনেওছি।"

"ও—"

"পানি-শঙ্খই করি তাহলে, কি বল। আজই শুরু করি—"

"এখানে কোথা বুনবে?"

"রামধনদের ওখানে যাই চল। বেশ, নিরিবিলি ওখানটা। তাই চল নিরুদি।"

ফুলু আমাকে দিদি বলে কিন্তু ও আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়। প্রথম যখন বলেছিল গা জ্বলে গিয়েছিল। কিন্তু অমন অনেক গাত্রদাহ সহ্য করতে হয়েছে জীবনে। মধ্যবিত্তদের সহ্য করতে হয়। রোজ যখন স্কুলে যাই ডাইনে বামে পিছনে সামনে মোটরগাড়ির হর্ন আর পথচারী জনতার হ্যাংলা চাউনি—শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও। মেয়েরা মেয়েদের আরও খুঁটিয়ে দেখে, সে দেখার মধ্যে ঈর্ষাই থাকে না সব সময়ে, হ্যাংলামিও দেখেছি—এসব তো সহ্য করতেই হয় রোজ। করুণাদির কথাটা মনে পড়ে, করুণাদি বলত যার যত সয়, তার তত জয়। করুণাদি যদিও জয়লাভ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত, সকলের জন্য সহ্য করতে করতে যক্ষ্মাই হল বেচারার। স্যানাটোরিয়মে যেদিন মারা যায় সেদিন কাছেও কেউ ছিল না। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ওই রকমই হয়। করুণাদি যদিও হেরে গেছে কিন্তু করুণাদির কথার দাম একটুও কমেনি সেজন্য। "যার যত সয়, তার তত জয়"—বহুমূল্য কথা এটা। নিজের জীবনেই বুঝতে পারছি। পিসীমার লাথি ঝাঁটা সহ্য না করলে কি পড়াশোনা হ'ত কিছু? আজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকতে হ'ত!

"জলের দিকে অমন ক'রে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ তুমি নিরুদি—"

"দেখছি দিনের আলোয় যে টুনটুনিকে গরীবের মেয়ের মতো দেখায়, চাঁদের আলোয় সেই টুনটুনিকে রাজার মেয়ের মতো দেখাচ্ছে।"

"তা দেখাক, চল আমরা রামধনের বাড়িতে যাই। তোমার কাছেই শুরু করি সোয়েটারটা।"

"আমার তো রামধনের সঙ্গে আলাপ নেই মোটে। যাওয়া কি ঠিক হবে? তার স্ত্রীর শরীরও খারাপ শুনলাম—"

"তাতে কি হয়েছে। আমাকে খুব খাতির করে ওরা। আমার বাবার খুব অনুগত কিনা। বাবার আণ্ডারেই রামধন কাজ করে তো। গেলে খুব খুশি হবে।"

কি বলব, চুপ ক'রে রইলাম। সোজাসুজি 'না' বলবার ক্ষমতা নেই, ফুলুর দাদার বইগুলো না পেলে পরীক্ষাই দেওয়া হবে না আমার। অথচ উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে, এই নদীর ধারে—। ফুলুটাকে সঙ্গে না আনলেই হ'ত। বড়লোকের মেয়ে তো, অত্যন্ত একগুঁয়ে। যেটা ধরবে সহজে ছাড়বে না। এখন এখানে এসে সোয়েটার বোনবার মানে হয় কোনও?

"রামধন কি কাজ করে তোমার বাবার আণ্ডারে—"

"বুলি খাটায় সম্ভবত। এই কাছেই কোথায় রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বাবা সেটার কনট্র্যাক্ট্ নিয়েছেন কিনা, সুখেনবাবুরও শেয়ার আছে তাতে শুনেছি। সুখেন-বাবুই রামধনকে নিয়ে গিয়েছিলেন একদিন।"

হঠাৎ ফুলু থেমে গেল।

"সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছ তুমি নিরুদি—?"

"সিগারেটের? হ্যাঁ, পাচ্ছি তো।"

সত্যিই একটা মিষ্টি সিগারেটের গন্ধ কখন যে ধীরে ধীরে এসে আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, টেরই পাইনি আমরা। সিগারেটের এ গন্ধটা চেনা, অত্যন্ত চেনা, অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে গন্ধটার সঙ্গে, বিজুদা এসেছে নিশ্চয়। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, কাউকে দেখা গেল না। নদীর পাড়টা এক জায়গায় হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে, ওর আড়ালে বসে' আছে নাকি কেউ। বিজুদা কি? গন্ধটা বিজুদার সিগারেটের। অত্যন্ত চেনা গন্ধ। বিজুদা যদি এসে থাকে উঠতে হবে এখান থেকে। কথা বলব না ওর সঙ্গে।

ফুলু চুপিচুপি বললে—"একটা কথা জানো নিরুদি? এ জায়গাটা নাকি ভুতুড়ে। কবরস্থান ছিল নাকি এককালে। ভয় করছে আমার, চল উঠি এখান থেকে—"

উঠলাম কিন্তু যেতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে। এদিক ওদিক চাইলাম আবার। কেউ নেই।

"চল, ওদিকে যাচ্ছ কোথা। রামধনের বাড়ি এদিকে—"

আমি কিন্তু যাচ্ছিলাম নদীর পাড়টা হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠেছে যেখানে সেই দিকে। কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। উঁচুটার আড়ালে বসে' আছে একজন।

"কে, বিজুদা নাকি—"

"না, আমি।"

"ও রাজু? তুমি এখানে একা বসে' কেন?"

"এমনি। খাওয়ার দেরি আছে দেখে ভাবলাম বেড়িয়ে আসি একটু। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে আজ, নয়?"

"হ্যাঁ।"

ফুলু বললে—"যদি কেউ খুঁজতে আসে বোলো আমরা রামধনের বাড়িতে গেছি।"

"আচ্ছা—"

পাঁচ

রাজেনের কথা

নিরুদি দেখতে পেয়েছে কি? কথাটা বিজুদার কানে যদি তুলে দেয় তাহলেই মুশকিল হবে। লোভ সামলাতে পারলাম না কিছুতে। নাইন নাইন নাইন আজকাল তো দেখাই যায় না বাজারে, বিজুদা পেলে কোথা থেকে! বিজুদা অনেক সন্ধান রাখে। আমার বিশ্বাস ওই যে অ্যামেরিকান সাহেবটা বিজুদার কাছে আসে সে-ই সন্ধান দিয়েছে। আমাদের হোস্টেলের কাছে যে দোকানটা আছে সেটা অতি বাজে। পছন্দমত জিনিস একটাও পাওয়া যায় না। কুইংক্ রাখে না। কোবরা পালিশ নেই। যা চাও তাই বলে নেই। বিজুদা কি টের পাবে? বেশী সরাই নি, গুটি চারেক মাত্র। নিরুদি যদি দেখতে পেয়ে থাকে ঠিক বিজুদাকে বলে দেবে। দু'জনে ভাব খুব। বলবে কি? বলুক গে। মু আছে সামলে দেবে ঠিক। মু জানে আমি স্মোক করি। কিন্তু চুরি করেছি শুনলে চটে যাবে হয়তো। কিন্তু মুশকিল, চটলে বোঝা যাবে না। হাসবে শুধু মুচকি মুচকি, তর্জনীটা তুলে শাসাবে হয়তো দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে, আর হাসবে, বোঝা যাবে না চটেছে। না বোঝা যাক সামলে দেবে তবু। আমাকে আজ খবরের কাগজটা পড়তে দিলে না কেন বুঝলাম না। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে ফেললে। খেলার খবরটা দেখাই হয়নি আজ। মোসাদেকেরই বা কি হ'ল কে জানে। কাশ্মীরের আবদাল্লা যে শেষ পর্যন্ত আলিবাবার আবদাল্লা হয়ে যাবে কে জানত। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ধরেছিলেন কিন্তু ঠিক। মু আমাকে কাগজটা পড়তে দিলে না কেন! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে কিছু। ও, বুঝেছি! মু বাজিতে হেরেছে বোধ হয়। ঠিক হেরেছে। আমি বলেছিলাম ইস্টবেঙ্গল এবারও জিতবে, মু বলেছিল হারবে। চার পাঁচ দিন থেকে কোলকাতা ছাড়া, কোলকাতার কোন খবর পাইনি। কাল খেলাটা হয়ে গেছে। আজকের কাগজে খবরটা আছে বোধ হয়। সেইজন্যই মু দিলে না কাগজটা। নগদ দশটি টাকা গুণে দিতে হবে, আমি ছাড়ছি না। দেখতে হবে কাগজটা। কে আসছে? ওরে বাবা, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়। বিজুদা!

"কে রাজু নাকি? এখানে কি করছিস?"

"এমনি বেড়াচ্ছি—"

"এদিকে নিরু এসেছিল, দেখেছিস তাকে ?"

"নিরুদি আর ফুলুদি এইখানেই ছিল। রামধনের বাড়িতে গেল বোধ হয়।"

"রামধনের বাড়িতে ? কেন ?"

"জানি না তো।"

"তুই গিয়ে নিরুকে পাঠিয়ে দে একবার আমার কাছে। তার সঙ্গে দরকার আছে একটু।"

"এইখানেই পাঠিয়ে দেব ?"

"আমি ওই টিলাটার উপর বসছি।"

"আচ্ছা—"

বাঁচা গেল! নিরুদির সঙ্গে কি দরকার বিজুদার। নিশ্চয়ই নিরুদি কিছু বুঝতে চেয়েছে বিজুদার কাছে। আর একদিনও এসেছিল আমাদের বাড়িতে। এসব বোঝাবুঝির আড়ালে আর কিছু নেই তো। ওরা সব বেরালের জাত, অন্যমনস্ক হলেই পাত থেকে মাছটি তুলে নেবে, একটু খাতির করবে না। আর বিজুদা যে রকম ভাবে-ভোলা লোক—।

ছয়

অবনীশের কথা

পায়রাগুলোর ব্যবস্থা ক'রে সুখেন আবার এসে বসেছিল আমার কাছে। আবার শুরু করেছিল তার গল্প। খাপছাড়া ভাবে মাঝখান থেকেই শুরু করেছিল। মঞ্জুলার অনুরোধে গোটা দুই কাটলেট খেয়ে পূবদিকের বারান্দার কোণে ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে পড়েছিলাম, এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে আমার পায়ের উপর পড়েছিল। ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম একটু, মানে চোখ বুজে পড়ে' ছিলাম, মনে হচ্ছিল একটু যেন নেশা হয়েছে, কিসের নেশা তা বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, উপভোগ করছিলাম সেটা। একটা সূক্ষ্ম জাল, সুতোর নয়, আলোর, নানা রঙের আলোর—আমার চারিদিকে যেন মূর্ত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। আমি অস্পষ্ট ভাবে ভাববার চেষ্টা করছিলাম উর্ণনাভটি আমি স্বয়ং না আর কেউ। এমন সময় সুখেন হাজির হল।

"অবন ঘুমুলি নাকি—"

"না। পারাবত পর্ব শেষ হল তোমার ?"

"হয়েছে। জিরে গোলমরিচটা বাটা হলেই চড়িয়ে দেব এইবার। শুকুলই দেবে। আমি ততক্ষণ গল্পটা শোনাই তোকে। ছেলে-মেয়েগুলো বেরিয়ে গেছে, ভালই হয়েছে। কতদূর বলেছি বলতো—"

"সেই যে কোন মেয়েকে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু এইখানে একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার কৃতিত্ব ওই কুড়িয়ে-পাওয়া পর্যন্ত। আর কিছু আমি করিনি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই কুড়িয়ে পাওয়াটাও আমার কৃতিত্ব কিনা সন্দেহ আছে। আমিই ওকে দেখতে পাব এইটে হয়তো আগে থাকতেই ঠিক হয়েছিল, আর সেই জন্যেই বোধ হয় রঘু ডোমের কাছে শূয়োরের দাঁত পেলাম না, যেতে হল আমাকে তেজপুরে শিবুর কাছে। ভাগ্যে সেবার পুজো ছিল দেরিতে, তাই শূয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়িটি বসাতে পেরেছিলেন মামী। আমি উর্ধ্বশ্বাসে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট্ করছিলাম—আমাদের গ্রামের সেই বাগানটা দেখেছিস ? সেই যে-বাগানটায় কহিতুর আমের গাছ ছিল একটা, তোকে খাইয়েছি তো সে আম, মনে নেই ? এত ভুলে যাস্ তুই ?"

হঠাৎ আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে সুখেন।

"আমের কথা মনে আছে। শূয়োরের দাঁতের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

"পারবে কি ক'রে! শহরে শহরে কাটিয়েছ চিরটাকাল, লক্ষ্মীপুজোর ব্যাপার খুঁটিয়ে জান না। জানলে বুঝতে।"

"ও, লক্ষ্মীপুজোয় শূয়োরের দাঁত লাগে বুঝি—"

"হ্যাঁ। বেড়ের মাঝখানে দিতে হয়! তার উপর বসাতে হয় ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি। আমার কি মনে হয় জানিস্ ? আমাদের পুজোগুলোর মধ্যে মানব-সভ্যতার, আজকালকার ভাষায় প্রগতির, ইতিহাস লুকোনো আছে। শূয়োরের দাঁতের উপর ফল-মিষ্টান্নের হাঁড়ি বসানো মানে শত্রুকে জয় করে লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করা। ওটা ছেলেখেলাও নয়, ননসেন্সও নয়। লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে পশুকে জয় করা চাই, ওটা, মানে শূয়োরের দাঁতটা হল আমাদের সেই পশু-জয়ের প্রতীক। এটা আমার থিয়োরি অবশ্য, মানা না-মানা তোমার ইচ্ছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম বাগানের ভিতর দিয়ে যখন শর্টকাট্ করছিলাম, তখন প্রথম চোখ দুটো দেখতে পাই। ছোট ছোট দুটো পূর্ণিমার চাঁদ, বা এক জোড়া দামী বৈদূর্যমণি, এখন নানারকম উপমা দিতে পারি, কিন্তু তখন মনে হয়েছিল বন-বেরালের চোখ, অন্ধকারে জলছে। লক্ষ্মী-প্যাঁচা বলে বুঝতেই পারি নি তখন, এক ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম তখন, ভয়ে। কিন্তু আমার স্বভাব তো জানিসই, কোন জিনিসকে তলিয়ে না দেখা পর্যন্ত শান্তি

পাই না। তলিয়ে দেখতে গিয়েই ব্যাপারটা ঘটে গেল। কিন্তু তারপর আমার আর কোন হাত নেই। মামা মামী দুজনেই কিন্তু সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। মামীর মতে আমি যদি ওই কুড়োনো মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়েই বলতাম—নিজে বরাবর ওকে 'কুড়ুনী' বলেই ডাকতেন তিনি—তাহলে ব্যাপারটা এমন জট পাকাত না। জট পাকিয়ে গেছেন অবশ্য তিনিই বেশি, তিনি মুখে বলতেন কুড়ুনী, কিন্তু মনে মনে জানতেন অন্যরকম। বাইরে বকতেন, মারতেন, মুখে চব্বিশ-ঘন্টা দাঁতে চিবিয়ে রাখতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয় করতেন, ভক্তি করতেন। আমি একদিন স্বচক্ষে যা দেখেছিলাম তা অদ্ভুত। অদ্ভুত—"

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু। আমার চারিদিকে, মানে আমার সমস্ত সত্তাকে ঘিরে, যে জালটা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল সেটাও যেন থেমে গেল। সেটাও যেন কথা কইছিল আমার কানে কানে সূক্ষ্ম বর্ণের ভাষায়। চেয়ে দেখলাম, সুখেন্দু দিগ্বলয়ের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে। সেখানে ময়ূরপঙ্খী নেই, একটা ছোট শাদা মেঘ, খুব ছোট, একা ভেসে বেড়াচ্ছে। সে-ও যেন মহাশূন্যের জ্যোৎস্নালোকিত মহিমায় অদ্ভুত কিছুর সন্ধান করছে। বড় ছিল, ছোট হয়ে গেছে, ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

"কি দেখলুম জানিস্?"—সুখেন্দু অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু করল আবার—"দেখলুম সেই কুড়ুনী মেয়েটাকে, যাকে তিনি সমস্ত দিন খাটাতেন, বাসন মাজাতেন, ঘর ঝাড়ু দেওয়াতেন, কাপড় কাচাতেন, অষ্টপ্রহর যাকে দূর দূর করতেন, মর মর করতেন, সেই মেয়েটাকে প্রণাম করছেন গলবস্ত্র হয়ে। গভীর রাত, ছম ছম করছে চারিদিক, মিট মিট করছে ঘরের প্রদীপ, মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে তার গালে কপালে, আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার ধারে চোরের মতো। মামী বসে আছেন মেজেতে হাতজোড় করে, হাঁটু গেড়ে। প্রণাম করছেন বারবার। ঘুমন্ত মেয়েটার মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত একটা হাসি, মেঘচাপা জ্যোৎস্নার মতো। আমি চোরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি নির্বাক হয়ে। অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত। অথচ ওই মানুষই দিনের বেলায় কি কাণ্ডই করতেন, যেন ওই কুড়োনো মেয়েটা আপদ বালাই, দূর হয়ে গেলে যেন হাড় জুড়োয় ওঁর। আসল কথা জানিস? নজরে বিশ্বাস করতেন মামী। ধরতে পারলি কথাটা—"

পারলাম কিনা তা ব্যক্ত করবার মুখেই বাধা পড়ল। রামধন দাঁড়াল এসে।

"পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনটা চাইলেন ফুলুদিদি।"

"ফুলুদিদি কোথা?"

"আমার বাড়িতে।"

"আর কে আছে?"

"নিরুদিদি।"

"পেট্রোম্যাক্স নিয়ে কি করবে এখন?"

"কি একটা বই পড়ছেন। আমার লণ্ঠনটায় তেল নেই।"

"ও, আচ্ছা নিয়ে যাও। দাঁড়াও, জেলেই দিই আমি। সেবার জ্বালতে গিয়ে ম্যানটেলটি ভেঙেছিল রাজু।"

উঠে গেল সুখেন। আবার তন্দ্রা এল। তন্দ্রায় মনের ভিতর ঝড় বইতে লাগল। আঁধি। ধুলো উড়তে লাগল। মনের ভিতর কত দিনের কত আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছিল, সব উড়তে লাগল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বরাহ শিকারীর দল কলরব করতে লাগল একযোগে। মনে হল, ঝড়ের ওপারে ডাইনীর দল বসে' আছে বিষাক্ত দৃষ্টির ফাঁদ পেতে সত্য-শিব-সুন্দরকে ধরবে বলে', মারবে বলে'। সত্য-শিব-সুন্দর কুৎসিতের বেশ ধরেছে, মুখোশ পরে পার হয়ে যাচ্ছে ফাঁদ, এড়িয়ে যাচ্ছে ডাইনিকে। ভণ্ডামির নৌকোয় পার হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দর···ঝড়ে নৌকো ডুবে গেল···অপার সমুদ্রে ভাসছে সত্য-শিব-সুন্দর···ঝড় প্রবলতর হচ্ছে ···ঢেউগুলো উত্তাল···তারপর কেবল ঝড় ঝড় ঝড়। হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরেও ঝড় উঠেছে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলাম। সুখেন পেট্রোম্যাক্স জেলেছে। জানালা দিয়ে প্রখর আলো পড়েছে এক ঝলক বারান্দায়। জ্যোৎস্না পালিয়েছে।

মৃদুলার গলা পেলাম।

"কার গল্প শোনাচ্ছ তুমি অবনীশবাবুকে—"

"ও একটা ভুতুড়ে গল্প। কফি করতে বললাম যে, তার কি হল?"

"হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

রামধন পেট্রোম্যাক্স নিয়ে চলে গেল। জ্যোৎস্না ফিরে এল আবার। তারপর একটা চাকর এসে তেপায়া রেখে গেল একটা আমার সামনে। তারপর কফি নিয়ে এল এক পেয়ালা। মৃদুলা নয়, চাকরটা। তারপর সুখেন এল আবার। হাতে কফির কাপ।

"কফিটা বড্ড কড়া হয়েছে।"

"কড়া কফিই ভাল লাগে আমার।"

"আশ্চর্য, মৃদুলাও ঠিক ওই কথা বললে। নিরুর কাছে খবর পেয়েছে বোধ হয়—"

নীরবে কফি পান শেষ করলাম দুজনে।

কাপটা সন্তর্পণে এককোণে রেখে সুখেন্দু জিগ্যেস করলে, "নজরে বিশ্বাস করিস তুই—?"

"করি বোধ হয়। একবার ভাল একটা বুল টেরিয়ার পুষেছিলাম, সবাই নজর দিত কুকুরটার উপর, মরে গেল সেটা হঠাৎ একদিন।"

"মামীমাও করতেন, তাই ওই মেয়েটা যে কে, তা বুঝতে দিতে চাইতেন না কাউকে। এমন কি মেয়েটাকেও না। কিন্তু সেদিন ওর ঘুমন্ত মুখে হাসিটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল মেয়েটা জানে, তাকে মামী ফাঁকি দিতে পারেন নি।"

ঠিক এই সময় সেই গন্ধটা পেলাম আবার। চেনা অথচ অচেনা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম মৃদুলা আমার পিছনদিকের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সোজা মাঠের মধ্যে নেমে গেল।

"তুই আবার কোথা চল্লি। রামধনের বাড়িতে নাকি?"

"না, আমি কোথাও যাচ্ছি না।"

ঘাড় ফিরিয়ে কথাগুলি বলে' মৃদুলা চলতেই লাগল কিন্তু। থামল গিয়ে, হাতাটা শেষ হয়েছে যেখানে সেইখানে। থেমে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে। যেন কারো অপেক্ষা করছে। সুখেন বোধ হয় আবার গল্পটাই শুরু করতে যাচ্ছিল কিন্তু থামের আড়াল থেকে শুকুল ঠাকুর গলা খাঁকারি দিলে সন্তর্পণে।

"কি শুকুল? পায়রাটা চড়িয়ে দিয়েছ?"

"দিয়েছি। এখনি হয়ে যাবে। কিন্তু খাওয়া হবে কিসে?"

"কেন, অত কলাগাছ রয়েছে, পাতা কাটতে বল ভজুয়াকে।"

"ভজুয়া কাটতে যাচ্ছিল, কিন্তু দিদি মানা করলে।"

"দিদি মানে মৃ?"

"হ্যাঁ—"

"ও, আচ্ছা থাক, কেটো না তাহলে। মৃ-কে জিগ্যেস করছি আমি—"

শুকুল চলে গেল। আমরা দুজনে মৃদুলার দিকে চাইলাম। আমার মনে হতে লাগল, জ্যোৎস্না, কুয়াশা, আর আমার চোখের ভুল মিলে যে জিনিসটা মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাতার ওপারে, তা মৃদুলা নয়, তা আর ফিরবেও না। যে ফিরে এসে আমরা কিসে খাব তার সমাধান করবে সে মৃদুলা হয়তো, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তাকে নিয়ে মন মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। সুখেনের কপালের চামড়া কুঁচকে ছিল কিনা তা আবছা আলোতে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ওর চোখ দুটোতে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল তা অবর্ণনীয়, মাদাম ক্যুরি প্রথম যখন তার আবিষ্কৃত রেডিয়মের দিকে চেয়েছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতেও এই রকম

একটা ভাব ফুটেছিল সম্ভবত। কয়েক সেকেণ্ড নির্নিমেষে চেয়ে রইল সুখেন। তারপর আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে হাত দুটো ওলটালে।

"কিছু একটা মতলব আছে ওর। আমি আর মাথা ঘামাব না তাহলে, ও যখন ঘামাচ্ছে আমার ঘামিয়ে লাভ নেই। গল্পটাই আরম্ভ করা যাক বরং—"

"তাই কর।"

"সেই কুড়োনো-মেয়েটাকে কুড়োনো মেয়ে না ভেবে আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম এবং সেটা মামীর কাছে ব্যক্ত করেছিলাম, এতেই মামী প্রকাশ্যে চটেছিলেন আমার উপর এবং মেয়েটা যে সত্যিই একটা আপদ এসে জুটে গেল এ কথাটা দিবালোকে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করতেও ছাড়ে নি। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর কি ছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি একদিন। বললাম তোকে এক্ষুণি। মেয়েটির সম্বন্ধে মামীর বাইরের অশ্রদ্ধা এবং ভিতরের শ্রদ্ধা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তাতে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন মামা। তিনি মামীর শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা দুটোরই আভাস পেতেন, ঠিক করতে পারতেন না নিজে কি করবেন। ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও মামী বকতেন, খারাপ ব্যবহার করলেও বকতেন, নির্বিকার থাকলে বলতেন, তুমি মানুষ না পাথর। ফলে মামা আমার উপর চটে' গেলেন, ভাবলেন আমিই এই বিপদ জুটিয়েছি। তারপর ফেল করেছিলাম সেবার, তাই মামার চোখের দৃষ্টি কটমট থেকে কটমট-তর হ'য়ে উঠত মাঝে মাঝে। পরে অবশ্য তিনিও আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন, যখন ভালবেসে ফেললেন মেয়েটাকে, বুঝেছিলেন যে লক্ষ্মী যখন আসেন শোরগোল ক'রে আসেন না, চুপি চুপি অলক্ষ্যে আসেন নারিকেল-ফলাম্বুবৎ, বুঝেছিলেন যে, আমি নিমিত্তমাত্র, ও আসতই। তাই শেষের দিকে তার চোখের দৃষ্টি আর কটমট তো ছিলই না, কোমল হয়ে এসেছিল রীতিমত, সে দৃষ্টি যেন বলত, বাবা সুখেন দীর্ঘজীবী হ' তুই। তিনি যে মেয়েটাকে ভালবেসেছিলেন তা বোঝা গেল যখন বছর চারেক পরে ওই কুড়োনো মেয়ের এক পিসেমশাই হাজির হল এসে। শূয়োরের মত দেখতে। এসে বললে শ্রীদামগঞ্জে লক্ষ্মী পূজোর মেলা দেখতে ওর পিসিমা ওকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে, মেলায় ও হারিয়ে যায়। লোক-মুখে শুনলাম আপনারা নাকি মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন একটি, ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শুনে মামা বললেন, ও আমাদের ঘরের মেয়ে হয়ে গেছে, ওকে এখন আমরা ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন। পিসেমশায় বললেন, আমি ওকে নিয়েই যেতে চাই। ওর মা-বাবা মারা যাবার পর ওর পিসীই ওকে মানুষ করেছিল কিনা। এর উত্তরে মামা সংক্ষেপে বললেন, আমরা ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না,

মাপ করবেন। লোকটা চলে গেল। কিন্তু গিয়ে মকোদ্দমা ঠুকে দিলে একটা মামার নামে। উকিল ভজহরি সেন সব শুনে মাথায় হাত বুলুলে কয়েকবার চোখ বুজে, তারপরে বললে, আমরা জিতব। কিন্তু লড়তে হবে, টাকা খরচ হবে। মামার তখন হাত খালি। দোকানটি ফেল মেরেছে। কুড়োনো মেয়েকে নিয়ে মকোদ্দমা বেধেছে শুনে মামী তো ক্ষেপে গেলেন। মেয়েটাকে দিনের বেলা এমনভাবে দাঁতে চিবোতেন যেন কাটোয়ার ডাঁটা চিবুচ্ছেন, আর রাতের বেলা, হাত জোড় ক'রে প্রণাম করতেন। আমি মজা দেখতাম লুকিয়ে লুকিয়ে। ভজহরির মতি বদলে গেল হঠাৎ। বললে কুছ পরোয়া নেই, ফি দিতে হবে না আমাকে, আমি এমনিই খাটব। খাটতে লাগলেন। আমার বয়স তখন বছর চোদ্দ কি পনের। ভজহরি একটা ঠিকানা দিয়ে আমাকে বললেন, একটি কাজ করতে হবে বাবা তোমাকে। তুমি এই ঠিকানায় চলে যাও, চলে গিয়ে মেয়েটির মা বাপের নাম আর ওদের কুল-পরিচয় সংগ্রহ ক'রে আন। পিসেমশায়ের খবরও যদি কিছু পাও নিয়ে এস সংগ্রহ ক'রে। গেলাম। তখনই জানলাম যে মেয়েটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। মহাদেব মুকুজ্যে ওর বাপের নাম। মহাদেব মুকুজ্যে আর তার বউ শৈলবালা একদিনে একসঙ্গে কলেরায় মারা গেল যখন, পিসেমশায় বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর ঘাড়ে মেয়েটা তখন পড়ে' গেল। বছরখানেক বয়স তখন ওর। বটুকেশ্বরের স্ত্রী ছিল না, ছিল একটি রক্ষিতা। শুনলাম দুজনে মিলে মদ খেত, আর ঠ্যাঙাতো ওই কচি মেয়েটাকে। জুতো পেটা করত শুনলাম। শ্রীদামগঞ্জের মেলায় ওকে এনেছিল বিক্রি করবার জন্যে। তারিণী বাগদীর বাঁজা বউ (নবিগঞ্জে বাড়ি তাদের, মাইলখানেক দূরে) কিনতে চেয়েছিল মেয়েটাকে নগদ কুড়ি টাকা দিয়ে। পাড়ার লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শ্রীদামগঞ্জের মেলায় বেচা-কেনা হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু মেলার ভিড়ে মেয়েটা গেল হারিয়ে। হঠাৎ উবে গেল যেন, আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। যে মেয়েকে বটুক অমন ক'রে বাড়ি থেকে বিদেয় করতে চাইছিল, তাকেই ফিরে পাওয়ার জন্যে আবার মকোদ্দমা করছে কেন, এ রহস্যের সমাধান ক'রে এলাম আমি। মেয়েটাকে বিদেয় ক'রে দেওয়ার পর থেকে হাড়ির হাল শুরু হয়েছিল বটুকেশ্বর গাঙ্গুলীর। কাত্যায়ণীর, মানে সেই রক্ষিতাটির কুষ্ঠ হল, দেনার দায়ে জমিগুলো নীলামে উঠল, লিবারে ব্যথা হতে লাগল বটুকের, ডাক্তাররা পয়সা লুটতে লাগল। এমন সময় এল পাঞ্জাবী গনৎকার। সে বটুকেশ্বরের হাত দেখে বললে—তোমার ঘরে লক্ষ্মী এসেছিলেন, তুমি জুতো মেরে তাঁকে বিদেয় করেছ, তাই তোমার এই দুর্দশা। তুমি আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তাহলেই লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসবে তোমার। বটুকেশ্বর তাই

খুঁজে খুঁজে এসেছিল। সমস্ত শুনে উকিল ভজহরি সেন আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবাস। পাঠালেন তখন নিজের মুহুরি সনাতন ভটচাজকে। সনাতন সাক্ষীসাবুদ যোগাড় ক'রে একেবারে পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা ক'রে এল। ভজহরি খুঁজেপেতে মহাদেব মুকুজ্যের সঙ্গে আমার মামার এক সম্পর্ক বার করলেন, একটা জাল চিঠিও তৈরি করলেন। সে চিঠিতে লেখা ছিল যে, তাঁদের অবর্তমানে মামা যদি মেয়েটির ভার নেন তাহলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন, কারণ ডাক্তার বলছে যে তাঁদের আর বাঁচবার আশা নেই। চিঠিটা এমনভাবে লেখা ছিল যেন মহাদেব মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে শুয়ে চিঠিটা লিখিয়েছিলেন শ্যামলাল মিত্তিরকে দিয়ে। মাত্র পঁচিশ টাকা নিয়ে শ্যামলাল আদালতে এসে এই মিথ্যে কথাটি বলে গেল। তারিণী বাগদির বাঁজা বউও এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে গেল। সত্য কথাটা বলবার জন্যে অবশ্য টাকা দিতে হল তাকে। মকোদ্দমায় জিতলেন ভজহরি। বটুকেশ্বর গলায় দড়ি দিলেন, কাত্যায়ণী আশ্রয় নিলেন এক কুষ্ঠাশ্রমে। শুনেছি এখনও বেঁচে আছেন তিনি। শুয়োর বধ হ'ল, তারপর তার দাঁতের উপর লক্ষ্মীও এসে বসলেন। শূয়োরের দাঁতের অনেক মানে রে ভাই, চট ক'রে ওসব জিনিস উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শুধু বটুকেশ্বর নয়, আর একটা শূয়োরও শায়েস্তা হ'ল। আমাদের পূর্ণ পুরুত। আজকাল একেবারে কুঁজো হয়ে গেছে, কোমর সোজা করতে পারে না আর। সে দিনরাত মামীর কানের কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করত—কোথা থেকে একটা কুড়োনো মেয়েকে নিয়ে মাখামাখি করছেন আপনারা, কি জাত তার ঠিক নেই···। মামী তার কথায় সায় দিতেন ঝঙ্কার দিয়ে। বলতেন, বলুন গিয়ে সুখেনকে আর তার মামাকে। কোথা থেকে এক আপদ জুটিয়ে হাড জালিয়ে খাচ্ছে আমার। পূর্ণ পুরুত আমাকে বলেছিলেন একদিন, তোমাদের এ অনাচার কিন্তু সমাজ সহ্য করবে না, তোমার মামাকে বোলো। আমি বললুম, 'আপনিই বলুন না মামাকে। সে সাহস কিন্তু পূর্ণ পুরুতের ছিল না। মামীর কাছে গিয়ে গুঁইগাঁই করত কেবল। মকোদ্দমায় মেয়েটার পিতৃ-পরিচয় যখন জানা গেল, তখন পূর্ণও শায়েস্তা হল। তারপর থেকেই ঘুণ ধরল ওর মেরুদণ্ডে। কুঁজো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।"

হঠাৎ থেমে গেল সুখেন্দু।

"তারপর ?"

"চুপ কর। মু আসছে, ও চলে যাক, তারপর বলছি—"

দেখলাম মৃদুলা ফিরছে।

কাছে আসতেই সুখেন বলল, "পাতা কাটতে মানা ক'রে গেছিস্ তুই—"

"হ্যাঁ, মর্তমান আর অগ্নীশ্বর ছাড়া অন্ত কলার গাছ এখানে কোথায়। ওসব গাছের পাতা কেটে নিলে কি আর বাঁচবে ওরা—"

"খাব কিসে আমরা তাহলে।"

"সে ব্যবস্থা করেছি। বাসন আসছে—"

"এখানে বাসন পেলি কোথা—"

"সে পরে বলব।"

আমার দিকে চট ক'রে একবার চেয়ে সুখেনের দিকে চাইলে মৃদুলা। মুখে হাসি, চোখেও হাসি।

"কই বাসন—"

"ওই যে আসছে।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জনচারেক ষণ্ডা লোক মাথায় ক'রে কি বয়ে আনছে। মনে হল চারটে দৈত্য যেন।

"কি বাসন আনছে ওরা ?"

"কাচের প্লেট। কার্পেটের আসনও আছে।"

মৃদুলা ভিতরের দিকে চলে গেল।

"কাণ্ড দেখ—"

সুখেনও অনুসরণ করল তার।

আমি বসে রইলাম চুপ ক'রে। আমারও মনে হতে লাগল সুখেন্দু আমাকে জ্যোৎস্না রাত্রির গল্প বলবে বলেছিল। এতক্ষণ ধরে' ও যা বলল তাতে জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বিশেষ ছিল না, কিন্তু আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। খোলাখুলি মুক্ত আকাশে যে জ্যোৎস্না দিগদিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে সে জ্যোৎস্না নয়, যে জ্যোৎস্না গভীর অরণ্যে শাখাপল্লবের ফাঁক দিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো দেখা যায় সেই জ্যোৎস্না। একবার জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিরাট একটা বটগাছের তলায় শুয়ে এই রকম জ্যোৎস্না দেখেছিলাম মনে পড়েছে। আকাশের বুকে আলো আর কালোর জাফরি টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন, সুখেন্দুর এলোমেলো গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সেইরকম জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছিলাম। সুখেন্দু হয়তো জানেনা যে আমি জ্যোৎস্না দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার গল্পটা ফলাও ক'রে বলবে হয়তো সে এইবার। কিম্বা কে জানে হয়তো বলবেই না। আমার মন কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রির গল্পই শুনছিল।

সাত

নিরুর কথা

রামধনের বউ শুয়ে আছে চুপ ক'রে। অপরাধীর মতো শুয়ে আছে, তার চোখে মুখে কি কুণ্ঠিত সঙ্কোচ যে ফুটে উঠেছে আমরা বসে আছি অথচ তাকে শুয়ে থাকতে হচ্ছে এর অপরিসীম লজ্জা যেন ঢাকতে পারছে না বেচারা আর কিছুতে। উঠে বসেছিল আমরা আসাতে, উঠে বসেছিল এত জ্বর নিয়েও। কিছুতেই শুচ্ছিল না, ফুলু ধমক দেওয়াতে শেষকালে শুয়ে পড়ল। মনিবের ধমকে পোষা কুকুর শুয়ে পড়ে যেমন ক'রে। ফুলুর বাবা ওদের অন্নদাতা, ফুলুর কথা কি অমান্য করতে পারে ও? লণ্ঠনে তেল ছিল না, তা-ও যেন ওরই অপরাধ। রামধন এমন খেঁকিয়ে উঠল ওকে। তারপর ছুটে গেল, নিয়ে এল পেট্রোম্যাক্স। বড়লোকের মেয়ে, শখ হয়েছে পিকনিক করতে এসে রাতদুপুরে উলের সোয়েটার বুনবে, এর বিরুদ্ধে কি কথা বলা চলে কারও। মেয়েটা কিন্তু অত্যন্ত হাঁদা। নিজে হাতে ক'রে দেখিয়ে দিলাম খানিকটা, বুঝিয়ে দিলাম, তবু বইটা খুলে ভুরু চেয়ে আছে পাতার দিকে.

"নিরুদি, বই পড়ে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। পড়ব?"

"পড়।"

"১ সোজা, ১ সোজা, সামনে সুতা ২ সোজা ৩ উল্টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্টা-জোড়া, ৩ উল্টা, ২ সোজা, সামনে সুতা, পুনরাবৃত্তি কর। সর্বশেষে ৩ সোজা। এ তো কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"

"এখন ছেড়ে দাও। পরে কোরো—"

"না, আজ আমাকে খানিকটা করতেই হবে।"

একটা হাস্যকর জেদ ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে। রামধনের বউ একবার আমার দিকে, একবার ফুলুর দিকে চাইল। জ্বর খুব বেড়েছে বোধ হয়। মুখের ফ্যাকাশে রংও লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের দিকে চেয়ে ও যেন তৃপ্তি পাচ্ছে, মুখের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে সেটা। একটা ছেলেমানুষি আনন্দও যেন জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটোতে। আমরা যে এসেছি, বসেছি ওর ঘরে, এতেই যেন ও কৃতার্থ। আমাদের এই উল বোনা নিয়ে আলাপ আলোচনার প্রতি কথাটি ও যেন উপভোগ করছে, আমরা যেন থিয়েটার করছি আর ও যেন দেখছে সেটা, অনায়াসে, বিনা পয়সায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। কিন্তু সঙ্কোচ

ওর যেন ঘুচছে না, অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখছে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

কি বলব ভেবে পাচ্ছি না।

"দাও না লক্ষ্মীটি—"

রামধনের বউ আবার চাইলে আমার মুখের দিকে। এবার লক্ষ্য করলাম, তার দৃষ্টিতে তিরস্কারও আভাসিত হয়েছে। উঠতে হল।

"আমি নিজেই ক'রে দিই খানিকটা, তাড়াতাড়ি হবে।"

"না। আমি মিছে কথা বলতে পারব না। আমি নিজে করব।"

আশ্চর্য জেদী মেয়ে। কাকে মিছে কথা বলতে পারবে না? কেমন যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে কথাগুলো।

"বুঝিয়ে দেবে না তো—"

বোঝাতে শুরু করলাম। রামধনের বউয়ের চোখমুখ হৃষ্ট হয়ে উঠল।

"নিরুদিদি এখানে আছ?"

বাইরে থেকে কে ডাকছে। আমাকেই ডাকছে। না-শোনার ভান করলাম। ডাক আসবে জানতাম, কিন্তু এভাবে ডেকে পাঠাবার মানে কি। না-শোনার ভান করলাম।

"তোমার কাঁটাই তো ধরা হয়নি ঠিক ক'রে। এই রকম ক'রে ধর।"

"কিন্তু ছবিতে—"

"ছবিতে ঠিকই আছে, এইরকম ক'রে—"

"ও বুঝেছি!"

ফুলুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। শিশুর হাসি, অকৃত্রিম, সরল।

"ঠিক হচ্ছে না?"

"হচ্ছে। উলটা অমন ক'রে ঝুলছে কেন। সব জড়িয়ে যাবে যে। বলটা সামনে রাখ, উলের টানটা বেশ সমান থাকা চাই এমন ভাবে ধরতে হবে। বেশী জোরে ধরলে বোনা শক্ত হয়ে যাবে, বেশী ঢিলে ক'রে ধরলে বোনাও ঢিলে হবে। হ্যাঁ, ডান হাতের কড়ে আঙুলে একবার পাক খাইয়ে নাও, তারপর অনামিকা আর তর্জনীর নীচে দিয়ে এনে, ছবিটা দেখ না—"

"ছবি দেখে বোঝা যায় না। এই দেখ, এবার হয়েছে?"

"হয়েছে। কাঁটাটা আর একটু—হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে—"

ডাকটা থেমে গেল কেন? ঘাড় ফিরিয়ে দেখি রাজু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে।

কখন ঢুকেছে টের পাইনি। জল জল করছে চোখ দুটো, চাপা হাসি ঝিক্‌মিক্‌ করছে ঠোঁটের কোণে।

"বিজুদা খুঁজছে তোমাকে।"

"আমাকে ?"

ভান করতে হল বিস্ময়ের। রাজুর কাছে আত্মপ্রকাশ করার মানে হয় না কোনও। কিন্তু বিজুদার কি আক্কেল, রাজুকে পাঠিয়েছে ডাকতে।

"বিজুদা কোথায় ?"

"মাঠে, টিলার উপর বসে আছে—"

ফুলু অপটু হস্তে বুনে চলেছে। সেই দিকেই চেয়ে রইলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

"আমি অপেক্ষা করছি না হয়।"

"অপেক্ষা করার দরকার কি ?"

"মাঠের ভিতর দিয়ে একা যাওয়া ঠিক নয় এত রাত্রে।"

"ক'টা বেজেছে ?"

"তা দশটা হবে।"

রাজু হাতঘড়িটা একবার কানে দিয়ে, তারপর দম দিতে লাগল।

"ফুলুদি, তোমার ঘড়িটায় ক'টা বেজেছে দেখতো। আমার ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গেছি।"

ফুলু নিজের হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"আমারটাও বন্ধ—"

ফুলুকে কি ক'রে বলা যায় ভাবছি এমন সময় ফুলু নিজেই বললে—"তুমি ঘুরে এস নিরুদি। মনে হচ্ছে, আমি এবার পারব নিজে নিজেই। দেখ তো, হচ্ছে না ?"

"বেশ হচ্ছে—"

বাইরে বেরিয়েই রাজু চুপিচুপি বললে—"আসতে আসতে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম নিরুদি।"

"কি—"

"আমাদের বাংলোর হাতাটা অনেক দূর পর্যন্ত, ওই যেখানে ছোট টিলাটা রয়েছে ঠিক তার নীচেই তারের বেড়া। আসবার সময় দেখলুম, কে একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ধপধপে শাদা কাপড়-পরা, দূরে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হ'ল স্ট্যাচু, পাথরের নয়, কুয়াশার। তারপর দেখলাম

চারটে দৈত্যের মতো লোক আসছে, মনে হল যেন শূন্য থেকে এল, মানে মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দেখতে পেলাম তাদের পাথরে-কোঁদা কালো-কালো চেহারা, প্রত্যেকের মাথায় বোঝা। কিসের বোঝা বুঝতে পারলাম না। তারপর খদে নাবতে হল আমায়—ওই যে খদটা আছে ওটাতে নাবলে শর্টকার্ট হয়—খদে নাবলে আর কিছু দেখা যায় না। খদ থেকে যখন উঠলাম, তখন দেখি কেউ নেই —কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে সব—"

"মৃদুলা দাঁড়িয়ে ছিল বোধ হয়। একটু আগে তো ট্রেন এল একটা। শহর থেকে জিনিসপত্র এল সম্ভবত কিছু—"

"মৃ নয়। মৃ-কে আমি চিনতে পারব না ? সে কি রকম যেন অদ্ভুত। তাছাড়া তার গা থেকে আলো বেরুচ্ছিল যেন—"

চেয়ে দেখলাম তার দিকে। মনে হল ভয় পেয়েছে।

"ভয় করছে নাকি ?"

"ভয় আমার করে না। তবে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। এটা একটা কবরস্থান ছিল জান তো ?"

"শুনেছি।"

মনে পড়ল, আমি আর ফুলু যখন টিলাটার উপর বসেছিলাম তখন সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিলাম একটা। অথচ কাছাকাছি কোনও লোক যে সিগারেট খাচ্ছিল তার প্রমাণ তো পাওয়া গেল না। রাজুকে বললাম সে কথা।

রাজু চোখ বড় বড় ক'রে বললে—"ওই দেখ। আমি তো কাছেই ছিলাম, কাউকে সিগারেট খেতে দেখিনি তো।"

"তুমি খাচ্ছিলে না তো ?"

"আমি ? না।"

আট

দ্বিজেনের কথা

নিমাই ছাতের উপরই বসেছিল। কম্পাউণ্ডারের মুখে শুনলাম ছুটো রোগীকে নাকি ফিরিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই বিশেষ, যা রোজগার করে তার অধিকাংশই দান করে নাকি। টাকার খাঁকতি নেই।

"আপনাকে ওপরেই আসতে বললেন।"

চাকরটা এসে খবর দিলে নীচে। তার হাতে একটা ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ারও দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে ছাতে গেলাম, চাকরটাও এল আমার পিছু পিছু। এসে নীরবে চেয়ারটা পেতে দিয়ে চলে গেল। নিমাই চুপ ক'রে বসেছিল। একটি কথা বললে না আমাকে দেখে। আকাশে একটা খুব বড় নক্ষত্র দপ দপ ক'রে জলছিল, তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে বসেই রইল সে। আমিই কথা বললাম প্রথমে।

"আমাদের সেই পোড়ো বাংলোয় পিকনিক হচ্ছে আজ। তোমাকে নিতে এসেছি।"

অপ্রত্যাশিতভাবে নিমাই বলল, "বেশ, যাব" বলেই আবার নক্ষত্রটার দিকে চাইলে, চেয়েই রইল। আমি কথাটা কিভাবে পাড়ব ভেবে না পেয়ে সিগারেট বার করলাম, নিমাইকে একটা দিলাম, নিজেও একটা নিলাম। সিগারেটটা নিলে কিন্তু চেয়ে রইল আকাশের দিকে। সিগারেট লাইটারের আওয়াজ হ'ল খস ক'রে। নিমাই তবু অন্যমনস্ক।

"নাও—"

নিমাই সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে।

"কি ভাবছিস তুই ?"

"ভাবছি, তুই যদি রোগী হতিস বেশ হ'ত। এক কথায় বিদেয় ক'রে দিতাম।"

"তুই শুনেছি প্রায়ই রোগী বিদেয় করে দিস। কেন বলতো ?"

"টাকার দরকার নেই।"

"তোমাকে রোগীর দরকার থাকতে পারে তো।"

"রোগীর মনে হতে পারে আমি তার পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু আমার তো মনে হয় না। কোতলপুরের আশুও যা করে, আমিও তাই করি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।"

"আশু তো কোয়াক—"

"কিন্তু সেও পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এন, এ, বি, দেয়, আমিও দিই। যেটা সারবার সারে, যেটা মরবার মরে। আমার ফি ষোল টাকা, আশুর দু টাকা। আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও।"

"তুই আজকাল ষোল টাকা ফি করেছিস নাকি?"

"তাতেও ফুরসৎ নেই। একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারকে ডেকে রোগীর আত্মীয়েরা নিজেদের অহঙ্কারকে তৃপ্ত করতে চায়। আসলে চিকিৎসার চেয়ে ধুমধাম করার দিকেই অধিকাংশ লোকের বেশী ঝোঁক। আশুও খারাপ চিকিৎসা করে না। ইংরিজি মোটামুটি ভালই জানে। ইংরেজি ভাষায় লেখা যে বিজ্ঞাপনগুলো আসে তা পড়ে বুঝতে পারে। ওই বিজ্ঞাপনগুলোই তো আমাদের কাছে অভ্রান্ত বেদবাক্য এখন। সে বেদবাক্যের মমার্থ আশুও যখন বুঝতে পারে, তখন আমাকে নিয়ে টানাটানি করার মানে হয় না কোনও। একটি মাত্র মানে হয়—আমি বিলেতের ডিগ্রিধারী।"

দেখলাম, প্রসঙ্গটা যে রাস্তা ধরেছে সে রাস্তায় গেলে আমার উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যাবে। ডাক্তারি নিয়ে তর্ক করতে আমি এতদূর আসি নি। সুখেনদার কথাটা এনে ফেলতে হবে কোনরকমে।

বললাম, "সুখেনদা কি তোমাকে ভালবাসে তোমার ডিগ্রির জন্যে?"

নিমাই চুপ ক'রে রইল। আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে সোজা হয়ে উঠে বসল।

"সুখেন আমাকে ভালবাসে কারণ ও জানে আমি যে-কোনও মুহূর্তে মারা যেতে পারি।"

"মারা যেতে পার! তার মানে?"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই। আকাশের দিকে চেয়ে রইল। মনে হল তার এই সাংঘাতিক উক্তির পর আমার ব্যক্তিগত কথা বলাটা এখন শোভন হবে কি? নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে, হঠাৎ একথা বলার মানে কি। ওর চালচলন দেখে অনেকেই আজকাল সন্দেহ করছে যে ও ক্রমশ পাগল হয়ে যাচ্ছে, আমারও সন্দেহ হল। চোখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম দৃষ্টি স্বাভাবিক কিনা।

আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েই নিমাই বললে, "তার মানে তুমি বুঝবে না। সে শক্তি তোমার নেই।"

"সুখেনদা যা বুঝতে পেরেছে, তা আমিও বুঝতে পারব আশা করি।"

"আশা করতে পার কিন্তু আমি মনে করি সেটা দুরাশা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি যারা পরেছে তারা নিজের নাক পর্যন্ত দেখতে পায় না।"

আত্মসম্মানে আঘাত লাগল।

বললাম, "দেখ নিমাই, হঠাৎ পণ্ডিতমশাই সেজে মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলা খুব সোজা। স্বল্পবিদ্যার ঠুলি প্রভৃতি কথাগুলো বড্ড একঘেয়ে হয়ে এসেছে। যদি গাল দিতেই চাও, নূতন ধরনে দাও।"

নিমাই সিগারেটটায় শেষ টান মেরে ফেলে দিলে। কোনও কথাই বললে না অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলে বসল, "তুমি প্রেমে পড়েছ কখনও ?"

শুয়ে শুয়েই বললে।

"তার সঙ্গে তোমার যে-কোনও মুহূর্তে মারা যাওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, ভূতে বিশ্বাস কর তুমি ? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলে ঠিক করব সুখেনকে যা বলেছিলাম তা তোমাকেও বলা চলে কি না।"

চাকরটা দু'পেয়ালা চা নিয়ে এল।

পুলকিত হয়ে উঠলাম, চা দেখে নয়, প্রসঙ্গটার মোড় ফিরেছে দেখে। আমার প্রেমের কথাই তো ওকে বলতে এসেছি। বোতলের ছিপিটা নিমাই খুলে দিলে দেখে সত্যিই আরাম পেলাম। তবু চুপ ক'রে রইলাম খানিকক্ষণ। নিমাইও চুপ ক'রে রইল। নক্ষত্রের দিকে চেয়ে রইল।

"কি আশ্চর্য, চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

উঠে বসল নিমাই। চুমুক দিলে চায়ের পেয়ালায়। আমিও পেয়ালা তুলে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, "তুমি যখন প্রসঙ্গটা তুলেছ তখন তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। অদ্ভুত যোগাযোগের কথাটা ভেবে কেবল আশ্চর্য হচ্ছি। যে কথা তুমি তুললে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। শুধু বলতে নয়, চাইতে। যে অদৃশ্য অফুরন্ত ডিনামাইটের অধীশ্বর তুমি সেই ডিনামাইট ভিক্ষা করতেই এসেছি আজ বিশেষ ক'রে। মনে হল, এমন পূর্ণিমা রাত্রে ভিক্ষা চাইতে লজ্জা নেই, যে ভিক্ষা দেবে সে-ও এমন রাত্রে কৃপণ হতে পারবে না—" থেমে গেলাম। মনে হল কথাগুলো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। নিমাই চায়ের পেয়ালাটা তুলে ঢক ঢক ক'রে সমস্ত চা-টা খেয়ে ফেললে, মনে হল কোনও

পিপাসিত মাতাল যেন মদ খাচ্ছে। একটা অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠল তার চোখ দুটোতে হঠাৎ। মনে হল ওর বুকের ভিতর কে যেন সুইচ টিপে আলো জেলে দিলে, সেই আলো ফুটে বেরুল চোখের জানালা দিয়ে। আমার দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ অবাক হয়ে, তারপর বললে, "এতদিনে তোমার উপর শ্রদ্ধা হল। যাকে কেউ ভালবাসে নি, কিম্বা যে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, সে মানুষ নয় শয়তান। আমার ধারণা ছিল কলিয়ারির খাদে নেমে কয়লাই ঘেঁটে বেড়াচ্ছ বুঝি, হীরের সন্ধান পেয়েছ জানতাম না। কিন্তু ডিনামাইটের হেঁয়ালিটা বুঝতে পারছি না ঠিক। ডিনামাইট দিয়ে কি ওড়াবে?"

"বাধা। যে ডিনামাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তা তোমার কাছেই আছে, পৃথিবীতে আর কারও কাছে নেই, এমন কি নোবেলের উত্তরাধিকারীদের কাছেও না।"

"পরিষ্কার হচ্ছে না। আর এক পেয়ালা চা আনতে বলব? বাধাটা কিসের? ভাষাটা দুর্বোধ্য করছ কেন মিছিমিছি।"

"বাধাটা জাতিভেদের। না, ঠিক তা-ও নয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে সুখেনদার কুসংস্কারটাই আসল বাধা—"

"বেজাতের মেয়েকে ভালবেসেছ?"

"হ্যাঁ—"

"সুখেন কি বলছে।"

"সুখেনদাকে বলিনি এখনও কিছু। সাইড্‌কার-ওলা একটা মোটর বাইক কিনেছি খালি।"

নিমাই আবার শুয়ে পড়ল। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। মনে হল যেন নক্ষত্রটার কাছে পরামর্শ চাইছে। পরামর্শটা যাতে আমার স্বপক্ষে দেয় এই আশায় আমিও চাইলাম তার দিকে। করুণ দৃষ্টি মেলেই চাইলাম। মনে হল নক্ষত্রটা চোখ মিট মিট ক'রে ভরসা দিলে আমাকে।

"বিয়ে করতে চাও?"

নিমাইয়ের প্রশ্নটা বেখাপ্পা শোনাল যদিও, যদিও মনে হল এই নক্ষত্র-চাঁদের পরিবেশে বিবাহটা নিতান্তই বেমানান, তবু সত্য কথাটাই বলতে হল। মনে পড়ল, বিয়ে করতে চাই বলেই সুখেনদার অনুমতি প্রয়োজন আর সুখেনদার অনুমতি নিমাইয়ের সাহায্য ছাড়া পাওয়া শক্ত বলেই নিমাইয়ের শরণাপন্ন হয়েছি।

বললাম, "বিয়ে করতে চাই নিশ্চয়। প্রিয়ার গায়ে পতিতার লেবেল লাগাবার আমার ইচ্ছে নেই।"

"প্রিয়াকে যদি দূর থেকে ভালবাসতে পার তাহলে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগবে কেন? বিয়ে করলে তাকে পতিতার দুর্নাম থেকে বাঁচাতে পার কিন্তু পতন থেকে বাঁচাতে পারবে না। বিয়ে করলেই প্রিয়ার পতন এবং মৃত্যু।"

"একটা বাজে কথা বললে তুমি। শারীরিক সান্নিধ্য না হলে প্রেম সার্থক হয় না। প্লেটনিক প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না। তাতে কেবল পুরুষের হয় "প্লে" আর নারীর হয় টনিক এবং 'পেন্‌ফুল' টনিক।"

"আমি করি।"

নিমাইয়ের চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলে উঠল—"আমি যাকে ভালবাসি সে কোথায় আছে জানো?"

"কোথায়?"

"হাঁ, ওইখানে।"

নক্ষত্রটাকে দেখালে। আমি তার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত বাহুর দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

"ওইখানে?"

"হাঁ, ওইখানে।"

আবার তার চোখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম, কিন্তু পাগলের কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। বরং মনে হল আকাশের নক্ষত্রটাই যেন ছোট ছোট হয়ে নেবে এসেছে তার চোখের তারা দুটিতে, মিট মিট ক'রে হাসছে। বেশ অর্থপূর্ণ সে হাসি, পাগলের হাসি নয়। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

"একটু খুলে বল, বুঝতে পাচ্ছি না—"

"খুলে বললেও বুঝবে না, যদি না বিশ্বাস কর। সুখেন বুঝেছে, কারণ তার বিশ্বাসী মন। সে জানে যে মুহূর্তে ঐ নক্ষত্র আমাকে ডাক দেবে আমি চলে যাব। এই বিশ্বাস তার হয়েছে বলে তাকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি, সে আমাকে দুঃখ দিতে চায় না, পারে না, আমার কোনও অনুরোধ কখনও অগ্রাহ্য করে না। সে বুঝেছে, কিন্তু তুমি বুঝবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। তোমরা যুক্তিবাদী কিনা।"

উঠে বসল নিমাই। আর একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়াটার দিকে চেয়ে রইল, তারপর খানিকক্ষণ জলন্ত সিগারেটটার দিকে।

তারপর বলল, "আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের এখনও উত্তর দাওনি তুমি। ভূতে বিশ্বাস কর?"

"অবিশ্বাস করবার মতো যুক্তি আমার নেই। বিশ্বাস করবার মতোও নেই।

তবে একটা কথা মনে হয়। বহুকাল থেকে বহুলোক ভূতে বিশ্বাস করেছে, তাই মনে হয় ওর মধ্যে সত্য কিছু আছে—"

"নিশ্চয়ই আছে। স্বচক্ষে দেখেছি—"

"কি রকম।"

"ক'টা বেজেছে আগে জানা দরকার। সুখেন হয়তো ছটফট করছে। তোমার হাতে ঘড়ি দেখছি না।"

"না, নেই।"

ঘড়িটা বাঁধা দিয়ে যে একখানা ভাল শাড়ি কিনেছি তা নিমাইকে বলা প্রয়োজন মনে করলাম না।

"জটু, জটু—"

ডাকবামাত্রই নিমাইয়ের চাকরটি হাজির হল। যেন ওৎ পেতে বসেছিল।

"আমার ব্যাগটা আন তো—"

প্রকাণ্ড ব্যাগ নিয়ে এল জটু। নিমাই তার ভেতব থেকে ছোট একটি 'টাইমপিস' বার ক'রে দেখলে। নিমাই হাতঘড়ি বা পকেটঘড়ি ব্যবহার করে না।

"সাডে ন'টা বেজে গেছে। চল, ওখানে গিয়েই বলব। সুখেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এতক্ষণ।"

"আজই কিন্তু সুখেনদার কাছে কথাটা পেড়ো। বুঝলে।"

"নিশ্চয়ই পাডব। আমি যে কষ্টভোগ করছি, তা আর কেউ ভোগ করুক এ আমি চাই না। তোমাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু সাবধানও করে দিচ্ছি, যে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ কোন ফায়ার-ব্রিগেড তা নেবাতে পারবে না। তুমি নেবাতে দেবে না। আর একটা কথাও মনে রেখ, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, দাহ্যবস্তু মাত্রকেই সে পোড়ায়, তুমি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন আর একজনকে পোড়াবে সে। তোমার ভস্ম যদি তখন আর্তনাদও করে তোমার দিকে সে ফিরে তাকাবে না আব।"

"অসতীদের কথা বলছ—?"

"সতী বা অসতীর প্রশ্ন নয়, আমি চিরন্তনী নারীব কথা বলছি। তারা সতী হতে পারে, অসতী হতে পারে, ধনী হতে পারে, গরীব হতে পারে, সধবা, বিধবা, কুমারী হতে পারে, সামাজিক যে-কোনও টিকিট তার গায়ে লাগানো থাকতে পারে —কিন্তু তার নারীত্ব কখনও ঘোচে না। একাধিক পুরুষের ডাকে সে সাড়া দেবেই কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। পুরুষের প্রেমার্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্যে সে সর্বদা উন্মুখ। কোথায় যেন পড়েছিলাম—

The heart of a woman is never so full of affection that there does not remain a little corner for flattery and love—"

আবার শুয়ে পড়ল নিমাই, তারাটাকে দেখতে লাগল নির্নিমেষে।

"এই তোমার অভিজ্ঞতা ?"

"আমার অভিজ্ঞতা আরও ভয়ঙ্কর। পরে শুন,' এখন ওঠা যাক চল।"

"যাকে তুমি ভালবাসতে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে ?"

"গেছে। তবু তাকে ভালবাসি। তার জন্যে না করতে পারি এমন কাজ নেই।"

"কোথায় গেছে, কারও সঙ্গে গেছে ?"

"লম্বা কাহিনী, পরে বলব। তুমি যাকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করেছ, সে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী তো ?"

"ফুলুকে তুমি তো দেখেছ ?"

"ও, ফুলু। শ্রীদাম সিঙ্গির মেয়ে ?"

"হাঁ। স্বাস্থ্যের কথা জিগ্যেস করছ যে হঠাৎ।"

"আমি যাকে ভালবেসেছিলাম সে ছিল রুগ্ন। সে যদি রুগ্ন না হতো হয়তো তাকে আমি পেতাম—"

"ও।"

আর একবার নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে নিমাই বললে—"চল। আর দেরি করা ঠিক নয়।"

ছাত থেকে নেবে পড়লাম দু'জনে।

নয়

বিজেনের কথা

নিরু আসছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কি মেজাজে আসছে কে জানে। তবে যে মেজাজেই আসুক আমার কাছে লুকোতে পারবে না সেটা। নিরুর মুখের ভাব যেমনই থাকুক তার মনের ভাবটা আমি টের পেয়ে যাই। ও যখন খুব রাগের ভান ক'রে মুখে মেঘ ঘনিয়ে তুলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, তখন আমি বুঝতে পারি ও ভান করছে। আমিও ভান করি ভয় পেয়েছি, কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারি। ওর পিছু পিছু রাজু আসছে বোধহয়। রাজুটা সিগারেট খেতে

শিখেছে আজকাল। আমার টিন থেকে চারপাঁচটা সিগারেট ও-ই সরিয়েছে সম্ভবত একটু আগে। মুখের ভাবটা তাই অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, ও যদিও নিজে বুঝতে পারছে না সেটা। সিগারেট সরাক, আপত্তি নেই তাতে, খুশিই হয়েছি বরং। আমাকে শ্রদ্ধা করে বলেই লুকিয়ে নিয়েছে, আর ভাল জিনিসের সমঝদার বলেই এই সিগারেট নিয়েছে। এ সিগারেট আজকাল দুষ্প্রাপ্য। সুখেনদা ওকে যে পরিমাণ টাকা দেয় শুনেছি, তাতে সিগারেট কেনবার মতো পয়সা ওর পকেটে যথেষ্ট থাকা উচিত। আমার টিন থেকে সিগারেট সরিয়েছে, খুশিই হয়েছি তাতে, খুব খুশি হয়েছি। আজকালকার ছোকরাদের মতো গুরুজনদের প্রতি ওর অশ্রদ্ধা নেই, রুচিটাও ওর মার্জিত। খুব খুশি হয়েছি। অবাক ক'রে দিয়েছিল সেদিন। ওর এ রকম অঙ্কে মাথা, জানতাম না। চট ক'রে ক্যালকুলাসের দুরূহ অঙ্কটা কষে দিলে। নিরুর মুখে যেন একটা প্রসন্ন হাসির ঝলক দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ও চটেছে।

"আমাকে ডাকছ তুমি বিজুদা?"

"হ্যাঁ, একটু দরকার আছে। মানে সেই দরকারটা, তুমি এখানে আসবে জানলে ব্র্যাডলের বইখানাই নিয়ে আসতাম—লাইব্রেরি থেকে এনেই রেখেছি আমি তোমার জন্যে।"

"ব্র্যাডলে পেয়েছি আমি ফুলুর দাদার কাছ থেকে।"

"ও—"

বুঝলাম রাজু থাকলে সুবিধে হবে না। নিরু ছদ্ম হাসির তলায় চটতে থাকবে ক্রমশ, জ্যোৎস্নাটা মাঠে মারা যাবে। আমি তো যাবই।

"রাজু, তুই একটা কাজ কর না ভাই। দক্ষিণ দিকের ঘরটায় জামা খুলতে গিয়ে আমার সিগারেটের টিনটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আট দশটা সিগারেট বোধহয় পড়ে' গেছে টিন থেকে। অন্ধকারে খুঁজে পেলাম না, টর্চ নিয়ে একটু খুঁজে দেখতো যদি পাস। দেখিস, সুখেনদা যেন টের না পায়।"

"খুঁজে পেলে নিয়ে আসব এখানে?"

"না, টিনটা ওই ঘরের আলমারির পিছনের তাকটায় আছে। তারই ভিতরে রেখে দিস। আমার কাছে সিগারেট আছে এখন।"

রাজুর মুখের প্রচ্ছন্ন আনন্দটা উপভোগ করলাম।

"যেতে ভয় করবে না তো—!"

নিরু জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তরে রাজু মুচকি হাসলে একটু।

"দাদা যদি আমার খোঁজ করে আমি এখানে আছি বলে দিও।"

"সুখেনদা তোমার দাদার কাছে যে রকম গল্প ফেঁদেছেন তাতে তাঁর অন্য দিকে মন দেওয়াই শক্ত এখন।"

"আচ্ছা, বলে' দেব।"

যেতে যেতে রাজু ঘাড় ফিরিয়ে বলে' গেল।

রাজু কিছুদূর যেতেই নিরুর মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূভঙ্গি ক'রে বললে, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন—।"

ভ্রূভঙ্গি দেখেই বুঝলাম রাগটা কমে আসছে, খুশি হয়ে উঠেছে ক্রমশ।

"এই এমনি গল্প করতে। যদি ইচ্ছে কর, যে প্রসঙ্গ চিঠিতে লিখেছিলে তার সম্বন্ধে আলোচনাও করতে পারি। জ্যোৎস্না রাত্রে ফাঁকা মাঠে চমৎকার জমবে।"

"আমার আর বোঝবার দরকার নেই। ফুলুর দাদা আমাকে ভাল নোট দেবেন বলেছেন একটা।"

"ফুলুর দাদার সঙ্গে আলাপ হল কোথা ?"

"ফুলুদের বাড়িতেই। চমৎকার মানুষ। সত্যি চমৎকার।" নিরুর মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যেন ফুলুর দাদাকে দেখে ও সত্যিই মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মুগ্ধ হয়নি, আমাকে ঈর্ষাতুর ক'রে তোলবার চেষ্টা করছে। ঈর্ষাই প্রকাশ করলাম সোজাসুজি।

বললাম, "তোমার রুচির উপর শ্রদ্ধা ছিল আমার। কিন্তু ফুলুর দাদাকে যদি তোমার চমৎকার লেগে থাকে তাহলে নিজের ভুল ধারণাটা সংশোধন করতে হবে।"

"করতে পার। চারখানা চিঠি সত্ত্বেও উত্তর দেয় না যে লোক, তার ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাবারও সময় নেই আমার।"

"আচ্ছা নিরু, তুমি এমন অবুঝের মতো কথা বল কেন বুঝি না। চারখানা চিঠি লিখেও যখন জবাব পাওনি তখন তোমার বোঝা উচিত এর নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কারণ আছে। আমি হলে চটতাম না, চিন্তিত হতাম। ফুলুর দাদা চমৎকার লোক কিনা সে গবেষণা না ক'রে চলে যেতাম—"

নিরু এইবার কাৎ হল। ভুরু কুঁচকে আছে যদিও, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝছি কাৎ হয়েছে।

"কেন, কি হয়েছিল ?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অভিমানের ভান করলাম। অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হল, কারণ আমার নিজের চোখের উপর বিশ্বাস নেই। হয়তো হাসছে।

"চুপ ক'রে আছ যে। কি হয়েছিল বল না।"

চুপ ক'রেই রইলাম। মুখও ফিরিয়ে রইলাম।

"বলবে না ?"

"বলে লাভ কি। ফুলুর দাদাকে যখন তোমার ভাল লেগেছে তখন কেন চিঠি লিখতে পারি নি তা জানবার সার্থকতাই বা কি ?"

নিরু এবার বলপ্রয়োগ করলে। দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা ধরে' নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

"বল না, কি হয়েছিল। আঃ—"

'আঃ'টা ব্যর্থতা-সূচক আক্ষেপ ! আমার ঘাড়ের পেশী খুব দুর্বল নয়।

"বল না—"

কণ্ঠস্বরে কান্নার রেশ। ঘাড় ফেরাতে হল সুতরাং।

"কলমটা হারিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া জ্বরও হয়েছিল—"

"মিথ্যুক কোথাকার।"

"বললাম তো বলা বৃথা। বিশ্বাস করবে না।"

"কলম হারিয়ে কলেজের কাজ চালাচ্ছ কি ক'রে ?"

"এর ওর কলম নিয়ে কিম্বা পেনসিল দিয়ে কিম্বা কলেজের দোয়াত কলমে—"

নিরুর চোখ দেখে বুঝলাম ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে।

"এক লাইনে এই খবরটাও আমাকে দিলে পারতে—"

"তোমাকে অমন ব্যাগার সারা চিঠি লিখতে পারি কখনও। তোমাকে পেনসিলে চিঠি লিখব। আন্‌থিঙ্কেব্‌ল !"

"তোমার জ্বর হয়েছিল, সত্যি ?"

"হয়েছিল। তুমি অবশ্য মিথ্যে মনে করবে। কর।"

"না, না, মিথ্যে মনে করব কেন। চারখানা চিঠির জবাব না পেলে কার না রাগ হয়। তার ওপর পরীক্ষা সামনে—"

"ফুলুর দাদা সত্যিই যদি নোট দেবেন বলে' থাকেন—"

নিরু হেসে ফেললে এবার। "ওটা মিছে কথা। তবে ফুলুর দাদার কাছ থেকে ব্রাডলেখানা জোগাড় করেছি ফুলুর মারফত। ওর দাদার সঙ্গে আমার আলাপই হয় নি। আরও বই এনে দেবে ফুলু বলেছে।"

"তাহলে 'পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক' আর দুর্বোধ্য নেই আশা করি।

"বুঝিয়ে দাও আমাকে—"

আবদারের সুর ধ্বনিত হ'ল কণ্ঠে। আর একটু সরে' এল আমার কাছে। উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ বেসামাল হয়ে গেলাম।

"কি যে কর—"

নিরু সরে' বসল। যেন কত রাগ করেছে। তারপর দু'জনেই জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। হঠাৎ নিরু বললে—"দাদাকে বলেছ?"

"বলেছি—"

"কি বললে দাদা?

"বললে নিরুর যদি মত থাকে আমার আপত্তি কি। তবে সুখেনের মতটা জানা দরকার—"

নিরু চুপ ক'রে রইল কয়েক সেকেণ্ড।

"সুখেনবাবু যদি আপত্তি করেন? শুনেছি খুব এক বড়লোকের বাড়ি থেকে তোমার নাকি সম্বন্ধ এসেছে।"

বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। খবরটা আমিও শুনেছি, এও শুনেছি মেয়েটি নাকি সর্বগুণান্বিতা, তাকে বিয়ে করলে নাকি প্রকাণ্ড একটা জমিদারি যৌতুক পাব। চুপ ক'রে রইলাম।

"চুপ ক'রে আছ যে—"

"কি বলব। সুখেনদা আগে আপত্তি করুক, তারপর ভাবা যাবে। অবনদা হয়তো আজই পাড়বেন কথাটা।"

"আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছি।"

"কি?"

"ভাবছি আমি তোমার ক্ষতি করছি না তো?"

"কি ক্ষতি?"

"শুনেছি মেয়েটি সত্যিই ভাল। তার বাবার একমাত্র মেয়ে। একটা গোটা জমিদারিই নাকি যৌতুক দেবে। আমি গরীব, আমার রূপও নেই, তোমার তুলনায় গুণও নেই—" থেমে গেল নিরু।

"থামছ কেন বলে' যাও।"

"না, না, এটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ কথা নয়।"

"আমি কি তা বলছি—"

"আমার একটা কথা শোন।"

"বল—। একটা কেন, যত কথা বলবে সব শুনব।"

"সব দিক থেকে বিচার ক'রে ওই মেয়েটিকে তোমার যদি সত্যিই ভাল বলে মনে হয়, আমার জন্তে তুমি বিয়ে ভেঙে দিয়ো না।"

"তারপর ?"

"ওর সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যাবার পর আমাকে বিয়ে কোরো। তাতে আমার আপত্তি হবে না।"

"আর সে মেয়েটি যদি আপত্তি করে—"

"তার কাছে যাব না। দূরে দূরে থাকব। যেমন চাকরি করছি তেমনি করব। তুমি শুধু মাঝে মাঝে এসো আমার কাছে—তাহলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তোমার আর একটা বউ থাকলেও আমার আপত্তি হবে না।"

নিরু এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার পিঠে মুখ রাখলে।

বললাম, 'ধার-ধোর ক'রে কালই তাহলে গোটা দুই নৌকো কিনতে হয়।"

"নৌকো ? কেন !"

"দু' নৌকোয় পা দিয়ে চলাটা প্র্যাকটিস ক'রে নিতে হয়। অভ্যাস তো নেই—"

নিরু ছোট্ট চড় মারলে আমাকে।

"খালি ইয়ার্কি। 'পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ সেক' কখন বোঝাবে। রাত তো অনেক হল—"

"আগে 'ম্যারেজ ফর ম্যারেজস্ সেক'টা বোঝা হয়ে যাক। আমি তোমাকে বরাবর 'মিডিযকার' ভেবে এসেছি, এখন দেখছি তুমি জিনিয়াস।"

নিরুর চোখ দুটো জল জল ক'রে উঠল। চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, "এতক্ষণে ঠিক চিনেছ। সব মেয়েরাই সেই জিনিয়াস যার মানে ভূত বা পেত্নী। আমরা একবার ঘাড়ে চড়লে আর নাবি না। ইহকালে তো বটেই, পরকালেও চড়ে থাকি। উঃ, কি অসহায় আমরা, লেখাপড়া, চাকরি, কিছুই আমাদের কোন কাজে লাগে না—"

হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে ভেঙে পড়ল নিরু। আমার কোলের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলাম।

দশ

ফুলুর কথা

দ্বিজেনবাবু সাইড্‌কার-ওলা বাইক কেন কিনেছেন তা আর কেউ না বুঝুন আমি বুঝেছি। মৃদুলাও বুঝেছে। অদ্ভুত মেয়ে ওই মৃদুলা। সব জানে, সব বোঝে, ঠিক বিপদের সময়টিতে গিয়ে সব সামলে দেয়, অথচ কথাটি বলে না। সুখেনদা আর অবনীশবাবু যখন ওদিকে বসে' গল্প করছিলেন তখন শুকুল ঠাকুর যে কাণ্ডটি করেছিল মৃদুলা না থাকলে হয়েছিল আর কি। আমরাও তো বসেছিলাম কিন্তু আমরা কেউ টের পাই নি, এমন কি শুকুল ঠাকুরও পায় নি। হঠাৎ মৃদুলা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। শুনতে পেলাম বলছে—নাবাও নাবাও, শিগগির হাঁড়িটা নাবাও, তলা ধরে গেছে। অন্য একটা হাঁড়িতে ঢেলে ফেল, তলাটা চেঁচো না, যেমন আছে তেমনি থাক। কয়েকটা রসুন ঘিয়ে ভেজে দাও এবার, কিছু বোঝা যাবে না। তারপর দেখি বাটি ক'রে নিয়ে এসেছে একটু। আমাকে বললে, চেখে দেখতো ফুলু, পোড়া গন্ধ পাচ্ছ কিনা। মাংসে পোড়া গন্ধ ছাড়লে শুকুল ঠাকুরকে আর আস্ত রাখবে না সুখেনদা। চেখে দেখলাম একটুও পোড়া গন্ধ নেই। শুনেই চলে গেল মৃদুলা। অন্য মেয়ে হ'লে এই নিয়ে কত বাহাদুরিই করতো। মৃদুলা চুপ একেবারে। পানিশঙ্খ প্যাটার্নের কথা মৃদুলাই তো বললে আমাকে। সুখেনদার নাকি খুব পছন্দ ওই প্যাটার্নটা। ভাগ্যে নিরুদিকে পেয়ে গেলাম, গোড়ার দিকটা দেখিয়ে না দিলে বই দেখে পারতুম না আমি।

"কি বুনছ দিদি—"

বাবা, চমকে উঠেছি। রামধনের বউটা ঘুমোয়নি এখনও? সেই থেকে ঠায় চেয়ে আছে আমার দিকে।

"সোয়েটার বুনছি—"

"কার জন্যে।"

"তুমি কাউকে বলে' দেবে না তো?"

"না।"

"সুখেনবাবুর ভাইয়ের জন্যে।"

"দ্বিজুবাবু না বিজুবাবু—"

"দ্বিজুবাবু। কাউকে বোলো না যেন।"

"না, বলব না—"

কি রকম চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমার ঘরে ছবির পিছনে যে টিকটিকিগুলো আছে, আলো জ্বাললে তারা বেরিয়ে আসে আর ঠিক ওই রকম ক'রে, চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। দ্যুৎ, সব জড়িয়ে গেল আবার। অন্যমনস্ক হলে কি আর বোনা যায়। গোলমালের ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এলাম, এখানে রামধনের বউ জ্বালাতে লাগল। অদ্ভুত ওর চাউনি, শান্ত অথচ অন্যমনস্ক ক'রে দেয়। এমন ক'রে চেয়ে থাকার মানেই বা কি।

"ঘুমোও না তুমি ঝুনুর মা। জ্বর হয়েছে তোমার।"

"ঘুম আসছে না।"

"ওপাশ ফিরে শোও, তাহলেই ঘুম আসবে। চোখ বুজে থাক।"

ভারি বাধ্য। বলার সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে শু'ল।

…বাইকে চড়ে' দ্বিজুবাবু এসেই কোথায় বেরিয়ে গেলেন এত রাত্রে। এত ছটফটে লোক, একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে বসবে না, আপিসেও এই কাণ্ড। একদিন গিয়ে দেখেছি তো। কখনও ওপরে, কখনও নীচে, চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎ দেরাজ খুলে ঘাঁটতে লাগল কি সব, এক গাদা চিঠি বার ক'রে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়তে লাগল, পট ক'রে ঘন্টাটা টিপে চাপরাসীকে ডাকলে, তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—চায়ের সঙ্গে টোস্ট আর ওমলেট্ আনাই? 'ওমলেট'। আমি তো মামলেট্ জানতাম—তবে আমি মুখ্যু মানুষ। বললাম, "বেশ তো, আনাও।" আমার লোভ কেকে, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারলাম না সেটি। লুকিয়ে গেছি তো। বেশি বাড়াবাড়ি করা কি চলে। কেক আনতে গেলে আবার দেরি হয়ে যেতো হয়তো। তা'ছাড়া বলতে লজ্জাও করল। পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েদের হ্যাংলামি প্রকাশ করাটা কি উচিত? মুখ ফুটে একবার বললেই ফেবাজিনি বা ফিরপোতে লোক দৌড়তো জানি, কিন্তু বলতে পারলাম না। কলেজ থেকে লুকিয়ে' গেছি তো। বার বার তখন ঘড়ির দিকে চাইছি আর বলছি—আমাদের থার্ড পিরিয়ড দু'টোর সময় আরম্ভ হবে কিন্তু। আমার দিকে না চেয়েই বললে—এক মিনিট, এইগুলো সই ক'রে দিই; আজ ডাকে পাঠাতেই হবে। ঘস ঘস ক'রে সই করতে লাগল। সেই সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম সোয়েটারটা। চমৎকার রং, চমৎকার ফিট্ করেছে। জিগ্যেস করলাম—সোয়েটারটা কিনেছ না কি, চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। কোন উত্তর দিলে না, ঘস ঘস ক'রে সইই করতে লাগল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে

ঘরটা দেখতে লাগলাম, মাকড়সার ঝুল হয়েছে দেখলাম কোণে কোণে। কেন হয়েছে বুঝতে কষ্ট হল না। চাকরের গাফিলতি নয়, নিশ্চয় সময়মতো ঘরই খোলা হয় না কোন দিন, ঝাড়বে কখন বেচারা। পালকের তৈরি একটা হাতঝাড়ুও একটা সেল্‌ফে রাখা আছে দেখতে পেলাম। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। উঠে নিজেই সেটা নিয়ে কাছে যে ঝুলগুলো ছিল ঝাড়তে লাগলাম, নাগালের মধ্যে যতটা পেলাম, সোয়েটারের কথা ভুলেই গেছি, হঠাৎ সই করতে করতেই ঘাড় না ফিরিয়েই বললে—

"সোয়েটার কিনি নি। সুখেনদা বুনে দিয়েছে—"

"সুখেনদা বুনতে পারেন না কি?"

সই করতে করতেই, ঘাড় না ফিরিয়েই উত্তর দিলে—"শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাত খুন মাপও করেন।"

সই শেষ হল, ঘাড় ফিরল।

"ও কি করছ তুমি—শাড়িতে মাকড়সা উঠেছে যে একটা—কি পাগলামি—"

তাড়াতাড়ি উঠে এসে রুমাল দিয়ে আমার শাড়িটা ঝাড়তে লাগল। সেই সময় কেরানী, না কে এল একজন, লজ্জায় পড়ে গেলাম আমি। ওর কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত নেই, ঝেড়েই চলেছে, আমি যেন একটা আসবাব।

চা-ওমলেট্ শেষ হবার পর দেখলাম আর দশ মিনিটের মধ্যে যদি কলেজে না পৌঁছতে পারি, ক্লাসে যাওয়া হবে না। বললাম সে কথা। বললাম পারসেনটেজ থাকবে না।

"চল এক্ষুণি পৌঁছে দিচ্ছি তোমাকে—"

সেই সময় ফাইল হাতে ক'রে আর একজন ঢুকল। ঠিক বোমায় আগুন দিলে কেউ যেন। যাচ্ছেতাই করলে লোকটাকে।

"এতক্ষণ কি করছিলেন? বলিনি আপনাকে যে, সাড়ে বারোটার ভিতর সব তৈরি রাখবেন।"

মুখ চুন ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বেচারী।

"অপেক্ষা করুন। আমি আসছি এখুনি ঘুরে—"

তড়তড় ক'রে নীচে নেমে গিয়ে নিজের মোটর বাইকটা বার করলে।

"আমার পিঠের দিকে বসতে পারবে আমাকে ধরে'?"

"না, সে আমার বড় লজ্জা করবে।"

"লজ্জা? কিসের লজ্জা—কি মুশকিল—"

ট্যাক্সি ক'রে যেতে হল। ভাড়াটা আমি দিতে গেলাম, নিলে না কিছুতে।

আজ দেখছি সাইড্‌কারওলা বাইক। খবরটা মৃদুলা আগেই দিয়েছিল আমাকে।

রামধনের বউ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে মড়া যেন। ভয় করছে আমার।

"ঝুনুর মা, ঘুমুলে না কি ?"

"না।"

"ঘুমোও।"

"ঘুম আসছে না।"

"চোখ বুজে থাক।"

"চোখ বুজেই আছি।"

পাশেই ওর ছোট ছেলেটা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর চোখে ঘুম নেই। ও চুপ ক'রে জেগে আছে এতেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। কথা কইলে এত অস্বস্তি লাগত না। কিন্তু ও শান্ত মানুষ, ও তো কথা কইবে না, তার ওপর জ্বর হয়েছে। ঘুম হচ্ছে না কেন ওর, আশ্চর্য !

"মৃদুলা দিদি কি আসবে এখানে ?"—হঠাৎ জিগেস করলে।

"মৃদুলাদি ? জানি না তো—আসবে না বোধহয়, ওখানে ব্যস্ত আছে নানা কাজে। এতগুলি লোক খাবে তো।"

চুপ ক'রে রইল। ভারি চুপচাপ মেয়েটি, জ্বর হয়েছে বলে' নয়, যখন ভাল থাকে তখনও। ব্রাহ্মণের মেয়ে কিনা, ভদ্র খুব। শুনেছিলাম রামধন সুখেনবাবুর আত্মীয় হয় দূর সম্পর্কের। হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ে কষ্ট পাচ্ছিল, সুখেনবাবুই এনে বসিয়েছেন এখানে। আহা, আমিও যদি ব্রাহ্মণ হতাম। বাইরে মুখে যতই আস্ফালন করি, ব্রাহ্মণত্বের দিকে লোভ আছে বই কি। অব্রাহ্মণ গলায় পৈতে ঝোলালেই ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ সাজবার চেষ্টা করেন আজকাল অনেক অব্রাহ্মণ, চেষ্টা কিন্তু সফল হয় না। পৈতে নিয়ে, প্রবন্ধ লিখে, তর্ক ক'রে, যুক্তি দেখিয়ে অনেক রকম চেষ্টা অনেকে করছেন—কিন্তু সফল হচ্ছে না। বাইরে মুখে কিছু না বললেও অব্রাহ্মণকে মনে মনে সকলেই অব্রাহ্মণের শ্রেণীতেই বসিয়ে রেখেছে। অনেক অব্রাহ্মণ আজকাল দেখি ব্রাহ্মণের ছেলে-মেয়ের প্রণাম কুড়োবার জন্যে ব্যগ্র, পা বাড়িয়ে দিতে আপত্তি করেন না। আমাদের বাগানে একটা ল্যাংড়া আমগাছের মাথার উপরে পরগাছা হয়েছিল একবার। সেটাকে পরগাছা বলে' চিনতে কারও ভুল হয়নি। ল্যাংড়া গাছের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল বলে খাতিরও করে নি তাকে মালি। কেটে

ফেলে দিয়েছিল। আহা, আমি যদি ব্রাহ্মণ হতাম, আর দ্বিজেনবাবুর পালটি ঘর হতাম যদি, কি সুবিধেই হ'ত তা'হলে। দ্বিজেনবাবু জানেও না যে তার সেদিনকার কথাগুলো আমার মনে কি রকম দাগ কেটে বসে' গিয়েছিল—"সুখেনদা শুধু বুনতে পারেন না, যে বুনতে পারে তার সাতখুন মাপও করেন।" সেই দিনই উল-বোনার বই, কাঁটা, উল সব কিনিছি আমি। আঃ—আবার সব জড়িয়ে গেল, দূর ছাই!

"ঝুনুর মা, কেমন আছ—"

একি, মৃদুলা সত্যিই এসে হাজির হল যে! আরও জড়িয়ে গেল আমার সব। বলটা গড়িয়ে গেল মেঝেতে—দুত্তোর!

"ফুলু, চল খাবার দেওয়া হচ্ছে। নিমাইবাবুকে নিয়ে দ্বিজুদা এসে গেছেন। ঝুনুর মা, কেমন আছ তুমি—"

"ঘুম আসছে না কিছুতে।"

"আসবে এখুনি। পেট্রোম্যাক্সটার জন্যেই ঘুম আসছে না বোধ হয়। ওটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি এখুনি।"

মৃদুলা তার মাথার শিয়রে গিয়ে বসল। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"মৃদুলা, দেখনা বোনাটা কেমন হচ্ছে—"

নিয়ে গেলাম তার কাছে। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

"বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো, কি পরিষ্কার হাত তোমার—"

"পরিষ্কার না ছাই।"

"সত্যি, চমৎকার হয়েছে। সুখেনদাকে দেখিও, সুখেনদা এবিষয়ে অথরিটি—"

"তুমি দেখিও, আমার লজ্জা করবে। দেখাবে?"

"দেখাব। চল এবার। জায়গা হয়ে গেছে—। ঝুনুর মা ঘুমোক, ভজুয়া বসে থাক বাইরে—"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়েছে ঝুনুর মা। মৃদুলার স্পর্শটুকুর প্রত্যাশায় জেগেছিল যেন!

এগার

অবনীশের কথা

খাওয়া দাওয়ার পর দ্বিজেন প্রস্তাব করলে, চেয়ারগুলো মাঠে নিয়ে গিয়ে বসা যাক। আমার কিন্তু ইচ্ছে করছিল না বাইরে বসতে। একা থাকলে হয়ত গিয়ে বসতাম, কিন্তু দ্বিজেন আর নিমাইয়ের সঙ্গে বসে' পলিটিক্স বা সমাজনীতি আলোচনা করবার উৎসাহ পাচ্ছিলাম না এই জ্যোৎস্নারাত্রে। সুখেনের অদ্ভুত গল্প আর ফাঁকা মাঠের জ্যোৎস্না, মৃদুলার নাতিস্পষ্ট অস্তিত্ব (মৃদুলার সম্বন্ধে কি বলব তা ঠিক ভেবে পাচ্ছি না—কারণ কথা দিয়ে বর্ণনা করা যায় এরকম কিছু যে লক্ষ্য করিনি তা নয়, কিন্তু আমার মনে যা জাগছে তা ওই পর্যবেক্ষণের ফল যে নয়, তা যে অসম্ভব রকম আরও অনেক বেশী কিছু, তা-ও অনুভব করছি—আর সেই অনুভূতিটাকে আরও রঙ চড়িয়ে আরও অসম্ভব ক'রে তুলতেই ভাল লাগছে কেন জানি না)—এই সব মিলেমিশে মনের যে অবস্থা হয়েছে তাতে পলিটিক্সের কচকচি বা সমাজসংস্কারের গুরুগম্ভীর আলোচনা বরদাস্ত করা শক্ত এখন আমার পক্ষে। বারান্দার উপর ইজি চেয়ারটার উপরই শুয়ে আছি। বিজেন খেয়ে উঠেই বেরিয়ে গেল। নিরু আর ফুলুও চলে গেল রামধনের বাড়ি, সেখানেই নাকি ওরা শোবে, এখানে স্থানাভাব। সুখেন, দ্বিজেন আর নিমাই সামনের মাঠে তিনখানা চেয়ার নিয়ে বসেছে। জাতি-ভেদের সার্থকতা নিয়ে কি একটা তর্ক উঠেছে বুঝতে পারছি। ভাগ্যে চতুর্থ চেয়ার আর বাড়িতে নেই, থাকলে আমাকেও গিয়ে বসতে হত ওদের সঙ্গে। সুখেন বলেছিল একবার—"চল না, এই ইজি চেয়ারটাই ধরাধরি ক'রে মাঠে নাবাই। দ্বিজু একাই পারবে হয়তো, ওই জগদ্দল মোটর-বাইকটা যেরকম ওঠাচ্ছে নাবাচ্ছে—"

বললাম, "থাক, এইখানেই বেশ আছি আমি। তোমরা গল্প কর, আমি ততক্ষণ এক চটকা ঘুম দিয়ে নি—"

"বেশ—"

যাবার সময় সুখেন আমার কানে কানে বলে' গেল, "ওরা যাক, তারপর গল্পটা শুরু করা যাবে।"

ঘুম কিন্তু আসছে না। চোখ বুজে পড়ে আছি। চোখ দুটো পুরো বোজে নি। দুটো পাতার ফাঁক দিয়ে আবছাভাবে যা দেখতে পাচ্ছি, তা ঠিক জ্যোৎস্না-

প্লাবিত মাঠ নয়, তা বিদ্যুতালোকিত ছোট ঘর একটি, ঘরের কোণে ফোন রয়েছে, মৃদুলা ঘরে ঢুকল, কোনে কার সঙ্গে কথা কইতে লাগল—

"একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি। আমাদের কিছু কাচের প্লেট, গ্লাস আর আসন চাই। লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন ? তাহলে তো খুব ভাল হয়। তাদের ভাড়া দেব। না, না, ভাড়াটা নিতে হবে বই কি। মিছিমিছি আপনাদের খরচ করাবো কেন ? হ্যাঁ, দু'ডজন ক'রে হলেই হবে—আচ্ছা—আচ্ছা।"

স্পষ্ট শুনতে পেলাম মৃদুলার কথাগুলো। সুখেন যদিও বলে নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি মৃদুলা কে। ফুলু নিরু বেরিয়ে গেছে। মৃদুলা কিন্তু যায় নি। কি করছে ও ? কোথায় আছে ? নিরুর মুখখানা কেমন যেন মনে হল, একটু বেশী গম্ভীর, নিরু একটু গম্ভীরই কিন্তু ওর গাম্ভীর্যের তলায় যে কৌতুকটা প্রচ্ছন্ন থাকে সেটা যেন নেই মনে হল, ঘরটা আছে কিন্তু ঘরের আলোটা যেন নিবে গেছে। ওর সঙ্গী দরকার একটি। বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। দু'জনে একটু মাখামাখি হয়েছে মনে হচ্ছে। সুখেনের কাছে পাড়ব না কি কথাটা। ঝির ঝির ক'রে হাওয়া এল একটু পিছন থেকে! এসেই চলে গেল। হাওয়া নয় যেন পিওন, চিঠি দিয়ে গেল, সেই চেনা অথচ অচেনা গন্ধটার চিঠি। মৃদুলা কাছেই আছে তা'হলে কোথাও। তাকে দেখবার প্রলোভনটা সম্বরণ করতেই অনেকখানি সময় এবং শক্তি খরচ হল। আধবোজা চোখের ফাঁকে ফাঁকে নূতন ছবি ফুটে উঠছে ইতিমধ্যে। সীমাহীন সমুদ্রে তিনটে লোক হাবুডুবু খাচ্ছে—প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে। তিনটে কালো কালো মাথা দেখতে পাচ্ছি—সুখেনের, নিমাইয়ের আর দ্বিজেনের। সমুদ্রটা জ্যোৎস্নার। হাওয়া-হরকরা আবার এল। দিয়ে গেল সুগন্ধি চিঠি। হেরে গেলাম। আত্মসম্মানবোধ আর পোষাকী বিবেককে পরাজয় মানতে হল কৌতূহলের কাছে। জুতো খুলে নিঃশব্দে উঠলাম। দেখলাম দ্বিজেন নেই, সুখেন আর নিমাই বসে আছে। তর্ক করছে। নিঃশব্দচরণে ঘরে ঢুকে দেখি ওদিকের কোণের ঘরে আলো জলছে। পেট্রোম্যাক্স। কি করছে মৃদুলা ওখানে বসে'। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। দেখা পেলাম এবার। উল বুনছে বসে' মৃদুলা। নিবিষ্টচিত্তে বুনছে। পেট্রোম্যাক্সের কড়া আলোয় মুখের একপাশটা দেখা যাচ্ছে শুধু। রং ধপধপে সাদা নয়, গোলাপীও নয়, সোনালী, হঠাৎ মৃদু হাসি ,অতি মৃদু, ফুটে উঠল তার মুখে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—"দেশালাই খুঁজছেন বুঝি। দিচ্ছি, দাঁড়ান"—

—শুধু বিস্ময় নয়, আমার কেমন যেন আতঙ্ক হল। ঠিক ওই অজুহাতটাই মনে মনে খাড়া করেছিলাম আমিও, যদি ধরা পড়ে' যাই বলব দেশালাই খুঁজছি।

বললাম, "ঠিক ধরেছ। দেশালাইটা ফুরিয়ে গেল। তুমি কি ক'রে বুঝলে দেশালাই খুঁজছি।"

"যে রেটে সিগারেট খাচ্ছেন সন্ধে থেকে, দেশালাই ফুরোবে না? ক'টাই বা কাঠি থাকে একটা বাক্সে।"

উঠে এল। ঘরে ঢুকে নূতন এক বাক্স দেশালাই বার ক'রে দিলে আমাকে। আমার জন্যেই রাখা ছিল যেন!

"এত রাত্রে সোয়েটার বুনছ যে। বাইরে এমন জ্যোৎস্না—"

"আমি বুনছি না। এটা ফুলু বুনেছে, আমি একটু ঠিক-ঠাক ক'রে দিচ্ছি। ভোরে ও নিয়ে যাবে কিনা।"

"ও—"

চলে এলাম। এসেই কানে গেল সুখেন নিমাইকে বলছে, "জাতিভেদ আছে। প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে সেটা, আমরা শুধু সেটা মানছি—"

নিমাই হেসে উঠল জোরে। মনে হল হাসি নয় হ্রেষা।

"মানো তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু ওই মানাটাকে নিয়ে আস্ফালন কোরো না। প্রকৃতির নিয়ম নির্বিচারে মানে পশু, মানুষ সে নিয়ম উল্‌টে দেয়। সেই-খানেই তার মনুষ্যত্ব।"

সুখেন আমতা আমতা ক'রে বললে—"হতে পারে মনুষ্যত্ব। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব লাভ কি সবাই করতে পারে? এতগুলো বেড়া ডিঙোনো কি সোজা কথা!"

"তুমি তো হার্ডল রেসে ফার্স্ট হ'তে বরাবর। তোমার মুখে একথা মানাচ্ছে না।"

সুখেন চুপ ক'রে রইল।

তারপর বললে—"দ্বিজু তর্কটি তুলে দিয়ে সরে' পড়ল আর তুমি রাত দুপুরে কেন যে জাতিভেদ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করতে লাগলে সেইটে আমার মাথাতে ঢুকছে না কিছুতে।"

নিমাই গম্ভীরভাবে বললে—"সবগুলো না পার একটা বেড়া তোমাকে ডিঙোতেই হবে। তুমি নিজে না পার আমি পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাব—"

"কি যে উদ্দেশ্য তোদের বুঝতে পারছি না—। কিসের বেড়া? বেড়া মানে?"

"জাতিভেদের।"

"তার মানেটা কি—"

"তুমি অন্ধ না কি!"

"পাওয়ার একটু কমেছে, কিন্তু একেবারে, অন্ধ হইনি।"

ঠিক এই সময় নিমাই ডাক্তার লক্ষ্য করলে যে আমি ঘুমোচ্ছি না, সিগারেট ধরাচ্ছি। উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। বললে, "চল, দেখি ঝিজু কোথা গেল। রাত্রেই ফিরতে হবে আমাকে।"

সুখেনকে নিয়ে নিমাই চেয়ার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। বুঝলাম গোপনীয় কথা। আমার কানের জন্য নয়। দেখলাম কিছুদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কথা কইতে লাগল। নিমাই ডাক্তার মাঝে মাঝে আকাশের দিকে হাত তুলে কি একটা নক্ষত্র দেখাতে লাগল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। শুয়ে পড়লাম ইজি চেয়ারেই। আমার মনে হল আমি ঠিক বোধ হয় খাপ খাচ্ছি না এদের সঙ্গে। প্রথমত অনেকদিন বিদেশে ছিলাম, দ্বিতীয়ত লণ্ডনের ভাল ডিগ্রি পেয়েছি একটা, তৃতীয়ত এই তুচ্ছ ঘটনাটার উপর এদেশের কাগজওলারা দু'চার পোঁচ রং চড়িয়েছে, আমার ছবি ছেপেছে, আমি যে কোথায় কত টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি সে খবরটাও জানিয়েছে সবাইকে, ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা আমার পক্ষে মর্মান্তিক। শুধু পর নয়, শত্রু হয়ে পড়েছি অনেকের। আমি যে উন্নতি করেছি এইটেই আমার অপরাধ। বিলেতে যাবার আগে যে স্থানটি ছেড়ে গিয়েছিলাম ফিরে এসে সে স্থানটি খুঁজে পাচ্ছি না আর। সবাই দেঁতো হাসি হেসে ভদ্রতা করছে, একমাত্র সুখেন ছাড়া। ও-ই কেবল বদলায়নি। সুখেনের টানেই এখানে আসা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সুখেন টানটার বাহক, অদৃশ্য কোন শক্তি আমার অজ্ঞাতসারেই সম্ভবত আমাকে টেনে এনেছে এখানে। গভীর অরণ্যেও ফুল ফুটলে মধুকরের দল তার উদ্দেশ্যে ছুটে আসে, তারা ফুলটাকে দেখে আসে না, এসে তবে দেখে। সুখেন আর নিমাই ওই বাঁকটার মোড়ে অন্তর্ধান করল দেখছি। নিমাই-ডাক্তারের মতলবটা কি তা বোঝা যাচ্ছে কিছু। কিছু একটা আছেই। সুখেন এলে বোঝা যাবে সেটা। সুখেন···আশ্চর্য হচ্ছি, একটা কথা ভেবে। ওদের গোপন পরামর্শে আমি যোগ দিতে পারিনি বলে, আমাকে ওরা বাদ দিয়েছে বলে, কেমন যেন একটু অপমানিত বোধ করছি। অথচ বাদ দেবার মত কারণ তো থাকতে পারে।···দিগ্বলয়ে কোনও মেঘ নেই, সেই মেঘের ময়ূরপঙ্খী কোথায় ভেসে চলে গেছে, অজানা নদীর স্রোতে, অজানা সমুদ্রে। গাছগুলো কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ঠিক। আকাশের গায়ে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দিয়ে যে ছবি এঁকেছে তারা সে ছবির একটি রেখাও পরিবর্তিত হয়নি, ওরা মাটিতে আঁকড়ে ধ'রে অচল হয়ে আছে। কিন্তু না, ওরাও অচল হয়ে নেই, ওরাও চলছে, পৃথিবীতে কিছুই স্থির নেই, সমস্ত পৃথিবীটাই ছুটে চলেছে, সেকেণ্ডে প্রায়

আঠারো মাইল বেগে···তন্দ্রার ভিতর মোটর বাইকের শব্দটা শুনলাম, খুব জোরে বেরিয়ে গেল···মনে হল বিরাট এক মোটর-বাইকে চড়ে সবাই চলেছি, মহাশূন্য ভেদ করে···মোটর-বাইকটা গোল···সেকেণ্ডে আঠারো মাইল বেগে ছুটেছে··· নক্ষত্রদের দল কাছে আসছে আবার সরে' যাচ্ছে···নিমাই যেন সুখেনকে বলছে এখনও জাতিভেদের বেড়াটা পার হ'তে পারিনি ?

"অবন, ঘুমুলি না কি—"

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সুখেনের জন্য মনে মনে অপেক্ষাও করছিলাম, মনের ভিতর জেগেই ছিলাম। উঠে বসলাম।

"দাঁড়া আসছি—"

বলেই সুখেন ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ বেরুল না।

"চিপ্ চিপ্ চিপ্", সেই পোকাটা ইঙ্গিতে কি যেন বলল আবার। সিগারেট বার করলাম। সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে ধীরে ধীরে দেশালাই কাঠিটা বার করলাম, কিন্তু জ্বালতে সাহস হল না, মনে হল, বিস্ফোরণের যে অনিবার্য শব্দটা হবে তাতে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ঘুমন্ত শহরের বুকে অ্যাটম বম পড়লে যে সর্বনাশ হয়, তার চেয়েও ঢের বেশী সর্বনাশ, একটা সৃষ্টি বুঝি চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যাবে। "চিপ্ চিপ্ চিপ্" পোকাটাও মনে হল সাবধান করছে। বসে' রইলাম চুপ ক'রে। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, পিছনের ঘর থেকে গুঞ্জন হচ্ছে মনে হল। মনে হল, অনেক দূরে যেন নূপুর বাজছে। মৃদুলার সঙ্গে সুখেন কথা কইছে ? কি কথা···! হঠাৎ সুখেন জোরে কথা ক'য়ে উঠল।

"ফুলু ? ফুলু করেছে এটা ! চমৎকার হয়েছে তো, এমন চমৎকার আমিও পারতাম না···"

তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল আবার। একটু পরে সুখেন বেরিয়ে এল। বগলে একটা মাদুর হাতে একটা তাকিয়া।

"চেয়ারে বসতে আর ভাল লাগছে না। তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসা যাক একটু। মৃ যে হোল্ডলের ভিতর আমার তাকিয়াটা এনেছিল তা জানতামই না—"

আমার চেয়ারের সামনে সড়াৎ ক'রে মাদুরটা পেতে ধপাস ক'রে তাকিয়াটা ফেলল তার উপর, আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সিগারেটটা অসঙ্কোচে ধরিয়ে ফেললাম। দোমড়ানো তাকিয়াটায় চাপড় মারতে মারতে অস্ফুটকণ্ঠে সুখেন যেন তাকিয়াটাকে সম্বোধন করেই বললে—"ধারণাই বদলে গেল। কত ধারণাই যে বদলাতে হবে জীবনে। যাক, ভালই হল। আমি বাধা দিতে যাব কেন শুধু শুধু। ওরা থিতু হয়ে বসুক এইতো আমি চাই, ওরা নিজেদের সংসার

বুঝে নিলেই আমি সটান কাশী কিম্বা হরিদ্বার! এ সব ঝামেলার মধ্যে আর থাকছি না।..."

আবার তাকিয়া চাপড়াতে লাগল। তাকিয়ার দিকে চেয়েই বলল আবার—"আমার ধারণাটা অন্য রকম ছিল। একদম বদলে গেল। ধারণা জিনিসটা অদ্ভুত, কিছুতেই একরকম থাকে না, কি বলিস—"

এইবার আমার দিকে চাইলে স্থখেন।

বললাম, "হ্যাঁ, ঠিক মেঘের মতন। চেহারা তো বদলায়ই, অনেক সময় লোপও পেয়ে যায়।"

"ঠিক বলেছিস্"—বলেই আবার তাকিয়াটা নিয়ে পড়ল।

কাছেই যে থামটা ছিল তার গায়ে খাড়া ক'রে রেখে ঠেস দিয়ে বসল তাতে। এইবার মনোমত হল। আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাইলে।

"কি ধারণা বদলাল তোমার?"

এ প্রশ্নের উত্তরে ও আর একটা প্রশ্ন ক'রে বসল।

"জাতিভেদ মানিস তুই?"

"নানারকম জাতি আছে যখন, তখন সেটা মানতে হবে বই কি। কিন্তু সেটাকে দুর্লঙ্ঘ্য বলে মনে করি না।"

ভুরুকে যতদূর কোঁচকানো সম্ভব ততদূর কুঁচকে স্থখেন আমার হাঁটুর দিকে চেয়ে রইল। আমার মনে হল ও এ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনতে চাইছে আমার কাছে।

বললাম, "হিমালয় আছে, অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেই হিমালয়কে ডিঙিয়ে যাবার যখনই প্রয়োজন হয়েছে মানুষের, মানুষ ডিঙিয়ে গেছে—"

"নিমাই এতক্ষণ বেডা বেড়া করে চেঁচাচ্ছিল, তুমি সেটাকে একেবারে হিমালয় ক'রে তুললে। বেডাই বল, আর হিমালয়ই বল, আমি জানি জীবনে দু'টি জিনিসই হল আসল, তা বেডাও নয়, হিমালয়ও নয়—তা এই—"

এই বলে স্থখেন একবার কপালে আর একবার বুকে হাত দিলে।

"এই দু'টি জিনিসই চালাচ্ছে সকলকে, চালাবেও চিরকাল। ওরাই প্রেমিক, ওরাই ঘটক। তাছাড়া, এটা নিমাই ধরেই বা নিলে কেন যে আমি আপত্তি করব। নক্ষত্র-টক্ষত্র দেখিয়ে একেবারে ঘাবড়ে দিলে আমাকে। ও কি মনে করে আমি—"

বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আবার আমার হাঁটুর ওপর।

"ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। তুমিই বল না, যে মেয়েকে বরাবর বড়লোকের ভ্যাবাগঙ্গারাম আদুরে মেয়ে বলে ধারণা ক'রে রেখেছিলাম, হঠাৎ যদি আবিষ্কার করি যে, সে ঠিক একেবারে উল্টোটি,—স্বচক্ষে আমি দেখে এলাম রামধনের বউকে ও হাওয়া করছে বসে', স্বচক্ষে এক্ষুণি দেখলাম এমন সোয়েটার বুনেছে যা আমার—প্লীজ নোট—আমার সুদ্ধ তাক লেগে গেল। ম্‌ বললে, আনারসের চাটনিটা ও-ই করেছে বিকেলে এসেই, আমি তখন ছিলাম না, রামধনের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে টুক ক'রে কখন চাটনিটা ক'রে রেখেছে। এসব জানবার পরও জাতিভেদের মানে হয় কোনও—"

আমার দিকে চেয়ে এমনভাবে প্রশ্নটা করলে যেন আমিই জাতিভেদের প্রশ্ন তুলে বাধা সৃষ্টি করছি।

"কার কথা বলছ—"

"ফুলুর। দ্বিজু ওকে বিয়ে করতে চায়। নিমাই সুপারিশ করতে এসেছিল। মেয়েটি যখন সত্যিই লক্ষ্মী তখন আবার জাতের কথা কেন। লক্ষ্মীর কি জাত আছে ?"

"কি বলিস্ তুই—"

"বেশ, ভালই তো।"

"তোর আপত্তি নেই ?"

"কিছুমাত্র না। আমার আপত্তি থাকবে কেন ?"

"ঠিক মন থেকে বলছিস—?"

"মন থেকেই বলছি। ফুলু মেয়েটি ভাল, নিরু তো উচ্ছ্বসিত। খুব সরল না কি।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। আমার ভয় হচ্ছিল, তুই পাছে আপত্তি ক'রে বসিস।"

কথাটার তাৎপর্য তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুখেন হঠাৎ বলে উঠল—"আশা করি মামা মামীও খুশী হবেন। মামা তো নামজাদা লিবারল ছিলেন, মুসলমান বাবুর্চির হাতে প্রকাশ্যে মুরগীর মাংস খেয়েছেন কতবার। মামী বাইরে ছুঁই ছুঁই করতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও কিছু কম উদার ছিলেন না। তোকে তো বলেছি—ওই কুড়োনী মেয়েটাকে প্রণাম করতে স্বচক্ষে দেখেছি আমি। তখন কেউ জানতই না যে, ও কি জাতের মেয়ে—"

"গল্পটা তুই ভাল ক'রে বললিই না তো—"

"এইবার বলব, কফিটা খেয়ে নিয়ে জুৎ ক'রে বলা যাবে।"

"এখন আবার কফি কেন—"

"স্থ করছে যে। ও স্পিরিট স্টোভ সঙ্গে ক'রে এনেছে, না খাইয়ে ছাড়বে কি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভজুয়া দু' পেয়ালা কফি নিয়ে এল। সুখেন ধমকে উঠল— "আগে তেপায়াটা আন। রাখবি কিসের উপর?"

"এই যে আমি এনেছি—"

তেপায়াটা রেখেই মৃদুলা চলে' গেল ঘরের ভিতর।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। দেখলাম, আবার একটা মেঘ এসেছে দিগ্বলয়ের এক প্রান্তে। জ্যোৎস্নামণ্ডিত দুগ্ধধবল স্বপ্ন যেন একটা।

বারো

নিরুদ্ধ কথা

ছি, ছি, কি কাণ্ড ক'রে ফেললাম আমি তখন। আমি যে এতটা আত্মবিস্মৃত হ'তে পারি তা কল্পনাও করি নি কোনও দিও। কেঁদে ফেললাম? ছি, ছি। বিজুদার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে। মনে হচ্ছে আয়নাতে নিজেই নিজের মুখের দিকে আর চাইতে পারব না। রামধনের বাড়িতে তাদের দেওয়ালে-টাঙানো ছোট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম একবার, সরে' আসতে হল। লজ্জা করল। ভেবেছিলাম রামধনের বাড়িতেই একধারে কোথাও শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু মৃদুলা যে ফরমাসটি করেছে তা করতে হলে রাত্রে ঘুমোনো যাবে না। অত রাত্রে শুয়ে এত ভোরে আর ঘুম ভাঙবে না। তাছাড়া ওখানে শোওয়ার অসুবিধাও আছে। ঝুমুর মায়ের জ্বরটা বেড়েছে। ফুলু বসে' হাওয়া করছে তাকে। আমি যতক্ষণ ছিলাম ফুলু কেবলই গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে ফিস ফিস ক'রে গল্প করছিল আমার সঙ্গে। এতে আমার তো ঘুম হ'তই না, মাঝ থেকে ঝুমুর মায়েরও ঘুম ভেঙে যেত। চলে এলাম ভাই। বিজেনদা কিন্তু গেল কোথায়। খেয়ে উঠেই কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেছে। ওই তো সেই টিলা, যার উপর আমরা বসেছিলাম একটু আগে। কেউ তো নেই ওখানে। কোথায় গেল তাহলে ...। রাজুই বা গেল কোথায়? বাংলোতে ফিরে যাব না কি। কিন্তু সেখানে

দাদা আর সুখেনদা হয়তো গল্প জমিয়েছেন। আমি গেলেই বাধা পড়বে। বিজুবাবু তো নিমাই ডাক্তারকে পৌঁছুতে গেল। সুখেনদা নিশ্চয় গল্প ফেঁদেছেন আবার। আর মৃদুলা ঘরের ভিতর ঘোরা-ফেরা করছে অলক্ষ্যে। আড়ালে একা একা থাকতেই ভালবাসে মেয়েটা। অদ্ভুত মেয়ে মৃদুলা। খুব ভাল, কিন্তু কেমন যেন আন্‌ক্যানি, ঠিক সহজ হওয়া যায় না ওর কাছে। রাজু যাকে দেখে ভূত মনে করেছিল একটু আগে, সে আর কেউ নয়, মৃদুলাই। একটু আগে অন্ধকার কোণের বারান্দায় বসে' বসে' ও যখন ডিশগুলো মুছে মুছে রাখছিল, তখন আমারও যেন মনে হচ্ছিল, ওর গা থেকে একটু একটু আলো বেরুচ্ছে। দূর থেকে দেখেছিলাম অবশ্য, কাছে গিয়ে আর বুঝতে পারলাম না, বরং মনে হল দক্ষিণ বারান্দায় যে পেট্রোম্যাক্সটা জলছে তারি ঝলক বুঝি। মেয়েটি কিন্তু আন্‌ক্যানি। অথচ ভাল খুব।…কে আসছে দূরে…মেয়ে মনে হচ্ছে, ওড়না রয়েছে গায়ে। এই দিকেই আসছে। মৃদুলা কি? না, মৃদুলার মতো নয় তো। দেখা যাক একটু এগিয়ে। ওমা, এ যে একেবারে অন্য লোক। ঘাগরা, ওড়না, পায়ে চুমকি-বসানো নাগরা। এ আবার কোথা থেকে এল।

"আদাব—"

"আদাব। আপনাকে চিনতে পারছি না তো। কোথায় থাকেন আপনি?"

"এইখানেই। বিজেনবাবুকে খুঁজছেন তো, তিনি ওই ওদিকের খদের ভিতর বসে আছেন।"

"খদের ভিতর? কি করছেন সেখানে?"

"টর্চ জেলে কি যেন লিখছেন।"

অবাক হয়ে গেলাম শুনে। মেয়েটি মুচকি হেসে চলে গেল। কি অদ্ভুত পাতলা ওর ঘাগরা আর ওড়নার কাপড়। একেই মসলিন বলে না কি। মনে হচ্ছে যেন কাপড় নয়, জ্যোৎস্না গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। খদের ভিতর টর্চ জেলে কি লিখছে বিজেনদা? বিজেনদার খেয়ালের আর সীমা নেই। খদটা কোন্ দিকে? মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে হতো। ঘাড় ফিরিয়ে আর তাকে দেখতে পেলাম না। কোথা গেল মেয়েটি। এখানে তো চারিদিকেই উঁচু নীচু। বিজেনদা কোথায় বসে আছে কে জানে। রাজু একটা খদের কথা বলছিল সেটা চিনি। সেইদিকেই যাওয়া যাক। সত্যি অদ্ভুত জ্যোৎস্না আজ। উথলে উঠেছে যেন রূপের জোয়ার। চাঁদ শুনেছি মরা উপগ্রহ…

এই যে কর্তা এখানেই বসে আছেন দেখছি। মনে ক'রে এসেছিলাম খুব ঝগড়া করব এমনভাবে লুকিয়ে চলে আসার জন্যে। কিন্তু পারছি না, কি অদ্ভুত

সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে পাঞ্জাবী আর টিলা পায়জামায়, মাথার চুলগুলো এলোমেলো, বাতাসে উড়ছে, মনে হচ্ছে অদৃশ্য মুকুট পরানো আছে যেন মাথায়। টর্চ জ্বালা রয়েছে সত্যি, ঝুঁকে ঝুঁকে তারই আলোয় কি যেন লিখছে। কি কাণ্ড!

"আসতে পারি—?"

"হ্যাঁ, এইবার এস। আমার হয়ে গেছে—"

"কি লিখছ—?"

"পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রিজ্ সেকের পয়েন্টস্‌গুলো। বইটা তো আনিনি। ভেবে ভেবে লিখলাম। হয়ে গেছে। চল একটা টিলার উপরে ওঠা যাক। লেখবার সুবিধে হবে বলে' এখানে নেবেছিলাম।"

উঠে এসে এক হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম যে, সেই মেয়েটির কথা বলতেই ভুলে গেলাম। মনে পড়লেও দ্বিতীয় কোন মেয়ের কথা তুলতাম না। মিছে কথা বলেছিলাম তখন, বিজেনদার কাছে আর কোনও মেয়েকে সহ্য করতে পারব না আমি। কারও ছায়া পর্যন্ত নয়। আস্তে আস্তে একটা টিলার উপর উঠলাম আমরা। বিজেনদা আমার কোমর তো ধরে' রইলই, আমার হাতখানা তুলে জড়িয়ে দিলে নিজের গলায়। তারপর টিলায় উঠে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষে, যেন আমাকে প্রথম দেখছে।

"কি দেখছ অমন ক'রে?"

"তোমাকে। ভাবছি তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই আলোচনাটা শুরু করব—"

"চোখ অন্য দিকে ফেরাও, কি যে কর,—ভারি লজ্জা করছে আমার—"

"করুক। ফেরাব কি ক'রে, তুমিই তো ধরে' রেখেছ। যাক্, ও সব বাজে ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে ব্রাডলে সাহেবের বক্তব্যটা মন দিয়ে শোন। ব্র্যাডলে যা বলেছেন তাঁর এক কথায় মানে হচ্ছে, কবিতার প্রাণ কবিত্ব, আর কবিত্বের প্রাণ কবির অনুভূতি-ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রকাশ-ভঙ্গী। এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় যেখানে রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাকেই কবিতা বলব, রসোত্তীর্ণ ক'রে এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় সাধন ছাড়া কবিতার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কবিতা হচ্ছে সৃষ্টি, স্রষ্টার ছাপও তাতে থাকা চাই—"

"ব্র্যাডলে যে সাবজেক্ট্, সাব্স্টান্স আর ফর্ম নিয়ে কি সব বলেছে, তার মানে কি—"

"মানে খুব সরল। ব্র্যাডলে 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর উপমা দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখন সপ্তম স্বর্গে চড়ে আছি, স্বর্গ থেকে পতনের কথা ভাবতে রাজি নই।

আমি তোমাকেই উপমা দেব। মিছে কথা হবে না, সত্যিই তুমি একটা কবিতা, মানুষ-কবির নয় বিধাতা-কবির—"

শুনতে কি যে চমৎকার লাগছে তবু রাগের ভান করে বললাম—"কি যা তা বলছ—"

"বাধা দিও না, শুনে যাও। বিধাতা-কবির এই যে কবিতাটি—এর সাবজেক্ট্ কি? নিরুপমা। সাবজেক্ট হচ্ছে কবিতার নাম। নিরুপমা নামে আরও অনেক মেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও তোমার মতো নয়। বিধাতা তোমার মধ্যে দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তার নাম নিরুপমা না হয়ে পারুল, বকুল, এমন কি খেঁদি পুঁটি হলেও সে কাব্যের মাধুর্য কমত না। সুতরাং নামটার সঙ্গে আসল কবিতাটির নিবিড় সম্পর্ক নেই, যতটুকু আছে তা আকস্মিক যোগাযোগ। মিলটন তাঁর কাব্যের নাম প্যারাডাইস লস্ট্ না দিয়ে ধর যদি দিতেন 'দি গ্রেট ফল' বা ওইরকম একটা কিছু, তাহলে তাঁর কাব্যের মর্যাদা কমত না। কিন্তু আর একটা মজা আছে, নামকরণ একবার হয়ে গেলে তখন কাব্যের সঙ্গে নাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায় যে, কাব্যেরই একটা অঙ্গ বলে' মনে হয় তাকে। নিরুপমা বললেই তোমার চিত্রটা ফুটে ওঠে তোমাব পরিচিতদের মনে। নূরজাহান আরো অনেক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু নূরজাহান বললে অন্য আর কাউকে বুঝি না আমরা। নামের সঙ্গে কাব্যের এই সম্পর্কটির সুযোগ নেয় চোর লেখকরা। ভাল লেখকদের নামজাদা বইয়ের নামটা চুরি ক'রে ছেপে দেয় নিজেদের বইয়ের উপর। ভাবে নামের জোরে বই কাটবে। কিছুদিন কাটেও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটে পোকায়। আমি একজন মেথরাণীকে জানতাম, তার নাম ছিল নূরজাহান। প্রথম যখন নামটা শুনি একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু একবার চোখে দেখার পর—" হো হো ক'রে হেসে উঠল বিজেনদা।

আমি চমকে উঠলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

"সুতরাং এবার বোধহয় বুঝেছ সাবজেক্ট্ অর্থাৎ নামের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কটা কি—"

"বুঝেছি। আর ফর্ম?—"

"বলছি। ফর্মটা হচ্ছে বলবার কায়দা, প্রকাশভঙ্গী, বক্তব্যটাকে একটা বিশেষ ধরনে ব্যক্ত করা। কৃত্তিবাস রামায়ণের গল্পটা বলছেন সরল ভাষায় পয়ার ছন্দে। ওই ভাষা আর ওই ছন্দ মিলে যা হয়েছে তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের ফর্ম। মাইকেল মধুসূদন ওই রামায়ণের গল্পই লিখেছেন কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে শক্ত শক্ত গুরুগম্ভীর কথা দিয়ে—ওইটে হল মাইকেলের কাব্যের ফর্ম। আবার ওই রামায়ণের

গল্পই ভবভুতি লিখেছেন আলাদা ছাঁদে, আলাদা ভাষায়। তুলসীদাস লিখেছেন আর একরকম ক'রে। বিধাতা-কবি এই নিরুপমা শীর্ষক কাব্যটিও প্রকাশ করেছেন একটি বিশেষ ফর্মের মাধ্যমে, সে ফর্মটি হচ্ছে তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব। তার শ্যামল রং, পানের মতো মুখ, ছোট্ট নাক, পুষ্ট অধর, কুন্দ দন্ত, কম্বু গ্রীবা, পীবর বক্ষ—"

মুখ চেপে ধরতে হল।

"কি আরম্ভ করেছ তুমি। ওরকম কর তো উঠে যাব। ফর্ম বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এবার সাবস্ট্যান্সের কথা বল—"

"তোমার সাবস্ট্যান্স বিশ্লেষণ করলে কিছু মাংস, কিছু অস্থি, কিছু রক্ত, কিছু মেদ, কিছু মজ্জা—এই সব পাওয়া যাবে। যে কোন তরুণীর সাবস্ট্যান্সও মোটামুটি এই। সেইজন্য শুধু সাবস্ট্যান্স নিয়ে মাতামাতি করে যারা, তারা বেরসিক। পায়খানাও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়, প্রাসাদও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়, দেবমন্দিরও ইঁট দিয়ে তৈরি হয়। চুন ইঁট সুরকি সিমেন্টই বড কথা নয়, তা দিয়ে কি তৈরি হয়েছে সেইটেই হল আসল কথা। সুতরাং কাব্যে—শুধু কাব্যে কেন, যে কোনও সৃষ্টিতে—সাবস্ট্যান্সের সঙ্গে ফর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটা থেকে আর একটা আলাদা করা অসম্ভব। আলাদা করতে গেলেই কবিতা মারা যাবে। তোমাকে কেটে যদি তোমার অস্থি মাংস মেদ মজ্জা আলাদা করি তাহলে আর তুমি থাকবে না। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, ফর্ম আর সাবস্ট্যান্সের সমন্বয়ই কবিতা নয়। নিরুপমার ফোটো ব স্ট্যাচু যেমন নিরুপমা নয়। তার মধ্যে প্রাণের লীলা থাকা চাই। নিরুপমার চলনে বলনে হাসিতে ভ্রূভঙ্গে অপাঙ্গে অধরে যা বিস্ফুরিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, তার চরিত্রে বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে যা বিকশিত হচ্ছে নানা বর্ণে—তাই নিরুপমা কবিতার আসল রূপ। দেহকে অবলম্বন ক'রে অন্তরের রূপটা ফুটেছে বলেই দেহের কদর। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে রূপটাই মুখ্য। দেহটা নয়। পঙ্ককে আমরা সহ্য করি পঙ্কজিনীর জন্য। ক্যানভাসকে খাতির করি ছবির জন্য......"

"খদের ভিতরে বসে বসে এই সব লিখছিলে এতক্ষণ ধরে!"

"হ্যাঁ। এই সব লিখছিলাম, কিন্তু তার ফর্ম আলাদা—"

"তার মানে?"

"কবিতা লিখছিলাম। গদ্য ছন্দে অবশ্য। শুনবে?"

"পড়—"

দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল প্রকাণ্ড টর্চটা। বিজেনদা পড়তে লাগল—

> "নিরুপমার উপমা নেই বলে অনেকে,
>
> মানিনা সে কথা।

নিরুপমার উপমা আছে,
সে উপমা নিরুপমাই।

নিরুপমাকে রূপসী বলেছে কেউ কেউ,
কিন্তু তারা সবটা বলে নি,
কারণ তারা পুরো সত্যটাকে দেখে নি।
নিরুপমা একান্ত ভাবেই নিরুপমা,
নিরুপমা ছাড়া ও আর কিছু নয়,
কিছু হতে পারত না,
একথা না বললে সবটা বলা হয় না।
রূপসী অনেক আছে
কিন্তু সবাই নিরুপমা নয়।

রংটা যদি আর একটু ফর্সা হ'ত
নাকটা হ'ত যদি আর একটু টিকোলো'
কম-পুরু ঠোঁট দুটো হ'ত যদি,
চোখ দুটো আরও টানা-টানা হ'ত,
তাহলে হয়তো আরও রূপসী হ'ত সে
কিন্তু সে সেই নিরুপমা হ'ত না
যে আমার কল্পনাকে করেছে স্বপ্নাতুর,
চোখে পরিয়েছে মোহাঞ্জন,
রঙের পরশ লাগিয়েছে
জন্মজন্মান্তরের প্রহেলিকা-রহস্যে,

যে নিরুপমা
মহাকালকে বিলীন করতে পারে মুহূর্তে,
মুহূর্তকে প্রসারিত করতে পারে মহাকালে,
সেই শ্যামলী, ঠোঁট-পুরু নাক-ছোট নিরুপমা
বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি ;
সে অবিসংবাদিতা,
অদ্বিতীয়া।

ওকেই আমি চেয়েছি
চিরকাল চাইব্।”

টর্চ নিবে গেল। পাশাপাশি বসে আছি দু'জনে। গলার কাছটা ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়বে এখুনি, কিন্তু পড়ছে না।

হঠাৎ বিজেনদা বললে, “তুমি যখন খদের ওপার থেকে লুকিয়ে কথা কইছিলে তখন আমি এইটে লিখছিলাম।”

“আমি আবার কখন কথা কইলাম—”

“বাঃ, বললে না, আমি যদি বলি, শাহনশাহ্, আমি তোমার পূর্বজন্মের বেগম ফিরে এসেছি, চিনতে পারবে আমাকে—”

“না, আমি তো বলি নি।”

“মিথ্যুক কোথাকার—”

সেই ওড়না-পরা মেয়েটার ছবি ভেসে উঠল মনে। নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। না, বিজেনদার ভুলটা ভাঙাব না। ও মনে করুক যে আমিই এসেছিলাম। মুখের দিকে চেয়ে আছি নির্নিমেষে—হতে পারে বই কি শাহনশাহ্ ছিল…কিন্তু না, আর এখানে বসে' থাকা নয়।

“অনেক রাত হযে গেছে, চল। মৃদুলা আমাকে আবার ফরমাস করেছে ভোরবেলা কিছু কুমুদ ফুল আনবার জন্যে—ওই দূরের পুকুরটা থেকে—”

“কুমুদ ফুল? কেন?”

“কি জানি—”

“এখনই চল না নিয়ে আসি গিয়ে। বেশী দূর তো নয়—”

“চল।”

তের

বিজেনের কথা

“জোরে চালাও, আরো জোরে। ওই নক্ষত্রটা অস্ত যাবার আগে আমি আমার ছাতে গিয়ে বসতে চাই।”

মেঠো রাস্তায় প্রায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে নিমাই ডাক্তারের বাড়িতে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। নিমাই গাড়ি থেকে নেমেই ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চাইলে।

"না, এখনও অস্ত যায়নি। চল, ওপরে চল।"

"কোন্ নক্ষত্রটা ?"

"ওই যে বকুল গাছের মাথায় দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। এখনই অস্ত যাবে চল—"

"কি নাম ওটার ?"

"লুব্ধক। ইংরেজি নাম সিরিয়াস। চল ছাতে যাই—"

গাড়িটা নিমাইয়ের চাকরের জিম্মায় রেখে ছাতে উঠলাম দু'জনে। পথে একটিও কথা হয়নি। আমি একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, নিমাই উত্তর দেয় নি। ছাতে চেয়ার পাতাই ছিল। চেয়ারে বসে প্রথমেই জিগ্যেস করলাম—"সুখেনদা কি বললে—"

নিমাই চুপ ক'রে রইল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে বাম তর্জনীটা দিয়ে বাঁদিকের গোঁফটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। আমি চুপ ক'রে বসে থাকতে পারি না, ওর গোঁফের দিকে চেয়ে কতক্ষণই বা বসে থাকা সম্ভব। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করাও যুক্তি যুক্ত মনে হল না। নিমাইয়ের আকাশমুখী দৃষ্টির দিকে চেয়ে মনে হল নিমাই ছাতে নেই, আকাশেই চলে গেছে। যখন ফিরে আসবে তখন নিজেই উত্তর দেবে। লুব্ধক নক্ষত্রের দিকে আমিও মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। অদ্ভুত উজ্জ্বল নক্ষত্রটা সত্যি। পরে খবর নিয়ে জেনেছি, ওইটেই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল।

নক্ষত্রটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমিও কেমন যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। নিমাইয়ের কথাতে আমার চমক ভাঙল, কতক্ষণ পরে জানি না। নিমাই অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে বসল একটা।

"আর কি ফেরবার উপায় আছে ?"

"কোথা থেকে ?"

"ফুলুর কবল থেকে।"

"কবল মনে হলে ফেরবার উপায় নিশ্চয় বার করতাম, কিন্তু ওটা কবল বলে মনে হয় নি আমার একবারও।"

"কি মনে হয়েছে—"

"তা বলা যাবে না। তবে একটা জিনিস বলতে পারি, তুমি আমাকে এমনভাবে জেরা করবে জানলে আমি তোমার কাছে আসতাম না। তোমাকে যতটুকু বলেছি ততটুকু থেকেই তোমার বোঝা উচিত আমার মনের অবস্থাটা কি। আমি তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি, তোমার উপহাসের খোরাক জোগাতে

আসিনি। আসল কথাটা বল না। সুখেনদার কাছে পেড়েছিলে কথাটা? জাতিভেদের তর্কটা কোথায় গিয়ে ঠেকল শেষ পর্যন্ত।”

তবু নিমাই সুখেনদা প্রসঙ্গে কোন কথাই বললে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—“তোমাকে নিয়ে উপহাস করবার সময় নেই আমার, আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তবে তোমার মধ্যেও একজন উপহাস-রসিক ব্যক্তি আছেন সেটা মনে রেখ কিন্তু। নিজেই শেষ পর্যন্ত তার খোরাক না হয়ে পড, সেই কথাই আমি ভাবছি। ফেরবার উপায় যদি থাকে প্লীজ ব্যাক আউট। আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা মনোহর কিন্তু ভয়ঙ্কর। তোমাকে আমি সাহায্য করতে রাজি হয়েছি কারণ, না-পাওয়ার যে কি দুঃখ তা আমি মর্মে মর্মে জানি কিন্তু এর আর একটা দিকও যে আছে তা যদি তোমাকে না বলি তাহলে বন্ধুকৃত্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।”

“বল। ফিরে যাওযার তাডা নেই আমার।”

“সিগারেট ধরাও তা'হলে—”

নক্ষত্রটার দিকে চট্ ক'রে এক নজর চেয়ে নিমাই পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলে। আমাকে একটা সিগারেট দিলে, নিজে একটা নিলে। আমি সিগারেট ধরালাম, ও কিন্তু সিগারেটটাব দিকে নিবিষ্ট চিত্তে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে, তারপব ধবালে সেটা। ধরিয়েও চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ। আমি নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলাম ওর অন্যমনস্কতা। লক্ষ্য করতে করতে আমিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবছিলাম, ফুলু এখন কি করছে। সে কখন কার সঙ্গে কোলকাতায় ফিরবে। এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাকে সাইড্‌কারে বসিয়ে গোপনে একটা চক্কোর দিয়ে আসবার সময় হবে কি না।

হঠাৎ নিমাই বললে—“অরুণার সঙ্গে যখন আমার প্রথম্ দেখা হয় তখন আমি মেডিকেল কলেজে। থার্ড ইয়ারে পডি। কলেজের এক ডিমনস্ট্রেটারের বাডিতে আমার যাতাযাত ছিল, সেইখানেই আমি ওকে প্রথম দেখি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়েছিল। তখন ওর বয়স তের বা বড় জোর চৌদ্দ। বাঙালী মেয়ের মতো চেহারা নয়। নীল চোখ, লালচে রং, সোনালী চুল। শেলীর ছবি দেখেছিস্? অনেকটা সেই রকম। প্রথম দিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নিতান্ত পরিচিত লোককে অনেকদিন পরে অচেনা লোকের ভিড়ে দেখতে পেলে যেমন অবাক লাগে, আনন্দ হয়, আমার ঠিক তেমনি অবাক লেগেছিল, আনন্দ হয়েছিল। অরুণারও যে হয়েছিল তা তার চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝেছিলাম। পরে

অরুণা আমাকে বলেওছিল সে কথা। প্রথম প্রথম আমাদের কোনও কথাই হয় নি। আমি কোন না কোন একটা ছুতো ক'রে রোজই ডিমনস্ট্রেটারের বাড়ি যেতাম, আর সে-ও নানা ছুতোয় আমার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করত। কথাবার্তা একটিও হ'ত না, অথচ সে-ও সব বুঝত, আমিও সব বুঝতাম। আমি তখন মনে করেছিলাম, অরুণা বোধহয় ডিমনস্ট্রেটারের কোনও আত্মীয়া, কোলকাতায় পড়াশোনার জন্যে আছে। মেয়ে যে নয় তা বুঝেছিলাম। কারণ ডিমনস্ট্রেটার ভদ্রলোক বিয়েই করেন নি। চেহারার কিছুমাত্র মিল ছিল না, তাই বোন বলেও সন্দেহ হয় নি। ওসব নিয়ে মাথাই ঘামাই নি তখন। তাকে বিয়ে করতে হবে একথাও মনে হয় নি। তাকে রোজ কাছাকাছি পাচ্ছি এতেই আমি ভরপুর হয়ে' ছিলাম। ডিমনস্ট্রেটার মশাই, কিম্বা তাঁর মা আমাদের মেলা-মেশাতে বাধাও দিতেন না তেমন। বোটানিকাল গার্ডেনে একদিন পিকনিক করতে গেলেন তাঁরা। আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন। সেইদিনই অরুণার সঙ্গে প্রথম কথা কইলাম। সেইদিনই অরুণা বললে, "আমরা পরশু চলে যাচ্ছি এখান থেকে।" "কোথা যাচ্ছ?"—প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বোধ হয় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বেরোয় নি, কারণ অরুণা প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলেছিল। হেসে বললে, "জলপাইগুড়ি। ডক্টর রায় বদলি হয়ে গেছেন, শোনেন নি?" খবরটা আমি শুনিনি। খবরটা শুনে আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছিল তা ওর মুখের দর্পণে দেখলাম। ও হাসি মুখে চেয়েছিল আমার দিকে, দেখতে দেখতে ওর মুখটাও বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ সরে গেল আমার কাছ থেকে। তার দু' দিন পরেই চলে গেল ওরা—"

নিমাই সিগারেটটা ফেলে দিয়ে মাথার চুলগুলো দু' হাতে মুঠো ক'রে ধরে' কয়েক সেকেণ্ড বসে রইল মাথা নীচু ক'রে। তারপর উঠে দাঁড়াল। সোজা চলে গেল ছাতের রেলিঙের কাছে। চেয়ে রইল নক্ষত্রটার দিকে। নক্ষত্রটা তখন বকুল গাছের আড়ালে চলে গেছে।

"চিঠিপত্র চলেছিল নিশ্চয়।"

আমি একটু ইতস্তত ক'রে প্রশ্নটা করেই ফেললাম অবশেষে। আমার কৌতূহল হয়েছিল বলে' নয়, ওকে আকাশ থেকে মাটিতে টেনে আনবার জন্যে। ফল হল। নিমাই রেলিঙের ধার থেকে সরে এসে চেয়ারে বসল।

"চলেছিল। একটা দু'টো নয়, অনেক। কিন্তু মাত্র তিন মাস। ওর চিঠি থেকেই জেনেছিলাম যে, ও ডক্টর রায়ের আপনার লোক নয়। ওর মা ওঁরাও, বাপ এক মিলিটারি সাহেব। অবৈধ রিরংসার ফলে গত যুদ্ধের সময় জন্ম হয়েছিল

ওর। যথাসময়ে সাহেব দেশে ফিরে গেলেন যথারীতি। ডক্টর রায় তখন বাঁচিতে। সাহেবের সঙ্গে ডক্টর রায়ের আলাপ ছিল, সেই সূত্রে ওর মা ও মেয়েটি এসে ডক্টর রায়ের কাছে আশ্রয় নিলে। আশ্রয় নিতে বাধ্য হল, কারণ নিজেদের সমাজে ওর স্থান হয় নি। ওর মাও বেশি দিন বাঁচে নি। অরুণা হবার মাস ছয়েক পরেই মারা যায়। সেই থেকে অরুণাকে ডক্টর রায়ই মানুষ করছেন।"

নিমাই থেমে গেল।

"তারপর ?"

"তিন মাস পরে অরুণা হঠাৎ চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে দিলে।"

নিমাই আবার চুপ ক'রে গেল। চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ।

"তারপর ?"

"তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল।"

"হারিয়ে গেল মানে ?"

"মানে তরে আর কোন খোঁজ পেলাম না। আমার তখন পরীক্ষা সামনে, তবু আমি জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। শুনলাম, জলপাইগুড়ি থেকেও ডাক্তার রায় চলে গেছেন। কেউ বললে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাটনায় গেছেন, কেউ বললে কটকে গেছেন। দু' একজন মজঃফরপুরেরও নাম করেছিল। তিন জায়গাতেই গেলাম আমি, কিন্তু আর তাদের নাগাল পেলাম না।"

"তারপর ?"

নিমাই আবার চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর হঠাৎ হেসে বললে—"তারপর ফেল করলাম। একবার নয়, দু'বার। বকুনি দেবার মতো হিতৈষী কেউ ছিল না আমার। ব্যাঙ্কে ছিল বাবার সঞ্চিত অর্থ। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টেণ্ট নরেনবাবু ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু। তিনি একদিন সস্নেহে ভর্ৎসনা করলেন একটু। তাঁর ভর্ৎসনাটা নয়, স্নেহটা কাবু ক'রে ফেললে আমাকে। এখন মনে হয়, সেই সময়টা যদি পড়াশোনায় না মেতে অরুণার খোঁজ করতাম তাহলে হয়তো তাকে ধরতে পারতাম। আই কার্স দ্যাট নরেনবাবু নাউ। ধরবার অনেক পথ ছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পারতাম অন্তত একটা। কিন্তু আমি কিছুই করলাম না, বসে' বসে' অ্যানাটমি মুখস্থ করতে লাগলাম খালি। অরুণাকে কিন্তু আমি ভুলিনি। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন সূর্যের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, অরুণার স্মৃতিও তেমনিভাবে আমার মনে আঁকা ছিল। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকের মনেও যেমন বিশ্বাস থাকে যে সূর্য আবার উঠবে, আমার মনেও তেমনি বিশ্বাস ছিল-যে, অরুণাকে আবার পাব। এখনও আছে।..."

আবার উঠে পড়ল নিমাই, আবার রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, আবার চেয়ে রইল লুব্ধকের দিকে। লুব্ধক তখন আরও নেমে গেছে, বকুল গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছে।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল—"এতকাল আমরা জানতাম না যে, পৃথিবীই ঘোরে, নক্ষত্র ঠিক থাকে। আমরাই দূরে সরে' যাই বলে মনে হয় নক্ষত্র বুঝি অস্ত যাচ্ছে। নক্ষত্র অস্ত যায় না।"

"অরুণার কথা বল—"

"অরুণাকে খুঁজে পেলাম না। পড়তেই লাগলাম। এম বি. পাশ ক'রে বিলেত চলে গেলাম। যতদিন টাকায় কুলিয়েছিল বিলেতেই ছিলাম। গোটা তিনেক ডিগ্রী যখন জোগাড় হ'ল, জার্মানি যাব কি না যখন ভাবছি তখন হঠাৎ ব্যাঙ্কে খবর দিলে টাকা ফুরিয়েছে। ফিরে আসতে হল। যখন ফিরে এলাম তখন আমি কপর্দকহীন। অরুণাকে কিন্তু ভুলিনি। যদিও আর খোঁজবারও চেষ্টা করিনি তাকে। মনে মনে একটা দৃঢ় ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। ভেবেছিলাম ইতিমধ্যে আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে তার উপযুক্ত ক'রে তোলা, সে যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তখন আমাকে পেয়ে যেন গৌরব অনুভব করে। বিলেতে পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিলাম, অরুণাই ছিল প্রেরণা।"

আবার চুপ করল নিমাই। সিগারেট ধরাল একটা। দু'চার টান খেয়ে শুরু করল আবার।

"আমি যখন ফিরলাম তখন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিল্। সুতরাং চাকরির চেষ্টা করতে হল। ছেলেবেলায় একবার স্বদেশীর দলে যোগ দিয়েছিলাম বলে' সরকারের ব্ল্যাকবুকে নাম উঠেছিল। সরকারী চাকরি জুটল না। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াল যে, মেসের খরচ চালাতে পারি না। এমন সময় আমার এক বন্ধু এসে চাকরির খবর দিলে। একটা বিজ্ঞাপন দেখালে এসে। সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ে একটি শয্যাশায়ী রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্যে ডাক্তার দরকার একজন। মাসিক বেতন ৫০০্ টাকা, তাছাড়া খাবার খরচ এবং থাকবার বাড়ি পাওয়া যাবে। বিলিতি ডিগ্রি থাকলে ভাল হয়। দিলাম দরখাস্ত ক'রে। পোস্টবক্সে ঠিকানা দেওয়া ছিল। দিন পাঁচ সাতের মধ্যেই পেয়ে গেলাম চাকরিটা। দেখলাম আমাকে বাহাল করছেন একজন সাহেব,—মিস্টার হডসন, বোম্বাই থেকে। একটু আশ্চর্য হলাম। কে ইনি? যাই হোক, অভাবের তাড়নায় বেশী গবেষণা করবার সময় ছিল না। সোজা চলে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম জানিস?"

"কি—"

"রোগী নয়, রোগিনী, আর সে রোগিনী অন্য কেউ নয়, অরুণা। টি-বি হয়েছে। অরুণার সঙ্গে দেখা হবে সে বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু তাকে এ ভাবে দেখব তা ভাবি নি। অরুণাও দেখবামাত্র আমাকে চিনতে পারলে। তার বড় বড় নীল চোখ দুটো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কিন্তু হাসিটি দেখলাম ম্লান হয়ে গেছে। ম্লান হেসে বললে, 'নিমাইবাবু, আপনি এতদিনে এলেন। কতদিন যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করেছি মনে মনে। আমি জানতাম আপনি আসবেন, যাক, শেষ সময় তবু দেখাটা হল। দেখলাম, চোখের কোণে জল টলমল করছে। পরীক্ষা ক'রে দেখলাম তাকে, এক্স-রে প্লেট দেখলাম, সব রিপোর্ট পড়লাম। আশা হ'ল বেঁচে যেতেও পারে। বললাম, ভয় কি। তোমার সাংঘাতিক তো কিছু হয় নি। ভাল হয়ে যাবে। সে চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ, চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, না, আমি আর বাঁচব না। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা আর করবেন না।"

"কেন?"

"বেঁচে আমার সুখ নেই।"

আমি মনে মনে বললাম, বাঁচাবই তোমাকে।

তারপর তার ইতিহাস শুনলাম।

নিমাই উঠে দাঁড়াল আবার। আবার চলে গেল রেলিঙের ধারে। লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। অস্ত হয় তো যায় নি ঠিক, কিন্তু গাছপালার আড়ালে এত নেবে গেছে যে আর দেখা যাচ্ছে না। নিমাই কিন্তু বললে, "এখনও দেখা যাচ্ছে। তুই দেখতে পাচ্ছিস—?"

"না।"

"এদিকে সরে আয়। ওই যে—"

উঠতে হল।

'কই?—"

"ওই যে—"

খুব ঝুঁকে নিমাই দেখতে লাগল, আমারও ঘাড়টা ধরে যতদূর নোয়ানো সম্ভব নুইয়ে জিগ্যেস করলে, "এবার দেখতে পাচ্ছিস? ওই যে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছে—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

"তুই অন্ধ—"

আমি ফিরে এসে চেয়ারে বসলাম। একটু পরে নিমাইও এল।

এসেই শুরু করল—"ডাক্তার রায় অরুণার বিয়ে দিয়েছিলেন এক সাঁওতাল খৃস্টানের সঙ্গে। সাম্ মিস্টার কচ্ছপ। সে-ও ডাক্তার। অরুণার মা টি-বি-তে মারা গেছেন জেনেও লোকটা অরুণাকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কিছুদিন পরে ওদেরও টি-বি হল। অরুণা আর তার স্বামী দুজনেরই। অরুণার বাবা, মানে সেই কর্ণেল সাহেব একেবারে বিবেকবুদ্ধি-বর্জিত লোক ছিলেন না। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের ফলে তিনি যখন জানলেন যে, তাঁর অবৈধ প্রণয়ের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে-- তখন তার নামে বেশ একটা মোটা টাকা তিনি বোম্বাইয়ের এক ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিলেন। বোম্বাইয়ের তাঁর বন্ধু মিস্টার হডসন ব্যবসায় উপলক্ষে থাকতেন, তাঁরই জিম্মায় টাকাগুলো দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, অরুণার যখনই দরকার হবে তখনই তাকে এ টাকা যেন দেওয়া হয়। ডাক্তার রায়কেও এ কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। ডাক্তার রায় এ টাকা স্পর্শ করেন নি। অরুণার সমস্ত খরচ তিনিই বহন করতেন। তাকে কন্যাবৎ পালন করেছিলেন তিনি। দেবতুল্য লোক ছিলেন ডাক্তার রায়। অরুণার সঙ্গে কচ্ছপের যখন বিয়ে হয়ে গেল, আর বিয়ের পর দু'জনেই যখন যক্ষ্মাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তখনই দরকার হ'ল টাকাটার। ডাক্তার রায় ডাক্তার কচ্ছপকে বললেন, অরুণার যে টাকা আছে তা দিয়ে তোমরা কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় অনায়াসেই একটা ছোটখাট বাড়ি কিনে বাস করতে পার। তিনিই সন্ধান ক'রে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে ওই বাড়িটা তাদের কিনে দিয়েছিলেন।" নিমাই আবার চুপ করল।

মনে হল পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার রায় কোথায় থাকেন?"

"সাউথ ইণ্ডিয়ায়। কিছুদিন হল তিনিও মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি একবার। অরুণার এই ইতিহাস তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি। অরুণা আমাকে কিছু বলে নি।"

"তার যে বিয়ে হয়েছিল, একথাও বলেনি?"

"না।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—"না, বলেনি। নোট দিস্।"

"তুই কিছু জিগ্যেস করিস নি?"

"করেছিলাম। কি ক'রে সে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে এসে হাজির হল, নার্সের মাইনে, ডাক্তারের মাইনে, ওষুধ-পত্রের খরচ, খাওয়ার খরচ কি ক'রে চলছে এসব জিগ্যেস করেছিলাম বইকি। সে উত্তরে বলেছিল, আমি কিছু জানি

না, বাবা সব ব্যবস্থা করেছেন। ডাক্তার রায়কে অরুণা বাবা ব'লে ডাকত। তার কাছেই আমি ডাক্তার রায়ের ঠিকানাও পেয়েছিলাম।

"তারপর ?"

নিমাই কোন উত্তর দিলে না। দুহাতে মুখ ঢেকে চুপ ক'রে বসে রইল অনেকক্ষণ।

"অরুণার স্বামী ডাক্তার কচ্ছপ মাস ছয়েক আগে মারা গিয়েছিলেন। একথা আমি জানতামই না। নার্স বা চাকররাও জানত না, কারণ তারাও আমার আসার ঠিক মাসখানেক আগেই বাহাল হয়েছিল। ডাক্তার কচ্ছপের সময় যে নার্স, চাকর ছিল তারা তার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই চলে যায়। কেন যায় তা পরে বুঝেছি, তখন বুঝতে পারিনি। ডাক্তার কচ্ছপ যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন অরুণার জন্যে কোনও ডাক্তার দরকার হয়নি। তিনি নিজেই নিজের এবং অরুণার তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরই ডাক্তারের প্রয়োজন হল, মিস্টার হডসন তখন আমাকে পাঠালেন। আমি এসব খবর পরে শুনেছি, অরুণা আমাকে কিছুই বলেনি।"

নিমাই হঠাৎ উঠে আবার আলসেটার কাছে চলে' গেল। খুব-ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। লুব্ধক তখন অস্ত গেছে। কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

নিমাই ফিরে এসে বললে—"খুব উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় যদি দাঁড়াতে পারতাম তাহলে ওটাকে এখনও দেখতে পেতাম। কাল আবার পাব।"

"তারপর কি হল বল।"

"তারপর কি হল তা বলবার আগে আমি তোমাকে আমার তখনকার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে অনুরোধ করছি। কল্পনা করতে পারা শক্ত, তবু চেষ্টা কর। যে অরুণার কথা আমার মনে তীরের মতো গেঁথেছিল এতদিন ধরে, যাকে আমি একদিন না একদিন পাবোই জানতাম, সেই অরুণাকে যখন আমি এমন অবস্থায় পেলাম যে তার জীবনমরণ নির্ভর করছে আমার বিদ্যা-বুদ্ধির উপর, তখন আমার একমাত্র কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার বিস্তারিত বর্ণনা আশা করি নিষ্প্রয়োজন। দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন, আমি একাই চিকিৎসা-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করতে আরম্ভ করলাম। টেলিগ্রাম ক'রে প্রায় তিন চারশো টাকার বই-ই আনিয়ে ফেললাম। যত রকম ওষুধ, যত রকম খাবার, যত রকম ইন্‌জেকশন, সুলভ, দুর্লভ যত রকম যা কিছু সমস্ত সংগ্রহ করেছিলাম তার জন্যে। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। অরুণা বাঁচল না, তাকে বাঁচতে দিলে না।"

"কে—"

"তার স্বামী। ডাক্তার কল্লপ—"

"কি রকম—"

আমি ইজি চেয়ারে ঠেশ দিয়েছিলাম। উঠে বসলাম।

নিমাই বললে, "আমি প্রথম বুঝতে পারতাম না অরুণার ওজন বাড়ছে না কেন। ভাল ভাল খাবার তাকে প্রচুর খাওয়ানো হ'ত, কিছু ওজন বাড়া উচিত ছিল, কিন্তু বাড়ছিল না, বরং কমছিল।

আমি নার্সকে জিগ্যেস করতাম—ঠিক খায় তো। আমার মন যদিও সদাসর্বদা অরুণাময় হ'য়ে থাকত কিন্তু আমি নিজে তার কাছে পারতপক্ষে থাকতাম না। আমি কাছে থাকলে সে বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ত, একদিন আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, আমি কিছুতে আর ছাড়াতে পারি না। যক্ষ্মারোগের ওটা একটা বড় লক্ষণ। তারা প্রায় কামুক হয়। আমি পণ করেছিলাম তাকে বাঁচাব, তাই যথাসাধ্য তার কাছ থেকে সরে থাকতাম। নার্সই তাকে ওষুধ খাওয়াতো, খাবার খাওয়াতো। আমার প্রশ্নের উত্তরে নার্স বললে, "খানতো উনি সব, কিন্তু বমি ক'রে ফেলেন বাথরুমে গিয়ে।" "বমি ক'রে ফেলেন ? কেন ?" নার্স চুপ ক'রে রইল। তারপর নার্স বললে "কেন, তা আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। খাবার ঠিক পরেই জানলার দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ, জানলার সামনেই যে শ্যাওড়া গাছটা আছে সেই দিকে। তারপরই কেমন যেন হয়ে যান, বাথরুমে ঢুকে পড়েন, তারপরই বমির শব্দ শুনতে পাই।" বললাম, "তুমি একথা আমাকে বলনি কেন ?" সে ভয়ে ভয়ে বললে, "উনি মানা করেছিলেন।" নার্সকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসন করলাম। তারপর অরুণাকে জিগ্যেস করলাম, "তোমার বমি হয়ে যায় একথা আমাকে বলনি কেন ?" অরুণা চুপ ক'রে রইল। দেখলাম, তার চোখে একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি বললাম, "আজ তোমাকে আমার সামনে খেতে হবে। খাওয়ার পর তোমাকে একটা ওষুধও দেব যাতে বমি না হয়। তোমার যা অসুখ হয়েছে তাতে খাওয়াই হ'ল আসল জিনিস। ভাল ভাল খাবার খেয়ে যদি হজম করতে পার তাহলে দু'দিনে সেরে উঠবে। খাওয়া আর বিশ্রাম এই দুটিই হল আসল জিনিস।" অরুণা চুপ ক'রে রইল। তখন রাত খুব বেশী হয় নি। অরুণাকে সামনে খাবার খাইয়ে, ওষুধ খাইয়ে আমি পাশের ঘরে এসে বই ওল্টাচ্ছিলাম। বার করবার চেষ্টা করছিলাম বমির জন্য আর কি কি ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। অরুণার পাশের ঘরেই থাকতাম আমি। হঠাৎ শুনলাম মোটা গলায় কে যেন বলে উঠল—"গলায় আঙুল দাও। দাও—"

…পরমুহূর্তেই বমি করার শব্দ পেয়ে ছুটে গেলাম। দেখতে পেলাম, সাদা

কোট-প্যান্ট-পরা একটা লম্বা কালো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে জানলার সামনে। আমাকে দেখেই সরে গেল। ঘরের মেঝে দেখি বমিতে ভেসে যাচ্ছে। অরুণা বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে হাঁপাচ্ছে। আমি অরুণাকে বিছানায় শুইয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। জানলার কাছে কে এসেছিল, কেন এসেছিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসরই পেলাম না তখন। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, পাল্‌স-রেট হানড্রেড এণ্ড সিক্‌স্‌টি। গোঙাচ্ছে না এ রকম অবস্থা। গোটা দুই ইন্‌জেকশন দেবার পর অনেক কষ্টে সামলাল। নার্সকে বসিয়ে আমি উঠে যাচ্ছিলাম, অরুণা নার্সের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি যাও।" নার্স উঠে গেল। অরুণা তখন আমাকে বললে, "আপনি যাবেন না, আপনি বসুন। আর একটু সরে' আসুন না এদিকে! আপনি কাছে বসে থাকলেই আমি ভাল হয়ে যাব। ওষুধ বিষুধ লাগবে না। আপনি দূরে দূরে সরে থাকেন কেন? আর একটু কাছে এসে বসুন ন।" নিজেই সরে এল আমার কাছে। দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কি বলব, কি করব, মাথাতেই এল না খানিকক্ষণ। হঠাৎ অনুভব করলাম, অরুণা কাঁদছে। তার চোখের জলে আমার কামিজ ভিজে যাচ্ছে। এতক্ষণ অরুণাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সেই কালো লোকটার কথা মন থেকে একেবারে সরেই গিয়েছিল। কথাটা পরে ভেবে খুব আশ্চর্য হয়েছি। অত বড় একটা ঘটনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য। মেঘের আড়ালে সূর্য চন্দ্র যেমন লুপ্ত হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি। হঠাৎ কিন্তু মনে পড়ল আবার। অরুণাকে জিগ্যেস করলাম—"একটু আগে কার সঙ্গে কথা কইছিলে? কেউ এসেছিল কি?"

"কই, কেউ না তো। আপনি আর একটু সরে আসুন না।" দু'হাত দিয়ে আমাকে আরও জোরে জাপটে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি উঠে পড়লাম।

"ঘুমোও। আমি পাশের ঘরেই আছি। নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে বরং এসে একটু হাওয়া করুক তোমাকে—"

"ন, নার্সকে আসতে হবে না। কেউ ঘরে থাকলে ঘুম হয় না।"

"তাহলে আমাকে থাকতে বলছ কেন?"

"জেগে থাকব বলে। সমস্ত রাত জেগে থাকব।"

"না, ঘুমোও—"

চলে গেলাম। মনকে স্তোক দিলাম যা শুনেছি বা যা দেখেছি তা আমার মনের ভুল। সাহেবী পোশাক পরা কাফ্রির মতো চেহারা, এ রকম লোক তো এ অঞ্চলে চোখেই পড়েনি কখনও। কোথা থেকে আসবে ওরকম লোক। এলেও

গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে বলবে কেন। সকালেই কিন্তু ভুল ভাঙল। অরুণার পুষ্টির জন্ম যত রকম খাবারের আয়োজন আমি করেছিলাম, সকালে উঠে দেখি তার কিছু নেই। ছত্রিশটা মুরগী ছিল, প্রত্যেকটির গলা মোচড়ানো। শুধু গলা মোচড়ানো নয়, প্রত্যেকটি ছিন্ন-ভিন্ন করা। চারটে বড় বড় ছাগল ছিল দুধের জন্ম, সকালে দেখা গেল চারটেই মরে' পড়ে আছে। ভাঁড়ারের সমস্ত খাবার চারদিকে ছড়ানো, ডিমগুলো ভেঙে চুরমার, হর্লিকসের শিশি, ওভালটিন, মাখন, চীজ, কলা, কমলালেবু, চাল, ডাল, তরকারি, ওষুধপত্র সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে কে যেন ফেলে দিয়েছে চারদিকে। আমার ব্যাগটা পর্যন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে। চাকর আর বাবুর্চি এসে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে' গেল। নার্সও যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তাকে অনেক অনুরোধ করাতে সে থেকে গেল। আমি যে কি করব ভেবে পেলাম না। প্রথমেই মনে হল, অবিলম্বে খাদ্যদ্রব্যের জোগাড় করতে না পারলে সকলকেই অনাহারে থাকতে হবে। আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বাজার বেশ খানিকটা দূরে। অরুণাকে গিয়ে বললাম, "এখানে কি কোন বন্যজন্তুর উপদ্রব হয়েছে ইতিপূর্বে ?"

"না। কেন বলুন তো—"

বললাম। শুনে সে চুপ ক'রে রইল। দেখলাম, তার চোখে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ভাবলাম অরুণার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা ক'রে কোন লাভ নেই। ভয় পেলে অসুখ বেড়ে যাবে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ আর না তোলাই ভাল।

ঠিক করলাম নিজেই বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র সব কিনে নিয়ে আসি, আর পুলিশকেও একটা খবর দিয়ে আসি। তখনও আমি মনকে স্তোক দিচ্ছি যে কোনও বদমাইস লোক হয়তো এসে এই সব করেছে। নার্সকে বলে' গেলাম, তুমি অরুণার কাছে থাকো। আমি জিনিসপত্র সব কিনে আনি গিয়ে। পুলিশেও একটা খবর দেওয়া উচিত। একটা রাঁধুনীও জোগাড় করতে হবে। আমার ফেরার কথা দুপুরে। কিন্তু যখন ফিরলাম তখন রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। সেদিনও আজকের মতো পূর্ণিমা রাত্রি ছিল। আমার ফিরতে দেরি হ'ল একটা অদ্ভুত কারণে। জিনিসপত্র সব কিনে একটা গরুর গাড়িতে সেগুলো বোঝাই ক'রে থানায় গেলাম। দারোগাবাবু ছিলেন না, তাঁর অপেক্ষায় ঘণ্টা দুই বসতে হল। তিনি এসে সব শুনে বললেন, কোন বদমাইসেরই কাণ্ড। যাই হোক, কোন ভয় নেই, তিনি এসে এনকোয়্যারি ক'রে সব ঠিক ক'রে দেবেন। মাল-বোঝাই গরুর গাড়িটাতে চেপে বসলাম। খানিকক্ষণ বেশ এলাম। বেশ বড় বড় জোয়ান বলদ, মনে হল

রাত আটটা নাগাদ পৌঁছে যাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে আমরা প্রকাণ্ড একটা মাঠে এসে পড়লাম। মাঠে এসে গরু দুটো হঠাৎ কি যেন দেখে ভড়কে গেল, তারপর ডান দিকে ফিরে ছুটতে লাগল। সে কি ছুট! গাড়োয়ান প্রাণপণে রাশ টেনে ধরেছে, কিন্তু তাদের থামাতে পারছে না। হঠাৎ রাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেল। উদ্দাম বেগে ছুটতে শুরু করল তখন গরু দুটো। ছুটতে ছুটতে শেষে হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়ল একটা নদীতে, পা পর্যন্ত কাদায় পুঁতে গেল তাদের, আমার জিনিসপত্র কিছু রাস্তাতেই পড়ে গিয়েছিল, বাকীটা পড়ল নদীর জলে। আমি লাফিয়ে নেবে পড়লাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফিরলাম। ফিরে দেখি চারদিকে নিশুতি। নার্সের নাম ধরে ডাকলাম কয়েকবার, সাড়া পেলাম না। সন্তর্পণে অরুণার ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম অরুণা ঘুমুচ্ছে। তাকে আর জাগাবার চেষ্টা করলাম না। ভাবলাম নার্সও হয়তো নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু রাগ হল, অরুণার কাছেই তার থাকবার কথা। আচ্ছা দায়িত্বজ্ঞানহীন তো। তখনও বুঝতে পারি নি সেও মারা গেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। একবার ইচ্ছে হল অরুণার কাছেই জেগে বসে' থাকি। যদি থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না হয়তো। কিন্তু অরুণার ভালোর জন্যে তার কাছ থেকে বরাবরই সরে' ছিলাম, অত্যন্ত কষ্ট ক'রে, নিরতিশয় আত্মনিগ্রহ ক'রে সরে' ছিলাম, সেদিনও সরে' গেলাম। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ চেষ্টা করেছিলাম জেগে থাকতে। কিন্তু পারি নি। ঘুম ভাঙল আবার সেই গলার আওয়াজে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। শুনলাম, পাশের ঘরে মোটা গলায় কে যেন গুণছে—"চল্লিশ, একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ। থামছ কেন, আরও কর —তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ—" বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখলাম, সেই কালো লম্বা লোকটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর তার সামনে অরুণা উঠ-বোস করছে। রেগুলার উঠ-বোস করছে।

"কে—কে—কে তুমি"—চীৎকার ক'রে ঘরে ঢুকে পড়লাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল লোকটা। অরুণা দেখি মেঝেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। নাড়ি দেখে বুঝলাম, তার শেষ সময় উপস্থিত। পাঁজা-কোলা ক'রে তুলে বিছানায় শোয়ালাম তাকে। আমার দিকে চাইলে একবার অরুণা, তারপর হাসলে একটু। বললে, "আপনাকেও এ জীবনে পেলাম না। কিন্তু আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব।"

আমি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না। তার রক্তাক্ত অধরে চুমো খেলাম একটা।

"কোথায় অপেক্ষা ক'রে থাকবে অরুণা ?"

"ওইখানে—"

আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম জানালা দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে লুব্ধক জলছে দপ্‌ দপ্‌ ক'রে।

"ওই নক্ষত্রে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে ?"—

"হ্যাঁ, ওই নক্ষত্রে অপেক্ষা করব। আপনি আসবেন ওখানেই।"

ওই তার শেষ কথা। একটু পরেই সে মারা গেল।

অনর্গল কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিমাই।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। আমি তো চুপ ক'রে ছিলামই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর নিমাই উঠে বসল, সিগারেট ধরাল একটা। আমাকেও একটা দিলে। তারপর বলল, "তোমাকে এ গল্প শোনালাম একটি কারণে। ফাঁদে পা দেবার আগে ফাঁদের স্বরূপটা জেনে নাও। বিবাহিতা অরুণা স্বামীকে ভালবাসে নি, আমাকে ভালবেসেছিল। এখনও ভালবাসে। অথচ তার স্বামী তার জন্যে না করেছিল কি ? বাংলা ভাষা শিখেছিল, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছিল, যক্ষ্মারোগ বরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাকে ছিনিয়েও নিয়ে গেল, কিন্তু অরুণা তবু তাকে ভালবাসে নি। আমি জানি ভালবাসে নি। তুমি আজ যে আগ্রহ নিয়ে ফুলুকে বিয়ে করতে চাইছ, ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে কচ্ছপও একদিন অরুণাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে অরুণাকে চিনত না। তুমি ফুলুকে ঠিক চিনেছ তো ?"

"নিশ্চয় চিনেছি। সুখেনদা কি বললে তাই বল।"

"আমি যখন সুখেনকে অনুরোধ করেছি তখন তাকে রাজি হতেই হবে। তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, যা নিয়ে দরকার তা সুখেনের এলাকায় নয়, তোমার এলাকায়। আমি নিজের জীবনের সত্য অভিজ্ঞতা থেকে সে এলাকায় কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলাম শুধু।'

জ্যোৎস্নায় আকাশ-পৃথিবী স্বপ্নাতুর। আকাশের প্রেম যেন জ্যোৎস্না হয়ে এসে পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরেছে। মাঠের মধ্যে দিয়ে একা চলেছি। মোটর বাইকের আওয়াজও মোলায়েম হয়ে এসেছে এই জ্যোৎস্নায়। কেবলই মনে হচ্ছে—আহা, ফুলু যদি এসময়ে কাছে থাকত। নিমাইয়ের গল্পটা মনে পড়ছে মাঝে মাঝে। অদ্ভুত গল্প, কিন্তু গল্প। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতোই এ গল্পও যুগপৎ সত্য এবং

মিথ্যা। আরব্য উপন্যাসের গল্প যেমন আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, নিমাইয়ের গল্পও করবে না। নিমাইয়ের অভিজ্ঞতা নিমাইয়ের কাছেই সত্য, সে নক্ষত্র-লোকে তার প্রিয়ার সন্ধান করুক। আমি চাইব আমার ফুলুকে। সমস্ত বাধা সত্ত্বেও চিরকাল চাইব।

চৌদ্দ

অবনীশের কথা

কফি খাওয়ার পর সত্যিই আমরা দুজনেই বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। যে সব জটিলতা, যে সব আবছা-স্বপ্ন, আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল তা যেন সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো কেটে গেল। শুধু তাই নয়, মনটা শিশুর মতো যেন স্বচ্ছ সজীব পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ সেই মন হয়ে গেল, যে মন সাগ্রহে রূপকথা শোনে, যে মন অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করে না। বাইরের যে সব ঝামেলা সুখেনের মনকে বারবার বিক্ষিপ্ত ক'রে গল্পের রস ভঙ্গ করছিল, সেসব ঝামেলাও অন্তর্ধান করেছিল জ্যোৎস্না-রাত্রির গভীরতার মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে পরে 'চিপ্ চিপ্ চিপ্' ক'রে সেই পোকাটা ডাকছিল বটে, কিন্তু তা সুখেনের মনকে বিক্ষিপ্ত করছিল না। পোকার ডাকে বিচলিত হওয়ার মতো মনই নয় সুখেনদার। সে তাকিয়াটায় ঠেশ দিয়ে বেশ জুৎ ক'রে বসেছিল, আর বেশ জুৎ ক'রেই শুরু করেছিল গল্পটা।

"আমি যখন শুয়োরের দাঁতটা নিয়ে এলাম, আমাদের পূর্ণ-পুরুত তখন বাইরে অলক্ষ্মীর পূজো নিয়ে ব্যস্ত!"

"অলক্ষ্মীর?"

"হ্যাঁ। লক্ষ্মীপূজোর আগে অলক্ষ্মী-বিদায় করতে হয়। আমাদের দেশ ভদ্র দেশ তো, বিদায় করবার সময়ও পূজো ক'রে তবে বিদায় করে। অনেকে বলে ভয়ে পূজো করে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না, আমার মনে হয়, ওটা আমাদের ভদ্রতা। আমরা কাউকেই কষ্ট দিতে পারি না, এমন কি অলক্ষ্মীকেও নয়।..."

"লক্ষ্মীর মূর্তি দেখেছি। কিন্তু অলক্ষ্মীর মূর্তি তো দেখিনি কখনও। সে আবার কেমন—"

"ভয়ঙ্কর। কালো রং, কালো কাপড় পরা, সর্বাঙ্গ তেল-চুকচুকে, এলো চুল, বড় বড় দাঁত, এক হাতে ছাই, আর এক হাতে ঝাঁটা। বাহন গাধা, গায়ে লোহার গয়না, ভয়ানক কুরূপা, ভয়ানক ঝগড়াটে, বাস কুৎসিত স্থানে।"

"এর পূজো হয়?"

"হয়। অলক্ষ্মী-বিদায় না করলে লক্ষ্মী আসেন না। নিমাই অলক্ষ্মী বিদায় করতে পারে নি, তাই ওর জীবনে লক্ষ্মী আর এল না। এ জন্মে আসবেও না বোধ হয়।..."

নিমাই ডাক্তারের কথা জানতাম না আমি।

"কেন, কি হয়েছে নিমাইয়ের।"

"সে নিমাইয়ের মুখ থেকেই শুন' একদিন। আমি বলতে পারব না—"

থেমে গেল স্থখেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর সোজা হয়ে চাপটালি খেয়ে বসে, ডান হাঁটুটা নাচাতে লাগল অকারণে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে। যখন কথা কইল তখনও অন্যমনস্ক। নিমাইয়ের কথা আমার কাছে গোপন করতে চাইল কিন্তু অস্ফুটকণ্ঠে যা বললে তা নিমাইয়েরই কথা।

"নিমাই ছেলে খুব ভাল। কিন্তু কি যে ওর কপাল, অলক্ষ্মী ভর ক'রে আছে ওর ওপর। দূরে সরে গেছে, ছেড়েও যাবে, কিন্তু কষ্ট দিচ্ছে।"

আরও কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে স্থখেন যা ব্যক্ত করলে, বুঝলাম সেটা অলক্ষ্মী-বিদায় সম্বন্ধে স্থখেনের থিওরি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, প্রায় সব জিনিস সম্বন্ধেই আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক একটা 'থিওরি' খাড়া ক'রে রেখেছি মনে মনে। ঘটি কেন গোল থেকে আরম্ভ ক'রে পৃথিবী কেন গোল পর্যন্ত, কোন বিষয় বাদ নেই।

স্থখেন বলল—"আসল কথা কি জানিস আমাদের চরিত্রে যা কিছু মন্দ জিনিস আছে, ইংরেজিতে যাকে বলে বেস্ এলিমেন্টস্ সেগুলো দূর না হলে লক্ষ্মী আসতে পারেন না—যিনি গৌরবর্ণা, স্থরূপা, সর্বালঙ্কার-সমন্বিতা—যিনি পদ্মহস্তা পদ্মাসনা, তিনি নোংরামির মধ্যে এসে কি স্বস্তি পান কখনও? ভুল ক'রে এসেও পড়েন যদি, বেশীক্ষণ টিঁকতে পারেন না। দেখিস না, এক একটা লোক হঠাৎ বড়লোক হল, কিছুদিন খুব ধুমধাম, তারপর সব ধুস্। আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে। শয়তানের সঙ্গে ভগবানের যেমন লড়াই চলেছে, ইংরেজিতে নিশ্চয় পড়েছিস তুই, তেমনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অলক্ষ্মীরও লড়াই চলছে। রীতিমত লড়াই। প্রত্যেক মানুষের জীবনই সেই যুদ্ধক্ষেত্র। অলক্ষ্মীও কম নন, তাঁর শক্তিও তুচ্ছ করবার মতো নয়। কত রকম ছদ্মবেশে এসে তিনি যে মানুষকে ভোলান তার আর ইয়ত্তা নেই। কাম প্রেমের রূপ ধরে আসে, অহঙ্কার আসে আত্মজ্ঞানের ছদ্মবেশে, ক্রোধ আসে বীরত্বের মুখোশ পরে', অলক্ষ্মীর জালই তো সারা সংসারে পাতা। কিন্তু সেই জালেরই ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম পথ আছে, সেই পথে আসেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকে চঞ্চলা কেন বলেছে জানিস? অলক্ষ্মীই লক্ষ্মীকে চঞ্চলা ক'রে তোলে!

ছুস্থির হয়ে থাকতে দেয় কি কোথাও। আমি যখন শুয়োরের দাঁত নিয়ে ফিরলাম তখন পূর্ণপুরুত পুজো প্রায় শেষ ক'রে এনেছে—ভুল উচ্চারণ ক'রে অলক্ষ্মীকে অনুরোধ করছে—

ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী
সুখ রাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ন পূজ্যঞ্চ শাশ্বতীম্॥

রীতিমত অনুরোধ—এমন সুখের রাত্রে তুমি এখানে থেকো না, তোমার প্রাপ্য পূজা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি স্বস্থানে চলে' যাও দয়া ক'রে…"

সুখেন চুপ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করল আবার।

"সেদিন মামীমা সাজিয়েও ছিলেন অদ্ভুত। আলপনাগুলো মনে হচ্ছিল জীবন্ত। পদ্মের কুঁড়িগুলি যেন এখুনি ফুটবে, লক্ষ্মীর পদচিহ্নের ধারে ধারে আলতার আভা যেন দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্মীর চৌকিব উপর মুকুট আর পা' দুটি কি অদ্ভুতই যে দেখাচ্ছিল। সবই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সেদিন। লক্ষ্মীর কড়িবসানো ঝাঁপি, ধানছড়া, কলমিলতা, দোপাটিলতা, লক্ষ্মীর সরার উপর লাল নীল সবুজ হলুদ কালো দাগগুলি, স্তূপীকৃত খই, স্তূপীকৃত ধান চিঁড়ে, লক্ষ্মীর কাপড়ের রং সবুজ, গায়ের রং সোনার মতে—সবই অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। মনে হচ্ছিল, ওরা সবাই যেন অপেক্ষা কবছে কারও, এমন কি ঘটের উপর যে রুক্ষ নারকোলটা ছিল সেটাও যেন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল।"

সুখেন চুপ করল আবাব। মনে হল নিজের মধ্যেই সে তলিয়ে গেছে। মাথা হেঁট ক'রে চোখ বুজে বসে' আছে দেখলাম। যতটা কম শব্দ ক'রে সম্ভব ততটা কম শব্দ ক'রে আমি একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালাম একটি। সেই সামান্য 'খুস' শব্দেই কিন্তু সুখেনের ধ্যান ভঙ্গ হল। সে আমার দিকে চেয়ে মুখটা ঈষৎ উঁচু ক'রে গলাটা ধীরে ধীরে চুলকুলে খানিকক্ষণ। তারপর ঈষৎ হেসে বললে—"আমি শুধু অদ্ভুত যোগাযোগের কথাটাই ভাবছি। বাগানের মধ্যে দিয়ে আসবার সময় চকচকে এক জোড়া চোখ দেখে আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম খুব, পুজো শেষ হয়ে গেলেই আমি বাগানে যেতামও একবার নিশ্চয়ই। কিন্তু সরে' পড়বার মতলব, মানে পুজোটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দেওয়ার ইচ্ছে আমার হ'ত না যদি না মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মামা কটমট ক'রে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে একবার। তারপর বললেন, শক্তিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার? আমি বললাম, না, হয়নি। মামা বললেন, তিনি পুজোর প্রসাদ নিতে এখুনি আসবেন, তাঁর কাছ থেকে জেনে নিও পরীক্ষায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ফেল করেছ। বুঝলে? চুপ ক'রে রইলাম। মামা সংবাদটি দিয়ে ভিতরে চলে' যাওয়া

মাত্র ঠিক ক'রে ফেললাম পুজোটি শেষ হওয়া মাত্র প্রসাদটি নিয়েই চম্পট দিতে হবে। সেই রাত্রে শক্তিধর সান্যালের সম্মুখীন হবার সাহস আমার ছিল না। শক্তিধর প্রকৃতই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, এক ঘুষিতে কার যেন পাঁজরার হাড় ভেঙে দিয়েছিলেন শুনেছিলাম। শাঁখ বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই মামীমার হাত থেকে প্রসাদের খুরিটি নিয়ে লম্বা দিলাম। তখন ন্যাপলা ছিল আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। তার কাছেই গেলাম। খুলে বললাম তাকে সব কথা। সে বললে—'ভালই হয়েছে তুই এসেছিস। আমাদের লোক হচ্ছিল না। ফণী আর বিশু আসবে একটু পরে। আমাদের চিলে-কোঠার ঘরটাতে টোয়েনটি নাইন খেলব চল। তাস যোগাড় করেছি। আজ কোজাগরী পূর্ণিম, রাত জাগতে হয়—।' টোয়েনটি নাইন খেলাটা তখন খুব চলেছিল দিনকতক।'

আবার চুপ করলে সুখেন্দু। চুপ ক'রে চেয়ে রইল মাঠের দিকে। আমিও চাইলাম। মনে হল সন্ধ্যার দিকে জ্যোৎস্না ফিকে ছিল, এখন যেন ঘন হয়েছে। কিশোরী যুবতী হয়েছে যেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগলাম মৃদুলা জেগে আছে। পিছনের ঘরে কি একটা করছে যেন গোপনে গোপনে। হাওয়া বইছে না, কিন্তু তবু যেন সেই চেনা-অথচ-অচেন সোরভটা ভেসে এসেছে, ঘিরে ধরেছে আমাকে।

হঠাৎ সুখেন বলে' উঠল—"কে যেন আসছে মনে হচ্ছে—"

আমিও দেখলাম কে যেন আসছে।

"নিরু কি?'

"না, নিরু বলে' মনে হচ্ছে না। এর গায়ে ওড়না দেখছি—",

নারী মূর্তিটি আরও কাছাকাছি হ'তে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম যে এ অন্য লোক, নিরু বা ফুলু নয়।

সুখেন বলে, উঠল, "ও বুঝেছি, এ সেই পাগলী বেগম—"

বেগম কাছাকাছি এসে বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—"আদাব। আপনারা এখানে এসেছেন বুঝি আজ।"

"হ্যাঁ। আপনি কোথা যাচ্ছেন—"

"আমি বাদশাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

বলে' মুচকি হেসে বাংলোর ডানদিক দিয়ে চলে গেল। তার ওড়নার মিহি কাপড় দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এত মিহি কাপড় আমি আর দেখিনি। তার পায়ের নাগরা জুতো জোড়াও বিস্ময়কর। জুতোর গায়ে যে চুমকি বসানো ছিল, মনে হচ্ছিল তা যেন চুমকি নয় নক্ষত্রের সারি।

"বেগম ক্লাহেবটি কে, চেন নাকি ?"

"ঠিক চিনি না। তবে এমনি পূর্ণিমা রাত্রে ওকে আরও দু' একবার দেখেছি এখানে। কেউ বলে পাগলী, কেউ বলে ভূত।"

"থাকে কোথায়, পাগলী হলে তো দিনেও দেখা যাবে।"

"দিনে কি সব জিনিস দেখা যায় ? দিনে জোনাকী দেখেছিস, প্যাঁচা দেখেছিস ?"

"কিন্তু ও তো প্যাঁচাও নয়, জোনাকীও নয়, ও মানুষ।"

"সব মানুষও দিনের বেলায় বেরোয় না। আমি একটি সাধুকে জানতাম, সে সমস্ত দিন একটা গুহায় লুকিয়ে থাকত। বার হ'ত গভীর রাত্রে। দুনিয়াতে কত রকম আছে—"

দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড।

সুখেন তারপর বললে, "হতে পারে ভূত। এ স্থানটা কবরস্থান ছিল। কিছুতেই আর অবিশ্বাস হয় না রে ভাই। নিজের চোখে ছেলেবেলায় সেই কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে যা দেখেছি তাতে চট ক'রে কোন-কিছুকে হেসে উড়িয়ে দেবার সাহস নেই আর।"

"তোমার গল্পটা শেষ কর। তারপর কি হল—"

"নেপালের বাড়িতে সমস্ত রাত কাটানো গেল না। ঘণ্টাখানেক তাস খেলেছিলাম বোধ হয় আমরা। তারপরই নেপালের মা তাড়া লাগাতে লাগলেন। তাঁর তাড়ায় নেপালের বাবার ঘুম ভেঙে গেল। সিঁড়িতে খড়মের আওয়াজ পেয়ে দুদ্দাড় ক'রে উঠে পড়লাম আমরা। ফণে আর বিশে বাড়ি চলে গেল। আমি পড়লাম সমস্যায়। শক্তিধর সান্যালের গোবদা মুখটা মনে পড়ল। মনে হল, তিনি নিশ্চয় এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে বসে নেই, কিন্তু মামা তো আছেন। গিয়ে হয়তো দেখব সামনের-বারান্দাতেই চেয়ারে বসে' পা দোলাচ্ছেন। বাড়ি কেরা নিরাপদ মনে হল না। কি করা যায়। হঠাৎ মনে হল, বাগানের ভিতরটা একবার ঘুরে আসা যাক। বনবেড়ালটা এখনও আছে কি ? গিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। কি করি, ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। আম বাগানের পাশেই খানিকটা জমিতে মামা গোলাপ বাগান করেছিলেন। সেখানেও উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলাম, বনবেড়াল টেরাল কিছু দেখতে পেলাম না বটে, কিন্তু একটা জিনিস যা দেখলাম তা অপূর্ব। খুব বড় ধবধবে সাদা গোলাপ ফুটেছিল একটি। স্নো কুইন। মনে হচ্ছিল, জ্যোৎস্নাই ফুল হয়ে ফুটেছে বুঝি। আমি কাছে যেতেই ফুলটা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। মনে হল নীরব ভাষায় যেন বলতে লাগল, আমায় তুলে

নাও তুমি। ফেলে যেও না, তুলে নাও। মামার ভয়ে তার গোলাপ গাছে হাত দিতাম না কেউ আমরা। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ফুলটা ধীরে ধীরে দোল খেতে লাগল। তুলেই নিলাম শেষে। ভাবলাম, বলব যে লক্ষ্মীপুজোর দেবার জন্যে তুলেছি। আর একটা কথা মনে পড়াতেও নির্ভয় হলাম খানিকটা। মনে হল কাল অন্তত আমার কোনও ভয় নেই। আমার জন্ম হয়েছিল পূর্ণিমার ভোরে, তাই প্রতিমাসে পূর্ণিমার পরদিন মা আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা দিয়ে পায়েশ ক'রে খাওয়াতেন। মা মারা যাবার পর যখন মামীর কাছে এলাম, তখন তিনিও সেটা বজায় রেখেছিলেন কিছুদিন। তাই আমার ভরসা হল যে, কাল পায়েশ না খাই মার অন্তত খাব না। সোকুইনকে তুলে নিলাম। ফুলটি হাতে ক'রে বাগান থেকে যখন বেরোলাম তখনও দেখতে পাইনি কিছু। অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ির দিকেই আসছিলাম। ভাবছিলাম, এতক্ষণ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, আমিও গিয়ে মা লক্ষ্মীর ঘটের উপর ফুলটি রেখে চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়ব। কিন্তু কিছুদূর এসেই দেখতে পেলাম—ধবধবে বড় শাদা প্যাঁচা একটা গুট গুট করে' আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর পিছু পিছু চলেছে ছোট্ট মেয়ে একটি। বছরখানেক কি বড় জোর বছর দেড়েকের মেয়ে একটি। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অত বড় প্যাঁচা আমি দেখিনি কখনও, প্রথমে মনে হয়েছিল রাজহাঁস। কিন্তু সে যখন ঘাড় ফিরিয়ে চাইল মেয়েটির দিকে, মাঝে মাঝে সে ফিরে ফিরে দেখছিল মেয়েটি আসছে কিনা তার সঙ্গে, তখন দেখলাম এ তো রাজহাঁস নয়। গোল মুখ, টিকোলো নাকের মতো ঠোঁট, জল্ জল্ করছে চোখ। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম একটু দূরে। মনে হল, প্যাঁচাটা দু' একবার আমার দিকেও চাইলে। ভাবটা যেন, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন, তুমিও এস না। আমিও পিছু নিলাম। তখন দেখলাম, মেয়েটি ছোট হলে কি হবে, দিব্যি গুছিয়ে শাড়ি পরেছেন একটি। প্রতি অঙ্গে গয়না, চাঁদের আলো পড়ে চকমক করছে সেগুলো। মনে হল, মাথায় ছোট মুকুটও যেন রয়েছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়—গায়ে হাত দিয়ে দেখ আমার—"

সুখেন আমার হাতটা টেনে তার গায়ের উপর রাখলে। দেখলাম, সত্যিই সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

অদ্ভুত সে দৃশ্য। কল্পনা করতে চেষ্টা কর। চারদিকে জ্যোৎস্না উথলে পড়েছে। একটা ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড বড় প্যাঁচা গুট গুট ক'রে চলেছে, তার পিছু পিছু চলেছে ছোট্ট মেয়েটি, আর তাদের পিছু পিছু চলেছি আমি। কিছুদূর

গিয়ে দেখলাম, প্যাঁচাটা আমাদের বাড়ির দিকে ফিরল। গেটটাও দেখলাম হাঁ ক'রে খোলা রয়েছে। আমার জন্যই খুলে রেখেছিলেন বোধ হয় মামীমা। সেই গেট দিয়ে প্যাঁচা ঢুকল, আর তার পিছু পিছু সেই মেয়েটি। সামনেই পুজোর ঘর। পুজোর ঘরের কপাটও খোলা। মামীমা পাশের ঘরে ছিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্যাঁচা সোজা গিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকল। সমস্ত ঘরটা আলো হয়ে গেল যেন। আলপনার পদ্ম, কলমিলতা, দোপাটিলতা সবাই হেসে উঠল, তাদের প্রতীক্ষা সার্থক হল যেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, প্যাঁচাটা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে আর সেই মেয়েটি লক্ষ্মীর পদ-চিহ্নগুলির উপর পা রেখে রেখেএগিয়ে যাচ্ছে ঘটের দিকে। প্রদীপের আলো পড়েছে তার সর্বাঙ্গে। দেখলাম শাড়ির রং সবুজ, সত্যিই মুকুট রয়েছে মাথায়, গয়না ঝলমল করছে সর্বাঙ্গে। মেয়েটি এগিয়ে লক্ষ্মীর পটের মধ্যে অন্তর্ধান করলে মনে হল। তারপর দেখলাম প্যাঁচাটিও গুটি গুটি সেই দিকে যাচ্ছে। আমি আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। গোলাপ ফুলটা ঘটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে মামীমাকে ওঠালাম, যা যা দেখেছি সব বললাম খুলে। মামীমা ধড়মড়িয়ে ছুটে এলেন পুজোর ঘরে—এসে দেখেন, কোথাও কিছু নেই। কেবল লক্ষ্মীর পটের পিছনে ছেঁড়া কাপড় পরা ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে একটি। চুপচাপ বসেও নেই, নৈবেদ্যের উপরে যে মণ্ডটি থাকে সেইটি তুলে নিয়ে খাচ্ছে। আমাদের দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমাকে আমি যা বলেছিলাম তার সঙ্গে কিছুই মিলল না। প্যাঁচা ট্যাচা কিছু নেই, মেয়েটিও অন্য রকম। মামীমা আমার দিকে কোপদৃষ্টি হেনে বললেন, "ফাজিল কোথাকার। কোথা থেকে নিয়ে এলি একে। কার মেয়ে—"

"আমি আনি নি। নিজেই এল—"

সত্যি কথাই বললাম আমি।

"ঠাকুর দেবতা নিয়ে মিছে কথা বলতে লজ্জা করে না? তোর কি ভয়-ডর নেই—"

মামীমা ধমকে উঠলেন।

যতই বলি, "সত্যি বলছি আমি আনি নি—ও নিজে এসেছে"—কিন্তু আমার কথা শোনে কে।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। মামীমা কিন্তু সকালেই রটিয়ে দিলেন, সুখেন রাস্তা থেকে কার মেয়ে কুড়িয়ে এনেছে একটা। কি জাত তার ঠিক নেই—। কুড়ুনী বলে ডাকতে লাগলেন তাকে। তার কিছুদিন পরেই কিন্তু

চোখ খুলল তাঁর। সেই সো কুইন গোলাপ গাছটা আস্তে আস্তে মরে গেল। বুড়ো হয়েছিল। মামা সেখানে আর একটা লাগাবেন বলে' খুঁড়ছিলেন জায়গাটা। মামা বাগানের কাজ নিজে হাতেই করতেন। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং ক'রে একটা শব্দ হল। তারপর সেখান থেকে কি বেরুল জানিস্? এক ঘড়া মোহর। দেনার দায়ে মামার চুল পর্যন্ত বিকিয়েছিল, সব শোধ ক'রে ফেললেন।"

চুপ করল সুখেন।

"তারপর। মেয়েটির কি হল?"

"হয়নি কিছু, আছে সে এখনও।"

হঠাৎ কণ্ঠস্বর নীচু ক'রে সুখেন বললে, "মৃদুলাই সেই মেয়ে। দ্বিজু, বিজু, রাজু কেউ জানে না একথা। ওরা তখন খুব ছোট ছিল তো, ওরা জানে মৃদুলা আমারই দূর সম্পর্কের বোন…"

আমি আন্দাজ করেছিলাম। চুপ ক'রে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুখেন বললে—"কিন্তু এখন মুশকিল হয়েছে কি জানিস্, ওর জন্যে সৎপাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। ও-মেয়েকে যার তার হাতে দিতে পারি না। তুই আমাদের পালটি ঘর, তুই যদি—"

সেই চেনা-অথচ-অচেনা গন্ধটা নিবিড় হয়ে এল যেন আমার চারদিকে।

বললাম, "আপত্তি নেই। কিন্তু নিরুর বিয়ে না হলে আমি কি ক'রে বিয়ে করি। বিজেনের সঙ্গে ওর মাখামাখি হয়েছে, দেখছি, তুমি যদি—"

"আরে হাঁ, হাঁ, সে তো মনে মনে ঠিক করেই রেখেছি। আমাদের ঘরের লক্ষ্মী তোমাকে দেব, আমাদের লক্ষ্মীর আসন শূন্য থাকবে নাকি। ফুলু, নিরু দু'জনকে এনে বসাব তাতে। দু'টি মেয়েই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মেয়ে দেখলেই আমি চিনতে পারি। বিজেনের সম্বন্ধ এসেছিল একটা খুব বড়লোকের বাড়ী থেকে। তারা জমিদারী লিখে দিতে চাইছে বিজেনকে। কিন্তু মেয়েটি মূর্তিমতী একটি অলক্ষ্মী। ঠোঁটে রং, হ-ব-ল করা শাড়ি, বব-করা চুল, মোটরে চড়ে দিনরাত টো টো ক'রে বেড়াচ্ছে সিনেমায় পার্টিতে। ও মেয়ের সঙ্গে বিজনের বিয়ে দিই কখনও আমি? তোকে বলব ভাবছিলাম।"

অতিশয় উত্তেজনা ভরে সুখেন উঠে দাঁড়াল।

"উঠছ যে—যাচ্ছ কোথা?"

"রামধনের বউটা কেমন আছে, খবর নিয়ে আসি একটু। তুই ঘুমো। এখানেই শুবি, না বিছানা ক'রে দিতে বলব—"

"এখানেই বেশ আছি—"

সুখেন চলে' গেল। চুপ ক'রে বসে রইলাম সামনের দিকে চেয়ে। অন্ধকারসাগর থৈ থৈ করছে চারিদিকে। চিপ্, চিপ্, চিপ্,—সেই পোকাটা অনেকক্ষণ পরে ইঙ্গিতে কি যেন বললে আবার। মৃদুলা পিছনের ঘরটায় কি করছে? ছবিটা আবার চোখের উপর ফুটে উঠল—সেই লক্ষ্মীর ছবিটা, যেটা আমার মায়ের ঘরে ছিল, মা যাতে রোজ সিঁদুরের টিপ দিতেন।

পনের

নিরুদি তো বেশ মজা করলে। এখুনি আসছি বলে' আমাকে এখানে একলাটি বসিয়ে কোথা চলে গেল। মৃদুলা যদিও আমাকে এখানে পাঠালে ওকে হাওয়া করবার জন্তে, কিন্তু এসে দেখি মৃদুলা সেই যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, আর ওঠে নি, সেই থেকে অগাধে ঘুমুচ্ছে। তবু বসে হাওয়া করলাম খানিকক্ষণ। সুখেনদা মাঝে এসেছিলেন একবার, এসে উঁকি দিয়েই চলে গেলেন। আমি একা বসে বসে কি করি এখন। কতক্ষণ হাওয়া করব। এই মাটি করেছে। ছেলেটা খুঁতখুঁত করছে। না ওঠে আবার। উঠে চীৎকার করলেই তো ঘুম ভাঙিয়ে দেবে মায়ের। ওই উঠে বসল। পালাই বাইরে নিয়ে। তা নাহলে ঠিক ঘুমটি ভাঙিয়ে দেবে। নিরুদি আচ্ছা বিপদে ফেলে গেল তো আমাকে।···বাঃ, বাইরে কি জ্যোৎস্না উঠেছে। পূর্ণিমা নাকি আজ? শহরে তো পূর্ণিমা অমাবস্যা বোঝবার উপায় নেই।

"ঘুমোও খোকন, ঘুমোও তো বাবা—"

কাঁধে ক'রে নিয়ে পাইচারি করছি। তাছাড়া উপায় কি।

"ঘুমোও, আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোও তো বাবা। আমি গান করি, ঘুমোও তুমি—"

> কে বকেছে খোকাবাবুকে কে বলেছে যা তা
> খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা
> হিমসাগরের ঠাণ্ডা বাতাস হাত বুলুবে গায়ে
> ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি আসবে স্বপন নায়ে—

না বাবা, এ ছেলে ঘুমুবে না। খিদে পেয়েছে নাকি!

হ্যাঁ।

কি খাও তুমি রাত্তিরে ?

ভুভু।

এত রাত্তিরে 'ভুভু' পাই কোথা। ও বাবা, ছেলের ঠোঁট ফুলছে দেখছি। আচ্ছা, ভুভু দেব তোমাকে। বললাম তো, কিন্তু কোথা পাই দুধ। ঘরে আছে নিশ্চয়ই কোথাও, কিন্তু অন্ধকারে সে কি আমি খুঁজে পাব। জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করতে গেলেই রামধনের বউয়ের ঘুমটি ভেঙে যাবে ঠিক। কি করা যায়, মহা মুশকিল তো। নিরুদি কোথা গেল। ও, নিরুদি বোধহয় শ্বেতপদ্মের সন্ধানে ঘুরছে। ঠিক। মৃদুলা আমাকে বলেছিল ভোরের আগেই মালা গাঁথতে হবে। আমি কিন্তু একে নিয়ে কি করি এখন। দুধ পাই কোথা ? কে আসছে দূরে ? পালাই বাবা ঘরের ভেতর। একা ভয় করে আমার এই মাঠের মাঝখানে। এই দিকেই আসছে। সরে দাঁড়াই একটু। ও, রাজু আমাদের। রাজু সিগারেট খেতে শিখেছে দেখছি।

"রাজু না কি—"

"ফুলুদি ? তোমার কাছেই আসছি আমি। বিজেনদা তোমাকে বলতে বললেন, নিরুদি পদ্মফুল এনেছেন, তুমি মালা গাঁথবে চল।"

"তা যাচ্ছি। কিন্তু একে ঘুম না পাড়িয়ে যাই কি করে। একটু দুধ জোগাড় করতে পার ? জোগাড় করা মুশকিল। কিন্তু একে দুধ না খাওয়ালে ঘুমুবে না। ক্ষিধেয় উঠে পড়েছে।"

"কিচ্ছু মুশকিল নয়। তুমি আমাকে একটা ঘটি-টটি দাও, আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।"

"বাংলোয় এক ফোঁটা দুধ নেই। মৃদুলা সব পায়েশ ক'রে ফেলেছে—"

"আমি অন্য জায়গা থেকে আনব।"

"কোথা থেকে ?"

"ভজুয়ার অনেকগুলো ছাগল আছে দেখলাম। দুয়ে নিয়ে আসছি।"

ঘটি নিযে চলে গেল রাজু। কি উৎসাহ। চমৎকার ছেলে। এ বাড়ির সবাই চমৎকার। রাজু যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ বাইরেই ঘোরা-ফেরা করি। ঘরে যাওয়া নিরাপদ নয়। রামধনের বউ উঠে পড়লেই সর্বনাশ। মালা গাঁথা মাথায় উঠবে তা'হলে। রামধন থাকলে ভাবনা ছিল না, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর মৃদুলা কোথায় যে তাকে পাঠালে, এখনও ফেরবার নামটি নেই তার। না, দুষ্টুমি করো না। ছি, বুকের কাপড় ধরে' টানতে নেই, লক্ষ্মী ছেলে, আমার কাঁধে মাথা

রেখে চুপটি ক'রে শুয়ে থাক। আমি স্নান করি, কেমন? রাজু এক্ষুণি দুধ নিয়ে আসবে।

পা টিপব, গা টিপব, চুল কুমিয়ে দেব
পিঠে পেটে হাত বুলিয়ে সুড়সুড়িয়ে দেব
দুলকে দেব কানের গোড়া, বুজবে চোখের পাতা
খোকন সোনা চাঁদের কণা পদ্মকলির পাতা
ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী আসছে চাঁদের আলোয়
ঘুমের লিখন লিখবে এসে কাজলটুকুর কালোয়—

ওই রাজু আসছে। সাইকেল পেলে কোথা থেকে। ভজুয়ারই বোধ হয়। ও-মা, এক ঘটি দুধ এনেছে প্রায়। কিন্তু একটা কথা তখন খেয়াল হয় নি, এখন মনে পড়ছে। বললাম, "রাজু, দুধ তো আনলে, কিন্তু গরম করতে হবে যে। কাঁচা দুধ খাওয়ানো যাবে না তো।"

"এখুনি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। রামধনের বাড়ির পিছনে ঘুঁটে থাক-করা আছে। এখুনি ধরিয়ে দিচ্ছি।"

রাজু বাড়ির পিছন দিকে গিয়ে ঘুঁটে কাঠ-কুটো কাগজ নিয়ে এল। ইঁটও নিয়ে এল দু'খানা।

"দেশলাই আছে?"

"আছে।"

পকেট থেকে দেশলাই বার করলে। চট ক'রে আমার মুখের দিকে চাইলে একবার। তারপর কাগজ ধরিয়ে নিমেষে ধরিয়ে ফেলল ঘুঁটে। ইঁট দিয়ে উনুনই ক'রে ফেললে একটা। কি চটপটে ছেলে। ঘটিটাই চড়িয়ে দিলে ঘুঁটের আগুনে। দেখতে দেখতে উথলে উঠল দুধ। ভাগ্যে আঁচল দিয়ে ধরে টপ্‌ ক'রে নাবিয়ে ফেললাম ঘটিটা, তা না হলে আগুনে পড়ে যেতো খানিকটা দুধ। আর এক সমস্যা। এই গরম আগুন দুধ, ওকে খাওয়াই কি ক'রে। রাজুকে সে কথা বলতেই সে বললে—রামধন চা খায়, ওর কাপ ডিশ নিশ্চয় আছে। ঘরে ঢুকে বার ক'রে নিয়ে এল।

"আর কোনও কাজ আছে?" জিগ্যেস করলে তারপর।

"না। ঘুমোও নি তুমি—?"

"ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। বিজেনদার কাছে কোয়ানটম্ থিয়োরিটা বুঝছি—"

"নিরুদি কোথায়—"

"এক বোঝা ফুল নিয়ে এখুনি তো মৃদুলাদির কাছে গেল। তোমাকে সেই খবরটাই তো দিতে এসেছি। আমি যাই তাহলে।"

"যাও। আমি একে ঘুম পাড়িয়ে যাচ্ছি—"

ডিশে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে ক'রে ওকে দুধ খাওয়াতে লাগলাম। রাজু চলে গেল।

"এ কি, এখানে কি হচ্ছে—"

বাবা, চমকে উঠেছি! ফিরে দেখি সুখেনদা দাঁড়িয়ে আছেন।

"এ উঠে পড়েছিল, তাই একে দুধ খাওয়াচ্ছি।"

"রামধনের বউ কেমন আছে?"

"ঘুমুচ্ছে। ভালই আছে।"

সুখেনদা'র চোখে মুখে আনন্দ ঝলমল করছে মনে হল।

"তুমি যে অমন চমৎকার সোয়েটার বুনতে পার তা তো জানতাম না। চমৎকার হয়েছে পানি-শঙ্খ প্যাটার্ন। আমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ। খুব খুশী হয়েছি, হিংসে হচ্ছে—"

সুখেনদা চলে গেলেন।

দুধটি পেটে পড়তেই ছেলে ঘুমুল। তাকে আস্তে আস্তে শুইয়ে হাওয়া করছি, এমন সময় মোটর-বাইকের শব্দ শোনা গেল। এই দিকেই আসছে না কি। হ্যাঁ—ওই যে। কি জোরেই আসছে, কি দরকার অত জোরে চালাবার, দেখতে দেখতে এসে পড়ল। আমাকে দেখতে পেয়ে নেমেছে। আসছে এই দিকেই। কি অস্থির লোক, হাঁটছে না তো দৌড়ুচ্ছে যেন।

"কে, ফুলু?"

"হ্যাঁ।"

"আর কে আছে?"

"আর কেউ নেই।"

"কেমন আছে রামধনের বউ?"

"ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেটাও ঘুমিয়েছে—"

"চল তবে এক চক্কোর দিয়ে আসি।—"

"না, না, এখন আমাকে মালা গাঁথতে যেতে হবে। মৃদুলা, নিরুদি বাংলোয় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে—"

"দশ মিনিটে এক চক্কোর দিয়ে পৌঁছে দেব তোমাকে সেখানে। চল—"

"না, সে বড় লজ্জা করবে আমার। তোমার গাড়িতে বসে' আমি ওখানে যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, বেশ এইখানেই নাবিয়ে দেব তাহলে।"

"থাক না আজ। কি যে পাগলের মতো করো—"

"চল, চল, প্লীজ—"

যেতেই হল। কি স্পীড্ গাড়িটার, সব উলটে পালটে দিচ্ছে যেন।

ষোল

অবনীশের কথা

ঘুমুচ্ছি, না জেগে আছি বুঝতে পারছি না ঠিক। নূতন জগতে এসেছি যেন।

আধ-বোঁজা চোখের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, জ্যোৎস্নার নূতন রূপ। বিগলিত আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেছে। আনন্দের সাগর। সামনের মাঠে ও তিনটে চেয়ার নয় তিনটে পদ্ম যেন। তাতে বসে আসে মৃদুলা, নিরু আর ফুলু। দেখতে দেখতে তিনজন মিশে এক হয়ে গেল। অপূর্ব রূপসী একজন। এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পরনে সবুজ শাড়ি, মাথায় মুকুট, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, গৌরবর্ণা। হাতে পদ্ম। এগিয়ে আসছে আমার দিকে, পা ফেলছে চন্দনে আঁকা পদ্মপত্রের উপর।

আসছে, আসছে, আসছে···।

হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল। তন্দ্রা ভেঙে গেল।

উঠে বসলাম। ভিতরের দিকে সুখেনের গলা পেলাম।

"অবন কোথা গেল, তাকেও ডাক—"

তারপর সুখেন নিজেই বেরিয়ে এল।

"মৃ কি কাণ্ড করেছে দেখ। আমার যে আজ জন্মদিন তা মনেই ছিল না। ও এর মধ্যে কখন পায়েশ করেছে, খাবার আনিয়েছে, পদ্মফুল তুলিয়ে মালা গেঁথেছে কিছুই জানতে পারিনি।"

দেখি সুখেনের গলায় শ্বেতপদ্মের মালা দুলছে।

"চল, আমাদের খেতে দিয়েছে। চোখে মুখে জল দিয়ে নে একটু।"

চোখে মুখে জল দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি কার্পেটের আসনে বিজু, বিভু আর রাজু বসে আছে! প্রত্যেকের গলায় পদ্মের মালা।

"তুমিও একটা পরে' ফেল।"

সুখেন একটা মালা আমার গলায় পরিয়ে দিলে।

"চল, বসা যাক এবার। ওই আসনটায় তুই বস'। ওটা একটু বেশী রঙিন মনে হচ্ছে—"

বসলাম। আবার শাঁখ বেজে উঠল।

"ঠিক চারটে তেতাল্লিশ। ঠিক এই সময়ে জন্ম আমার।" সুখেনের কথা শেষ হতে না হতে পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মৃদুলা, নিরু আর ফুলু। প্রত্যেকের হাতে পরমান্নের বাটি।

গল্পগুচ্ছ

তন্বী

উৎসর্গ

কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কালি দাদা,

কবিশেখর কালিদাস রায়ের পবিত্র কাব্যধারায় মন বাল্যকাল হইতেই স্নিগ্ধ হইয়াছিল। সম্প্রতি আপনাকে আবিষ্কার করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি এবং এই বৃহৎ ঘটনাটিকে স্মরণ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র গল্প সংগ্রহটির সহিত আপনার নাম যুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার দিক হইতে সঙ্কোচের কারণ থাকিলেও আপনি যে তদগ্রজসুলভ প্রসন্নতার সহিত ইহা গ্রহণ করিবেন সে বিশ্বাস আমার আছে। ইতি—

প্রণত

বলাই

সেকালের রায় বাহাদুর

রায় বাহাদুর কর্তব্য কর্মে লিপ্ত ছিলেন।

গত কয়েক দিবস হইতে তাঁহার আহার-নিদ্রা নাই বলিলেও চলে। বিদ্রোহ-দমনার্থ সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিতে হইয়াছে। আইনভঙ্গকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া, বিদ্রোহী নেতাগণকে বন্দী করিয়া, পলাতক আসামীদের নামে সমন জারি করিয়া কর্তব্যপরায়ণ রায় বাহাদুর গত কয়েক দিবস হইতে আইন ও শান্তিরক্ষা কার্যে ব্যাপৃত আছেন। তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, এ জাতীয় কার্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু দেশের এই দুর্দিনে, স্বেচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়াই, তাঁহাকে এই সকল অপ্রিয় কর্তব্য করিতে হইতেছে। তিনি ইহা জানেন যে, জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিলে অনেক নিরীহ লোকও মারা পড়ে। যাহারা পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে নির্দোষ লোক থাকাও অসম্ভব নহে; কিন্তু কি করিবেন তিনি। কেহই যে আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতেছে না, সকলেই যে আইনভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় নিক্তির ওজনে বিচার করিয়া চলিলে বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব। বিদ্রোহীদের মনে ত্রাস সঞ্চার করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে বিভীষিকাপূর্ণ বিকটতা প্রয়োজন। এই আকস্মিক বিপদ হইতে, যে কোন উপায়েই হউক, দেশকে রক্ষা করা প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। তিনি কর্তব্যে অবহেলা করিতে অপারগ।

রায় বাহাদুর একাগ্রচিত্তে লিখিতে লাগিলেন।

রায় বাহাদুর দেশদ্রোহী নহেন। তিনিও স্বদেশহিতৈষী। কিসে দেশের মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, তাহা তাঁহার অবিদিত থাকিবার কথা নহে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, ইতিহাসেই প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। এতকাল শাসন-বিভাগে কর্ম করিয়া তিনি দেশের কার্যই করিয়াছেন এবং মর্মে মর্মে ইহাই বুঝিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুগত্য করিলেই ভবিষ্যতে হয়তো আমরা কোন দিন স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা লাভ করিলেও করিতে পারি। ইহা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই।

যাঁহারা অন্য পন্থার কথা চিন্তা করিয়া স্বল্পবুদ্ধি অথবা দুষ্টবুদ্ধিবশে উত্তেজনা-প্রবণ জনতাকে বিপথে চালিত করেন এবং দেশের অগ্রগতিকে পিছাইয়া দেন, তাঁহারা উন্মার্গগামী বাতুল মাত্র। গারদই তাঁহাদের যোগ্য স্থান।

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রায় বাহাদুর লেখনী সংযত করিলেন। দূরে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে। কিন্তু সময় নষ্ট করিলে চলিবে না, রিপোর্টটা আজই লিখিয়া ফেলিতে হইবে। আবার তিনি কাজে মন দিলেন।

—লুঠতরাজ করিলে আমরা স্বাধীন হইব? রেল-স্টেশন, পোস্ট অফিস পোড়াইয়া দিলেই স্বরাজ হইবে? টেলিগ্রাফের তার কাটিলেই বৃটিশ সাম্রাজ্য পঙ্গু হইয়া যাইবে? ইহারা ক্ষ্যাপা, না পাগল।

যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ইহাদের দৌলতেই যাইবে। ইতিহাসের নজির তুলিয়া রায় বাহাদুর অনায়াসেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন, ইংরেজ-শাসনের প্রভাবে আমরা কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সুসভ্য আত্মসচেতন জাতিতে পরিণত হইতেছি এবং ভবিষ্যতে ক্রমশ কিরূপে সুপক্ক হইয়া অবিমিশ্র স্বাধীনতালাভে সমর্থ হইব। এখনও যে আমরা অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অসমর্থ আত্মকলহপরায়ণ সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া অর্থহীন। যোগ্য হইলেই ব্রিটিশ জাতি যে আমাদের স্বাধীনতা দিতে ইতস্তত করিবেন না, এ বিষয়ে রায় বাহাদুর নিঃসন্দেহ। যোগ্যের সমাদর করিতে বৃটিশ জাতি কখনও পরাঙ্মুখ নহেন—ইহার প্রমাণ তিনি নিজেই। অখ্যাত বংশে তাঁহার জন্ম। দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র তিনি। অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া প্রভূত অধ্যবসায়বলে তিনি বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ইংরেজ তাঁহার সে দুরূহ তপস্যার জন্য অভীষ্ট বরদান করিয়াছেন।

বন্দে মাতরম, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—কোলাহলটা ক্রমশ নিকটবর্তী ও প্রবল হইয়া উঠিল।

বন্দে মাতরম—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ-

বন্দে মাতরম—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

বন্দে মাতরম—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

চীৎকার ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল।

দুম—দুম—দুম—দুম—

গুলিবর্ষণ শুরু হইয়া গেল। তারপর সব চুপ। রায় বাহাহাদুর উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতেছে, একটা লোক পড়িয়া আছে—বোধ হয় মারা গিয়াছে। তাহার হাতে কংগ্রেসের পতাকা। রায় বাহাদুর নামিয়া গেলেন। রক্তাক্ত দেহটার পানে চাহিয়া ক্ষণিকের জন্য তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গেল। তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ক্ষণিকের জন্য তিনি বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। পর মুহূর্তেই মোটরে চড়িয়া কমিশনার-ভবনের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটিতে লাগিলেন—নির্বোধ ছেলেটার হঠকারিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

অপূর্ব কৌশল

প্রায় সাত ফুট লম্বা লোকটাকে লইয়া সত্যই সকলে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এই বিদেশী লোকটা প্রথম যখন আসিয়াছিল, তখন—ভদ্রলোক মাত্রেরই যেমন করা উচিত—আমরা উহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম। লোকটাও প্রথম প্রথম কিছুদিন বেশ সদ্ব্যবহার করিয়া সকলের মনোহরণ করিয়াছিল। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে খেলনা দিত, কাহারও রোগ হইলে সাগ্রহে সেবা করিত, গ্রামোফোন বাজাইয়া বিলাতী সঙ্গীত শুনাইত, ধর্মকথা তত্ত্বকথা অনেক কিছু বলিত। সত্য কথা বলিতে কি আমরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। লোকটা যাহাতে গ্রামে বসবাস করে, বদ্ধপরিকর হইয়া সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম। আমাদেরই আনুকূল্যে বেশ কিছু জমিজমা লইয়া লোকটা গ্রামের মধ্যে জাঁকিয়া বসিয়াছিল। এখন কিন্তু আমরা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। লোকটা নিজমূর্তি ধরিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করে। চুরি করিবার পদ্ধতিটাও অদ্ভুত। বলিয়া কহিয়া চুরি করিতেছে অন্যত্র কোথায় নাকি ভয়ানক খাদ্যাভাব—সেখানে খাদ্য পাঠাইতে হইবে, যেমন করিয়া হউক পাঠাইতে হইবে। পাঠাইতেছে। এমন একটা মানব-হিতৈষীকে বাধা দিতে অনেকের বিবেকেই বাধিতেছে। লোকটা নিজে লম্বা, কিন্তু ভাব করিয়াছে যত বেঁটের সঙ্গে, বিশেষত তরলমতি বালকেরা খেলনার লোভে উহার পদানত ব'ললেই হয়। বেঁটেরা তো গদগদ।

কোন তরকারিওয়ালী হয়তো মাথায় তরকারির ঝাঁকা লইয়া বাজারে যাইতেছে। লোকটা হাঁকিল, এই, দাঁড়াও। দাঁড়াইবামাত্র বেঁটেগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রত্যেক বেঁটের হাতেই একটা করিয়া থলি—লম্বা লোকটা লম্বা হাত বাড়াইয়া টপ টপ করিয়া ঝাঁকা হইতে তরকারি তুলিয়া বেঁটেদের থলিতে ফেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝাঁকা খালি এবং থলি ভর্তি হইয়া গেল। বেঁটেরা থলি কাঁধে করিয়া সরিয়া পড়িল। তরকারিওয়ালী যখন দাম চাহিল, তখন লম্বা লোকটা বলিল, দেখ বাবু, মানবের হিতার্থে এই তরকারি লইয়াছি। লাভ করিও না, ন্যায্য মূল্য লও।

এক পয়সা, দুই পয়সা—যা প্রাণ চাহিল, দিয়া দিল। কখন বা দিলই না। গরিব বেচারীরা ভয়ে কিছু বলিতেই পারে না। একজন নাকি প্রতিবাদ করিয়াছিল, লম্বা হাতের চড় খাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

লম্বা হওয়াতে লোকটার সুবিধা অনেক। হাত বাড়াইয়া গাছ হইতে ফল পর্যন্ত পাড়িয়া লইতে পারে। সেদিন ধনেশ্বরের চাল হইতে কয়েকটা কুমড়া তুলিয়া

লইয়া গিয়াছে। যেখানে নাগাল পায় না, সেখানে বেঁটেরা আছে—মর্কটের মত চড়িয়া পাড়িয়া আনে। কিছু বলিবার উপায় নাই। মানবহিতৈষীকে বাধা দিবে কে? তা ছাড়া, চড়ের ভয় আছে।

লোকটা এত লম্বা যে, আমাদের মত সাধারণ উচ্চতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইলে উর্ধ্বমুখে করিতে হয়। একবার আলাপ শুরু করিলে নড়িবার উপায় থাকে না, এমন মনোরম আলাপ যে মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতে হয়। কথা বলিবার ক্ষমতা আছে লোকটার। সেদিন আমরা জন কয়েক উহার পাল্লায় পড়িয়াছিলাম, উর্ধ্বমুখে তন্ময়চিত্তে আলাপ শুনিতেছিলাম, বেঁটেগুলা আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেঁটেগুলা সর্বদাই উহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আলাপ শেষ করিয়া বেঁটের দল লইয়া লোকটা যখন চলিয়া গেল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, আমাদের সকলের পকেট কাটা। আমাদের উর্ধ্বমুখ ও মুগ্ধভাবের সুযোগ লইয়া বেঁটেগুলাই আমাদের পকেট মারিয়াছে।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

যা থাকে কপালে বলিয়া লাঠি সোঁটা যাহার যাহা ছিল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হয়তো একটা এস্‌পার ওস্‌পার হইয়া যাইত, যদি না অপূর্ববাবুর সহিত দেখা হইত। কিছু দূর গিয়া অপূর্ববাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। অপূর্ববাবু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তাঁহাকে আমাদের দলে পাইলে আরও জোর পাইব এই ভরসায় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে আমাদের দলে যোগ দিতে অনুরোধ করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হঠকারিতা করিবেন না। আমার সঙ্গে আসুন।

গেলাম।

নিজের বৈঠকখানায় আমাদের বসাইয়া অপূর্ববাবু আমাদের প্রশ্ন করিলেন, আপনারা এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, শূকর এবং শৃগাল মানবজাতির পরম শত্রু—বিশেষ করিয়া কৃষকদের?

নিশ্চয়ই।—সকলে স্বীকার করিলাম।

এ কথা স্বীকার করেন কি না যে, ওই ভদ্রলোক আজকাল বন্দুক দিয়া শূকর এবং শৃগাল মারিতেছেন?

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লোকটার অনেক জমিজমা আছে, কলাও রকম চাষও করে, নিজের ফসল রক্ষা করিবার নিমিত্তই উহাকে শূকর শৃগাল কেন, বহুবিধ জন্তু মারিতে হয়।

স্বীকার করিলাম।

প্রায় জ্যামিতিক পদ্ধতিতে অপূর্ববাবু তখন বলিলেন, অতএব স্বীকার করিবেন কি না যে, ওই লোকটি গৌণভাবেও আমাদের উপকার করিতেছেন?

অঙ্কে বরাবরই কাঁচা ছিলাম, স্বীকার করাই নিরাপদ বলিয়া মনে হইল।

বিজয়ীর মত অপূর্ববাবু তখন প্রশ্ন করিলেন, উপকারী ব্যক্তিকে কি মারা উচিত?

এতদুত্তরে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

দীনু ময়রা আমাদের মনোভাবকে ভাষা দিল।

কিন্তু লোকটি আমাদের অবস্থা যে শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সেদিন আমার দোকান হইতে সন্দেশ রসগোল্লা সব তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, মায় কড়াসুদ্ধ।

মৃদু হাসিয়া অপূর্ববাবু বলিলেন, সব জানি। তাহার ব্যবস্থাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। অত্যুচ্চঃ পতনায় চ—সংস্কৃত এ কথাটা আপনারা মানেন কি?

মানি বইকি।

ওই সূত্র ধরিয়াই ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করিয়া দিতে হইবে। আরও জমিজমা আরও ধনসম্পত্তি আরও প্রতাপ-প্রতিপত্তি বাড়াইয়া দিয়া উহাকে খুব বেশি উঁচু করিয়া তুলিলেই উহার পতন অনিবার্য। লোকটার জুতা পরার শখ আছে, লক্ষ্য করিয়াছেন কি?

করিয়াছি।—স্বীকার করিলাম।

উহার এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আমি ছোটখাট আর একটা ব্যবস্থাও করিয়াছি। আসুন।

ভিতরের একটা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সুদৃশ্য কিন্তু প্রায় একফুট উঁচু হীলওয়ালা একজোড়া জুতা একটি টেবিলের উপর শোভা পাইতেছে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, লোকটাকে ক্রমাগত উঁচু করাই আমার লক্ষ্য। মতলব করিয়াছি, এই জুতা জোড়া পরাইয়া তাহার শারীরিক ভারকেন্দ্রেও অসাম্য সৃষ্টি করিব। লোকটা এমনিতেই বেশ লম্বা, তাহার উপর শখের বশবর্তী হইয়া এই জুতা জোড়া পায়ে দিয়া যদি চলিতে চেষ্টা করে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অনুসারে আপনিই মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। লাঠি সোঁটা কিছুরই দরকার হইবে না।

বলিলাম, কিন্তু আপনি যে বলিতেছেন, শূকর শৃগাল ধ্বংসের জন্য উহাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার?

আপাতত নিশ্চয়ই দরকার। উহাকে ক্রমাগত উঁচু করিতে চেষ্টা করুন, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখিই মরিবে। বেশি বলশালী হইয়া শূকর শৃগালও

মারিবে, এবং অত্যুচ্চ: পতনায় চ—এই সূত্র অনুসারে নিজেও শেষ পর্যন্ত মরিবে। রাশিয়ার জারের ইতিহাস জানেন না?

দীনু ময়রা সবিস্ময়ে জুতা জোড়াটাই পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কোন ভদ্রলোক কি এ রকম জুতা পরিতে রাজী হইবে?

রাজী করাইতেই হইবে। জোর করিয়া, হাত জোড় করিয়া, যেমন করিয়া হউক। প্রয়োজন হইলে পায়ে তুলিসহযোগে তেল মাখাইয়া ভেলভেট-মোড়া শু-হর্নের সাহায্যেও এ জুতা উহাঁকে পরাইব ঠিক করিয়াছি। দেখুন না, কি করি।

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম।

অপূর্ব রহস্য

সেদিন অপূর্ববাবু বেশ একটি রহস্য করিলেন। দেবু আসন পাতিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে রেকাবি-পূর্ণ সন্দেশ, পাশে জল-পূর্ণ গ্লাস। দেবু সন্দেশগুলির সদ্ব্যবহার করিতে যাইবে, এমন সময় অপূর্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

দেবু। [স-সম্ভ্রমে] আসুন, অপূর্ববাবু। সন্দেশ খাইবেন?

অপূর্ব। কি করিতেছ?

দেবু। [স-সঙ্কোচে] সন্দেশগুলি খাইব ভাবিতেছি।

অপূর্ব। তোমার নাম কি?

দেবু সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

দেবু। আমার নাম কি আপনি জানেন না?

অপূর্ব। তবু বল না শুনি।

দেবু। আমার নাম দেবু।

অপূর্ব। আর কোন নাম নাই?

দেবু। ভাল নাম দেবতাচরণ।

অপূর্ব। সন্দেশগুলি কে খাইবে? দেবু, দেবতা, চরণ, না দেবতাচরণ?

দেবু। [ভ্যাবাচাকা খাইয়া] আজ্ঞে?

অপূর্ব। তোমার নাম সম্পর্কে চারিটি শব্দ পাইতেছি। দেবু, দেবতা, চরণ এবং দেবতাচরণ। সন্দেশগুলি কে খাইবে?

দেবু একটু চিন্তিত হইল। কিয়ৎকাল চিন্তার পর একটি সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল।

দেবু। সন্দেশগুলি আমি খাইব।

অপূর্ব। তুমি কে?

দেবু। আমি দেবু।

অপূর্ব। তোমার নামটাই কি সন্দেশ খাইবে?

দেবু। আজ্ঞে না, আমি খাইব।

অপূর্ব। [অধীরভাবে] তাই তো প্রশ্ন করিতেছি—তুমি কে?

দেবু। [ঈষৎ চটিয়া] আমি দেবু।

অপূর্ব। তুমি কে, তাহা তুমি জান না দেখিতেছি।

দেবু। মানে?

অপূর্ব। বহু-কিছু তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তুমি জান না।

দেবু। প্রচ্ছন্ন আছে!

অপূর্ব। আছে। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও? রাগ করিও না, বল, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও?

দেবু চুপ করিয়া রহিল। অদ্ভুত রকম প্রখর দৃষ্টিতে অপূর্ববাবু দেবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবু কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

অপূর্ব। [ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া] বল, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাও?

দেবু। [স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে] চাই।

অপূর্ব। দেবতা এবং চরণ দুইটি শব্দ মাত্র ইহাই তোমার ধারণা। শাস্ত্রে কিন্তু বলিয়াছে শব্দব্রহ্ম। শঙ্করের মতে জীবাত্মাই ব্রহ্ম। দুইটি জীবের সমন্বয়ে তুমি দেবতাচরণ হইয়াছ, তাহা জান কি?

দেবু। আজ্ঞে না।

অপূর্ব। দেখাইতেছি। [দ্বারের দিকে চাহিয়া] ওরে, তোরা আয়।

ছিরু ধোপা এবং মুলী চামার প্রবেশ করিল।

অপূর্ব। [ছিরুকে] তোমার নাম কি?

ছিরু। দেবতা।

অপূর্ব। [মুলীকে] তোমার নাম কি?

মুলী। চরণ।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। [স-বিস্ময়ে] কিন্তু আমি তো জানিতাম উহাদের নাম ছিরু এবং মুলী।

অপূর্ব। ভুল জানিতে। আরও দেখাইতেছি। উপসর্গ কাহাকে বলে জান?

দেবু। উপসর্গ?

অপূর্ব। হাঁ উপসর্গ।

দেবু বাল্যকালে পঠিত ব্যাকরণ স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতকার্য হইল।

দেবু। যে শব্দের রূপান্তর হয় না, তাহাকে উপসর্গ বলে। কিন্তু যাহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া—যুক্ত হইয়া—

অপূর্ব। উহাতেই হইবে। আর শুনিতে চাই না। দেবতা এবং চরণ এই দুইটি শব্দের উপসর্গযুক্ত রূপ এক-প্রস্থ দেখ। [দ্বারের দিকে চাহিয়া] ওহে, তোমরা এস—

রমেন, হরিশ, যতীন, সুরেশ, কালী, বিপিন, সুখেন, শ্যাম প্রবেশ করিল। সকলেই তরুণবয়স্ক ছাত্র, সকলেই অপূর্ববাবুর ভক্ত। সকলেই মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অপূর্ব। তোমাদের প্রত্যেকের নাম কি বল।

রমেন, হরিশ, যতীন, সুরেশ, কালী, বিপিন, সুখেন ও শ্যাম নিজেদের নাম বলিয়া চলিল—উপদেবতা, অপদেবতা, অতি-দেবতা, অভি-দেবতা, সঞ্চরণ, দুশ্চরণ, বিশ্চরণ, বিচরণ ও আচরণ।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতেছি না।

অপূর্ব। ইহাদেরও কাহারও মধ্যে দেবতা এবং কাহারও মধ্যে চরণ আছে। অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেই তোমার ওই সন্দেশের অংশ পাক।

দেবু। [সচকিত] তাই নাকি। ইহাদের সন্দেশ খাওয়াইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু জোর করিয়া লুটিয়া খাইবে নাকি?

অপূর্ব। তোমার করুণার প্রত্যাশী ইহারা নহে, কারণ তোমার সন্দেশে ইহাদের সম্যক অধিকার আছে। না দিলে জোর করিয়াই লইবে।

দেবু। তাহা হইলে ভুতোকে ডাকিতে হইল দেখিতেছি।

অপূর্ব। ভুতো ব্যক্তিটি কে?

দেবু। আমার ভৃত্য।

অপূর্ব। তাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন নাই। [রমেনকে] বাহিরে আর ছেলে আছে?

রমেন। আছে।

অপূর্ব। তাহাদের 'ভূত' শব্দের পোশাক পরাইয়া লইয়া আইস।

রমেন চলিয়া গেল।

অপূর্ব। [দেবুকে] নামটা কিছু নয়, বাহিরের পরিচয় মাত্র। জীবাত্মাই আসল বস্তু। নাম মাত্রেই এক বা একাধিক শব্দের সমন্বয়। শব্দ অর্থেও যে জীবাত্মা, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি।

ক্যাবলা, জটু, টিপ্‌লে, পুতু, হাবুল ও গদাই সমভিব্যাহারে রমেন প্রবেশ করিল।

অপূর্ব। তোমাদের নাম কি বল?

ক্যাবলা প্রভৃতি পর পর উত্তর দিল—প্রভূত, পরাভূত, সম্ভূত, অনুভূত, উদ্ভূত, অভিভূত।

অপূর্ববাবু স্মিতমুখে দেবুর দিকে চাহিলেন।

দেবু। ক্রমাগত লোক জুটাইতেছেন, ইহার মানে কি?

অপূর্ব। ইহারা সকলেই তোমার সন্দেশের ন্যায্য অংশীদার।

দেবু। এ তো বড়ই তাজ্জব ব্যাপার।

অপূর্ব। [সকলের দিকে চাহিয়া] তোমাদের কি সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা নাই? স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া বল।

এইখানে একটু গোল হইল। মুখস্থ-করা কথা সব সময়ে মনে থাকে না। সর্বসমক্ষে অপূর্ববাবু স্মারকের কার্যও করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ সত্য সত্যই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ফেলিল।

দেবতা। আমার মহাশয় নিমকি ভাল লাগে।

চরণ। আমার পাটালি।

কলেজের ছোকরারা তাহাদের নব-উপাধি-অনুযায়ী কবিত্বময় চটুল উক্তি করিতে লাগিল।

উপদেবতা। আমি চাই ঝাড।

অপদেবতা। আমি চাই মাছ।

অতি-দেবতা। আমার কাম্য হবির সূক্ষ্মতম বায়বীয় অংশটুকু।

অভিদেবতা। আমি মাংসাশী।

সঞ্চরণ। আমি খাইতে চাই না, বেড়াইতে চাই।

বিচরণ। আমিও। কিন্তু তোমার মত অত ধীরে ধীরে নয়।

দুশ্চরণ। খাইতেও নয়, বেড়াইতেও নয়, আমার কেবল লাথি মারিতে ইচ্ছা করে।

আচরণ। আমার ইচ্ছা করে উপদেশ দিতে।

প্রভূত। আমি যেরূপ স্থূল, তাহাতে আর খাওয়া কি উচিত?

পরাভূত। আমার এ বিষয়ে কিছু বলাটাই অশোভন।

অপূর্ববাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

অপূর্ব। [ধমক দিয়া] সাম্যের খাতিরে সকলেরই অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত যে সন্দেশ তোমাদের সকলের প্রিয়।

সকলে। সাম্যের খাতিরে নিশ্চয়।

অপূর্ব। [সহাস্যে] তোমরা তাহা হইলে সকলেই এ সকল খাইতে ইচ্ছুক?

সকলে। সাম্যের খাতিরে নিশ্চয়ই—

অভিভূত এতক্ষণ কিছু বলে নাই। এইবার সে করজোড়ে হৃদয়ভার লাঘব করিবার প্রয়াস পাইল।

অভিভূত। প্রভু, কটি নিবেদন আছে।

অপূর্ব। কি বল?

অভিভূত। সন্দেশগুলি আপনি ভক্ষণ করুন। আপনি সকলের জন্যই চিন্তা করিয়াছেন, করেন নাই কেবল নিজের জন্য। অহো, কি মহত্ত্ব। অথচ আমি জানি, আপনি সন্দেশ কত ভালবাসেন।

দেবু ব্যতীত বাকি সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অপূর্ব। তোমাদের সকলেরই এই মত নাকি? [দেবুকে] তোমার?

দেবু আমি তো আগেই আপনাকে ভাগ দিতে চাহিয়াছিলাম। আপনি খাইবেন, তাহাতে আর আপত্তি কি। খান না।

অপূর্ব। তোমরা যখন সকলে বলিতেছ—

অপূর্ববাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিল। রেকাবিটি তুলিয়া তিনি সন্দেশগুলি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অপূর্ব-বিভ্রান্ত

হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল।

পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে। কি সর্বনাশ, আমাদের সকলেরই যে খড়ের চাল। বেগে বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া বুঝিলাম, ডাকাত পড়িয়াছে। তাহারাই আগুন লাগাইয়াছে। লোকগুলা কোথায় গেল? বাঁশ-ফাটার শব্দ ছাড়া

আর কোন শব্দ না করিয়া বারান্দা হইতে নামিতেই নাকে প্রচণ্ড ঘুষি খাইয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। নিমেষ মধ্যে কয়েকজন আসিয়া আমার হাত-পা-মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম, একজন ডাকাত একটু ঝুঁকিয়া আমার মুখটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, আরে, এ যে ডাক্তারবাবু। এঁকে ছেড়ে দাও। উপকারী ব্যক্তিটি কে চিনিতে পারিলাম না। মুখোশ পরা ছিল। সকলেই মুখোশ পরা। আমাকে খুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তাহাদের নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে বিস্মিত হইলাম। বুঝিলাম, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হাত-পা-মুখ শক্ত করিয়া বাঁধা, তাই টুঁ শব্দটি নাই।

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কি কর্তব্য ভাবিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি একা কি করিতে পারি। সহসা নারীকণ্ঠের আর্তনাদে চমকাইয়া উঠিলাম। একটু আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, শুধু লুণ্ঠন নয়, ধর্ষণও চলিতেছে। মনে হইল, প্রতিবাদ করা উচিত। চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিলাম, কেহ আমার কথা শুনিল না। নিকটেই একটা থান ইট পড়িয়াছিল, উত্তেজনাবশত তাহাই তুলিয়া একটা দস্যুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে আমার হাত চাপিয়া ধরিল।

"কি করছেন, আসুন আমার সঙ্গে, ইট ফেলে দিন।"

ফিরিয়া দেখিলাম, প্রতিবেশী অপূর্ববাবু। প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি। বরাবর সমীহ করিয়া থাকি। ইট ফেলিয়া দিলাম।

"আসুন আমার সঙ্গে।"

বাড়ির পিছনে ঘেঁটুবন ছিল। অপূর্ববাবুর নির্দেশ অনুসারে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, আমার এবং অপূর্ববাবুর পরিবারবর্গও ইতিপূর্বে তথায় সমাবিষ্ট হইয়াছেন—সম্ভবত অপূর্ববাবুরই প্রাজ্ঞতার ফলে।

অপূর্ববাবু বলিলেন, "মাথা ঠিক রাখুন। আমাদের আসল গলদটা কোথায় বুঝুন। আসল গলদ একতার অভাব। একতা থাকলে কি পাড়ায় ডাকাত পড়তে পারে? খামখা একটা ইট ছুঁড়ে কি করবেন আপনি? মূল সমস্যাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই ধরুন না, রুশদেশে—"

অপূর্ববাবু নিম্নকণ্ঠে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান রাজনীতি সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। প্রাণপণে নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে বিজ্ঞ অপূর্ববাবুর নখদর্পণে প্রাণপণে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমাদের আসল গলদ কোথায়!

লুণ্ঠন চলিতে লাগিল।

প্রতিবাদ

ট্রেনে একটা বই পড়তে পড়তে আসছিলাম। বইটিতে লেখক মহাশয় অনেক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেছেন। তথ্য-প্রমাণ-সহকারে বলেছেন যে আমাদের দেশের নৈতিক অধঃপতনের কারণ শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই অর্থাভাবে স্কুলে যেতে পারে না। ফলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন ভদ্রলোক পাশের বেঞ্চিতে ছিলেন। অনেকক্ষণ থেকেই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বইটার দিকে। বইটা মুড়ে রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন —একবার দেখি বইখানা, দিন তো—

দিলাম।

তিনি একাগ্রচিত্তে পড়তে লাগলেন। আমি জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। দূর চক্রবালরেখায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নানাবর্ণের রঙীন মেঘ বিচিত্র পোশাক পরে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও সম্রাট বিদায় নিচ্ছেন আর বড় বড় রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহর দল সমবেত হয়েছেন তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন দেবার জন্য।

পরের স্টেশনেই নেমে আমাকে জাহাজে উঠতে হবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। তাড়াতাড়ি কুলি যোগাড় করে দ্রুত গিয়ে যদি না পৌঁছাতে পারি তাহলে জাহাজে স্থান পাব না। সারাটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

স্টেশনে আসতেই তাড়াতাড়ি কুলি ডেকে জিনিসপত্র তার মাথায় চড়িয়ে রওনা হলাম জাহাজের দিকে। প্রচণ্ড ভীড়। ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে অগ্রসর হতে লাগলাম তবু। জাহাজে ওঠবার মুখে ভীড়টা পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। টিকিট চেকার প্রত্যেকের টিকিট পরীক্ষা করে তবে জাহাজে উঠতে দিচ্ছিলেন।

আমারও টিকিট দেখাবার পালা এল। চামড়ার মানিব্যাগ থেকে টিকিট বার করে হাতের মধ্যে রাখলাম। ব্যাগটা রাখলাম বুক পকেটে। জাহাজে উঠে সৌভাগ্যক্রমে বসবারও জায়গা পেলাম। দুর্ভাগ্য কিন্তু পাশেই যে দাঁড়িয়েছিল তা বুঝতে পারি নি। কুলিকে পয়সা দিতে গিয়েই টের পেলাম যে মানিব্যাগটা বুক পকেট থেকে তুলে নিয়েছে কে ভীড়ে। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগলাম। কুলি জিনিসপত্র নামিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল পাগড়ি খুলে। তার মুখের দিকে চেয়ে আরো ভীত হয়ে পড়লাম। লোকটা চেনা, আগে কশাই ছিল। এ কি শুনবে কোনও কথা? শুনুক আর না-ই শুনুক, সত্যি কথা বলতে হল।

একটা রূঢ় কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু সে সেলাম করে মৃদু হেসে বললে—"আমার পয়সার জন্তে ভাববেন না বাবু। আপনার কাছ থেকে আমার পয়সা মারা যাবে না। কিন্তু ব্যাগটা—চুরি গেল—বড় আফসোসের কথা। আচ্ছা, যাই বাবু—" পুনরায় সেলাম করে চলে গেল।

যে ভদ্রলোকটি ট্রেনে আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি দেখলাম এক কোণে বসে আমার বইটি পড়ছেন। গেলাম তাঁর কাছে। সব কথা বললাম। তিনি হেসে বইটা দেখিয়ে বললেন—এ ভদ্রলোক ঠিকই লিখেছেন, ছোটলোকেরা শিক্ষিত না হলে আমাদের আর গতি নেই। একজন চা-ওলাকে তিনি বোধ হয় চা আনতে বলেছিলেন। সে চা দিয়ে গেল। আমারও খুব ইচ্ছে করছিল চা খাবার, কিন্তু আমি কপর্দকশূন্য, লোভ সম্বরণ করতে হল। সে ভদ্রলোকও নির্বিকারচিত্তে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আমার বইটা পড়ে যেতে লাগলেন। আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবার কথা তাঁর মনেও এল না।

আমার দুর্ভাবনা হতে লাগল ওপারে গিয়ে কি হবে। টিকিট কালেকটারকে সব কথা বলেছিলাম। তিনি হয়তো আমাকে গেট পার করে দেবেন—কিন্তু কুলি? বাস ভাড়া? ঘাট থেকে আমার বাড়ি প্রায় পাঁচ মাইল। অতদূর কি হেঁটে যেতে পারব রাত্রিবেলা?

স্টিমার ঘাটে ভিড়তেই সেই কুলিটা এসে দাঁড়াল আবার। বিনা বাক্যব্যয়ে আমার জিনিসগুলো মাথায় তুলে নিল। আমি পিছু পিছু চলতে লাগলাম। বাসের কাছে গিয়ে সে সটান বাসে আমার জিনিসপত্র তুলে দিলে। আমি বললাম, "বাসে জিনিস তুললে কেন, আমার যে—" বাক্য সম্পূর্ণ করবার পূর্বেই সে তার কোমরের থেকে গেঁজে বার করে তার সমস্ত দিনের উপার্জন আমাকে দিয়ে বললে, "আপনি নিয়ে যান—আমি কোনও সময়ে নিয়ে আসব এখন—"

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার এক ভাই কাছে থাকে। পকেটে ছোট একটা পকেট বুক ছিল। তার থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে আমার ভাইকে লিখে দিলাম, "এ লোকটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে দিও। আমি গিয়েই টাকাটা তোমায় পাঠিয়ে দেব।"

কাগজটা দিয়ে বললাম, "আমার ভাইকে এই চিঠিটা দিও, সে তোমাকে তোমার পয়সা দিয়ে দেবে।" সে সেলাম করে চলে গেল। আমি নির্বিঘ্নে বাড়ি পৌঁছলাম।

তারপর দিন সকালেই দেখি কুলিটা আবার এসে হাজির হয়েছে। ভাবলাম আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি বোধহয়।

সেলাম করে বললে, "হুজুর, কাল আপনি ভুল করে বেশি টাকার কথা আপনার ভাইকে লিখে দিয়েছেন। আমি আপনাকে আড়াই টাকা দিয়েছিলাম—আর আমার দু'বারের মজুরি আট আনা। সবসুদ্ধ তিন টাকা হয়। আপনি দু'টাকা বেশি লিখে দিয়েছেন।"

দুটি টাকা সে আমার সামনে রেখে দিলে। বলা বাহুল্য, আমি ইচ্ছে করেই দু' টাকা তাকে বেশি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর সেকথা তাকে বলতে পারলাম না। তাকে দু' টাকা বখশিস করবার স্পর্ধা আমার হল না। চুপ করে রইলাম। হঠাৎ মনে পড়ল ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি আমার বইটি ফেরত দেয় নি—আমিও চেয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম।

প্রভেদ

চশমাটা খুলে আড়ময়লা খদ্দরের কাপড়ের কোঁচা দিয়ে সেটা আবার ভাল করে পরিষ্কার করে নিলেন যোগেন্দ্রনাথ। ভাল করে আবার চেয়ে দেখলেন। এবার বেশ দেখা গেল। আর ঝাপসা মনে হল না। অতীতের কুয়াশাটাও কেটে গেল। তরুণকান্তি ক্ষুদিরামের ছবির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন পককেশ যোগেন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সেই মুখই বটে। তাঁর বুকের ভিতরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠল। ক্ষুদিরাম আজ শহীদ। কাগজে কাগজে সভায় সমিতিতে ঘরে-বাইরে তার জয়-জয়-কার। অথচ—

"যোগেনবাবু উঠুন, মল্লিক সাহেব এসেছেন—" কে যেন বলল কানের কাছে। ত্রস্ত যোগেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারটা খালি ছিল বলে বসেছিলেন তিনি। তাঁর আপিসের মনিব মিস্টার মল্লিক। ক্ষুদিরামের স্মৃতি-সভাতে বিলাতী সুট চড়িয়ে যদিও আসেননি, তবু বিলাতী গন্ধটা সম্পূর্ণ ঢাকতে পারেন নি তিনি। তাঁর চোখে মুখে চলার ভঙ্গীতে ঠোঁট বাঁকানো ঈষৎ হাসির কায়দায় মিস্টার মল্লিক নিজের অজ্ঞাতসারেই যে ভাব ফুটিয়ে তুলছিলেন তা নিতান্তই বেমানান মনে হচ্ছিল এই সভায়। ক্যাপস্ট্যান টোবাকোর গন্ধ বিকিরণ করতে করতে চেয়ারটা টেনে বসলেন তিনি। যোগেনবাবু সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এক পাশে। সঙ্কুচিতভাবে নমস্কারও করলেন একটা। কিন্তু মিস্টার মল্লিক সেটা দেখতে পেলেন না। ক্ষুদিরামের ছবির দিকে চেয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ যোগেনবাবুর মনে হল সেই অগ্নি-যুগের দৌলতেই মিস্টার মল্লিকও আজ তার

মনিব হয়েছেন। এঁরই কোন এক আত্মীয় সে যুগে পুলিশের সি. আই. ডি. বিভাগে সুদক্ষ কর্মচারী ছিলেন। অগ্নি-যজ্ঞের অনেক হোতাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বড় বড় চাকরি দিয়েছেন। মিস্টার মল্লিক তাঁদেরই একজন। তা হোক্ তবু এঁরই দয়ায় যোগেন্দ্রবাবু চাকরিতে 'এক্স্টেনশন' পেয়েছেন।

সভায় গান হচ্ছিল—

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান—"

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন যোগেনবাবু। হঠাৎ দেখতে পেলেন ভূপেন বাইরে থেকে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। হাতছানিটা এত প্রবল রকম মনে হল যে স্থিরচিত্তে আর গান শুনতে পারলেন না তিনি। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে হল। একজন ছোকরা তাঁর পায়ের কড়াটা মাড়িয়ে দিলে। অসহ্য যন্ত্রণায় শিউরে উঠল সমস্ত শরীরটা। মুখটি বুজে বেরিয়ে এলেন, ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় গোলমাল করা যায় না। তাছাড়া দোষ তাঁরই, গানের মাঝখানে এমন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

ভূপেন অবশ্য খুব সঙ্গত কারণেই ডাকছিল তাঁকে। বেরিয়ে আসতেই বললে—"রেশন কার্ডটা দিন। আজ জিনিস না কিনলে এ হপ্তার জিনিস যে আর দেবে না।"

রেশন কার্ড বাড়িতে বাক্সের মধ্যে আছে। একবার মনে হল চাবিটা দিয়ে দেন ভূপেনকে। কিন্তু সাহস হল না। বাক্সে গোটা কয়েক টাকাও আছে, ভূপেন যদি সরায় কিছু মুশকিলে পড়তে হবে। অনেকবার ঠকেছেন তিনি, অনেকবার প্রমাণ পেয়েছেন, ভূপেনকে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ ভূপেন ছাড়া চলেও না। বাজার করা, ওষুধ আনা, ডাক্তার ডাকা, পারমিটের জন্য সাপ্লাই আপিসে ধরণা দেওয়া—সবই ভূপেন করে।

ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভা ফেলে দৌড়লেন যোগেনবাবু বাড়ির দিকে।

বাড়ি গিয়ে যখন পারমিট আর টাকা ভূপেনকে দিচ্ছিলেন তখন পাশের ঘর থেকে তাঁর অসুস্থ পুত্র খোকন বললে, "বাবা আমার জন্যে কমলালেবু আনতে দিও আজ। আবার ভুলে যেও না যেন—"

"আচ্ছা।"

ভূপেন বললে, "আজকাল আট আনায় একটা।"

"আচ্ছা, এনো গোটা দুই।"

একটা টাকা বেশি দিলেন তাকে।

ভূপেনের ছোট বোন—যোগেনবাবুর ছোট শালি—টুনকি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বয়স তার পাঁচবছর। ক্ষুদিরামের স্মৃতিসভায় সকলে গিয়েছিল, সে-ই কেবল যায় নি। যার জন্য সে এত বড় লোভটা সম্বরণ করেছিল তা-ও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়। মাথার ক্লিপ কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে তার দিদি বাড়িতে রেখে গিয়েছিল তাকে অসুস্থ ছেলের তত্ত্বাবধান করবার জন্য। টুনকি বললে, "দিদি আমাকে কিলিপ দেবে বলেছে, দাদাকে সেটা আনতে দাও না জামাইবাবু।"

"আমি যখন নিজে বাজার যাব নিয়ে আসব।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও টুনকিকে বলতে হ'ল, "আচ্ছা—।"

তাকে আর একটু আশ্বস্ত করে যোগেনবাবু বললেন, "আমি বেশ ভাল দেখে নিয়ে আসব। ভূপন ঠিক ঠিক পছন্দ করতে পারবে না। কেমন?"

টুনকি এবার আনন্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। যোগেনবাবু পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর ছেলের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন। জ্বর বেশ আছে। ছেলে কিন্তু হেসে বললে, "আজ আমি বেশ ভাল আছি বাবা।"

যোগেনবাবু আবার বেরিয়ে পড়লেন স্মৃতিসভার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আবার বাধা। বাড়ি-ওলার সঙ্গে দেখা। লোকটি ভদ্র কিন্তু বাড়ি-ওলা। একমুখ হেসে বললেন—"মাইনে পেয়েছেন না কি—"

"পেয়েছি। কিন্তু খোকাটার অসুখ—বড্ড খরচ হচ্ছে—তাই এ মাসের ভাড়াটা এখনও দিতে পারি নি—"

"ও, আচ্ছা—তাতে কি হয়েছে—দেবেন যখন সুবিধে হয়।"

"হাতে টাকা হলেই দিয়ে দেব।"

"বেশ, বেশ।"

যোগেনবাবু আবার ধাবিত হলেন স্মৃতিসভার দিকে। মোড়টা ঘুরতে না ঘুরতে বৈকুণ্ঠবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"বিলটা পাঠিয়ে দেব না কি যোগেনবাবু? বেশী নয় উনিশ টাকা সাত আনা।"

আবার দাঁড়াতে হ'ল। মোড়ের দোকানটা বৈকুণ্ঠবাবুর। তাঁর কাছে যোগেনের কৃতজ্ঞ থাকার কথা। ছেলের অসুখের সময় বাজারে যখন কোথাও হর্লিক্‌স্ পাওয়া যাচ্ছিল না, চিনি পাওয়া যাচ্ছিল না, বার্লি পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন এই বৈকুণ্ঠবাবুই সব যোগাড় করে দিয়েছেন কালোবাজার থেকে। দামটা দেওয়া হয় নি এখনও, টাকাও নেই এখন।

সুতরাং নমস্কারান্তে মৃদু হেসে বলতে হ'ল—"সে আমার মনে আছে। আপনার ঋণ কি উনিশ টাকা সাত-আনা দিলেই শোধ হবে বৈকুণ্ঠদা ? আপনার ঋণ কোনও দিনও শোধ হবে না।"

প্রীত হলেন বৈকুণ্ঠনাথ।

"খোকা কেমন আছে আজকাল ?"

"জ্বর চলছে।"

যোগেনবাবু গমনোদ্যত হলে বৈকুণ্ঠ আবার বললেন, "বিলটা পাঠিয়ে দেব কি ?"

"আসছে মাসে দেব টাকাটা। অসুখের বাড়ি বুঝতেই পারছেন, টাকা দাঁড়াতে পারছে না —"

বৈকুণ্ঠ চুপ করে রইলেন। তাঁর এই নীরবতার অর্থ বেশ প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁকে তোয়াজ করবার জন্যে যোগেনবাবু আর দাঁড়াতে পারলেন না। মোড় ঘুরে চলতে লাগলেন দ্রুতপদে। প্রায় ছুটতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের স্মৃতি-সভায় না যাওয়াটা ঘোরতর অন্যায় হবে তাঁর পক্ষে।

…ভীষণ ভীড় হয়েছে। ভিতরে আর ঢুকতে পারলেন না যোগেনবাবু। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সভা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। যে নব্যযুবকটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর শুধু উচ্ছ্বসিত নয়, উচ্চও। বাইরে থেকে বেশ শুনতে পাচ্ছিলেন যোগেনবাবু। —"যে বৃটিশের সিংহ-শক্তির ভয়ে সেদিন সমস্ত বিশ্ব কম্পমান ছিল, ভারতবর্ষ থেকে সেই বৃটিশ শক্তির উচ্ছেদ-কল্পে নির্ভয়ে এগিয়ে গেল কে ? বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে কিশোর ক্ষুদিরাম। পরাধীনতার যে কারাগারে সমস্ত ভারত বন্দী ছিল সেদিন সেই কারাগারের পাষাণ প্রাচীরে মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়ে মরেছিল কে ? আমাদেরই ক্ষুদিরাম। সাম্রাজ্যবাদীর স্পর্ধিত দম্ভের শীর্ষে বজ্র হানতে হবে ঠিক করেছিল সেদিন বাঙালী, সেই বজ্রনির্মাণে প্রথম অস্থিদান করেছে কোন্ দধীচি ? আমাদেরই ক্ষুদিরাম।"

ঘনঘন হাততালি পড়ল সভায়। যোগেনবাবু দেখতে পেলেন মল্লিক সাহেবও সোৎসাহে হাততালি দিচ্ছেন। সভা ভঙ্গ হল। রাস্তায় ভীড় করে চলতে লাগল সবাই। বড় বড় মোটরকারগুলো হর্ন দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। যোগেনবাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাঁর মনে পড়ছিল নিজের অতীত জীবনের কথা। তিনিও অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন একদিন। ক্ষুদিরাম বন্ধু ছিল তাঁর। প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গেও আলাপ ছিল। যৌবনারম্ভের সেই অতীত দিনগুলো মনে পড়তে লাগল

ফুলার সাহেবের চাবুক খেয়ে সকলের মতো তিনিও সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এদের উচ্ছেদ করতে হবে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু হল না। তিনি যে অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন তা জানাজানি হয়ে গেল যেন কি করে। বাবা দুহাত ধরে বারণ করতে লাগলেন, মায়ের কান্না আর থামে না। যোগেনবাবুকে ও পথ ছাড়তে হল শেষকালে। বাবা মা'র বারণ শুনে তিনি কি অন্যায় করেছিলেন? সহসা এতদিন পরে নিজেকেই এ প্রশ্ন করলেন তিনি আবার। বাবা মা অমন করে বাধা না দিলে তিনিও নিঃসন্দেহে একজন শহীদ হতে পারতেন। তাঁরও সাহসের অভাব ছিল না। সহসা তাঁর মনে হল—সারাজীবন ধরে তিনি কি করলেন? কাজের মতো কোন কাজ করেছেন কি তিনি? এম. এ.-টা পাশ করেছিলেন অবশ্য, ভাল ভাবেই পাশ করেছিলেন,—কিন্তু তারপর? সুপারিশের অভাবে ভাল চাকরিও জোটেনি একটা। সামান্য কেরানীগিরি করতে করতেই জীবনটা কেটে গেল। বাবার অনুরোধে বাবারই এক দরিদ্র বন্ধুর কুৎসিৎ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বাবা মা মারা গেছেন, শ্বশুরমশাইও মারা গেছেন। তাঁর সমস্ত সংসারটা এখন যোগেনবাবুর ঘাড়েই। বিধবা শাশুড়ী, তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে। নিজের তিনটি নাবালক ভাইকে মানুষ করতে হয়েছে তাঁর নিজের উপর্যুপরি পাঁচটি মেয়ে হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকটির বিয়ে দিয়েছেন প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাগুলি নিঃশেষিত-প্রায়, কিছু ঋণও হয়েছে। একমাত্র ছেলে খোকন এখনও মানুষ হয় নি। সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে সে। খোকন ভাল ছেলে, পনের টাকা বৃত্তি পেয়েছে, তার উপর যোগেনবাবুর অনেক আশা। ভাল করে যদি মানুষ করতে পারেন—কিন্তু পারবেন কি আর—জীবন তো শেষ হয়ে এল। যোগেনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। প্রকাণ্ড বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন আর যেন পারছেন না। প্রতিদিন পলে পলে নিজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করে তিনি এই যে বিরাট পরিবার পালন করে এসেছেন কি মূল্য আছে এর? এর জন্যে কেউ মনে করে রাখবে না তাঁকে। যুগে যুগে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীদের নিয়ে সভা হবে, তাঁর কথা মনেও থাকবে না কারও। পরিবার পালন করার জন্য কেউ কাউকে বাহবা দেয় না, তিনিও দেন না। অথচ পরিবার নিয়েই সমাজ, সমাজ নিয়েই দেশ। সৎপথে থেকে সংসারধর্ম পালন করে তিনি যে প্রকৃতপক্ষে দেশ সেবাই করেছেন, এ কথা কেউ ভাববেও না। ফাঁসির মঞ্চে মরাটাকেই লোকে বেশি বীরত্ব বলে মনে করে, কবির তা নিয়ে কবিতা লেখে, তিলে-তিলে মরাটা চোখে পড়ে না কারও। যোগেনবাবুর নিজের চোখেও পড়ল না। তাঁরও মনে হল জীবনটা বৃথাই গেছে।

যে ডাক্তারবাবু খোকনের চিকিৎসা করছেন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"খোকা আজ কেমন আছে যোগেনবাবু?"

"জ্বর আছে এখনও। ওর স্পিউটাম্‌টা পরীক্ষা করেছিলেন?"

"করেছিলাম।"

"কি পেলেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তারবাবু বললেন, "টি. বি. পাওয়া গেছে।"

বিবর্ণমুখে যোগেনবাবু ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটু

[বিহারের একটি দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বারান্দায় মহিমবাবু ও নবীনবাবু কথাবার্তা বলছেন। মহিমবাবু ডাক্তার এবং নবীনবাবু তাঁর বন্ধু। রোগীরা চলে গেছে। নবীনবাবু শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।]

নবীন। আর তো পারা যায় না হে, এবার ফিরতে হবে।

মহিম। এসেইছ যখন আরও দিনকতক থেকে যাও। তোমার পরিবার নেই, চাকরি করে খেতে হয় না, তোমার ফেরবার তাড়াটা কি।

নবীন। ভাল লাগছে না আর।

মহিম। [বিস্মিত] ভাল লাগছে না। এমন চমৎকার ফাঁকা জায়গা, এমন খাঁটি দুধ, খাঁটি ঘি, কোলকাতায় পাবে না কি। এসেছ যখন থেকে যাও দিন কতক।

নবীন। বিশুদ্ধ জিনিস বেশি দিন বরদাস্ত করতে পারি না ভাই। তোমার ওই ফাঁকা মাঠের দিকে চেয়ে কতদিন আর থাকা যায় বল। না আছে একটা সিনেমা, না আছে একটা লাইব্রেরী। তুমি সারাদিন রুগী চরিয়ে বেড়াও, আমি একা এই বারান্দায় বসে বসে কাঁহাতক আর খাঁটি দুধ-ঘি হজম করি বল। দু'মাস তো হয়ে গেল। প্রথম দিন কতক তোমার ভায়রা ভাইটির সঙ্গে বেশ জমানো গিয়েছিল, কালাজ্বর হয়েও দমাতে পারে নি ভদ্রলোককে, তাকেও তো তুমি কালনায় চালান করে দিলে। কেমন আছেন ভদ্রলোক কে জানে।

মহিম। রমেশ মারা গেছে।

নবীন। অ্যাঁ, বল কি। কবে খবর পেলে?

মহিম। তারাপদ পণ্ডিত বাড়ি থেকে ফিরেছেন পরশু দিন, তিনিই বললেন।

নবীন। তাঁর সঙ্গেই তো রমেশবাবুকে পাঠিয়েছিলে তুমি ?

মহিম। হ্যাঁ, তারাপদ পণ্ডিতের বাড়ি কালনার কাছেই কি-না। ছুটিতে উনি বাড়ি যাচ্ছিলেন, পাঠাবার সুবিধে হয়ে গেল। তা ব্রাহ্মণ খুব যত্ন করে নিয়ে গিয়েছিলেন, রমেশ চিঠি লিখেছিল গিয়ে।

নবীন। ব্রাহ্মণের যত্নের আধিক্যেই ভদ্রলোক কাবু হয়ে পড়েছিলেন কি না কে জানে।

মহিম। না, না, তারাপদ পণ্ডিত লোক খুব ভাল। সরল লোক।

নবীন। অতিশয় সরল, টনস্ অব সিমপ্লিসিটির আকার একেবারে। চলতি ভাষায় যাকে নিভাঁজ বলে। তোমাদের স্কুলে দুটি পণ্ডিতের জুড়ি মিলিয়েছ খাসা। তোমাদের হরসুন্দর পণ্ডিতটি একটি ঘুঘু। তিনবার মোক্তারি ফেল করে চতুর্থবারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন উনি তা জান ? ওর আসল উদ্দেশ্য মোক্তার হওয়া। তারাপদ পণ্ডিতেরও উদ্দেশ্য আছে একটা। বলেছেন সেটা তোমাকে ?

মহিম। [হাসিয়া] বলেছেন।

নবীন। আচ্ছা, ও রকম উজবুককে কোন ইন্‌স্‌পেক্টার ভালো সার্টিফিকেট দেবে বল তো।

[মহিম কোনও উত্তর না দিয়ে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন। পিওন এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল মহিমকে]।

মহিম। [চিঠিটা দেখে] এ কি।

নবীন। কি ?

মহিম। রমেশ চিঠি লিখেছে।

নবীন। রমেশ ? পরলোক থেকে ?

[মহিম ভ্রূকুঞ্চিত করে পোস্ট কার্ডখানা দেখছিলেন।]

মহিম। ও, বুঝেছি। মৃত্যুর আগেই চিঠিখানা লিখেছিল সে। পরে কেউ পোস্ট করে দিয়েছে। কালনা হাসপাতাল থেকেই লিখছে। হয়তো ও মারা যাবার পর ওর জিনিস-পত্রের মধ্যে চিঠিখানা পেয়েছিল কেউ, পোস্ট করে দিয়েছে।

নবীন। দেখি চিঠিখানা।

[মহিম চিঠিখানা দিলেন, নবীন দেখলেন উল্‌টে পাল্‌টে।]

নবীন। ইংরেজিতে লিখেছে দেখছি।

মহিম। সেকালে ইংরেজিতে চিঠি লেখা ফ্যাশন ছিল কি না।

নবীন। [সহসা] আচ্ছা তোমাদের তারাপদ পণ্ডিত ইংরেজি জানে ?

মহিম। না। কেন ?

নবীন। একটু বগড় করা যায় তাহলে।

মহিম। বেশ, কর। আমি একটা কল সেরে আসি ততক্ষণ। তারাপদ পণ্ডিত টুনুকে পড়াবার জন্যে এসেছে বোধ হয়। [জীবু চা দিতে এল।]

নবীন। জীবু, পণ্ডিতমশায় এসেছেন ?

জীবু। এসেছেন।

নবীন। তাঁকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও তো।

জীবু। আচ্ছা। [জীবু চলে গেল]

মহিম। [চা পানান্তে] আমি এইবার চলি তাহলে।

নবীন। কতদূর যাচ্ছ তুমি।

মহিম। কাছেই। বাইসাইকেলে যাব আর আসব।

নবীন। বেশি দেরি কোর না যেন, কারণ নাটকে হয়তো তোমাকেও ভূমিকা নিতে হতে পারে।

মহিম। না না, আমাকে আর ওসবের মধ্যে টেন না। তবে আমি আসছি যত শিগগির পারি।

[মহিম ডাক্তার চলে গেলেন। নবীন গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তা করতে লাগলেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। একটু পরেই তারাপদ পণ্ডিত এসে প্রবেশ করলেন। তারাপদকে দেখলেই মনে হয় অতিশয় সরল নিরীহ গ্রাম্য পণ্ডিত তিনি।]

নবীন। আসুন পণ্ডিত মশাই, বসুন। একটা বিপদে পড়া গেছে।

তারাপদ। [আসন গ্রহণান্তে] বিপদ ?

নবীন। সঙীন বিপদ।

তারাপদ। কি রকম ?

নবীন। আচ্ছা, বাড়ি যাবার সময় রমেশবাবুকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তো ?

তারাপদ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নবীন। পথে তার সঙ্গে আপনার কোনও কথাবার্তা হয়েছিল কি ?

তারাপদ। প্রচুর। আমুদে লোক ছিলেন তো।

নবীন। কোন কারণে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল কি আপনার ?

তারাপদ। মনোমালিন্য ? কই না।

নবীন। ভাল করে ভেবে দেখুন।

তারাপদ। মনোমালিন্য যাকে বলে ঠিক তা হয় নি, তবে রাস্তায় তিনি আলুর দম কিনে খেতে চেয়েছিলেন, আমি দিই নি। ডাক্তারবাবু বারণ করে দিয়েছিলেন কি না।

নবীন। না, আলুর দমের জন্যে এতটা করবেন ভদ্রলোক তা তো মনে হয় না। টাকাকড়ি-সংক্রান্ত কোনও কথা হয়েছিল কি ?

তারাপদ। টাকাকড়ি তো সব আমার কাছেই ছিল। পাছে রাস্তায় উনি কিছু কিনেটিনে খান সেইজন্যে ডাক্তারবাবু ওঁর হাতে কোনও পয়সা কড়ি তো দেন নি। যা দেবার আমাকেই দিয়েছিলেন। পনর টাকা দিয়েছিলেন সবসুদ্ধ। টিকিট লেগেছিল চার টাকা দু' আনা আর বাকি টাকাটা আমি রমেশবাবুর হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম হাসপাতালে ভরতি হবার পর।

নবীন। আপনি হাসপাতালে ভরতি করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

তারাপদ। হ্যাঁ।

নবীন। হাসপাতালের লোকেরা আপনাকে দেখেছিল ?

তারাপদ। তা দেখেছিল বই কি।

নবীন। সর্বনাশ, তাহলে তো সাক্ষীরও অভাব হবে না।

তারাপদ। [ভীত] কি হয়েছে বলুন তো ?

নবীন। রমেশবাবু মারা যান নি।

তারাপদ। মারা যান নি। কিন্তু কালনার অম্বিকা কম্পাউণ্ডার আমাকে খবর দিলে যে।—

নবীন। ভুল খবর দিয়েছে। আপনি তাকে স্বচক্ষে মারা যেতে দেখেন নি তো ?

তারাপদ। আজ্ঞে না। কিন্তু যারা তাঁকে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। সে বললে যে।

নবীন। সব ভুল বলেছে। রমেশবাবুর আজ চিঠি এসেছে, এই দেখুন।

[চিঠিটি তাকে দিলেন। তিনি ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে চিঠিটি উলটে পালটে দেখতে লাগলেন।]

তারাপদ। কি লিখেছেন চিঠিতে।

নবীন। যা লিখেছেন, তা অতিশয় সাংঘাতিক।

তারাপদ। কি ?

নবীন। লিখেছেন, তারাপদ পণ্ডিত—আচ্ছা ট্রেনে যে কামরায় আপনারা উঠেছিলেন সেটা খালি ছিল কি ?

তারাপদ। যখন উঠেছিলাম তখন খালি ছিল না কিন্তু পরে খালি হয়ে যায়।

নবীন। একেবারে খালি হয়ে যায় ?

তারাপদ। একেবারে।

নবীন। রমেশবাবু লিখেছেন যে তারাপদ পণ্ডিত আমাকে ট্রেনে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমি অসুস্থ শরীরে কোনও রকমে ধস্তাধস্তি করে তার হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিই, তাই প্রাণে বেঁচে গেছি কোন রকমে। পরের স্টেশনেই নেবে পড়ি আমি; তারাপদও আমার সঙ্গে নাবে। হাসপাতাল পর্যন্ত সে আমাকে 'ফলো' করেছিল।

তারাপদ। বলেন কি। এই কথাই লিখেছেন তিনি ?

নবীন। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আর কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে আসুন চিঠিটা।

তারাপদ। না না, আপনার কথায় অবিশ্বাস করবার কি আছে। কিন্তু আমি ভাবছি, তাঁর এ রকম লেখার মানেটা কি। আমি সমস্ত রাস্তা তাঁর পা টিপতে টিপতে গেলুম আর তিনি কিনা—

নবীন। তিনি এখন আপনাকে, আমাকে আর মহিমকে জড়িয়ে পুলিশ কেস করেছেন।

তারাপদ। আপনাদের সুদ্ধ জড়িয়েছেন ?

নবীন। আমাদের সুদ্ধ। তার ধারণা আমি মহিমকে বুদ্ধি দিয়েছিলাম, তাই মহিম আপনার সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছিল।

তারাপদ। আপনি বুদ্ধি দিয়েছিলেন ? কিন্তু আসল কথা তো তা নয়—!

নবীন। আহা তা তো জানি। কিন্তু আপনার আমার মুখের কথা তো আদালত বিশ্বাস করবে না, সেটা প্রমাণ করতে হবে—

[একটি চাপরাশি-জাতীয় ভৃত্যের প্রবেশ।]

চাপরাশি। [সেলাম করিয়া] ডাক্তারবাবু আছেন ?

নবীন। না, কেন ?

চাপরাশি। ডাকবাংলায় স্কুলের ইন্‌স্পেক্টার এসেছেন, তিনি দাঁত ব্যথার একটু ওষুধ চাইলেন। এই চিঠি দিয়েছেন। [একটি চিঠি বার করে দিল।]

নবীন। [চিঠিটার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে] আচ্ছা, আমি জবাব লিখে দিচ্ছি। এইটে নিয়ে তাঁকে দাও গিয়ে।

[চিঠিটার পিছনে খানিকটা কি লিখে দিলেন। চাপরাশি চিঠি নিয়ে চলে গেল।]

নবীন। ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি শুরু হয়ে গেল বোধ হয়। হঠাৎ স্কুল ইন্‌স্পেক্টার আসবার মানে কি তাহলে। ওঁর কি আসবার কথা ছিল আজ ?

তারাপদ। [ঢোঁক গিলিয়া] না তো।

নবীন। তাহলে আর দেখতে হবে না। এই জন্যেই এসেছেন।

তারাপদ। [ব্যাকুল ভাবে] উঃ তাহলে তো আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওই স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের কাছেই আমি একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করব বলে আশা করে বসে আছি।

নবীন। গ্রহের ফের আর কি। যাই হোক, মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন। একটি ভরসার কথা হরসুন্দরবাবুর মতো একজন আইনজ্ঞের পরামর্শ আমরা পেতে পারব। উনি ইংরেজিনবীশ হলে আরও ভাল হত। কিন্তু সৎপরামর্শ উনি দিতে পারবেন একটা। অভিজ্ঞ লোক তো। আপনি এক কাজ করুন বরং হরসুন্দর পণ্ডিতকে ডেকে আনুন।

তারাপদ। আমি টুনুরাণীকে পড়া করতে বলে এসেছি, সেইটে নিয়ে তারপর যাচ্ছি। তাকে বলে এসেছি এক মিনিটের মধ্যে আসব

নবীন। আপনাকে যা বলছি তাই করুন আগে।

তারাপদ। শিশুর কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়াটা কি ঠিক হবে ?

নবীন। আরে। পাগল নাকি আপনি। হরসুন্দরবাবুর কাছে যেতে আসতে কতটুকু সময় লাগবে আপনার। দু' মিনিটের রাস্তা তো।

নেপথ্যে টুনুরাণী। আমার পড়া হয়ে গেছে পণ্ডিত মশাই।

[তারাপদ পণ্ডিতের চোখে মুখে অপ্রতিভতা পরিস্ফুট হয়ে উঠল, যেন টুনুরাণীর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পেরে সত্যই তিনি লজ্জিত হয়েছেন। মহিমবাবুর সাত বছরের মেয়ে টুনুরাণী এল।]

টুনুরাণী। এই বুঝি আপনার এক মিনিট। আমার পড়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

[তারাপদ পণ্ডিত আরও অপ্রতিভ।]

নবীন। পণ্ডিতমশাই একটু দরকারে বাইরে যাচ্ছেন। এস আমি তোমার পড়া নিচ্ছি। [তারাপদকে] আপনি যান।

[তারাপদ পণ্ডিত চলে গেলেন।]

টুনুরাণী। প্রথম রিডিং নেবেন তো।

নবীন। পড।

টুনুরাণী। [বই থেকে পড়তে লাগল] "সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। যাহারা মিথ্যা কথা বলে জীবনে তাহারা কখনও সুখী হয় না। সাময়িক ভাবে তাহাদের সুখ-সুবিধা হইলেও পরিণামে তাহাদের কষ্ট পাইতে হয়। তাহাদের মনে কখনও সুখ-শান্তি থাকে না, লোকের কাছে তাহারা মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারে না, ধনী কিম্বা বিদ্বান হইলেও মনে মনে তাহারা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে তাহাদের মিথ্যা কথা ধরা পড়িয়া যায়। যাহারা সত্যবাদী তাহারা কিন্তু নির্ভীক, তাহাদের মনের শান্তি সর্বদা অটুট থাকে"—বাস্ আর নেই, এই পর্যন্ত। মানে আপনি বলে দেবেন?

নবীন। কিসের মানে বল।

টুনুরাণী। মহাপাপ মানে কি?

নবীন। খুব বেশি পাপ।

টুনুরাণী। পাপ কাকে বলে কাকাবাবু?

[নবীন এবার একটু বিপন্ন হইলেন।]

নবীন। পাপ? মানে, এই সব খারাপ কাজ আর কি।

টুনুরাণী। ও! সাময়িকভাবে?

নবীন। সাময়িকভাবে মানে, তখুনি তখুনি।

টুনুরাণী। শান্তি মানে কি?

নবীন। শান্তি মানে সুখ।

টুনুরাণী। ও। তাহলে সুখ শান্তি মানে সুখ সুখ? কি রকম বিচ্ছিরি যেন শোনাচ্ছে।

নবীন। সুখ শান্তি আছে নাকি। সেরেছে। এখানে তাহলে শান্তি মানে আনন্দ।

টুনুরাণী। ও। ধনী মানে বড়লোক, নয়? [হাসিয়া] দেখুন আমি জানি এটা। পরিণামে মানে কি?

নবীন। পরিণামে মানে শেষ কালে।

টুনুরাণী। ও। নির্ভীক?

নবীন। নির্ভীক মানে যার ভয় নেই, সাহসী।

টুনুরাণী। ও। অটুট?

নবীন। কই দেখি বইটা। [বইটা নিয়ে] অটুট থাকে, মানে ঠিক থাকে। যা গোটা তাকেই অটুট বলে। টুটে যাওয়া মানে ভেঙে যাওয়া।

টুনুরাণী। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের হিন্দুস্থানী চাকরটা বলতো 'টুট গিয়া'—

নবীন। যা ভেঙে যায় নি তাকেই বলে অটুট। তার মানে যা ঠিক আছে। আর কি পড়া আছে তোমার?

টুনুরাণী। কবিতা মুখস্থ। বলব?

নবীন। বল—

টুনুরাণী। "পাখি সব করে রব রাত্তি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল"

[টুনুরাণীকে কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হ'তে হল না। হরসুন্দরবাবুর সঙ্গে তারাপদ পণ্ডিত প্রবেশ করলেন এসে। হরসুন্দর যদিও হিন্দু কিন্তু হঠাৎ দেখলে মুসলমান বলে ভুল হয়। পরণে চেক-চেক লুঙ্গি, থুতনির উপর উপর একটু দাড়ি।]

নবীন। টুনু, এবার তুমি বাড়ি যাও।

টুনুরাণী। [তারাপদ পণ্ডিতকে] কাকাবাবুকে সব পড়া দিয়ে দিয়েছি।

নবীন। যাও ছুটি তোমার।

[টুনু একছুটে বেরিয়ে গেল।]

হরসুন্দর। ইন্‌স্‌পেক্টার হঠাৎ এসেছেন এই খবর পেয়ে আমিও এই দিকেই আসছিলাম। পথে তারাপদবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

নবীন। শুনলেন ওঁর কাছে সব কথা।

হরসুন্দর। শুনলাম তো।

নবীন। কি মনে হয় আপনার। বসুন।

[তারাপদ ও হরসুন্দর চেয়ার টেনে বসলেন। তারাপদর চোখের দৃষ্টি ভীত। হরসুন্দর চিন্তিত মুখে দাড়ি টানতে লাগলেন।]

নবীন। ব্যাপার তো খুবই সাংঘাতিক মনে হচ্ছে আমার। আপনার কি মনে হয়।

[হরসুন্দর ওষ্ঠ দিয়ে অধরকে নিষ্পিষ্ট করে চুপ করে রইলেন। তারপর আবার দাড়ি টানতে লাগলেন।]

নবীন। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সঙীন প্যাঁচে পড়েছি আমরা।

হরসুন্দর। গুম খুন।

নবীন। অ্যাঁ, বলেন কি!

হরসুন্দর। মোক্তারি-তত্ত্ব-কৌমুদীতে একে গুম খুনই বলেছে। এর শাস্তি হচ্ছে কারাবাস, দ্বীপান্তর বা প্রাণদণ্ড।

তারাপদ। কিন্তু আমি তো কিছুই করি নি। সত্য বলছি আমি।

হরসুন্দর। আরে চুপ করুন মশাই। আপনার কথা বিশ্বাস করে কে। আসামী মাত্রেই বলে থাকে যে সে নির্দোষ।

[ধমক খেয়ে তারাপদ পণ্ডিত চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখচোখে অসহায় ভাব আরও বেশি করে ফুটে উঠল।]

নবীন। এখন কি করতে হবে বলুন?

হরসুন্দর। অস্বীকার করতে হবে।

নবীন। অস্বীকার?

হরসুন্দর। তাছাড়া উপায় নেই। ওঁর বলতে হবে যে রমেশবাবুকে আমি নিয়ে যাই নি। রমেশ নামে কোনও লোককে আমি চিনি না, চিনতামও না। ও ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। সাফ অস্বীকার করে যেতে হবে।

নবীন। কিন্তু কালনা হাসপাতালের কয়েকজন লোক তারাপদবাবু আর রমেশবাবুকে একসঙ্গে দেখেছে যে।

হরসুন্দর। তাদের ঘুস দিয়ে স্বপক্ষে আনতে হবে।

নবীন। ও বাবা।

হরসুন্দর। এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাফ চেপে যেতে হবে।

নবীন। মহিমকেও তাহলে মিছে কথা বলতে হবে বলুন।

হরসুন্দর। নিশ্চয়।

নবীন। কিন্তু মহিমকে তো চেনেন, সে যদি রাজী না হয়।

হরসুন্দর। রাজী করাতেই হবে যেমন করে হোক। দরকার হলে তারাপদবাবু ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরবেন। রাজী হতেই হবে। সাক্ষীর মুখেই মকোদ্দমা।

[ডাকবাংলোর চাপরাশি এল। হাতে চায়ের সরঞ্জাম।]

চাপরাশি। ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু নিজেই এখানে আসছেন। চা দিয়ে এখানেই ওষুধ খাবেন বললেন।

নবীন। ও। [হরসুন্দরকে] হয়তো এখুনি এনকোয়ারি শুরু করবেন। আপনি তারাপদবাবুকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটু তালিম টালিম দিন।

হরসুন্দর। ইস্, সময় বড্ডই কম। তবু আসুন—

[তারাপদ ও হরসুন্দর বেরিয়ে গেলেন। চাপরাশি টেবিলে চায়ের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখল। পরমুহূর্তেই স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার প্রবেশ করলেন। সৌম্য দর্শন প্রৌঢ় একজন।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। [হেসে নমস্কার করে] নমস্কার, আপনিই বুঝি ডাক্তারবাবু?

নবীন। না, আমি ডাক্তারবাবুর বন্ধু। ডাক্তারবাবু কলে বেরিয়েছেন। এ

কি, আপনি চা সঙ্গে নিয়ে এলেন কেন? আমি আপনাকে এখানেই চা খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলাম।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার চিঠি যখন গেল তখন আমার চা ভিজিয়ে ফেলেছে। বললাম, তাহ'লে নিয়ে চল ওখানেই খাওয়া যাবে। অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট পেলে ভালো হ'ত একটা। দাঁতটা ব্যথা করছে।

নবীন। দিচ্ছি ব্যবস্থা করে। কম্পাউণ্ডারবাবু—

[কম্পাউণ্ডারবাবু প্রবেশ করিলেন।]

নবীন। অ্যাসপিরিনের একটা ট্যাবলেট দিন তো…

[কম্পাউণ্ডার চলে গেলেন। তার মধ্যে চাপরাশি চা তৈরি করে ফেলেছিল।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। [হেসে] নিন। ভাগাভাগি করে এটা শেষ করে ফেলা যাক।

[কম্পাউণ্ডারবাবু অ্যাসপিরিন দিয়ে গেলেন।]

নবীন। আপনি আসাতে আমাদের একটা বড় সুবিধে হয়ে গেছে।

[চায়ে চুমুক দিলেন।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। [অ্যাসপিরিন গলাধঃকরণান্তে] কি রকম! আমরা তো সকলের অসুবিধেই করে আসছি চিরকাল শুনছি।

নবীন। [হেসে] ইচ্ছে করেন তো এবার তার ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। কি রকম?

নবীন। আমি কোলকাতার লোক মশাই। অপুষ্টিকর সুস্বাদু দই, ধবধবে সাদা ভেজাল কলের ময়দার লুচি, সিনেমা, ফুটবল, গুজব, পরনিন্দা, পরচর্চা, বালাম চাল এই সবে অভ্যস্ত। হঠাৎ বাল্যবন্ধু মহিমের এখানে বেড়াতে এসে বেকায়দায় পড়ে গেছি। এখানকার কাণ্ডকারখানা আগাগোড়া নিদারুণ রকম খাঁটি এবং বিশুদ্ধ। ঘি, দুধ, দই প্রত্যেকটি ধোঁয়া-গন্ধ এবং খাঁটি। লোকগুলি নিরেট, রসিকতা করুন বুঝতে পারবে না, দাঙ্গা করতে বলুন সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত। দু-চার দিন ভাল লেগেছিল, বুঝলেন, কিন্তু তারপর থেকে পালাই পালাই ডাক ছাড়ছি, কিন্তু মহিম কিছুতে যেতে দেবে না। আজ তাই চিত্তবিনোদনের জন্য এখানকার স্কুলের তারাপদ পণ্ডিতকে নিয়ে একটু প্রহসন রচনা করছি। আপনি আসাতে খুব সুবিধে হয়ে গেছে। আপনি দয়া করে একটি কাজ করুন শুধু।

ইন্‌স্‌পেক্টার। কি কাজ?

নবীন। তারাপদ পণ্ডিতকে ডেকে শুধু জিগ্যেস করুন—আপনি রমেশ বলে কাউকে কি চিনতেন? বাস আর কিছু বলতে হবে না আপনাকে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। ব্যাপারটা কি ?

নবীন। রমেশ বলে মহিমের এক অসুস্থ আত্মীয়কে আপনাদের তারাপদ পণ্ডিত ছুটিতে বাড়ি যাবার সময়ে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কালনায় রমেশ মারা যায়। আজ হঠাৎ ইংরেজিতে রমেশের লেখা এক চিঠি এসেছে মহিমের নামে। আগেই সে চিঠিটা লিখেছিল, পরে পোস্ট করা হয়েছে। তারাপদ পণ্ডিত ইংরেজি জানে না, আমরা তাকে বলেছি যে রমেশ মরে নি। সে লিখেছে তারাপদ নাকি রাস্তায় তাকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল এবং আপনি নাকি ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি করতে এসেছেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। এই গল্প বিশ্বাস করেছেন উনি ?

নবীন। খুব বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক কিনা। আপনি ডেকে শুধু ওই কথাটি জিগ্যেস করুন, দোহাই আপনার।

ইন্‌স্‌পেক্টার। [একটু ইতস্তত করে] আমার পক্ষে এতে নিজেকে জড়ানোটা কি ঠিক হবে ?

নবীন। তাতে ক্ষতিটা কি। কেবল জিগ্যেস করুন, রমেশ বলে কাউকে আপনি কি চিনতেন ? বাস আর কিছু না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। বেশ ডাকুন।

নবীন। কম্পাউণ্ডারবাবু ?

[পাশের ঘর থেকে কম্পাউণ্ডারবাবু এলেন।]

কম্পাউণ্ডারবাবু। কি বলছেন ?

নবীন। তারাপদবাবুকে ডেকে দিন তো। বলুন, ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব তাঁকে ডাকছেন।

[কম্পাউণ্ডারবাবু চলে গেলেন।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। ডাক্তারবাবু ফিরবেন কখন ?

নবীন। তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেই তো গেছে।

ইন্‌স্‌পেক্টার। দাঁতটা দেখাতে হবে তাঁকে। কেরিজ হয়েছে মনে হচ্ছে, তুলে ফেলতে হবে বোধ হয়।

নবীন। খবরদার, খবরদার। চট করে দাঁত তোলাতে যাবেন না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। তাই নাকি ?

নবীন। নিশ্চয়। তুলে ফেললেই তো জন্মের মত বেহাত হয়ে গেল মশাই। যতক্ষণ আছে তাপ্‌পি তুপ্‌পি দিয়ে চালান, তুলবেন না।

[কম্পান্বিত কলেবর তারাপদ পণ্ডিত প্রবেশ করলেন। ইন্‌স্‌পেক্টারের পিছন দিকের খোলা জানলাটা দিয়ে দেখা গেল হরসুন্দরও বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন এসে।]

নবীন। [তারাপদকে] ইনিই ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব। আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে চান।

[তারাপদ হাত জোড় করে ইন্‌স্‌পেক্টারকে নমস্কার করলেন এবং হাত জোড় করেই রইলেন। দেখা গেল তাঁর পা থর থর করে কাঁপছে।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনি কি রমেশ বলে কাউকে চিনতেন ?

[তারাপদ নীরব। জানলা দিয়ে দেখা গেল হরসুন্দর ঘন ঘন হাত নেড়ে তাঁকে সত্যি কথা বলতে বারণ করছেন।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। রমেশ বলে কাউকে চিনতেন কি ?

তারাপদ। [কম্পিতকণ্ঠে] আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকে আমি সঙ্গে করে কালনা হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। পরে খবর পাই তিনি মারা গেছেন। এখন শুনছি—

[তিনি আর বলতে পারলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। ও, আচ্ছা। আপনার দেশ কোথা ?

তারাপদ। ওই কালনার কাছেই।

ইন্‌স্‌পেক্টার। সেখান থেকে এতদূর চাকরি করতে এসেছেন ?

তারাপদ। আমি গ্রামেই চাকরি পেয়েছিলাম হুজুর। কিন্তু সেখানে ওঁরা নিয়ম করলেন যে, একজন ইন্‌স্‌পেক্টারের সার্টিফিকেট না হলে চাকরি পাকা হবে না। ওখানে সার্টিফিকেট পেলাম না, তাই এখানে এসেছিলাম যদি—কিন্তু কি করে যে কি হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারছি না আমি—বিশ্বাস করুন হুজুর আমি নির্দোষ—আমি কিছু করি নি—

ইন্‌স্‌পেক্টার। আপনার পুরো নাম কি ?

তারাপদ। শ্রীতারাপদ রায়।

ইন্‌স্‌পেক্টার। ও, আচ্ছা। যান আপনি।

[তারাপদ পণ্ডিত চলে গেলেন।]

ইন্‌স্‌পেক্টার। অত্যন্ত সরল লোকটি।

নবীন। অত্যন্ত।

ইন্‌স্‌পেক্টার। এবার আমি উঠি।

নবীন। কিন্তু একটা জিনিস যে উল্‌টো হয়ে গেল। আমি আপনাকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করলাম কিন্তু আপনিই আমাকে চা খাইয়ে গেলেন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। [হেসে] তাতে কি হয়েছে।

নবীন। হয় নি কিছুই। রাত্রে কিন্তু আপনি খাবেন আমাদের সঙ্গে। আলাদা ব্যবস্থা করবেন না আর।

ইন্‌স্‌পেক্টার। আচ্ছা, তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

নবীন। ব্যস্ত হচ্ছি না। এইখানেই খাবেন কিন্তু।

ইন্‌স্‌পেক্টার। [হাসিয়া] এখন চলি তবে। একটু পরে আসব।

[ইন্‌স্‌পেক্টার চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ ও হরসুন্দর প্রবেশ করলেন বিপরীত দ্বার দিয়ে।]

তারাপদ। [শুষ্কমুখে] কি বলে গেলেন উনি?

নবীন। গুম হয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

হরসুন্দর। ছি ছি ছি সমস্ত পণ্ড করে দিলেন। এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলাম—

নবীন। [তারাপদকে] এ রকম একজন আইনজ্ঞ লোকের পরামর্শ আপনার নেওয়া উচিত ছিল।

তারাপদ। [অপ্রতিভ] মিছে কথা কখনও বলি নি। ওরকম ডাহা মিছে কথাটা কি করে—

হরসুন্দর। প্রয়োজনের খাতিরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও মিছে কথা বলেছিলেন তা জানেন? আত্মরক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। ওর চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। যান এবার ফাঁসি কাঠে ঝুলুন গে—

নবীন। ফাঁসিই হয়ে যাবে বলছেন?

হরসুন্দর। নির্ঘাত। অথচ ব্যাপারটা যদি উনি অস্বীকার করে যেতেন কিছুই হ'ত না। লিখিত প্রমাণ তো কোন নেই। সাক্ষীর জবানবন্দীর উপরই সব নির্ভর করছে। সে পরে ঠিক করে নেওয়া যেত। কিন্তু উনি গোড়াতেই যে গুটি কাঁচিয়ে দিলেন। ছি, ছি, ছি—

তারাপদ। আমার কি রকম যেন ভয় করতে লাগল। কখনও তো—

হরসুন্দর। ভয়? বলতে লজ্জা করে না? আপনি কি পুরুষ মানুষ? খুলে ফেলুন তাহলে এটা।

[ফস করে তারাপদ পণ্ডিতের কাছা টেনে খুলে দিলেন।]

তারাপদ। [অপ্রস্তুত মুখে কাছা গুঁজতে গুঁজতে] কি করছেন আপনি—

হরসুন্দর। কান্না দিয়ে থাকবার অধিকার নেই আপনার। ঘোমটা দিয়ে থাকুন, তাই মানাবে আপনাকে।

নবীন। হরসুন্দরবাবু, মাথা ঠিক রাখুন। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন কি করতে হবে সেইটে বলুন, বাজে কথা ছেড়ে দিন।

হরসুন্দর। গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি কিছু হয়? হয় না।

নবীন। আপনি সুদ্ধ যদি এমন করে হাল ছেড়ে দেন তা হলে তো ভরাডুবি হব আমরা। আপনিই আমাদের ভরসা এখানে।

হরসুন্দর। এখন যদি ওই ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু আমাদের স্বপক্ষে রিপোর্ট দেন তাহলেই বাঁচবার আশা আছে। সেইটে চেষ্টা করে দেখতে পারেন আপনারা।

নবীন। মিথ্যে কথা লিখতে কি উনি রাজী হবেন? [তারাপদকে] আপনি গিয়ে কি অনুরোধ করে দেখবেন একবার?

হরসুন্দর। ওঁর দ্বারা কিছু হবে না। তা ছাড়া, এসব অনুরোধ-উপরোধের কর্ম নয় [আঙুল দিয়ে কল্পিত টাকা বাজিয়ে] নগদ এই যদি ছাড়তে পারেন কায়দা করে তাহলে হয়তো হতে পারে।

নবীন। ঘুষ বলছেন? অত টাকা কোথায় পাবেন ব্রাহ্মণ। অন্তত শ'খানেক টাকার কম তো ওরকম একটা পদস্থ অফিসারকে অফার করা চলে না। শ'খানেকেও কুলোবে কি না কে জানে।

হরসুন্দর। ও ছাড়া আর উপায় নেই। [দাড়ি টানতে লাগলেন।]

নবীন। [তারাপদকে] কত টাকা যোগাড় করতে পারবেন আপনি।

তারাপদ। আমার কাছে চার পাঁচ টাকা আছে বড় জোর।

নবীন। মহিম আসুক, তার কাছ থেকে জোগাড় হতে পারবে হয় তো।

[ডাকবাংলার চাপরাশি আবার এল। তার হাতে একটি কাগজ।]

চাপরাশি। ইন্‌স্‌পেক্টারবাবু এটা তারাপদবাবুকে দিয়ে দিতে বললেন।

নবীন। কি ওটা?

হরসুন্দর। ওয়ারেন্ট সম্ভবত।

[চাপরাশি কাগজখানা নবীনের হাতে দিয়ে চলে গেল।
নবীন ভ্রূকুঞ্চিত করে পড়তে লাগলেন।]

হরসুন্দর। ওয়ারেন্ট, না?

নবীন। না সার্টিফিকেট একখানা। তারাপদবাবুর উপর সন্তুষ্ট হয়ে খুব ভাল একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

হরসুন্দর। সন্তুষ্ট হয়েছেন?

নবীন। খুব। যাক বাঁচা গেল। এ ফাঁড়াটা কেটে গেল আপাতত।

[তারাপদ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অবিশ্বাস, বিস্ময় এবং আনন্দে তাঁর মুখভাব অবর্ণনীয় হয়ে উঠেছিল। ঈষৎ ব্যাদিত আননে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি শুধু।]

যোদ্ধা

স্থানীয় স্কুলের কার্যকরী সভার সভ্য হিসাবে নূতন শিক্ষকটির মনোনয়ন ব্যাপারে আমারও খানিকটা হাত ছিল। আমার পালটি ঘর বলিয়া নয়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণাবলীর জন্যই আমি তাহার হইয়া লড়িয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. এবং বি টি.। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও আছে। দরখাস্তের সঙ্গে সে সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইয়াছিল। তাহাকে আসল সার্টিফিকেট পাঠাইবার জন্য লেখা হইল। ফেরত ডাকেই আসল সার্টিফিকেটগুলি আসিয়া গেল। দেখিয়া মেম্বাররা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুত মফঃস্বলের স্কুলে এরূপ প্রথম শ্রেণীর লোক পাওয়া যাইবে তাহা আমরা আশাই করিতে পারি নাই। তার-যোগে আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিলাম। সার্টিফিকেট দিয়া যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়াছেন, দেখা গেল, তাঁহারা মোটেই অত্যুক্তি করেন নাই। চৌকোস ছোক্‌রা। শুধু গুণবান নয়, রূপবানও। গান বাজনা খেলা সবেতেই দক্ষ। চমৎকার পড়াইতে পারে। সহকর্মীদের সহিত ব্যবহারও ভদ্রজনোচিত। সকলেই সুখ্যাতি করিতে লাগিল। আমি তাহাকে আমার বাড়িতেই স্থান দিলাম। মফঃস্বলে মেয়েদের পড়াইবার বড় অসুবিধা। আমার একমাত্র সন্তান একটি মেয়ে। সাধ ছিল বিজলীকে লেখাপড়া শিখাইব, কিন্তু সুবিধা ছিল না। নরেন্দ্রনাথকে পাওয়াতে সুবিধা হইল। আমার বাসায় থাকিয়া সে বিজলীর পড়াশোনার ভার লইল।

…শুধু বাংলা ইংরেজী অঙ্ক সংস্কৃত নয়, অনেক বিষয়ই সে বিজলীকে পড়াইত। পাশের ঘর হইতে একদিন শুনিলাম সে ডারবিনের থিয়োরি অব ইভল্যুশন সম্বন্ধে সরলভাষায় বক্তৃতা করিতেছে। বেশ লাগিল।

বলিতেছিল—"একটা কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, আমরা সকলেই যোদ্ধা। সকলেই আমরা বাঁচবার জন্যে যুদ্ধ করছি, এই যুদ্ধের প্রধান উপকরণ শক্তি। সে শক্তির নানা রূপ। শুধু বাহুবলই শক্তি নয় বুদ্ধিবলই আসল শক্তি। মানুষ

জীবনযুদ্ধে সিংহ গণ্ডার হাতীকে হারিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। মানুষদের মধ্যেও যে যত বেশি বুদ্ধিমান, সে তত বেশি কৃতী। পাখির গান, ফুলের গন্ধ, প্রকৃতির এই এত অজস্র ঐশ্বর্য সবই সেই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, বিচিত্র লীলা…"

সহজ সরল ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর শুনি নাই। ছেলেটির প্রতি ক্রমশই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলাম। একদিন মনে হইল বিজলীর সহিত ইহার বিবাহ দিলে কেমন হয়? ইহাকে স্বামীরূপে পাইলে বিজলী যে অসুখী হইবে না তাহা তো স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। মাস্টারমশায়ের কাছে বসিয়া থাকিতে পাইলে বিজলী আর কিছুই চায় না।

পরিচয় লইয়া জানিলাম নরেন্দ্রনাথের তিনকুলে কেহ নাই। দূর সম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে নাকি বাল্যকাল কাটাইয়াছিল। তাহার পর স্কলারশিপের টাকা দিয়াই সে বারবার নিজের খরচ চালাইয়াছে। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। পণ দাবি করিতে পারেন এমন কোন অভিভাবক নাই। ইহার সহিত বিবাহ হইলে আমার একমাত্র সন্তানটিও আমার কাছেই থাকিতে পারিবে।

কথাটা একদিন পাড়িলাম। নরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। বুঝিলাম অমত নাই। বিবাহ হইয়া গেল।

* * *

বিবাহের পর তিনমাস অতীত হইয়াছে।

সেদিন নরেন এবং আমি বাহিরের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, হঠাৎ পথ-চলতি একজন ভদ্রলোক নরেনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"আরে পূর্ণ যে। তুমি এখানে—"

লোকটি আগাইয়া আসিলেন। নরেনের মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। আমিও অবাক হইয়া গেলাম। নরেনকে পূর্ণ বলিয়া ডাকিল কেন! ভদ্রলোক আগাইয়া আসিতেই নরেন উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, "আমি আসছি একটু ভিতর থেকে।" ভিতরে চলিয়া গেল। আমিই ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়া বসাইলাম।

"আসুন, বসুন।"

ভদ্রলোক উপবেশন করিয়া বলিলেন, "পূর্ণকে এখানে দেখব আশাই করি নি।"

আমি প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না।

"ওর নাম তো নরেন, পূর্ণ বলছেন কেন?"

"নরেন? ওকে পূর্ণ বলেই তো বরাবর জানি। ও আমাদের স্কুলের নামজাদা ছেলে। এখানে নাম বদলেছে নাকি?"

"আপনার সহপাঠী ছিল ?"

"শুধু আমার কেন, আমার, আমার দুই দাদার, আমার ছোট কাকারও। বেচারী ম্যাট্রিকুলেশনটা কিছুতে পাশ করতে পারলে না। এদিকে চৌকোস। গান, বাজনা, খেলা সবেতেই ওস্তাদ। ইংরেজিও বেশ বলতে কইতে পারে, এখানে কি করছে ?..."

স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

নরেন বাহির হইয়া আসিল। মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। চোখে মুখে বেশ সপ্রতিভ ভাব।

"বীরেন এখানে কি মনে করে ?"

"আমি ভাই পাটের বিজনেস করছি। পাট কিনতে এসেছি এখানে। এখানকার নাথুমলের সঙ্গে আলাপ আছে তোর ?"

"আছে।"

"একবার যাবি আমার সঙ্গে ? আয় না—"

দুই বন্ধুতে বাহির হইয়া গেল।

অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। কাহাকেও কিছু বলিলাম না। সন্ধ্যার পর নরেনকে নিরিবিলিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, সকালে ওই যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন—"

আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নরেন বলিল, "সব কথা খুলেই বলি তাহলে। বীরেন যে কথা সকালে আজ আপনাকে বললে তা মিছে নয়। আমার নাম পূর্ণ, নরেন নয়।"

"তুমি এম. এ. বি. টি. নও ?"

"আজ্ঞে না। আমি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারি নি। তবে আমি মূর্খ নই, আমি—"

"তবে তুমি সার্টিফিকেটগুলো পেলে কি করে ?"

"যোগাড় করেছিলাম। মানে, খুলেই বলি তা হলে। আপনি এখন আমার আপনার লোক, আপনার কাছে আর গোপন করে লাভ নেই। কোথাও চাকরির কোনও যোগাড় করতে না পেরে আমি একটা বুদ্ধি বার করলাম শেষে। আমিই নিজে একটি বিজ্ঞাপন দিলাম যে, অমুক স্কুলের জন্য ভাল একজন শিক্ষক চাই। বেতন মাসিক দু'শো টাকা। অমুক পোস্টবক্সে দরখাস্ত করুন। অনেক দরখাস্ত এল। তার মধ্যে নরেন বাঁড়ুয্যের কোয়ালিফিকেশন দেখলাম সবচেয়ে ভাল। তাকে লিখলাম যে, তোমার অরিজিন্যাল সার্টিফিকেটগুলো পাঠিয়ে দাও, তোমার

চাকরি হবার খুব সম্ভাবনা। সেই সার্টিফিকেটগুলো হস্তগত হবার পর আমি আপনাদের স্কুলে দরখাস্ত করলাম। এদিকে তার সঙ্গে চিঠিপত্র চলতে লাগল। চিঠিতে তাকে খুব আশা দিতে লাগলাম যে, আপনার চাকরি হবার খুবই সম্ভাবনা, দু'জন মেম্বার অসুস্থ, তাই আমাদের মীটিং হচ্ছে না। তাঁরা সুস্থ হলেই আপনাকে নিয়োগপত্র পাঠান হবে। তারপর আপনারা যখন আমাকে রাখলেন তখন তাকে সার্টিফিকেটগুলো ফেরত দিয়ে দুঃখের সঙ্গে জানালাম যে, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার মতন লোককে আমরা নিযুক্ত করতে পারলাম না, কারণ ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেবের ইচ্ছা একজন মুসলমান নেওয়া। এই হল ট্রু ফ্যাক্ট···”

বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে নরেনের চোখমুখ ঝলমল করিতে লাগিল।

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, বুঝিলাম প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই, তবু করিলাম, “এমন কাজ করলে কেন ?”

“পেটের দায়ে। জীবনটা একটা যুদ্ধ—কথাই আছে Everything is fair in war and love, জীবনযুদ্ধে বুদ্ধিই একমাত্র অস্ত্র। আপনাকে অকপটে সব কথা খুলে বললাম, আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাও হয়েছে, আশা করি আপনি আমার সহায় হবেন। স্কুলের চাকরি আমি করব না বেশি দিন। বীরেনের সঙ্গে পাটের কারবারেই নাবব ভাবছি। বীরেন আমাকে সাহায্য করবে বলছে—”

নীরব হইয়া রহিলাম।

এখনও নীরব হইয়া আছি, কারণ জীবনযুদ্ধে আমিও একজন যোদ্ধা। বিজলীর ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে !

মুখোশ

অঘোরে ঘুমুচ্ছিলাম বাইরের ঘরটায়। রাস্তার দিকের কপাটটা ভেজান ছিল ; হঠাৎ বিজন আমাকে ডেকে জাগিয়ে দিলে।

“আপনি ভিতরে যান একবার, পিসিমা কি রকম করছেন—”

বলেই সে চলে গেল। পাশের বাড়িতে থাকে বিজন। পাশের ঘর থেকে সত্যিই গোঁ গোঁ শব্দ আসছিল একটা। তাড়াতাড়ি গেলাম সেখানে। গিয়ে দেখি পিসিমা—আমার একমাত্র পিসিমা—বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন।

“কি হ'ল পিসিমা ?”

পিসিমা নিরুত্তর।

"অমন করছ কেন পিসিমা? কি হ'ল?"

"ভু-ভু-ভু-ভু" গোছের একটা শব্দ করে পিসিমা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পিসিমা বরাবরই একটু ভীতু প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম একটু। ছুটে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিলাম, বেরিয়েই দেখি বিজন দাঁড়িয়ে আছে।

"ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছেন না কি?"

"হ্যাঁ।"

"আমিই ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি বরং পিসিমার কাছে থাকুন।"

বিজন ছেলেটি বড় ভাল।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই একটা ইনজেকশন দিলেন। এক ডোজ ওষুধও খাইয়ে দিলেন ব্যাগ থেকে বার করে। বললেন, পিসিমার স্নায়ু-দৌর্বল্য হয়েছে। একটা ফুল কোর্স ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিতে হবে। ডাক্তারবাবুকে তখনই নগদ বাইশ টাকা দিতে হ'ল। রাত্রে এসেছেন বলে ডবল ফি ষোল টাকা, ইনজেকশন আর ওষুধের দাম ছ' টাকা। ফুল কোর্স ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়ামে আরও কত লাগবে কে জানে। তবু মরীয়া হয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ভিটামিন বি এবং ক্যালসিয়ামের ইনজেকশন তিনি দিয়ে যান এসে। কালো বাজারে অনেক পয়সা পিটেছি, পিসিমার চিকিৎসার ত্রুটি করব না। পিসিমাই মানুষ করেছেন আমাকে।

রাত্রে পিসিমা চুপ করে শুয়ে রইলেন। কোনও কথা বললেন না বিশেষ। ডাক্তারবাবুও মানা করে গিয়েছিলেন যেন কথা কওয়াবার চেষ্টা না করা হয়।

সকালে পিসিমা একটু সুস্থ হতে জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা পিসিমা, কি হ'ল বল তো তোমার কাল হঠাৎ?" পিসিমা চুপি চুপি বললেন, "ভূত বাবা, ভূত! ডাক্তার না ডেকে একটা ওঝা ডাক।"

"ভূত!"

"হ্যাঁ, ভূত।"

পিসিমার চোখের দৃষ্টি ভয়-বিহ্বল।

"বল কি! দেখলে তুমি?"

"স্বচক্ষে! আমার মাথার শিয়রের দিকে জানলাতে রাস্তার আলোটা পড়ে তো, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি সেখানে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো চেহারা, বড় বড় সাদা চোখ, চোখের তারা লাল টকটক করছে, বড় বড় দাঁত। উঃ, আবার যদি দেখি তা হলে ম'রে যাব আমি! একটা ওঝার সন্ধান দেখ, তুই।"

চিন্তিত হলাম। ভূতের জন্য নয়, পিসিমার জন্য। পাগল হয়ে যাবেন না তো শেষটা? আমার এক বন্ধুর মা ভূত-ভূত করে পাগল হয়ে গেছেন জানি।

যে ডাক্তারবাবু কাল এসেছিলেন তার সঙ্গে বিজনেরই আলাপ বেশী। তিনি যদি আর কোনও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত মনে করেন তাই করুন না হয়।

বিজনের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে গেলাম পাশের বাড়িতে। বিজনরা অল্পদিন হল আমাদের প্রতিবেশী হয়েছে। খুব বেশি মাখামাখি হয় নি, তবু বিজন ছোকরাটিকে ভাল বলেই মনে হয়। গিয়ে দেখি বিজন বেরিয়ে গেছে। বাইরের বসবার ঘরটি খোলা ছিল, সেইখানে বসে তার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ বিজনের ভাই-পো ফড়িং একটা মুখোশ পরে এসে আমাকে ভয় দেখাতে লাগল—হুম্ হুম্ হুম্—! কুচকুচে কালো রংয়ের মুখোশ। তাতে বড় বড় সাদা চোখ আর চোখের তারা টকটকে, লাল দাঁতগুলোও বড় বড়।

মুখোস খুলে খিল খিল করে হেসে উঠল ফড়িং!

"কোথা থেকে পেলি এটারে?"

"কাকা পরশু দিন কিনে এনেছে"—বলেই ফড়িং ছুটে চলে গেল অন্দরের দিকে।

পরমুহূর্তেই বিজন ফিরল। বাজারে গিয়েছিল, চমৎকার একটা ইলিশ মাছ কিনেছে দেখলাম।

"আমি আসছি এখনি"—বলেই সে ভিতরে ঢুকে গেল। বাজারটা রেখে ফিরে এল মিনিট পাঁচেক পরে। আসতেই তাকে বললাম, "পিসিমা কি বলছেন জান?"

"কি?"

"বলছেন তিনি ভূত দেখেছিলেন। আর ভূতের চেহারার যা বর্ণনা দিলেন তা আশ্চর্য রকম মিলে যাচ্ছে তোমার ভাইপো ফড়িং যে মুখোশটা পরে এসেছিল তার সঙ্গে।"

"এসেছিল না কি! রাস্কেলটাকে মানা করে গেলাম ওটাতে যেন হাত না দেয়।"

সবেগে বিজন ঢুকে গেল অন্দরের দিকে এবং পর মুহূর্তেই ফড়িংয়ের আর্ত হাহাকার শোনা গেল। বুঝলাম ফড়িংকে চাবকাচ্ছে বিজন।

বেরিয়ে এল আবার।

"কি, ব্যাপার কি?"

বিজনের সমস্ত মুখের চেহারা বদলে গেছে যেন।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল, তারপর কেঁদে ফেলল। খুব কাঁদতে লাগল। ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আমি। হল কি।

কিছুক্ষণ কেঁদে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে বিজন শেষকালে যা বলল তা আরও বিস্ময়কর। কিছুদিন থেকে অত্যন্ত দুরবস্থা চলেছে তাদের। যদিও বাইরের ভড়ংটা বজায় আছে কিন্তু ভিতরে হাঁড়ি চড়ছিল না। যে ডাক্তারবাবুটি এসেছিলেন তিনি বিজনের মাস্তুতো ভাই। তাঁর অবস্থাও তদ্রূপ। তাই দু'জনে মিলে প্যাক্ট করেছে একটা। রোগী জুটিয়ে দিলে রোগী পিছু তাকে কমিশন দেবেন ডাক্তারবাবু। অনেক ফন্দী করে অনেক রকম রোগী তাকে জুটিয়ে দিয়েছে বিজন। কিন্তু গত সাতদিন থেকে একটিও রোগী জোটাতে পারেনি সে। অথচ সংসারে নিত্য খরচ লেগেই আছে। কাল বৌদি বললেন যে, চাল বাড়ন্ত হয়েছে। এ ক'দিন শুধু ভাত জুটছিল, অবিলম্বে কিছু টাকা যোগাড় করতে না পারলে তাও জুটবে না। পিসিমা ভীতু লোক সে জানত, তাই একটা মুখোশ কিনে সে…।

শুনলাম ওই ভিটামিন আর ক্যালসিয়ামওলাদের সঙ্গেও না কি ডাক্তারবাবুটির কমিশন বন্দোবস্ত আছে।

সাধুতার মুখোশ পরে কালো বাজারে ব্যবসা করি বলে মনে মনে আমিই লজ্জিত ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি—ও বাবা।

মাত্রা

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, "মণিমোহন চক্রবর্তী? ভদ্রলোকের বাঁ চোখের নীচে কি কালো দাগ ছিল একটা?"

"হ্যাঁ। আপনি চিনতেন না কি তাকে?"

"দেখা হয়েছিল একবার।"

ট্রেনে পাশাপাশি বসিযাছিলাম। পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা ওঠাতেই মণিমোহন চক্রবর্তীর কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। মণিমোহন চক্রবর্তীর কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ ট্রেনে তাহার শ্বশুরের সহিত যে দেখা হইয়া যাইতে পারে ইহাও আমার কল্পনাতীত ছিল।

…প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। চাকুলা ডিস্পেন্সারির ডাক্তারবাবু ছুটি

লইয়াছিলেন, আমি এক মাসের জন্য তাঁহার জায়গায় গিয়াছিলাম। সেইখানেই মণিবাবুর সহিত দেখা হয়, মণিবাবু চাকুলার ডাক্তারবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের যে ঘরটি স্ত্রীলোকদের জন্য আলাদা করা থাকে মণিবাবু সেই ঘরটিতেই রাত্রে শয়ন করিতেন। ঠিক তাহার পাশেই রোগীদের ঘা ধোয়াইবার জন্য যে ঘরটি নির্দিষ্ট, আমি সেইটাতেই শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। মফঃস্বলের ডিস্‌পেন্সারিতে আইন বাঁচাইবার জন্য এ ঘর দুটি থাকে বটে কিন্তু রোগীদের জন্য কখনও ব্যবহৃত হয় না। রোগী সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কর্মই প্রায় বারান্দাতেই নিষ্পন্ন হয়। আমাদের খাবার ডাক্তারবাবুর বাসা হইতে আসিত। ডাক্তারবাবু ছুটি লইয়া বাহিরে গিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন চাকুলায়।

একদিন এই মণিবাবুর জ্বর হইল। সামান্য জ্বর, বিশেষ কিছু না। কিন্তু মণিবাবু কেমন যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন ভয় পাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, ঔষধাদি দিলাম এবং চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া থাকিতে বলিলাম। তখন শীতকাল। মণিবাবু সমস্ত দিন লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন। জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যাবেলা দেখিলাম জ্বরটা একটু বাড়িয়াছে। চক্ষু দুইটি লাল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছেন?"

"খুব ভাল, চমৎকার।"

টেম্পারেচার লইয়া দেখিলাম জ্বর বাড়িয়াছে।

রাত্রি তখন বোধহয় দশটা হইবে। ডাক্তারবাবুর চাকর মধু আসিয়া বলিল, "মণিবাবু কি রকম করছেন, আপনি একবার দেখুন এসে।"

গিয়া দেখিলাম সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া মণিবাবু চেয়ারে বসিয়া আছেন।

বলিলাম, "এ কি করছেন মণিবাবু, কাপড় খুলে ফেললেন কেন? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

"এখনই তো লেপের তলায় ঢুকব, কাপড় পরে আর কি হবে।"

মধু মণিবাবুর জন্য সাবু আনিয়াছিল। সাবুটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিলাম।

"জল খাবেন একটু?"

"খাব বই কি। কিন্তু কাঁসার গ্লাসে নয়, রূপোর গ্লাসে! ওই যে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখছেন না?"

খোলা দ্বারটার দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। আমি ঘাড় ফিরাইয়া অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

"কে দাঁড়িয়ে আছে?"

"মায়া, আমার স্ত্রী মায়া। দেখতে পাচ্ছেন না? রূপোর গ্লাসে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই যে—"

বিস্ফারিত উৎসুক নেত্রে অন্ধকারের দিকে তিনি খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—মনে হইল সত্য যেন কিছু একটা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

"এই যে যাচ্ছি—"

ওই অবস্থাতেই উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, আমি জোর করিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিলাম। বুঝিলাম জ্বর বাড়াতে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

"আপনি একলা উঠে খবরদার বাইরে যাবেন না। আমি পাশের ঘরেই আছি, দরকার হলে ডাকবেন। কেমন? আমি সজাগ হয়ে রইলাম।"

...অনেকক্ষণ জাগিয়া ছিলাম। একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিলাম মণিবাবু আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া আছেন। আমিও গিয়া শুইয়া পড়িলাম। ঘুম ভাঙিল চৌকিদারের ডাকাডাকিতে। বাহির হইয়া দেখি উলঙ্গ মণিমোহন তাহার সঙ্গে।

চৌকিদার বলিল, "আমি রোঁদ দিয়ে ফিরছিলাম। দেখলাম বেত ঝোপটার কাছে অনেকগুলো কুকুর ডাকছে। খুব ডাকছে। কেমন যেন সন্দেহ হল, এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। গিয়ে দেখি এই লোকটা ন্যাংটো দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম, পাগল টাগল হবে বোধ হয়। জিগ্যেস করাতে বললে ডাক্তারখানার রাস্তা কোন্‌টা খুঁজে পাচ্ছি না। কথা শুনে ভদ্রলোক মনে হল, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।"

চৌকিদারকে বিদায় করিয়া মণিবাবুকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, মুখে মৃদুহাসি।

"একা বেরিয়ে গেস্‌লেন কেন? আমাকে ডাকলেই পারতেন।"

"মায়া ছিল যে। চকচকে রূপোর গ্লাসটা দেখিয়ে সে আমায় ডাকলে। বললে, আমার সঙ্গে এস। ঝরনা থেকে ফটিক জল তুলে দেব তোমাকে। তাই চলে গেলাম। হঠাৎ মাঝখানে কি রকম বেত বন টন এসে পড়ল—বুঝতে পারছি না ঠিক—গুলিয়ে যাচ্ছে—"

"শুয়ে পড়ুন। আমাকে না ডেকে আর বাইরে বেরুবেন না।"

বাধ্য বালকের মতো মণিবাবু বিছানায় ঢুকিয়া পড়িলেন।

...মধুর ডাকাডাকিতে ভোরবেলা ঘুম ভাঙিল। বাহির হইয়া দেখি মণিবাবুর মৃতদেহটা সিঁড়ির উপর পড়িয়া আছে।

…অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন হু হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। পার্শ্ববর্তী বৃদ্ধকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "আপনার মেয়ে মায়া আত্মহত্যা করেছিল ?"

"হ্যাঁ, মশাই। দানে রূপোর বাসন দিতে পারি নি বলে এমন গঞ্জনা দিয়েছিল সবাই মিলে যে গলায় দড়ি দিতে হয়েছিল তাকে।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

শিল্পীর ক্ষোভ

মদন ঘোষাল যদিও জীবনে কোনও কবিতা লেখেন নি বা ছবি আঁকেন নি তবু তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বললে অন্যায় হবে না, কারণ তিনি জীবনের প্রতি মুহূর্তটিকে শিল্পীজনসুলভ আনন্দসহকারে উপভোগ করেছেন। অনন্যতাও আছে তাতে।

রেশ খেলেছেন, কিন্তু টাকার লোভে নয়, খেলেছেন ওর নাটকীয় উন্মাদনাটা উপভোগ করবার জন্যে। জীবনে নর্তকী-বিলাস করেছেন বহুবার, কিন্তু নর্তকীকে স্পর্শ করেন নি কখনও। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন খুব বড়লোকের বাড়িতে। ব্যাঙ্কের অঙ্ক তাঁকে মুগ্ধ করে নি, করেছিল জামাইয়ের লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা। অদ্ভুতরকম অব্যর্থ বন্দুকের লক্ষ্য ছোকরার।

শোনা যায় তত্ত্ব করবার সময় বেয়াইমশায়কে লিখেছিলেন—আমি গরীব মানুষ, আপনার মর্যাদা রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই আমার। বেশি কিছু পাঠাতে পারলাম না। একটি মাত্র মিষ্টান্ন পাঠাচ্ছি, দয়া করে গ্রহণ করলে বাধিত হব।

বেয়াইমশাই চিঠি পড়ে চটে উঠেছিলেন, কিন্তু মিষ্টান্নটি দেখে অবাক হতে হল তাঁকে। বিশাল একটা কড়ায় বিরাট একটা পানতোয়া প্রচুর রসে হাবুডুবু খাচ্ছে। কড়ার আংটায় বাঁশ গলিয়ে ষোল জন লোক বয়ে এনেছে।

খবর নিয়ে জানতে পারলেন পানতোয়াটির ওজন একমণ।

ঘোষালমশায় দানে চিরকাল মুক্তহস্ত। দানটা যত নাটকীয় হত তত আনন্দ হত তাঁর।

পাড়ার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন। মেয়েটি কালো, অনেক টাকা পণ লাগবে।

ঘোষালমশাই অর্থ সাহায্য করলেন না, মেয়েটিকে একেবারে নিজের পুত্রবধূ করে নিলেন।

শোনা যায় প্রথম-যৌবনে নব-পরিণীতা বধূর কাছে চিঠি পাঠাবার জন্তে বহুবিচিত্রবর্ণের শিক্ষিত পারাবত পুষেছিলেন তিনি। পায়রার গলায় চিঠি বেঁধে দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিতেন এবং আশা-আশঙ্কা-দোদুল-চিত্তে চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে।

এ রকম নানা গল্প প্রচলিত আছে ঘোষালমশায়ের সম্বন্ধে। তাঁর যা কিছু ছিল খেয়ালের হাওয়ায় রঙীন ফানুসের মতো উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি সারা-জীবন ধরে।

সেদিন ঘোষালমশায় অতিশয় বিপন্নমুখে প্রতিবেশী হরেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে টাকা নেই একথা কি বলা যায়, আর বললেই বা বিশ্বাস করবে কেন হরেন। চিরকাল টাকা পেয়ে এসেছে সে। কিন্তু সত্যিই আজ তাঁর হাতে টাকা নেই। যা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। বাইরের ঠাট বজায় আছে কিন্তু ভিতর ফোঁপরা। সত্যিই আজ তিনি কপর্দকশূন্য। অথচ হরেন অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এসেছে।

শিল্পী মদন ঘোষাল নাটকীয় পরিস্থিতিটা বেশ উপভোগ করছিলেন মনে মনে। প্রার্থী হরেন চক্রবর্তীর জন্তে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু তার চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছিল ফতুর মদন ঘোষালের জন্তে।

কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে হরেনবাবু আর একবার বললেন, "অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছি। বিশ্বাস আছে, আপনি অন্তত আমাকে নিরাশ করবেন না। সত্যি বলছি, বড কষ্টে পড়েছি ঘোষালমশাই। ঘরে চাল নেই, কাপড নেই, ছেলেটা অসুখে ভুগছে ওযুধ কেনবার সামর্থ্য নেই। স্কুলের মাইনে দিতে পারি নি বলে বড় ছেলেটার নাম কেটে দিয়েছে। কি যে করব জানি না। বেশি নয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিন আমাকে দয়া করে—"

ফতুর মদন ঘোষাল অপ্রস্তুত মুখে বাইরের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা নেই একথা অবিশ্বাস্য। জানালার দিকে চেয়ে গুম্ফপ্রান্ত পাকাতে লাগলেন তিনি। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন শিল্পী মদন ঘোষাল।

ফতুর মদন কি করে দেখা যাক।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর যখন রূঢ় সত্য কথাটাই মোলায়েম করে বলবার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফতুর মদন ঘোষাল, তখন রঙ্গমঞ্চে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল।

ময়লা-কাপড়-পরা গরীব-গোছের একটি লোক ঘরে ঢুকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

বলল, "আমি আপনার প্রজা। পঞ্চাশ টাকা খাজনা বাকি ছিল দিতে এসেছি।"

ফতুর মদন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ টাকাটা হরেনবাবুর হাতে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

সফলমনোরথ হরেন বাষ্পাকুল নয়নে অস্ফুটকণ্ঠে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমস্যাটার এমন একটা অরোমাঞ্চকর সমাধান হওয়াতে শিল্পী মদন কিঞ্চ ভারী দমে গেলেন। প্রজাটির দিকে চেয়ে বললেন,—"তোমার নাম কি?"

"জনার্দন গোস্বামী।"

"তোমার নাম তো শুনি নি কখনও, কোথায় থাকা হয়?"

"আপনারই আশ্রয়ে।"

আরও প্রশ্ন হয়তো করতেন তাকে, কিন্তু হন্তদন্ত হয়ে পুরোহিতমশাই প্রবেশ করলেন।

"সর্বনাশ হয়েছে বাবু, ঠাকুরঘরে ঠাকুর নেই!"

"অ্যাঁ, সে কি! সিংহাসনের পাশে পড়ে-টড়ে যায় নি তো?"

"না, আমি দেখেছি ভাল করে।"

"আর একবার দেখুন গিয়ে।"

পুরোহিত চলে গেলেন। পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত সোনার তৈরী জনার্দন—সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে হওয়াতে শিল্পী মদন ঘোষালের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল যেন।

গৃহদেবতা জনার্দন ঠাকুর সিংহাসনে নেই, প্রজাটির নাম জনার্দন গোস্বামী। ফতুর মদন ঘোষালের অবস্থা দেখে তবে কি স্বয়ং জনার্দন—আর ভাবতে পারলেন না তিনি।

চোখের দৃষ্টি জলজল করে উঠল, থরথর করে কেঁপে উঠল নীচের ঠোঁটটা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন প্রজা জনার্দন চলে গেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন, না নেই—চলেই গেছে।

পুরোহিতমশাই ফিরে এলেন।

তাঁর মুখে হাসি।

ঠাকুর পাওয়া গেছে। গিয়ে দেখেন ঠিক সিংহাসনের উপরেই বসানো আছে।

হেসে বললেন—"আমার বিশ্বাস মন্টুবাবু তুলে নিয়ে ছিলেন। জনার্দনের ওপর ওঁর ভারী লোভ। আমার কাছে একদিন চেয়েও ছিলেন—"

মন্টু মদন ঘোষালের নাতি, বয়স পাঁচ বছর। শিল্পী মদন ঘোষাল তখন উত্তেজনার তুঙ্গে আরোহণ করে বসে আছেন।

বললেন—"মাধব গোমস্তাকে ডেকে দিন তো একবার।"

একটু পরেই মাধব গোমস্তা এল।

"মাধব, দেখ তো জনার্দন গোস্বামী নামে কি আমাদের প্রজা আছে কোনও? আমার তো যতদূর মনে পড়ছে ও নামের কেউ নেই।"

"দেখি।"

মাধব চলে গেল।

পরবর্তী দৃশ্যের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন মদন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগলো নাটকটা বেশ জমেছে, শেষ পর্যন্ত কি হয়…।

মাধব ফিরে এসে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। জনার্দন গোস্বামী নামে আছে একজন প্রজা মহালে।"

"আছে? ভাল করে দেখেছ তুমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তার পঞ্চাশ টাকা খাজনাও বাকি আছে।"

উত্তপ্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন মদন:

"খাজনা বাকি আছে কি না তা তো দেখতে বলি নি তোমায়, ও নামের কোনও লোক আছে কি না।"

"আছে।"

"ভাল করে দেখেছ তো?"

"দেখেছি।"

"আচ্ছা যাও তবে।"

ক্ষুব্ধ হয়ে বসে রইলেন মদন ঘোষাল। আজকাল আর নাটক জমে না। ঠিক সময়ে কিছুতেই যেন তালটি পড়ে না আজকাল। সবই কেমন যেন পানসে গোছের।

ভাগ্য-পরিবর্তনের ইতিহাস

ভাজিবার মতো ভ্যায়েগুও যখন গ্রামে আর জুটিল না তখন আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়া দিনকতক কাটাইয়া আসিব মনস্থ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। ট্রেনে ভাগ্য-পরিবর্তন হইয়া গেল।

ভদ্রলোকটি পাশেই বসিয়াছিলেন। আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। খাঁটি স্বদেশী লোক। নগ্নপদ, নগ্নগাত্র। এক-পা ধুলা, এক-বুক চুল। মাথায় ঈষৎ টাক। পরিধানে খদ্দর। কিছুক্ষণ কথা-বার্তার পর অনিবার্য ভাবে গান্ধী-প্রসঙ্গে আসিয়া উপনীত হইতে হইল।

ভদ্রলোক বলিলেন—"উনিই তো ভারতবর্ষের প্রতীক, মশাই। বাইরে অনাড়ম্বর, অন্তরে ঐশ্বর্য। এইটেই তো ভারতের বৈশিষ্ট্য। কি ভীষণ আধ্যাত্মিক শক্তি বলুন তো, ইংরেজের মতো অত বড় একটা দুঁদে জাতকে কেঁচো বানিয়ে দিলে একেবারে—এ কি সোজা শক্তি—"

শ্রদ্ধা হইল। সুতরাং গৃহিণী একটি ক্ষুদ্র কৌটায় করিয়া যে খাবার সঙ্গে দিয়াছিলেন সেটি যখন বাহির করিলাম তখন অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকেও আহ্বান করিতে হইল। দেখিলাম তিনিও আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, কারণ আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। দুই পেয়ালা চা কিনিলাম, আমিই কিনিলাম। চা সহযোগে সেই শুক্‌নো পরোটা ও আলু চচ্চড়ি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলিল যাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। দুইটি সিগারেট ধরাইবার পর তাহা প্রায় অবর্ণনীয় হইয়া উঠিল।

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অতঃপর উভয়ে এমন সব উক্তি করিতে লাগিলাম যাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ কিন্তু তখন অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই ওঠে না।

ভদ্রলোক বলিলেন—"আসল কথা কি জানেন, মহাত্মা একটি ঘুঘু। আমি খুব 'রিলায়বেল সোর্স' থেকে শুনেছি যে রোজ রাত্রে উনি ওড়েন।"

বাংলা ভাষায় 'ওড়েন' কথাটি একাধিক অর্থ বহন করে। ইহার সহিত 'ঘুঘু' জড়িত থাকিলে সাধারণতঃ যে অর্থ করা উচিত তাহাই করিয়া আমি বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করতঃ বলিলাম—"উনি নিজের জীবন-চরিতে এই ধরনের আভাসও দিয়েছেন, লুকো-ছাপা কিছু নেই।"

"আরে না মশাই, সে কথা বলছি না। ঘুঘু মানে যোগী, পদ্মাসনে বসে উনি রোজ শূন্যমার্গে ওড়েন একজন স্বচক্ষে দেখেছেন। আমার বিশ্বাস উনি হিমালয়ে

গিয়ে মহাদেবের সঙ্গে কন্‌সাল্‌ট করে আসেন রোজ। তা না-হলে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বলামাত্র ইংরেজরা সুট্‌ সুট করে চলে যাবে এ কি আর এমনিতে হয়। অ্যাটম্‌ বমের বাবা স্বয়ং বোমকেশ রয়েছেন এর মধ্যে।"

তখন আমাকেও বলিতে হইল—"শুনেছি একবার এক বখাটে ছোঁড়া ওঁর বন্ধুর একটা খাসি কেটে ফেলেছিল। বন্ধু খাসির শোকে কেঁদে আকুল, তখন উনি অহিংসা মন্ত্রবলে সেটাকে নাকি বাঁচিয়ে দেন—"

চোখ বড় বড় করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"তবেই দেখুন, সাধে আমি জাতীয় পতাকাকে আশ্রয় করেছি। ওইটি আঁকড়ে থাকলেই কূল পাব—"

তাহার পর কৌশলে পরস্পর পরস্পরের হাঁড়ির খবর লইতে শুরু করিলাম। শুনিলাম ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। আমি বেকার শুনিয়া তিনি বলিলেন—"আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনার তো দু'পয়সা হওয়া উচিত। আচ্ছা আপনি আমার দোকানে আসুন একদিন, দেখব যদি কিছু করতে পারি আপনার—"

ঠিকানা দিলেন।

তাঁহার দোকানে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি বিলাতী রেশমী কাপড়ের ব্যবসায় করেন। সম্প্রতি রেশমী কাপড়ের উপর ছোট ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা ছাপাইয়া একরকম সুন্দর ডিজাইনের ছিট বাহির করিয়াছেন। শাড়ি ব্লাউজ দুইই হইতে পারে, মূল্য প্রতি গজ কুড়ি টাকা।

ভদ্রলোক চোখ মটকাইয়া বলিলেন—"হু হু করে বিক্রি হয়ে যাবে দেখবেন। আপনি যদি ইচ্ছে করেন কমিশন বেসিসে ক্যানভাস্‌ করতে পারেন।"

তাহাই করিতেছি।

দাঙ্গার সময়

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আতঙ্কে আকাশ বাতাস থমথম করছে। দিনের বেলাটা তবু কোন রকমে কাটে কিন্তু রাতটা আর কাটতে চায় না। ওই বুঝি শাঁখ বাজল, ওই বুঝি 'বন্দে মাতরম্‌'। যে কোনও কোলাহলের সামান্যতম আভাস পেলেই হুড়হুড় করে সবাই ছাতের উপর এসে হাজির হই। প্রায় কিছু হয় না, দু-চার মিনিটের মধ্যে থেমে যায় সব। ঠাণ্ডায় ছাতে বেশিক্ষণ দাঁড়ানও অসম্ভব, নেমে আসতে হয়। গিন্নী কেবল তদারক করে বেড়ান প্রত্যেক কপাটের প্রত্যেক খিল, প্রত্যেক জানলার প্রত্যেক ছিটকিনি ঠিক আছে কি-না। রাত্রে পালা করে জাগা

হয়। এই সুযোগে 'সুনরি' দাইও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার তাড়িখোর নাক-বসা রোগা লম্বা স্বামী ফৈজুই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। কারণ বাড়িতে আমি ছাড়া সে-ই দ্বিতীয় পুরুষ। তৃতীয় পুরুষ আমার দশ বছরের ছেলেটি। আমার সম্বল একটি লাঠি, সেটিকে ছড়ি বললেই আরও ভাল হয়। ফৈজু একটা ভোঁতা বর্শা জোগাড় করে এনেছে। ছাতের উপর ইঁট জমা করা হয়েছে প্রচুর। এর বেশি যুদ্ধোপকরণ যোগাড় করতে পারা যায় নি। কিন্তু মুসলমানদের নৃশংস হত্যাকাহিনীর, দুর্ধর্ষ প্রতাপের হিটলারী চালচলনে যে সব বর্ণনা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল তাতে এই সব সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে তাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে যে পেরে উঠব সে ভরসা হচ্ছিল না কিছুতে। আমার বন্দুক একটা আছে অবশ্য, কিন্তু টোটা নেই। যে দু-চারজন অফিসারের সঙ্গে ভাব ছিল তাঁদের প্রত্যেককে অনুরোধ করেছি টোটা সংগ্রহ করে দেবার জন্যে। প্রতিশ্রুতি সকলেই দিয়েছেন, কিন্তু কার্যত, প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই সেই পুরাতন সত্যটিকেই বারম্বার স্মরণ কবছি—কাবও কথাব ঠিক নেই। সাথে মুসলমানরা আমাদের নাজেহাল করেছে। মুসলমানরা যদি আক্রমণ করে ওই সরু লাঠি এবং ভোঁতা বর্শা দিয়েই আত্মরক্ষা করতে হবে।

যে সব গুজব শোনা যাচ্ছে তা রোমাঞ্চকর। শোনা যাচ্ছে, মুসলমানেরা অতর্কিতে নদীপথে আসবে। বহু নৌকো না কি যোগাড করেছে তারা। অস্ত্র শস্ত্র প্রচুর—বোমা বন্দুক তো আছেই—কামানও আছে না কি। আমাদের বাড়ি ঠিক গঙ্গার উপরেই। সুতরাং প্রথম ধাক্কাটি আমাদের সামলাতে হবে। কিন্তু কি করে যে সামলাব তা ভাবতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসছে। ওই সরু লাঠি আর ভোঁতা বর্শা দিয়ে কি···। ফৈজুর ভয় নেই। সে ভোঁতা বর্শাটা ঘষে ঘষে ধার করে আর ভরসা দেয়—"কুছ ডরিয়ে নেহি হুজুর, সব ঠিক হো যায়ে গা। দরিয়াপুর মে গোয়ালা বস্তি হ্যায"—ইত্যাদি।

দিনের বেলা ভয়টা কম থাকে। সুতরাং দার্শনিক মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিই। ইতিহাসের নজীর তুলে আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করি। এমন কি, দিনের আলোতে নিজের অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকেও যাচিয়ে দেখবার সাহস পাই। আজ না হয় এই কাণ্ড হয়েছে কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ এমন কি, ঘনিষ্ঠতাও তো ছিল।

হঠাৎ সেদিন রহিমের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল রহিম কিম্বা রহিমের মা কি আমার শত্রু হতে পারে? রহিমের বাবা আবদুল আমাদের চাকর ছিল, আমাদের ক্ষেতখামারের তদারক করত। কখন কোন জমিতে কি বীজ বুনতে

হবে, কটা লাঙল লাগবে, কখন কোন জমির ফসল কাটতে হবে, ক'জন মজুর দরকার, কোন ফসল কোন হাটে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়—সমস্ত ভার আবদুলের উপর। অর্থাৎ আসলে আবদুলই মালিক ছিল। সে-ই সব করত। তার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করবার কোনও কারণও ঘটেনি।

…একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ। রহিমের মায়ের দুধও আমি খেয়েছি। রহিম আর আমি সমবয়সী। একই বছরে একই মাসে জন্ম আমাদের। আমি জন্মাবার মাস দুই পরেই মা অসুখে পড়েন। তখন রহিমের মা নিজেই দুধ খাইয়ে আমাকে মানুষ করেছিল! প্রচুর দুধ ছিল তার। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত তার মাই খেয়েছি। মানে, প্রায় চার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। মনে আছে রহিমের মা আমাকে মাঠে নিয়ে যেত। রহিমের সঙ্গে সেই বড় অশ্বত্থ গাছতলায় কতদিন খেলা করেছি। রহিমের মা মাঠে কাজ করত, আর আমরা খেলা করতাম। অবসর হলে সে এসে আমাদের দুধ খাইয়ে যেত।…আবদুল মরে গেছে। সে বেঁচে থাকলে এখনও আমাদের বাড়িতেই থাকত। রহিম আমার সহপাঠী ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর সে পাটনায় একটা চাকরি পায়। মাকে নিয়ে সেইখানেই চলে গিয়েছিল বছর দুই আগে। এখন কোথায় আছে কে জানে…।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছিল বারান্দার কোণটায়। চতুর্দিক নির্জন। একটা বসন্ত-বউরী অশ্রান্ত ডেকে চলেছে। আরক্তিম স্বর্ণকিরণ মায়ালোক গড়ে উঠেছিল যেন একটা। দাঙ্গার কথা ভুলে গিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য। কতক্ষণ বসেছিলাম মনে নেই। হঠাৎ চমক ভাঙল প্রতিবেশী হরেনবাবুর কণ্ঠস্বরে।

"আজকের খবর শুনেছেন?"

"কি?"

"ওপারের হিন্দুবস্তি দরিয়াপুর একেবারে সাফ।"

ধড়াস করে উঠল বুকের ভিতরটা।

"অ্যাঁ, বলেন কি! দরিয়াপুরের গোয়ালারাই যে আমাদের ভরসা মশাই।"

"একটি প্রাণী বেঁচে নেই।"

"বলেন কি?"

বলবার কিছু নেই, দুজনেই চুপ করে চেয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হরেনবাবু দ্বিতীয় সংবাদটিও দিলেন।

"বিশু বলে গেল, আজ রাত্রেই নাকি ওরা গঙ্গা পেরিয়ে এসে আমাদের অ্যাটাক করবে। অনেক নৌকো যোগাড় করেছে।"

"অতটা সাহস করবে কি?"

"করবে। ওরা সব পারে। আপনার বন্দুকটা ঠিক করে রাখুন আজ।"

"বন্দুক ঠিকই আছে। টোটা নেই।"

"টোটা নেই ? হাঁস আর ঘুঘু মেরে সব শেষ করেছেন বুঝি ? এখন ঠেলাটি সামলাবেন কি করে।"

হরেনবাবুর ধরণধারণ একটু অভিভাবকী গোছের। প্রত্যুত্তর না করে চুপ করে রইলাম। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে হরেনবাবু বললেন—

"আচ্ছা, দেখছি আমি বাসুদেওবাবুর কাছে। ওর স্টকে থাকে অনেক সময়।"

"তাঁকে আমিও বলেছি—"

"দেখি।"

বাসুদেওবাবুর বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন হরেনবাবু। বিহারী জমিদার বাসুদেও মিশ্র এ অঞ্চলের নামজাদা শিকারী। তাঁর কাছে টোটা থাকা সম্ভব।

হরেনবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী হাজির হলেন এসে। তিনি পাশের বাড়ি থেকে যে খবর শুনে এসেছেন তা আরও ভয়ানক। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক রেলে কাজ করেন। তিনি নাকি দেখে এসেছেন আড়াইশ বলিষ্ঠ কাবুলী নেবেছে এই বিকেলের ট্রেনে।

"কাবুলী যদি বাড়িতে ঢোকে তা হলে তো আর কাউকে বাঁচতে হবে না। তোমাকে বলে বলে তো হার মেনে গেলাম, দেয়ালটা তুমি কিছুতেই সারালে না। গেট বন্ধ করে আর কি হবে, দেওয়ালে যদি অত বড় ফাঁক থাকে!"

আমার বাড়ির হাতার চারদিকে যে দেওয়াল আছে তাতে সত্যিই একটা ফাঁক আছে মস্ত বড়। বর্ষায় ধ্বসে গিয়েছিল গেল বার। সারাবো সারাবো করে আর সারানোই হয় নি। বিস্ফারিত-নয়নে ফাঁকটার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। আপাতত সারাবার উপায়ও নেই। সমস্ত রাজমিস্ত্রী মুসলমান।

…সূর্য অস্ত গেল। তারপর গুটি গুটি পাড়ার লোকেরা আসতে লাগলেন একে একে। হিতৈষীর দল। সকলেরই মুখে এক কথা—"সাবধান, আজ রাত্রে হবেই কিছু একটা।" একজন আমাকে একটু অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন—"এখানকার মুসলমান এস. ডি. ও. গোপনে গোপনে আর্মস্ সাপ্লাই করেছে—সাজংগীর মুসলমানদের। 'মাস্ অ্যাটাক' হবে রাত দশটার পর।"

আর একজন বললেন—"মিলিটারী যা এসেছে, সব মুসলমান…"

কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। ফৈজু আরও গোটা দুই বর্শা যোগাড় করে এনেছে। বলছে, যদি তেমন দরকার হয় মাঈজি একটা চালাবেন আর একটা

চালাবে সুনরি। ওই অস্থি-চর্মসার সুনরি না কি অস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। জানা ছিল না।

"কিছু ডরিয়ে মৎ হুজুর"—বারংবার আশ্বাস দিতে লাগল নাক-বসা ফৈজু।

কিন্তু আমার মনে হতে লাগল অকূল সমুদ্র।

আড়াই শ' কাবুলী, দরিয়াপুরের পঞ্চাশখানা নৌকো, ক্ষিপ্ত কশাই আর সাজংগীর সশস্ত্র পাঠানের দলকে গোটা তিনেক বর্শা দিয়ে আটকানো যাবে? বলে কি লোকটা! একটু পরেই কিন্তু অকূল সমুদ্রে ভেলা পাওয়া গেল। হরেনবাবু গোটা চারেক টোটা দিয়ে গেলেন। চারটে বুলেট।

...পাড়া রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাড়ার ছেলেরা নিয়েছিল। প্রতি মোড়ে মোড়ে প্রতি গলিতে গলিতে কিশোরের দল মজুত ছিল 'হুইস্‌ল্' নিয়ে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই তারা হুইস্‌ল্ বাজাবে। হুইস্‌ল্ শোনামাত্র সকলকে ছাতে উঠে যেতে হবে, ছাতে গিয়ে শাঁখ বাজাতে হবে। যাদের ছাত আছে কিন্তু ছাতে ওঠবার সিঁড়ি নেই তাদের ছাতে ওঠবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে। খোলার বাড়ি যাদের তারা নিকটতম পাকা বাড়ির ছাতে উঠবে। ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই।

...সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। চতুর্দিক থমথম করছে। জনমানবের সাড়া নেই। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ফৈজুদেরও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি শুয়ে আমি একটি ইংরেজি উপন্যাস পড়ছি, গৃহিণী পড়ছেন বাংলা। আসলে কিন্তু দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে আছি। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে।...কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ পেটে একটা গুঁতো খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

"শুনছ, হুইস্‌ল্ বাজছে—"

গৃহিণী দেখলুম আলুথালু বেশে উঠে বসেছেন। হ্যাঁ, বাজছে তো! পাশের বাড়ি থেকে শাঁখও বেজে উঠল। ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাতে দৌড়ে গেলাম। গৃহিণী শাঁখ বাজাতে লাগলেন। চারিদিক থেকে শাঁখ বেজে উঠল। জয় হিন্দ্,—বন্দে মাতরম্,—অন্ধকার মুখরিত হয়ে উঠল।

হরেনবাবু পাশের বাড়ি থেকে চীৎকার করে উঠলেন হঠাৎ।

"আপনার কম্পাউণ্ড ওয়ালের কাছ ঘেঁষে ঘেঁষে যাচ্ছে দু'জন। দেখতে পাচ্ছেন? ফায়ার করুন, ফায়ার করুন।"

বন্দুকটা নীচে ছিল। দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। এসে দেখি গৃহিণী হাহাকার করছেন।

"ওগো, ওই যে দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে! কি হবে, হে মা কালী, হে মা দুর্গ্গা—ভগবান ভগবান—" টর্চ ফেলে দেখলাম। সত্যিই তো, কে একজন ঢুকছে গুঁড়ি মেরে।

ফৈজুকে বললাম—"টর্চটা ঠিক করে ধরে রাখ—"

ফৈজু টর্চ ধ'রে রইল। ফায়ার করলাম। একবার নয় দু'বার। শাঁখের আওয়াজে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। জয় হিন্দ—বন্দে মাতরম্—জয় হিন্দ—বন্দে মাতরম্···মনে হল, রাত্রির অন্ধকার এইবারে ছিঁড়ে যাবে বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গাড়ি এসে পড়ল।

কম্পাউণ্ড ওয়ালের সেই ফাঁকটার কাছে গিয়ে ভীড় করে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ রাস্তার ওপারের অন্ধকার ঝোপটা থেকে আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠল কে যেন—"ভাই পরেশ, আমি রহিম। পাটনা থেকে আমি মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় পাবো বলে। আমাদের বাঁচাও ভাই। গেট বন্ধ। দেওয়ালের ওই ফাঁকটা দিয়ে মা বোধ হয় ভেতরে ঢুকে গেছেন—"

রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে টেনে বার করা হল। দেখা গেল বুলেটটা ঠিক বাম স্তন ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।

অহঙ্কার পাঁড়ে

অহঙ্কার পাঁড়ে একবার খুব অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। একাধিকবার হওয়ার কথা, আমি একবারের খবরটা জানি।

অহঙ্কার পাঁড়েকে চেনেন আপনারা? খুব সম্ভব চেনেন না। কারণ অহঙ্কার পাঁড়ে নামে তিনি পরিচিত নন। বিনয়কুমার ভদ্র, সুশোভন মিত্র, সুব্রত দাস বা ওই ধরনের কোনও একটা মোলায়েম নামের লেফাফায় আবৃত হয়ে তিনি সমাজে বিচরণ করেন। আমি কিন্তু জানি তাঁর নাম অহঙ্কার পাঁড়ে। আপনারা হয়তো দেখেছেন তার গোঁফ-কামানো, নাপিত-লালিত মুখখানি, আমি কিন্তু তাঁর উদগ্র গোঁফ-জোড়া দেখেছি মহিষের শিঙের মতো উঁচিয়ে আছে খোঁচা খোঁচা দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে। নানাবিধ পেশায় নিযুক্ত দেখেছি তাঁকে। বর্তমান আখ্যায়িকায় তিনি একজন সমালোচক। ফ্রী লান্স্—খাপখোলা তলোয়ার একেবারে। সাহিত্য রাজনীতি 'বাজারদর প্রতিবেশী ফেরিওলা শিক্ষা সমাজ প্রত্যেককে কেন্দ্র করেই ওষ্ঠ-প্রান্ত ফেনায়িত হয় তাঁর। অহঙ্কার পাঁড়ের সমালোচনা-এলাকার পরিধি বহুবিস্তৃত।

কারও সমালোচনা-বাতিক যদি আইনের সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তা হলে অনাত্মীয় ব্যক্তিদের তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়। দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের অবশ্য একটু চিন্তা হতে পারে; কারণ যে ব্যক্তি ঠিক সীমারেখার উপরে দাঁড়িয়ে আছে তার সীমা-রেখা অতিক্রম করতে দেরি লাগে না। আর অতিক্রম করলেই বিপদ। পাগলা-গারদে রাখবার খরচ আজকার প্রচুর, বিনা পয়সায় রাখতে চায় না আজকাল। অনাত্মীয় ব্যক্তিদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা নয়, কিন্তু পৃথিবীতে এসব ব্যাপারে অনাত্মীয় ব্যক্তিদেরই ধর্ম-প্রবণতা একটু বেশি। আজকালকার বাজারে ফুলকো লুচি, মোহনভোগ খুব সুলভ নয়, তবু কিন্তু আর সহ্য করতে পারছিলেন না তাঁরা। অহঙ্কার পাঁড়ের বাগ্‌বিস্ফোরণে আকৃষ্ট হয়ে যদি পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষেরা আকৃষ্ট হতেন তাহলে অনাত্মীয়ের দলও রেহাই পেত। কিন্তু তা তাঁরা হন নি। লোকটা এখনও ছাড়া রয়েছে।

প্রধান মুশকিল, অধিকাংশ লোকই অহঙ্কার পাঁড়েকে চিনতে পারে না প্রথমে। বিনয়কুমার বা ওই ধরনের কিছু একটা ভেবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে যায়। তারপর ইট খেয়ে পালিয়ে আসে। অহঙ্কার পাঁড়ের দু'হাতে এবং চার পকেটে যে অনেক ইট মজুত থাকে সর্বদা, এ-খবরও অনেকে জানে না। কারণ ইটগুলোও অদৃশ্য। অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যখন নাকে বা রগে লাগে তখন চমকে যেতে হয়।

শুধু সমালোচনা করেই যদি অহঙ্কার পাঁড়ে নিরস্ত থাকতেন তা হলেও তত গোল হ'ত না। কিন্তু তা তিনি থাকতে চান না। তিনি তাঁর সমালোচনা শোনবার জন্যে একটি ভক্তমণ্ডলীও চান। ফুলকো লুচি, মোহনভোগ, ভাল চায়ের আয়োজন করেছেন প্রচুর। ভক্তমণ্ডলী পেয়েছেনও। এমন কি তাঁর বৈঠকখানায় স্থানাভাবও ঘটে প্রায় প্রত্যহ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লুচি মোহনভোগ খেতে খেতে অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতা শুনছেন এ রকম ভক্তও দেখেছি আমি স্বচক্ষে। অহঙ্কার পাঁড়ের বক্তৃতায় সায় দেওয়া খুব যে একটা অসম্ভব ব্যাপার তা নয়। হাসি চাপবার একটু ক্ষমতা থাকলেই হল।

তিনি হয়তো বললেন—"দেখুন, আকাশের সম্বন্ধে একটা বড় কথা আবিষ্কার করেছি।"

উৎকর্ণ উৎসুক হয়ে উঠলেন সবাই।

স্পর্দ্ধিত দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে খানিকক্ষণ। ভাবটা যেন—আমার আবিষ্কারকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করবার সাহস তোমাদের আছে নাকি? যদি থাকে—

সকলেই জানেন, এ অবস্থায় চুপ করে থাকাটাই সঙ্গত। অহঙ্কার পাঁড়ে তখন বললেন—"জানেন সেটা কি ?"

প্রায় সমস্বরে—"না।"

"আন্দাজ করুন।"

নানা ভঙ্গীতে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন সকলে এবং ব্যর্থকাম হলেন। একজন মাথা চুলকে মৃদু হেসে শ্রদ্ধাগদগদ কণ্ঠে বললেন—"আপনিই বলুন।"

অহঙ্কার পাঁড়ে বললেন—"আকাশ নীল।"

এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু কেবলমাত্র মুচকি হাসির সায় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবার লোক অহঙ্কার পাঁড়ে নন। তিনি দাবি করেন তিনি আকাশকে যে নীল দেখছেন তার মধ্যে অনন্যতা আছে। তিনি যা দেখছেন তা আর কেউ দেখেনি। তাঁর বক্তব্য—"আমি শুধু আকাশ দেখছি না, আমি শুধু নীল দেখছি না, আকাশ নীল বলতে আপনারা যে বাহ্য-রূপটা বোঝেন তা-ও দেখছি না আমি। আকাশের নিগূঢ় সত্তা যাকে আমি আকাশত্ব আখ্যা দিতে চাই এবং নীলের অন্য-বর্ণ-সম্পর্ক-হীনতা যাকে আমি নীলত্ব নামে অভিহিত করতে চাই—এই উভয় বৈশিষ্ট্যের রহস্যময় যোগাযোগ আমার মর্ম চেতনায় যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করছে তাই আমি প্রত্যক্ষ করছি রস-পরকলা-যোগে।"

সুতরাং তিনি চান এজন্য সকলে মিলে তাঁকে ঘিরে বাহবা বাহবা করতে থাকুক। বাহবা বাহবা করতে বাধ্য তারা। তাঁকে প্রত্যেক শিল্প-সভায়, সাহিত্য-সভায়, গণ-সভায়, জন-সভায়, সাংস্কৃতিক সভায়, সভাপতি করতে হবে। তাঁর নাম হাততালিতে বাজবে, রেডিওতে বাজাবে, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তম্ভে। সমাজকে উঠতে বসতে হবে তাঁর কথায় কথায়। তিনি নীলকে নীল, সবুজকে সবুজ বলেছেন, এ কি সোজা কথা ? এজন্য নীলের এবং সবুজেরও কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাঁর কাছে। নীলের সত্যরূপ চিনতে পারে ক'টা লোক। সবুজকে সবুজ বলবার মতো বুকের পাটা ক'জনের আছে ?

লুচি-লুব্ধ কয়েকটা ছোঁড়ার প্রশংসায় কেন সন্তুষ্ট থাকবেন তিনি। দেশসুদ্ধ সবাই তাঁকে ঘিরে বাহবা-কীর্তন করবে না কেন ? কেন—কেন—কেন ?

নিদারুণ পরিস্থিতি। এহেন গুণী লোককে চিনতে বাংলা দেশের লোকেরও দেরি হয়। তারা হুজুকে। গান্ধী জওহরলাল নিয়েই মত্ত, অহঙ্কার পাঁড়ের দিকে চাইবার অবসর হল না তাদের।

মোহনভোগখোর কয়েকটা ছোঁড়া ছাড়া আর কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।

…নিরুদ্ধ আক্রোশে কিছুদিন চুপ করে রইলেন অহঙ্কার পাঁড়ে। তারপর তাঁর সমালোচনায় বাজল নতুন সুর। বাহবা-বিরোধী হয়ে উঠলেন তিনি। কেউ কাউকে বাহবা দিলেই ক্ষেপে উঠতেন। রক্তচক্ষু বিস্ফারিত নাসা মুক্ত-কচ্ছ হয়ে যে সব কাণ্ড করতেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বুক চাপড়াতেন, চুল ছিঁড়তেন, মুখ-বিকৃতি করতেন। লম্ফ দিয়ে ক্রমাগত বলতেন—"ছোটলোক ছোটলোক ; ছোটলোক হয়ে গেছে সব।"

দূরদর্শী মধ্যবিত্ত আত্মীয়দের হৃৎকম্প হত।

পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষেরা অহঙ্কার পাঁড়েদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও আর এক ধরনের লোক আছেন যাঁরা এঁদের দিকে আকৃষ্ট হন। তাঁরা শিল্পী, —ছবির বিষয় খুঁজে বেড়ান যাঁরা।

একদিন একজন শিল্পী অহঙ্কার পাঁড়ের কাছে এসে সবিনয়ে নিবেদন করলে, "আপনার একটি ছবি আঁকব আমি। দেবেন আঁকতে ?"

"আমার ছবি। আমার ছবি এঁকে কি হবে। সতু ঘোষের ছবি আঁকুন, নাম হয়েছে তার ফুটবল খেলায়। আমি সামান্য মানুষ।"

শিল্পী বিনয়ের মাত্রা আর একটু বাড়িয়ে বললে—"আজ্ঞে না, আপনিও অসামান্য।"

একজন শিল্পীর মুখে এ কথা শুনে মনে মনে যদিও প্রীত হলেন অহঙ্কার পাঁড়ে, মুখে তবু বললেন—"মহাবিপদে পড়া গেল দেখছি আপনাকে নিয়ে—"

স্তাবক দু-একজন দাঁড়িয়েছিলেন কাছে, গদগদ হয়ে উঠল তাঁদের চোখের দৃষ্টি। মনে হল তাঁরা যেন নীরবে মিনতি করছেন অহঙ্কার পাঁড়েকে রাজী হয়ে যাবার জন্য।

শিল্পী আবার বললেন—"সত্যিই আপনার ছবি আঁকবার মতো।"

"কি করতে হবে আমাকে ?"

"বসে থাকতে হবে শুধু।"

ছবি আঁকা শুরু হল। মধ্যপথেই দু-একবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন অহঙ্কার পাঁড়ে।

শিল্পী বললেন—"শেষ হোক আগে, তারপর যা বলবার বলবেন।"

…শেষ হল। ছবির দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে বোমার মতো ফেটে পড়লেন অহঙ্কার পাঁড়ে। নিজের আলেখ্য সম্বন্ধে তারস্বরে যা বললেন তা অলেখ্য। ছবি নিয়ে ছুটে পালাতে হল শিল্পীকে।

ঠিক পরদিনই দেখা গেল শিল্পী আবার আসছে। এবার সাইকেল চড়ে। তাঁর পিছনে একটি কুলি কাগজে মোড়া ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মতো কি যেন একটা আনছে মাথায় করে। কাছে আসতে দেখা গেল একটা নয়—দুটো।

অহঙ্কার পাঁড়ে বারান্দাতেই বসেছিলেন।

চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার কি।"

শিল্পী বললেন—"নিজের চোখেই দেখুন।"

বলেই একটা মোড়ক খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। তাঁর প্রথম আঁকা ছবিটি। তারপর হেঁট হয়ে দ্বিতীয় মোড়কটির বাঁধন খুলতে লাগলেন। অহঙ্কার পাঁড়ের মনে হল বোধ হয় ভাল করে আর একখানি ছবি এঁকে এনেছে অনুতপ্তচিত্তে। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সাগ্রহে। দ্বিতীয় বস্তুটি ছবিখানির পাশে রেখেই শিল্পী কিন্তু তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন বারান্দা থেকে। এবং সাইকেল চেপে উধাও হয়ে গেলেন নিমেষে। অহঙ্কার পাঁড়ে বিস্মিত হলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন দ্বিতীয় ছবিটি কাগজ দিয়ে ঢাকা রয়েছে তখনও। উঠে গিয়ে খুললেন সেটা তাড়াতাড়ি। দেখলেন ছবি নয়, একটি বড় আয়না।

রাজাধিরাজ

সেদিন পর্যন্ত জানিতাম, আমিই রাজা, কিন্তু অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছিল। রাজাধিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

...শ্রাবণের নিবিড় সন্ধ্যা সেদিন। সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ঝিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ভেক-কণ্ঠের উন্মত্ত কোলাহলের পটভূমিকায় ঝিল্লীকুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সূক্ষ্ম সুরের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। আমার ঘরের বাহিরে জানালার ঠিক নীচেই যে কালো হাঁড়িটা অবজ্ঞাত অবস্থায় এতদিন পড়িয়াছিল, সহসা সে একটা নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, জলপূর্ণ হইয়া আমার ভিজা চালটার সহিত কথোপকথন জমাইয়া তুলিয়াছে।

টপ্, টপ্, টপ্, টপ্...অবিশ্রান্ত আলাপ চলিতেছে।

সহসা সমস্ত মনটা খুশি হইয়া উঠিল। বর্ষা-সন্ধ্যাটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইবে। উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি—গাঁজা, আফিং, চরস এমন কি এক বোতল মদ পর্যন্ত হাতের কাছে মজুত। নেশার রাজা আমি, সব রকম নেশাই জীবনে করিয়াছি, কিন্তু এমন রাজকীয় যোগাযোগ ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই।

কিন্তু একটু চিন্তায় পড়িলাম। সবগুলো তো একসঙ্গে চালাইতে পারা যাইবে না। চালানো উচিতও নয়। কোন্‌টা আগে শুরু করি? অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও যখন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না তখন স্টোভ জ্বালিতে বসিয়া গেলাম। চা পান করিয়া তাহার পর যাহা হয় ঠিক করা যাইবে। বেশ কড়া করিয়া এক কাপ চা পান করিলাম। মস্তিষ্ক ঈষৎ চাঙ্গা হইল বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। কোন্‌টা আগে শুরু করি? ঠাণ্ডার দিনে অবশ্য মদটা জমিবে ভাল, কিন্তু গাঁজাই বা কম কিসে! সহসা কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—ভাই, অহিফেনকে অবহেলা করিও না। পরমুহূর্তেই চরসের মধুর গন্ধ মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। এমন শ্রাবণ-সভায় কাহাকে সভাপতির আসনে বসাই? দোদুল্যমানচিত্তে বসিয়া আছি, এমন সময় দ্বারে কে যেন সন্তর্পণে করাঘাত করিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। প্রবেশ করিল একটি শীর্ণকান্তি ব্যক্তি। পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিটি যাহা বলিল তাহাতে কিন্তু পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

"প্রথমেই একটা কথা বলে নিই আপনাকে। আমি একটু নেশা করে থাকি। এই বর্ষায় আজ রাত্রে আর বাড়ী ফিরতে পারছি না। এইখানেই একটু নেশা করে রাতটা কাটিয়ে যাব ভাবছি। দয়া করে একটু জায়গা দেবেন কি?"

দোসর পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম, "নিশ্চয়। শুধু জায়গা কেন, নেশাও দেব। আসুন, বসুন।"

লোকটি বসিল এবং আড়চোখে একবার আমার দিকে চাহিল। মনে হইল, তাহার অধরে একটা অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া গেল যেন।

সম্রাট যেমন দরিদ্র প্রজাকে প্রশ্ন করে—কি চাই তোমার—অনেকটা সেইরূপ-ভাবেই আমিও তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, "কি নেশা করবেন আপনি—"

"কি আছে আপনার, সেইটা আগে শুনি"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলিল।

"গাঁজা চলবে?"

"দিন এক ছিলিম।"

লোকটির কণ্ঠস্বর খুবই মৃদু।

দিলাম। স্বহস্তে সাজিয়া ছিলিমটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। হাজার হোক অতিথি। উবু হইয়া বসিয়া এমন একটি টান দিল যে, ছিলিমটি ফাটিয়া গেল। তাহার পর যথারীতি দম বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ এবং আস্তে আস্তে ধোঁয়াটি ছাড়িতে লাগিল। সবটুকু ধোঁয়া নিঃশেষে বাহির করিয়া দিয়া

আমার দিকে চাহিল এবং মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এ কিছু হল না, দিন আর এক ছিলিম।"

আমার দ্বিতীয় ছিলিম ছিল না, সুতরাং অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

"গাঁজা আর আছে ?"

"আছে।"

"আনুন।"

যতটুকু ছিল বাহির করিয়া দিলাম। চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল।

"আর কি আছে আপনার ?"

"চরস আছে।"

"দিন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত চরসটা ফুঁকিয়া দিল।

তাহার পর হাসিয়া বলিল, "এতেও কিছু হল না, আছে নাকি আর কিছু ?"

"আফিং আছে।"

"দিন দেখি।"

কৌটাটি হাতে লইয়া সমস্তটা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া লজেন্সের মতো চুষিয়া চুষিয়া খাইতে লাগিল। বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

"জলীয় আছে নাকি কিছু ?"

"মদ আছে।"

"আনুন দেখি জমে কি না।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিলাম এবং মদের বোতলটা আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে সবটা শেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিলাম, এইবার বোধ হয় কাৎ হইবে। হইল না। পরমুহূর্তেই মাথা তুলিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিল, "কিৎসু হল না। আর কিছু কি আছে আপনার ?"

"আর তো কিছু নেই।"

"নেই ? আমার কাছে আছে কিছু। সেইটে বার করি তা হলে।"

ট্যাঁক হইতে একটি ছোট কৌটা বাহির করিল।

কৌটাটি খুলিতেই কৌটার ভিতর হইতে ছোট একটি সাপ টপ করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। লিক্‌লিকে ছোট সরু সাপ। সে কৌটাটি একবার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর সেটি বাম নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, আবার সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর কৌটাটি

বন্ধ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল—"এইবার জমেছে মনে হচ্ছে। শুচ্ছি।"

শুইয়া পড়িল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া করযোড়ে বসিয়া রহিলাম। বাহিরে কেলে হাঁড়িটা বলিতে লাগিল—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্…

রামগল্প

রাম-রাজত্ব এখনও আছে। আমাদের দৃষ্টি কলুষিত বলিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পবিত্র-দৃষ্টি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া সুধীবর্গের গোচরে তাহা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে শান্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। সহসা কিন্তু একদিন তিনি শুনিলেন যে, জনৈক দস্যু নাকি তাঁহার রাজ্যে যথেষ্ট লুটপাট করিতেছে, প্রজারা রাজদরবারে নালিশ করিয়াও কোন সুফল পাইতেছে না। তাহাদের নালিশ নাকি গ্রাহ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে না।

তিনি মন্ত্রীকে ডাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া মন্ত্রী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "কই মহারাজ, এরূপ কোনও দস্যুর সংবাদ তো শুনি নাই।"

জলদগম্ভীর কণ্ঠে দাশরথী আদেশ করিলেন, "অবিলম্বে অনুসন্ধান করুন।"

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রীমশায় নতমস্তকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

…ছয় মাস অতীত হইল। কোন সুরাহা হইল না। লুণ্ঠপাটের গুজব কানে আসিয়া প্রজা-প্রাণ রাঘবের চিত্তকে ক্রমাগত উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

পুনরায় মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। বস্তুত মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার রাজনৈতিক পদক্ষেপ করা যে-কোনও রাজার পক্ষে অসম্ভবই। জানকীবল্লভের পক্ষে তো বটেই—মন্ত্রীই তাঁহার সব।

"মন্ত্রী, দস্যুর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

"এখনও পাই নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে।"

"অনুসন্ধান কতদিন চলিবে?"

"শীঘ্রই শেষ হইবে আশা করি। দক্ষ কর্মচারীগণের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছি—"

"একটু তাড়া দিন।"

"যথা আজ্ঞা, মহারাজ।"

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আরও ছয় মাস কাটিল। আরও বহু বেনামী পত্র আসিয়া কৌশল্যানন্দনের প্রজাবৎসল হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মন্ত্রীকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।

"দস্যুর কোনও খবর মিলিল?"

"অনুসন্ধান চলিতেছে। দক্ষতর রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।"

রঘুমণি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কে এই দস্যু? যে সকল প্রজা তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহারাও কেহ দস্যুর নামোল্লেখ করে নাই। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, নৃশংস প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহার দুর্দমনীয়তা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। তা ছাড়া সমস্ত দরখাস্ত বেনামী। নিজেদের নাম দিতেও কেহ সাহস করে নাই। সীতাপতির মনে হইল, তাঁহার রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তাহা আপাত-শান্তি, একটা মিথ্যা মুখোশ মাত্র। ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক প্রজার অন্তরে অশান্তির হল্‌কা বহিতেছে।

দুর্মুখকে আহ্বান করিলেন। দুর্মুখ নতমস্তকে সমস্ত শুনিয়া বলিল, "মহারাজ আমি সব জানি।"

"জান? কে সেই দস্যু?"

"ক্ষমা করুন, নাম বলিতে পারিব না।"

"পারিবে না? কেন?"

"ক্ষমা করুন আমাকে।"

"আমার আদেশ, বলিতেই হইবে।"

"আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। তাহার নাম আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। তবে নিতান্তই যদি জেদ করেন, দেখাইয়া দিতে পারি।"

রাবণারি রাঘব কোষবদ্ধ তরবারি ঈষন্নিষ্কাষিত করিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, "বেশ, তাই দাও।"

"তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।"

"চল।"

নগরের প্রান্তে আসিয়া রাজরথ থামিল।

দুর্মুখ সবিনয়ে কহিল, "এইবার মহারাজকে পদব্রজে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিতে হইবে। দস্যু অরণ্যনিবাসী।"

"বেশ, চল।"

বেশ কিছুদূর হাঁটিয়া উভয়ে একটি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূরে গিয়া দুর্মুখ নিম্নকণ্ঠে সন্তর্পণে কহিল, "প্রভু, ওই দেখুন, ওই—"

দুর্মুখের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তর্জনী অনুসরণ করিয়া রামভদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে পাইবামাত্র কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া পড়িলেন।

বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিলেন স্বয়ং অঞ্জনানন্দন হনুমান। লক্ষণাগ্রজের গদগদ ভাব এখনও কাটে নাই।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

"সাপের কথাই যদি তুললেন তা হলে শুনুন একটা ঘটনা, আমার নিজের চোখের দেখা। আমার এক বন্ধু ছিল প্রহ্লাদ, তাকে তোমাদের মনে আছে কারও কি?"

দাসু খুড়োর বন্ধু প্রহ্লাদের নামই শুনিনি আমরা। বললাম সেকথা।

"শোনবার কথাও নয়। প্রহ্লাদ যখন এ পাড়ায় থাকত, তখন তোমাদের জন্মই হয়নি কারও। এই প্রহ্লাদকে একবার সাপে কামড়ায়।"

ডাক্তার রায় সসম্ভ্রমে থেমে গেলেন। সাপের সম্বন্ধে আলোচনা তিনিই করছিলেন। সাপ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন তিনি, এখনও করছেন। সাপ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলজনক প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা তিনি বলছিলেন, আমরা শুনছিলাম, এমন সময় দাসু খুড়ো বাধা দিলেন।

"একেবারে জাত সাপে কামড়েছিল প্রহ্লাদকে, বুঝলে। তাও আবার ব্রাহ্মমুহূর্তে। দেখতে দেখতে নীল হয়ে গেল ছোক্‌রা, সকাল হতে না হতেই খতম। ডাক্তার বদ্যি ডাকবার সময় পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মায়ের একমাত্র ছেলে, সেই সবে বিয়ে হয়েছে, বোঝ ব্যাপারটা।"

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক টানতে লাগলেন দাসু খুড়ো।

"তারপর?"

"তারপর শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে আমরা পাড়ার ক'জন গেলুম, আর গেল তার মা, আর সদ্য-বিধবা বউটা। বউটা রোগা লিক্‌লিকে তের চোদ্দ বছর বয়স। মাথায় ঘোম্‌টা ছিল বলে চোখ মুখ দেখতে পাইনি তখনও। পরে দেখলুম।"

ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে তামাক টানতে লাগলেন দাসু খুড়ো।

"তারপর?"

"শ্মশানে যখন গেলুম আমরা তখন বেলা দশটা আন্দাজ হবে। শ্মশান খাঁ খাঁ করছে, লোকজন বিশেষ কেউ নেই। একটু দূরে একটা নৌকো লাগানো ছিল ঘাটে, সেটাকে আমরা লক্ষ্য করিনি প্রথমে। কাঠ এসে পৌঁছয় নি। আমরা মড়াটাকে একধারে নাবিয়ে কাঠের প্রতীক্ষা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল সেই নৌকো থেকে একটি লোক নেবে আমাদের দিকে আসছেন। পরণে টকটকে লাল কাপড়। গায়ে টকটকে লাল উত্তরীয়! কুচকুচে কালো রং, মাথায় এক মাথা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। প্রত্যেকটি চুল যেন বেঁকে সাপের মতো ফণা ধরে আছে। প্রহ্লাদের মায়ের বুক-ফাকা কান্না শুনেই সম্ভবত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভদ্রলোক। সোজা তিনি আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন।"

আবার নীরব হলেন দাস্থ খুড়ো। তাঁর হুঁকোর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডাক্তার রায় উস্‌খুস করে গলা খাঁকারি দিলেন একটু। তিনি 'ভাইপার' এবং 'কলিউব্রিন' জাতের বিষাক্ত সাপের তফাত কি কি, তাই বোঝাচ্ছিলেন আমাদের ছবি এঁকে।

"তারপর?"

"এসেই জিগ্যেস করলেন, কতক্ষণ মারা গেছে?

'ভোর বেলা'—বললাম আমরা। 'কি হয়েছিল' 'সাপে কামড়েছিল।' 'সাপটাকে তোমরা কেউ দেখেছিলে কি?' প্রহ্লাদের মা তখন সব বললে খুলে—'না, বাবা, আমরা নিজের চোখে দেখিনি সাপকে। শেষ রাত্রে বউমা কপাট খুলে বেরিয়েছিল বাইরে। কপাট খোলা পেয়ে সাপ ঘরে ঢোকে। প্রহ্লাদ বললে বিরাট একটা কেউটে, সে নিজের চোখে দেখেছিল সাপকে। সেই সাপ বিছানায় উঠে বাছাকে আমার কামড়ায়। চীৎকার করে উঠতেই সাপটা বিছানা থেকে নেবে বেরিয়ে গেল সর সর করে। তার একটু পরেই বউমা এসে ঘরে ঢুকলো। বউমাও সাপটাকে দেখতে পায়নি। এর বেশি আর কিছু জানি না বাবা। বাছা আমার দেখতে দেখতে কালীবর্ণ হয়ে গেল। তারপর এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল সব। আমারই পূর্বজন্মের পাপ বাবা, আর কিছু নয়'—খুব কাঁদতে লাগল প্রহ্লাদের মা।"

আবার নীরব হলেন দাস্থ খুড়ো।

"তারপর?"

"কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে কাপালিক বললেন—'কিছু খাঁটি দুধ আর একটি নতুন মাটির সরা যোগাড় করতে পারেন যদি চেষ্টা করে দেখতে পারি।' খাঁটি

দুধ আর মাটির সরা জোগাড় করা কি আর এমন শক্ত কাজ! ছুটলুম আমরা তক্ষুনি। ঘন্টা খানেকের মধ্যে দুধ আর সরা যোগাড় হয়ে গেল। সরাতে দুধটা ঢেলে রেখে ভদ্রলোক তখন বললেন মড়ার গা থেকে কাপড়-চোপড় সব খুলে নিন। যেখানটায় সাপে কামড়েছিল সেখানটা বেশ করে খুলে রেখে দিন। যে সাপ কামড়েছে সে নিজেই এসে ওখানে মুখ লাগিয়ে বিষ চুষে তুলে নেবে। সে সাপ যেখানেই থাক আসতেই হবে তাকে। আপনারা কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। আমি ধ্যানে বসছি। এই বলে মড়ার পায়ের দিকে তিনি ধ্যানে বসে গেলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ একজন আর কি! দৈবাৎ এসে পড়েছিলেন—"

আবার নীরব হলেন দাসু খুড়ো। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

"তারপর?"

"কুম্ভক করে বসে রইলেন সামনে। আমরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম চুপচাপ। মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চাইতে লাগলাম সাপ আসছে কি না দেখবার জন্যে। খাঁ খাঁ করছে শ্মশান, তাঁ তাঁ করছে রোদ, রক্তাম্বর কাপালিক বসে আছেন কুম্ভক করে, সামনে মড়া, এক অদ্ভুত মায়ারাজ্য গড়ে উঠল যেন চারিদিকে। সাপের কিন্তু দেখা নেই। তারপর হঠাৎ নজরে পড়ল বউটা বসে দুলছে আস্তে আস্তে। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। মাথাটাও দোলাচ্ছে। ঠিক যেন সাপের ফণা। তারপর তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি, ও বাবা, একেবারে সাপের চোখ, জ্বল জ্বল করছে নিষ্পলক দৃষ্টি। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ক্রমশ নাক দিয়ে। জিবও বার করতে লাগল। মানুষের জীব নয়, সাপের জিব। কালো, দু'ভাগ করা!"

চুপ করলেন দাসু খুড়ো।

"তারপর?"

"আমাদের চক্ষু তো চড়কগাছ। কাপালিক কিন্তু ঠিক বসে আছেন অনড় হয়ে, চোখ বুজে দম বন্ধ করে। মনে হতে লাগল, তিনিও যেন একটা মড়া। আমরাও বসে আছি সব রুদ্ধশ্বাসে!"

"তারপর—?"

"তারপর আস্তে আস্তে বউটা লম্বা হয়ে শুল মাটির উপর গিরগিটির মতো। শুয়ে সাপের মতো এগিয়ে যেতে লাগল বুকে ভর দিয়ে প্রহ্লাদের পায়ের দিকে। পায়েই সাপটা কামড়েছিল। ক্ষতচিহ্নটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। বউটা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সেইখানে মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু করে দিলে।"

"তারপর ?"

"চোঁ চোঁ করে চুষতে লাগল।"

"তারপর—?"

"আধঘণ্টাটাক পরে মনে হ'ল প্রহ্লাদের যেন নিঃশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ চাইলে।"

"তারপর ?"

"তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। হঠাৎ চেয়ে দেখি বউটা আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে একটা কেউটে সাপ আর শাড়িখানা।"

"তারপর ?"

"সাপটা নেতিয়ে পড়েছিল একবারে। কাপালিক ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চোখ মেলে চাইলেন। তারপর সরার দুধটা সাপটাকে খেতে দিলেন। চুক চুক করে সব দুধটুকু খেলে।"

"তারপর---"

"তারপর সুড়সুড় করে চলে গেল মাঠের মাঝখান দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে ফণা তুলে চেয়ে দেখলে আমাদের দিকে, তারপর চলে গেল। আমরাও প্রহ্লাদকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।"

"আমিও এবার যাই"—একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ডাক্তার রায় উঠে চলে গেলেন।

কয়েকটি শব্দ

সেদিন প্রভাতে প্রচুর শব্দসহযোগে নানারূপ মুখবিকৃতি করিয়া হারু দন্তধাবন করিতেছিল। দন্তধাবন সমাপ্ত করিয়া চক্ষু তুলিয়া দেখিল, একটি সুকান্তি সুবেশ যুবক তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবকের পিছনে একটি কুলি, কুলির মাথায় একটি বাক্স। চোখাচোখি হইতেই যুবকটি বলিল, "আমরা খবর পেয়েছি যে, এ গ্রামে আপনারই সবচেয়ে বড় দইয়ের কারবার, তাই আপনার কাছে এসেছি। প্রথমে কে-একজন খবর দিয়েছিল, কেষ্ট গোয়ালাই নাকি সবচেয়ে বড়, কিন্তু পরে শুনলাম খবরটা ভুল।"

গোঁফ মুছিয়া হারু বলিল, "কেষ্ট আমার ভাই। চোর একটা। ভিন্ন হয়ে গেছি আমরা অনেক দিন আগেই। দই চাই আপনার ? কত ?"

মৃদু হাসিয়া যুবকটি বলিল, "আমি নিখিল-ভারত দধি-সমিতি থেকে এসেছি।"

হারু একটু থতমত খাইয়া গেল।

"কি চান আপনি?"

"আপনার দই পরীক্ষা করব একটু। জাতির স্বাস্থ্যগঠন করবার দায়িত্ব আমাদের। জাতকে গড়তে হবে। নিখিল-ভারত দধি-সমিতি আমাকে দিল্লী থেকে পাঠিয়েছেন আপনার নাম শুনে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাতে আপনি দধি প্রস্তুত করতে পারেন তারই ব্যবস্থা করতে এসেছি।"

"ও!"

তাহার নাম শুনিয়া ভদ্রলোক দিল্লী হইতে আসিয়াছেন! নিরক্ষর হারুর হৃদয় বেলুনের মতো ফুলিয়া উঠিল। ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই হল আসল হিউম্যানিজ্‌ম্‌।"

হারু সসম্ভ্রমে বলিল "আজ্ঞে!"

"কমিউনিজ্‌মের মূলকথাও এই।"

"আজ্ঞে।"

"গান্ধীজ্‌মের সঙ্গে তো এর কোনও বিরোধ নেই।"

"আজ্ঞে।"

"আপনার দই একটু দেখতে পারি কি? যেটা আপনি সবচেয়ে ভাল মনে করেন তাই দেখান।"

"এই যে।'

এক কড়াই ভাল দই হারু বাহির করিয়া দিল।

ভদ্রলোক কুলিটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এটা নিয়ে যেতে পারবি?"

"পারব।"

"আচ্ছা ওই বাক্সটা নাবা।"

বাক্সের ভিতর মাইক্রস্কোপ স্লাইড প্রভৃতি ছিল; খানিকটা দধি গুলিয়া ভদ্রলোক মাইক্রস্কোপে দেখিতে লাগিলেন। হারু সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাইক্রস্কোপ হইতে চোখ তুলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "ইস, পোকা গিজগিজ করছে একেবারে।"

"পোকা!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি নিজের চোখে দেখুন।" হারু আগাইয়া আসিয়া মাইক্রস্কোপে চোখ দিল এবং আগন্তুক ভদ্রলোকের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিল যে, অতি ক্ষুদ্রকায় অসংখ্য পোকা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য কাণ্ড!

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, "এই দই খেলে লোকের অসুখ করবে। আমরা এক রকম বড়ি দিচ্ছি, তা দিয়ে দই জমালে এসব হবে না। একটা দিচ্ছি আপনাকে, আপাতত এক পেয়ালা দুধে দিয়ে রেখে দেবেন রাত্রিতে, সকালে দেখবেন চমৎকার দই জমে গেছে।"

বড়িটি হাতে করিয়া বিস্মিত হারু দাঁড়াইয়া রহিল খানিকক্ষণ। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "এ দইটা কি ফেলে দেব?"

"ফেলে দেওয়াই উচিত; কিন্তু আমি একটু চেষ্টা করে দেখব ওষুধ-বিষুধ দিয়ে শোধরানো সম্ভব কি-না।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ তো। কোথা উঠেছেন আপনি?"

"ডাকবাংলায়!"

জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভদ্রলোক বলিলেন, "দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত, বেসিক এডুকেশন হলে দেখবেন কালচারের লেভেল কি রকম বেড়ে যায়! ওয়ার্ধা স্কীমটা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।"

হারু বলিল, "আজ্ঞে।"

"আচ্ছা, তা হলে চলি আমি। নমস্কার।"

হারু হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

কিছুক্ষণ পরে হারুর মনে হইল, পোকা পড়া দইটা ভদ্রলোক শোধরাইতে পারিয়াছেন কি-না দেখিয়া আসা যাক।

ডাকবাংলোয় গিয়া হারু দেখিল, গ্রামের দুই-তিনজন লোক বসিয়া আছে। একজন একটি পাঁঠা আনিয়াছে, আর একজন খানিকটা ঘি, তৃতীয় ব্যক্তি কিছু দাদখানি চাল লইয়া বসিয়া আছে।

ভদ্রলোকের মুখে খই ফুটিতেছে—"ভিলেজ রিঅর্‌গ্যানিজেশন করাটাই প্রধান কাজ, গ্রামই হল দেশের প্রাণ, স্টার্লিং ব্যালান্স নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে, পুঁজিবাদিদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিতে হবে, চরখা চালাও, শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই—"

"আমার দইটার কি হল হুজুর?"

"কিছু করা গেল না। ফেলে দিয়েছি।"

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনিয়া হারু বাড়ি ফিরিল। ফিরিবার পথে দেখিল দইয়ের খালি কড়াইটি পড়িয়া আছে। ভদ্রলোক একেবারে চাঁছিয়া পুঁছিয়া সমস্ত দইটা ফেলিয়া দিয়াছে। ট্যাঁক হইতে দই-জমানো বড়িটা বাহির করিয়া সে একবার দেখিল। শুঁকিল একবার। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

প্রয়োজন

আমার জীবনে দুইটি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

প্রথম ঘটনাটি খুবই সাধারণ। তোমরাও অনেকে হয়তো এ রকম দৃশ্য দেখিয়াছ। মেলায় একটি ভিখারী বালক ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল। জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, চোখের কোণে পিঁচুটি, মাথার চুল কটা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ক্ষীণকণ্ঠ তুলিয়া সকলের কাছেই সে হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। কিন্তু মেলার ভীড়ে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবার সময় ছিল না কাহারও। আমার হঠাৎ দয়া হইল। ব্যাগ খুলিয়া প্রথমে তাহাকে একটা পয়সা দিতে গেলাম, কিন্তু দিতে গিয়া মনে হইল এক পয়সায় উহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কি? অন্তত চার আনা না দিলে কিছুই হইবে না। একটা সিকিই তাহাকে দিলাম। তাহার মুখে হাসি ফুটিল। সে ছুটিয়া গিয়া কিন্তু যাহা কিনিল তাহা খাবার নয়, বাঁশী। একটি বাঁশী কিনিয়া মনের আনন্দে সে বাজাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটু অসাধারণ। তখন দাঙ্গার সময়। আমরা প্রত্যেকেই লাঠিসড়কি প্রভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমি শুধু সংগ্রহই করি নাই, বিতরণও করিতেছিলাম। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না। বহু লাঠি-প্রার্থী জুটিয়া গিয়াছিল। বিতরণ করিতে করিতে শেষে একটিমাত্র লাঠি অবশিষ্ট রহিল। ঠিক করিলাম, এটি আর কাহাকেও দিব না। সেদিন খুব জোর একটা গুজব উঠিয়াছিল, মুসলমানেরা রাত্রিতে না কি আমাদের পাড়া আক্রমণ করিবে। কারফিউ জারি হইয়াছে, রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ। তখন রাত্রি বোধহয় দশটা। আমি আমাদের বাহিরের ঘরে খিল লাগাইয়া একটি উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। দ্বারে সন্তর্পণে কে যেন করাঘাত করিল।

"কে—"

"আমি কেনারাম।"

কেনারাম আমার বন্ধু। সে লাঠি লইয়া যায় নাই। ভাবিলাম, লাঠির জন্যই আসিয়াছে। কপাট খুলিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি, লাঠি চাই না কি—"

"না, বিড়ি। আছে তোমার কাছে? দু'দিন থেকে সমস্ত বিড়ির দোকান বন্ধ, পেট ফুলছে আমার—"

অত রাত্রে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেনারাম আসিয়াছিল লাঠির জন্য নয়, বিড়ির জন্য।

সকলের প্রয়োজন সমান নহে।

আমার কোনও অভাব নাই, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে, হাতে প্রচুর সময়, কাজ করিয়া খাইতে হয় না, পায়ের উপর পা দিয়া আরামে দিন কাটাইতে ছিলাম, অর্থ দিয়া যত প্রকার আনন্দ ক্রয় করা সম্ভব সবই করিয়াছি, তবু আমি আত্মহত্যা করিলাম, কারণ তাহার প্রয়োজন ছিল। সকলের প্রয়োজন সমান নহে। উপরোক্ত গল্প দুইটি ভাল করিয়া প্রণিধান কর।

* * *

পিস্তলের আঘাতে বিদীর্ণমস্তক মৃত্যুঞ্জয় সিংহ যে রক্তাক্ত বালিশটার উপর মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহারই তলায় উপরোক্ত লেখাটি ছিল।

প্রাচীন পন্থা

ব্রহ্মার বৈঠকখানাতেই একটি সভা বসিয়াছে, কারণ, বৈঠকখানাটি বেশ প্রশস্ত। ব্রহ্মাকে কিন্তু সুকৌশলে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। অতি আধুনিক দেবতাগণ ব্রহ্মার সান্নিধ্য তেমন পছন্দ করেন না। বুড়া অত্যন্ত দোষ-অনিসন্ধিৎসু হইয়া পড়িয়াছেন, দেখা হইলে একটা-না-একটা দোষ বাহির করিয়া ভৎর্সনা করেন। তা ছাড়া, পিতামহের মতামত অতিশয় সেকেলে, আধুনিক যুগে একেবারে অচল। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিয়া চলাও শক্ত। তিনি শুধু অমর নন, অত্যুৎসাহীও। নানাবিধ সচিত্র সাময়িক পত্র ও রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের সহায়তায় তাঁহাকে পিছন দিকের একটি ঘরে অন্যমনস্ক করিয়া রাখা হইয়াছে। আজিকার সভায় অন্তত তাঁহার ন্যায় প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির ভ্যানভ্যানানি চলিবে না। অতি-আধুনিক একটি সমস্যার আলোচনার জন্য অতি-আধুনিক দেবতাকুল সমবেত হইয়াছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতারাও কেহ নাই। তাঁহারা অহোরাত্র স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত, সভা করিবার মতো অবসর তাঁহাদের নাই। এ সভায় আছেন তড়িৎকুমার, জ্যোৎস্নাকুমার, অমলকুমার, অনিলকুমার, সলিলকুমার, তপনকুমার প্রভৃতি ছোকরা দেবতাগণ।

মানব সমাজের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁহাদের আশঙ্কা মানব সমাজ এইবার ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং দেব সমাজও থাকিবে না। কারণ, মানবের কল্পলোকেই দেবতাদের বাস। দেবতাদের অস্তিত্ব

অটুট রাখিতে হইলে মানুষকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার। মানুষ 'অ্যাটম্ বোম্' আবিষ্কার করিয়াছে! কি সর্বনাশ!

তড়িৎকুমার কবি। বেশ নাম হইয়াছে। তিনি বলিতেছিলেন—জিলো পাখির জিজ্ঞাসার জাকড়ে প্রশান্ত ফুঁ দাও একটি···।

সকলে বলিয়া উঠিলেন—অর্থাৎ?

তড়িৎকুমার নীরব। তাঁহার ওষ্ঠের প্রান্তভাগে কি একটা ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতেছিল না। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাঁহার প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। শুধু তাঁহার নয় সকলেরই। দ্বারদেশে ভীষণ একটা গর্জন উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লম্বকর্ণের মুণ্ডটি দেখা গেল। লম্বকর্ণ প্রবেশ করিয়া শুদ্ধ ভাষায় কহিলেন—আমি প্রতিকার চাই।

অনিলকুমার। কে তুমি বাবা?

লম্বকর্ণ। আমি শ্রীরাসভ।

অনিলকুমার। এখানে কেন?

লম্বকর্ণ। প্রতিকারের দাবি লইয়া আসিয়াছি।

তপনকুমার। কিসের প্রতিকার?

লম্বকর্ণ। আমার গাধা নাম অভিধান হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হোক।

জ্যোৎস্নাকুমার। কেন?

লম্বকর্ণ। মানুষেরা বোকাকে গাধা বলে।

নূতন সমস্যা।

ইহার জন্য কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কবি তড়িৎকুমার এতক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। তাঁহার অন্তরে একটি প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, আধুনিক কবিতার টেকনিকে কিছু বলিলে বেরসিকটা যদি পুনরায় গর্জন করিয়া ওঠে তাহা হইলে শুধু প্লীহা নয় কর্ণপটহও বিদীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। অমরত্ব হেতু মৃত্যু অবশ্য হইবে না, কিন্তু ফাটা পিলে ও কালা কান লইয়া বাঁচিয়া থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং সরল ভাষাতেই স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করা সমীচীন মনে করিলেন।

তড়িৎকুমার। মানুষেরা নিজেরাই বোকা। দেখিতেছ না 'অ্যাটম বোম' আবিষ্কার করিয়া আত্মঘাতী হইবার চেষ্টা করিতেছে। গাধা নামটি তো সুন্দর কেমন সরল। মানুষের কথায় কান দিও না।

লম্বকর্ণ। কিন্তু আমার কান দুইটা যে বড় বড়, ঢাকিয়া রাখা মুশকিল।

ওসব বাজে ওজর খাড়া করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে আমার গাধা নাম যদি অভিধান হইতে বিলুপ্ত না করেন তাহা হইলে—

লম্বকর্ণ পুনরায় চীৎকার করিবার উপক্রম করিতেই সকলে যুগপৎ জোড় হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—থাম, থাম, আগে আমাদের কথাটা শোন—

লম্বকর্ণ। বলুন!

অতি-আধুনিক দেবগণ পুনরায় পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বস্তুত ইহা করা ছাড়া তাঁহাদের আর কিছু করিবার ছিল না। এই অদ্ভুত সমস্যার অতি-আধুনিক কোন সমাধান তাঁহাদের মাথায় আসিতেছিল না। সহসা তপনকুমারের মস্তিষ্কে একটি বুদ্ধির উদ্ভব হইল।

তপনকুমার। বীণাপাণির স্বরসপ্তকের দুইটি স্বর সহযোগে তোমার ওই নামটি নির্মিত, বুঝিয়া দেখ এতদ্দ্বারা তোমাকে কত সম্মানিত করা হইয়াছে। মানুষের নামে কেবল 'মা', পাখির নামে কেবল 'পা' চন্দ্রসোহাগিনী রেবতী নক্ষত্রেও কেবল মাত্র 'রে' বর্তমান। কেবল তোমার নামটিতেই গান্ধার এবং ধৈবতের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কি আছে?

লম্বকর্ণ। ক্ষুব্ধ না হইয়া উপায় নাই। যে মানব সমাজে আমাদের বাস করিতে হয়, সে সমাজে গাধা মানে বোকা। সুতরাং যতই সুরেলা হউক না কেন, ও নাম আমরা চাই না। ও নাম অভিধান হইতে তুলিয়া দিতে হইবে। আপনাদের সরস্বতীকে ডাকুন—

জ্যোৎস্নাকুমার। [সোৎসাহে] বেশ, দেখি তিনি কোথায় আছেন।

জ্যোৎস্নাকুমার সরিয়া পড়িলেন। বাকি সকলে ব্যোমমার্গে নিজ নিজ চিন্তাধারাকে চালিত করিয়া এই অভিনব সমস্যাটির সমাধানে ব্যাপৃত হইলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকে একটি করিয়া সিগারেট ধরাইলেন।

সলিলকুমার। আমার বিশ্বাস, দেবী বীণাপাণিও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না।

লম্বকর্ণ। কেন? তিনি শুনিয়াছি বাগীশ্বরী, সমস্ত বাক্যের মালিক।

সলিলকুমার। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] ঠিকই শুনিয়াছ। কিন্তু কোন বাক্যকে বাজারে চালু করিয়া দিবার পর তাহাতে আর কাহারও কোনও অধিকার থাকে না। তাহা সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যায়।

অনলকুমার। অভিধানের প্রকাশকগণ যদি সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়তো—

অনিলকুমার। তুমি তোমার বাবাকে অনুরোধ করিয়া দেখিতে পার। তিনি

যদি সমস্ত অভিধানগুলি ভস্মীভূত করিয়া দেন তাহা হইলে নূতন অভিধান সৃষ্ট হইবে তখন সেই অভিধানগুলি হইতে গাধা নাম তুলিয়া দিলেই চলিবে।

সলিলকুমার। কিন্তু মানুষের স্মৃতিকে ভস্মীভূত করিবার শক্তি কি অগ্নিদেবের আছে? আমার বিশ্বাস নাই—

লম্বকর্ণ। আমি অত শত বুঝি না। যে-কোনও উপায়ে হোক কথাটিকে লোপ করিতে হইবে।

সহসা দেবগণ একযোগে ঘর হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন। লম্বকর্ণ একটু অবাক হইয়া গেল। তাহার পর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছনের ঘরের জানলায় স্বয়ং চতুরানন হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অতি আধুনিক মানবগণ হয়তো পিতামহের নাকের উপরই সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতে ইতস্তত করিতেন না কিন্তু অতি আধুনিক দেবতারা ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

পিতামহ। [সোচ্ছ্বাসে] স্বাগতম্, স্বাগতম্! বাতায়ন-পথে তোমার সমস্ত কথাই শুনিয়াছি। ওসব ছেলে-ছোকরাদের কর্ম নয়, আমিই সব ব্যবস্থা করিয়া দিব। ভিতরে আইস।

[লম্বকর্ণ ভিতরে প্রবেশ করিল।]

লম্বকর্ণ। কি ব্যবস্থা করিবেন বলুন।

পিতামহ। তোমাদের স্ট্রাইক করিতে হইবে। উহাই আধুনিক পদ্ধতি। ছোঁড়াগুলো মনে করে আমি আধুনিক জগতের কোনও খবর রাখি না। হুঁ:—দেখ না সব ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

লম্বকর্ণ। স্ট্রাইকের কথা আমিও ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু স্ট্রাইক করিব কাহার বিরুদ্ধে? ধোপারা আজকাল আমাদের তোয়াক্কা করে না। রিক্সা এবং মোটর-লরি করিয়া কাপড় লইয়া যায়। আমাদের আর কদর নাই।

পিতামহ। ওই রিক্সা, মোটর-লরির বিরুদ্ধেই আন্দোলন করিতে হইবে।

লম্বকর্ণ। তাহা কি করিয়া সম্ভব?

পিতামহ [সহাস্যে] নিশ্চয় সম্ভব। আগে একটু বিশ্রাম করিয়া লও, তাহার পর আলোচনা করিব। ওহে বিশ্বকর্মা শ্রীযুক্ত রাসভকে তুমি দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় লইয়া যাও, কোনরকম অযত্ন যেন না হয়।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় গিয়া রাসভ অবাক হইয়া গেল। অপ্সরাগণ তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। স্বয়ং উর্বশী তাহার গলায় মালা দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বকর্মা নন্দনকানন হইতে মরকতমণিসন্নিভ দূর্বারাজি আনিয়া দিল, সুবর্ণনির্মিত কটাহে সোমরস পান করাইল।

…কিছুক্ষণ পর পিতামহ দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন উর্বশীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শ্রীরাসভ গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন।

পিতামহের চতুর্মুখে হাসি ফুটিল।

শ্রীরাসভের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

অভিধানগুলিতে 'গাধা' শব্দ এখনও বিদ্যমান আছে।

অবচেতনা

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্রুতগামী ট্রেন বেশ দ্রুতবেগেই ছুটিয়া চলিয়াছে। পরের স্টেশন বর্ধমান। আমার কামরায় দ্বিতীয় লোক নাই। আমি এককোণে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলাম। বোধহয় একটু তন্দ্রাই আসিয়াছিল। ট্রেনের ঝাঁকানিতে সেটুকু ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া কিন্তু আর তাহা বন্ধ করিতে পারিলাম না। সামনের বেঞ্চে একটি অপরূপ সুন্দরী বসিয়া আছে। অবাক কাণ্ড! মেয়েটি এতক্ষণ এখানেই ছিল অথচ দেখিতে পাই নাই?

…অপরূপ সুন্দরী। গায়ের রং ধপধপে ফরসা বলিলে কিছুই বলা হয় না। শ্বেতকমলের পাপড়ি দিয়া কে যেন তনু দেহখানি নির্মাণ করিয়াছে। তুষারশুভ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, কিন্তু ঠিকটি বলা হইবে না যেন। অনেকখানিই যেন অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। নিখুঁত সাদা, কিন্তু জীবন্ত।

…বিধবা কি? পরনের কাপড়ও সাদা, পাড় পর্যন্ত নাই। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। বরং মনে হইতেছে কোন রং থাকিলেই যেন ছন্দপতন ঘটিত। মাথায় সিঁদুর আছে কি না বোঝা যাইতেছে না। কপাল পর্যন্ত আধঘোমটা দেওয়া। মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। হাত দুইটি কোলের উপর। দুই হাতে দুইটি দুগ্ধধবল শাঁখা। আর কোনও অলঙ্কার নাই।

…মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমশ একটা অপরূপ গন্ধ চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। উগ্র নয়, স্নিগ্ধ, মধুর—অতি মধুর গন্ধ একটা। যূথিকা-বনের যে সৌরভ ধীরে ধীরে মরমে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞাতসারে প্রাণ মন উতলা করিয়া দেয়, এ যেন সেই সৌরভ।

মহাভারতে পদ্মগন্ধার কাহিনী পড়িয়াছিলাম সেই রকম কিছু একটা না কি!

মেয়েটি যেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আর আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"আপনি কোথায় যাবেন ?"

মেয়েটি ঘাড় আর একটু নীচু করিল। তাহার পর মৃদু অতি মৃদুকণ্ঠে যেন বলিল—"আমি হারিয়ে গেছি।"

"হারিয়ে গেছেন। তার মানে—"

তারপর যাহা ঘটিল তাহা অবিশ্বাস্য।

ফাল্গুনের স্বচ্ছ কুয়াশার মতো ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল সে। কেবল এই কয়টি কথা বাতাসে ভাসিয়া আসিল—"আমি সীতাভোগের স্বপ্ন।"

ট্রেন আসিয়া বর্ধমানে প্রবেশ করিল।

সাধু

সাধারণত যে সব জিনিস সাধুত্বের পরিচায়ক তার কিছুই ছিল না সাধুটির। তাঁর নিজের কোনও সংসার ছিল না বলেই লোকে তাঁকে সাধু বলত। অতিশয় সাদাসিধা ধরনের লোক ছিলেন তিনি। ভস্ম জটা গেরুয়া এসব তো ছিলই না, মুখে বুক্‌নিও ছিল না। আত্মা পরমাত্মা জীবাত্মা কখনও শোনা যায় নি তাঁর মুখে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর পরোপকার করবার প্রবৃত্তির জন্য। দরিদ্র রোগী নিয়ে প্রায়ই আসতেন তিনি মাঝে মাঝে। সেই সূত্রে ডাক্তারবাবুর বেকার ভাই জীবুর সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়। জীবু, এই সাধুসঙ্গ লাভ করে পরম উল্লসিত হয়েছিল। অনেক দিন থেকে একটি সাধুর খোঁজ করছিল সে। তাঁরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন, তন্ত্র-মন্ত্র, যোগ-যাগ কত কি জানা থাকে তাঁদের, একটা 'হদিশ' কেউ যদি 'বাতলে' দেন তা হলে ভাবনা কি। জীবু সব জিনিসই টাকার পরিমাণে বিচার করত। অবশ্য তার চিন্তাধারাটা ঠিক পাশ্চাত্য নকলে নয়। তার ধারণা আমরা যেদিন থেকে সোজাসুজি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করলাম অর্থাৎ ইতরের মতো টাকা রোজগারে মন দিলাম সেইদিন থেকেই আমরা ডুবলাম। আমাদের দেশ যোগীর দেশ, যোগবলে আমরা ঐশ্বর্য পাব। আমাদের কি কেরানীগিরি সাজে, না ব্যবসা করা মানায়! সুতরাং জীবু ভারতবর্ষীয় পন্থাই অন্বেষণ করছিল এতদিন, কেবল মনোমত গুরু পাচ্ছিল না। এই সাধুটিকে পেয়ে সে যেন নিজের ভবিষ্যৎকেই পেয়ে গেল নিজের আয়ত্তের মধ্যে। ভারি পুলকিত হল। পুলকের প্রথম অবস্থাটা কেটে যাবার পর কিন্তু তাকে উপলব্ধি করতে হল ব্যাপারটা সে যত সহজ মনে করেছিল তত সহজ

নয়। সাধু কিছুতেই আমল দিতে চান না। জীবুও ছাড়বার লোক নয়। আড়ালে পেলেই বলে—ঠাকুরমশাই, দীক্ষা দিন আমাকে। সাধু হাসেন। বলেন—আমি আবার কিসের দীক্ষা দেব। আমি কি জানি। জীবু অধিকতর মুগ্ধ হয়। আসল সাধু কি সহজে ধরা দেয়?

দিন কাটে। জীবু আমল পায় না। একদিন কথায় কথায় সে তন্ত্রের কথা পাড়লে। বললে—আচ্ছা, ঠাকুরমশাই, শুনতে পাই তন্ত্রসাধনা করলে না কি অনেক কিছু পাওয়া যায়। সাধু বললেন—আমিও শুনেছি। তারপর মৃদু হেসে চুপ করে গেলেন। জীবু এত সহজে ছাড়বার লোক নয়—তিনবার ফেল করে ম্যাট্রিক পাশ করেছে সে—লেগে থাকবার মতো ধৈর্য তার আছে। সাধুর স্মিতমুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে সবিনয়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করলে—তন্ত্র ব্যাপারটা কি ধরনের একটু যদি বুঝিয়ে দেন। সাধু হেসে বললেন—আমি ঠিক জানি না। জীবুকে তাড়াতাড়ি বলতে হল—আচ্ছা থাক থাক এখন থাক, পরে কোন এক সময়ে হবে এখন। অর্থাৎ জীবু ব্যাপারটাকে শেষ করতে চায় না, আলোচনার খুঁটটা ধরে থাকতে চায় যেমন করে হোক। সাধুটি মাঝে মাঝে আসেন আবার চলে যান। তিনি ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন নিতান্ত আধিভৌতিক কারণে। কখনও চাঁদা চাইতে, কখনও কোনও দুঃস্থ রোগী নিয়ে। ওই অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান তিনি জনসেবা করে। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের নাম লেখানো পাণ্ডা তিনি নন, অথচ সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকেন। কংগ্রেস, রামকৃষ্ণ মিশন, হিন্দুমহাসভা সব দলেই দেখা যায় তাঁকে। জীবু সুযোগ খোঁজে কি করে তাঁকে আড়ালে পাবে। আর একদিন সুযোগ মিলল। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অগ্রসর হবার প্রয়াস পেল জীবু। সসঙ্কোচে বলল, আচ্ছা প্রাণায়াম জিনিসটা কি রকম বলুন তো, ঠাকুরমশায়। সাধু চকিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—শুনেছি নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া। জীবু সোৎসাহে বলে উঠল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই, শুনেছি হঠযোগের আসল জিনিসই হল প্রাণায়াম—নয়? জীবু এসব বিষয়ে গোপনে পড়াশুনোও করত। সাধু চুপ করে রইলেন। জীবু একটু মাথা চুলকে আবার প্রশ্ন করলে—কি বলেন? সাধু উত্তর দিলেন—শুনেছি তাই। কিছুক্ষণ নীরবতার পর জীবু পুনরায় অগ্রসর হবার চেষ্টা করল একটু। বললে—আচ্ছা শুনেছি প্রাণায়াম করলে কপালের ঠিক মাঝখানে না কি আলো দেখা যায়? সাধু উত্তরে বললেন—গেলেই বা। তাঁর কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল যেন। জীবু বললে—সত্যি যায় না কি? জীবুর চেষ্টা সাধুর মুখ দিয়ে ওই জাতীয় একটা কিছু স্বীকার করিয়ে নেওয়া। এতদিন

চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই ধারা-ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছে না সে লোকটাকে। এর উত্তরে সাধু যা বললেন তাতে অন্য কেউ হলে দমে যেত। বললেন—রগ ঘেঁসে জোরে একটা চড় মারলেও কপালের মাঝখানে আলো দেখা যায়—যাকে চলতি বাংলায় বলে সরষের ফুল। জীবু দমবার ছেলে নয়, হেসে বললে—ও আলোটালো কিছু নয় তাহলে—অ্যাঁ, কি বলেন। নাছোড়বান্দা লোকটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সাধু বললেন—এসব জানবার আপনার এত আগ্রহ কেন। জীবু একটু আশান্বিত হল। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন—কেউ যদি পথ দেখিয়ে দিত সাধনা করতাম।

কিসের সাধনা করবেন? উদ্দেশ্যটা কি?

সত্যি কথাটা জীবু মুখ ফুটে বলতে পারলে না। আমতা আমতা করে বললে—শুনেছি ওতে শক্তি বাড়ে।

কিসের শক্তি—

মনের—

তা না হয় বাড়ল। কি করবেন সে শক্তি নিয়ে?

থতমত খেয়ে জীবু এমন একটা কথা বলে ফেলল যা সে কোনদিন কল্পনাও করে নি।

বললে—ভগবানকে খুঁজব।

সাধু হেসে উত্তর দিলেন—ভগবানকে খোঁজবার দরকার নেই। তিনি সর্বত্রই আছেন, চেয়ে দেখলেই হল।

জীবু নির্বাক।

সাধু চলে গেলেন।

জীবুর মনে হল এখনও বোধ হয় সময় হয় নি তাই ঠাকুরমশাই ধরা দিচ্ছেন না। নানারকম সাধুর গল্প সে শুনেছিল, সেই সব কথাই ভাবতে লাগল। কেউ নানারকম গন্ধ বার করতে পারে, কেউ ফল মাছ সন্দেশ রসগোল্লা নানাপ্রকার ভাল ভাল খাবার যে কোন মুহূর্তে আনিয়ে দিতে পারে, সোনা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে কোনও কোনও সাধু, দুরারোগ্য অসুখের ওষুধ জানে অনেকে। এর একটা কোনও বিদ্যা সে যদি আয়ত্ত করতে পারে, বাস্, তাহলে আর ভাবনা কি। জীবুর দৃঢ় বিশ্বাস, এ সাধুটিরও অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তার সময় হয়নি বলেই বোধ হয় ধরা দিচ্ছেন না। গভীর জলের মাছ। সহজে ধরা দেবেন না। সহজে ধরা দেনও না এঁরা। প্রতীক্ষা করতে হবে। জীবু প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ সুযোগ ঘটে গেল একদিন।

ডাক্তারবাবু একদিন দূরের গ্রামে একটি কঠিন রোগী দেখতে বেরুচ্ছেন। জীবুও তার সঙ্গে যাচ্ছে। জীবুর যাবার কারণ, জীবু কিছুদিন আগে উক্ত গ্রামে হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস করতে বসেছিল, রোগীর বাড়ির লোকেরা জীবুকে যাবার জন্যেও অনুরোধ করেছেন। তাঁরা বেরুতে যাবেন এমন সময় সাধুটি এসে হাজির হলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন—আপনিও চলুন না। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে গল্প করতে করতে।

এই দীর্ঘপথ একা জীবুর সঙ্গে যাবার সম্ভাবনায় ডাক্তারবাবু একটু বিব্রত বোধ করছিলেন। ভাই হলেও জীবুকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

সাধু রাজী হয়ে গেলেন।

রোগীটি বৃদ্ধ। নিউমোনিয়া হয়েছে। অত্যন্ত সঙীন অবস্থা। ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে গেলেন। একটু যা ভরসা রোগীর জ্ঞান আছে। ডাক্তারবাবু জ্ঞানবুদ্ধিমতো যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন। জীবুও এক ফোঁটা ওষুধ দিয়ে দিলে যদি লেগে যায় ভেবে। কিন্তু একটু পরে আর এক কাণ্ড হল। রোগী কি করে জানতে পেরে গেল যে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটি সাধুও এসেছেন। খবরটা শোনামাত্র রোগীর মনে অদ্ভুত বাসনা জাগল একটা। ডাক্তারবাবুকে সে অনুরোধ জানালে,—ওই সাধুর পায়ের ধুলো এনে আমার বুকে মাখিয়ে দিন তা' হলেই আমার বুকের ব্যথা কমে যাবে। আকুল অনুরোধ। জীবু বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ডাক্তারবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে সাধুকে বললেন। সাধু এরকমটা প্রত্যাশা করেন নি। বিব্রত কণ্ঠে শুধু বললেন—সে কি!

ডাক্তারবাবু হেসে জবাব দিলেন—তা আপনিই জানেন। আমাকে বলতে বলল বললাম। একটু দিন না, ক্ষতি কি।

না, না, সে হয় না—

জীবু না-ছোড়।

সাধু ক্রমাগত প্রতিবাদ করতে লাগলেন—না, না, সে হয় না, আমার পায়ের ধুলোর কি মূল্য থাকতে পারে। উনি প্রবীণ লোক, ওঁর বুকে পায়ের ধুলো দেবার কি অধিকার আছে আমার। পাগল না কি—

জীবু বলল—সে সব কিছু শুনব না, পায়ের ধুলো আপনাকে দিতেই হবে।

সাধু বলতে লাগলেন—না, না, ভাল করে ভেবে দেখুন আপনারা ব্যাপারটা। আপনারা চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক—

এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক আলুলায়িত-কুন্তলা

বৃদ্ধা। পাকা চুলে জলজ্বল করছে সিঁদুর। এসে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সাধুর পায়ের তলায়। বৃদ্ধটির স্ত্রী।

দয়া করুন, দয়া করুন বাবা, দিন একটু পায়ের ধুলো—

পা সরিয়ে নেবার আগেই বৃদ্ধা দু'হাত বাড়িয়ে পা থেকে তুলে নিলেন ধুলো। সাধু অত্যন্ত কুন্ঠিত হয়ে পড়লেন। দু'হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—ছি, ছি, এ বড় অন্যায় করলেন আপনারা। অবিচার করলেন আমার উপর—

ঘণ্টা কয়েক পরে যা ঘটল তা আরও নাটকীয়। ঘাম দিয়ে বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। কমে গেল বুকের ব্যথা। সকাল নাগাদ বৃদ্ধ প্রায় সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন। জয়জয়কার পড়ে গেল সাধুর। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল জীবু। ছুটে বেরিয়ে পড়ল সে পাড়ায়। ডাক্তারবাবু বললেন—নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস্ এই রকমই হয়। তবে এত চট করে হবে এটা আশা করি নি। আপনার পায়ের ধুলোর গুণ আছে ঠাকুরমশাই।

সাধু অপ্রতিভ মুখে বললেন—কি যে বলেন আপনি!

ডাক্তারবাবু আর যদিও কিছু বললেন না কিন্তু মনে মনে বিস্মিত হয়েছিলেন তিনিও একটু। বাড়ির লোকেরা তো শ্রদ্ধায় গদগদ। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন আবার। সাধুর দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন—বাবা একবার ভিতরে আসুন।

আবার কেন!

জল খাবার দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তারবাবুও বললেন—চলুন। খিদে পেয়েছে।

উঠলেন সবাই। সাধু ভিতরে গিয়ে দেখেন বিপুল আয়োজন। ক্ষীর, দই, ছানা, রাবড়ী, সন্দেশ, ফল-মূল এত দেওয়া হয়েছে যে, একজনের পক্ষে খাওয়া অসম্ভব। বললেন সে কথা।

গৃহিণী উত্তর দিলেন—আপনি যা খাবেন খান। বাকিটা প্রসাদ পাব আমরা। প্রসাদ পাবার জন্যে ভীড় করে এসেছে পাড়ার লোক।

সসঙ্কোচে একটু হেসে সাধু বললেন—আমাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন, আমি আপনাদেরই মতো একজন সাধারণ লোক—

সশ্রদ্ধ আনতচক্ষে সবাই এমন ভাব প্রকাশ করলেন যার অর্থ—আপনি তো ও কথা বলবেনই।

সাধু কুন্ঠিত ভাবে যা পারলেন খেলেন একটু। তারপর হাত ধুয়ে বাইরে এলেন। বাইরে এসে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বহুলোক সমবেত হয়েছে

সামনের মাঠে। অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, যক্ষ্মা, হাঁপানি, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা—বহুভাবে আর্ত বিপুল জনতা। ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জীবু।

বললে—পায়ের ধুলো দিতে হবে সকলকে।

জীবুর মুখের দিকে চেয়ে সাধু ঘাবড়ে গেলেন। ভক্তি আশা আনন্দের উদ্দীপনার সঙ্গে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা মিলে মুখের এমন একটা ভাব হয়েছে যা অবর্ণনীয়। ব্যাপারটাকে লঘু করে দেবার চেষ্টায় তবু তিনি একটু হেসে বললেন—কি ছেলেমানুষি করছেন আপনারা—

জীবু বললে—পায়ের ধুলো আপনাকে দিতেই হবে।

সত্যি কি আপনারা বিশ্বাস করেন আমার পায়ের ধুলোতেই উনি সেরে গেছেন?

অকম্পিত কণ্ঠে জীবু উত্তর দিলে—করি—

তারপর কম্পিত কণ্ঠে বললে—কোনও ছলনায় আর ভোলাতে পারবেন না আমাকে—

সাধু তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এত লোককে পায়ের ধুলো দেওয়া সম্ভবই বা হবে কি করে! আমার পায়ে এতো ধুলো আছে কি—

জীবু বললে—সে কথা আমি ভেবেছি, ব্যবস্থাও করেছি। রাস্তা থেকে ঝুড়ি করে ধুলো তুলে আনা হবে, আপনি পা দিয়ে সেটা ছুঁয়ে দেবেন খালি, তারপর আমি সেটা বিতরণ করব।

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে সাধু বললেন—বেশ তাই ব্যবস্থা করুন তাহলে। আমি ভিতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি ততক্ষণ—

বেশ বেশ—

ভিতরের দিকে একটি ঘরে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। জীবু ধুলো সংগ্রহ করতে বেরুল। অনেক ধুলো চাই। প্রায় আধ ঘন্টা পরে ফিরল সে। সঙ্গে গোটা চারেক কুলী। প্রত্যেকের মাথায় এক ঝুড়ি ধুলো।

ডাক্তারবাবু এই সব বখেড়ার মধ্যে পড়ে একটু বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ফিরে যাওয়া, অথচ সাধুকে এখানে রেখে যেতেও মন সরছিল না তাঁর।

জীবু বললে—তোমার কাজ থাকে তুমি যাও না, আমি ওঁকে নিয়ে যাব এখন এরপর। ঠাকুরমশাই কোথা?

তিনি পায়খানা গেছেন—তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি—

যে গাড়োয়ানটা তাঁদের এনেছিল সে এতক্ষণ তার গরু দু'টিকে চরাচ্ছিল।

পুকুর থেকে জল খাইয়ে সবে ফিরেছে সে। ডাক্তারবাবুর কথা শুনে সে বললে —আরে তিনি তো চলে গেছেন অনেকক্ষণ। আমি যখন গরু দুটোকে জল খাওয়াতে যাই তখন দেখলাম তিনি মাঠ দিয়ে চলে যাচ্ছেন হন হন করে। আমি একবার ডাক দিলাম—ও ঠাকুর, চলেছে কোথায় ঠাকুর,—আমার দিকে একবার পিছু ফিরে চেয়ে ছুটতে লাগলেন !

সাধু আর ফিরলেন না।

ও অঞ্চলে আর ফেরেন নি তিনি।

জীবুর কিন্তু আশা আছে। এখনও সে অপেক্ষা করছে।

দুই খেয়া

১

দুই বন্ধু যখন নদীতীরে এসে দাঁড়াল তখন খেয়ার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। খেয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। বিমূঢের মতো চেয়ে রইল তারা নদীর দিকে। পার হতেই হবে যেমন করে হোক, কালই যে শেষ দিন। অনেক কষ্টে সুপারিশ যোগাড় করে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার অনুমতি পেয়েছে তারা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন কালই ভর্তি হবার শেষ দিন। কাল যদি তারা পৌঁছতে না পারে তাদের জায়গায় অপর ছেলে নেওয়া হবে। উমেশ নবীন দু'জনেরই বাড়ি পাড়াগাঁয়ে। রেল-লাইন থেকে বেশ দূরে। কয়েক ক্রোশ হেঁটে নদী পার হয়ে তবে ট্রেনে চড়তে হয়। বাড়িতে টাকার যোগাড় করতে এসেছিল তারা। অতগুলো টাকা চট্ করে যোগাড় হয়ে ওঠেনি। দেরি হয়ে গেছে। খেয়ার নৌকো চলে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। সামান্য একটা নৌকোর অভাবে মেডিকেল কলেজে ঢোকবার আশা বিসর্জন দিতে হবে ?

উমেশ। সাঁতার জানিস্ তুই ?

নবীন। না।

উমেশ। আমিও জানি না, মহা মুশকিল হল তো।

উমেশের পরিধানে খাকি হাফপ্যান্ট হাফশার্ট। তার দূর-সম্পর্কের এক দাদার কাছ থেকে ধার করে এনেছে। নবীনের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, সাধারণ বাঙালী পোশাক। উমেশের চেয়েও নবীন বেশি গরীব। সাহেবী পোশাক ধার দেবার মতো দাদাও নেই।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজন। কাল সকালের আগে খেয়ার নৌকো নেই। সে-নৌকোয় গেলে ট্রেন ধরা যাবে না। নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছিল একটা বটগাছ কিছুদূরে। তার দিকে চেয়ে উমেশের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল হঠাৎ। আশায় আনন্দে চোখের দৃষ্টি ঝলমল করে উঠল।

উমেশ। ওই গাছটার নীচে একটা ডিঙি বাঁধা আছে রে।

নবীন। হ্যাঁ, আছে তো। কার ডিঙি ?

উমেশ। চল্ খোঁজ করা যাক।

এগিয়ে গেল দু'জনেই। মাঝি বললে কোন এক দারোগা সাহেবের জন্য পাঠিয়েছেন ওপারের এক জমিদার। উমেশ বুদ্ধিমান ছেলে। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়।

উমেশ। চিনিস তুই সে দারোগা সাহেবকে ?

মাঝি। না হুজুর।

উমেশ। আমিই সেই দারোগা সাহেব। চল্।

তড়াক করে লাফ দিয়ে নৌকোয় উঠে বসল উমেশ। নবীন কিন্তু উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

উমেশ। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কেন ?

নবীন। আমি তো দারোগা সাহেব নই।

উমেশ। দারোগা সাহেবের সঙ্গী তো বটে। আয়।

নবীন। না, আমি যাব না।

উমেশ। কি মুশকিল, আয় না।

নবীন। না।

উমেশের ভয় হচ্ছিল বেশি দেরি করলে আসল দারোগা না এসে পড়ে। সব ভেস্তে যাবে তা হলে। আরও দু-চার বার অনুরোধ করে উমেশ একাই শেষে চলে গেল। নবীনের গোঁয়াতুর্মির জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারে না সে। নৌকো যখন মাঝ নদীতে তখন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে—অচল প্রস্তরমূর্তিবৎ নবীন তখনও দাঁড়িয়ে আছে।

২

পঁচিশ বছর কেটে গেছে।

সেই নদীতীরে এক অন্ধকার রাত্রে আবার এসে দাঁড়াল উমেশ। এখন আর সে, সে-উমেশ নেই। এখন সে মেজর ইউ, সি, চ্যাণ্ডা। পরিধানে খাকি মিলিটারি পোশাক। বাড়ি থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটি নিয়ে এসেছে সে। একমাত্র ছেলে টাইফয়েডে মুমূর্ষু। সেদিনও পারের খেয়া ছেড়ে চলে গেছে। টর্চ ফেলে ফেলে সেদিনও সে হঠাৎ দেখতে পেলে একটা ছোট নৌকো একধারে বাঁধা রয়েছে। এগিয়ে গেল।

"এই—কার নৌকো—"

একটি জীর্ণ শীর্ণ গোছের লোক ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

"আমার নৌকো—"

"পার করে দিবি ?"

"না।"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলে লোকটি। কিছুদিন আগেই তাদের গ্রামে মিলিটারি 'রেড' হয়ে গেছে। খাকি পোশাক দেখলেই সমস্ত মন কন্টকিত হয়ে ওঠে তার। ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ভয় তার আর নেই। অতিব্যথা নির্ব্যথা করে দিয়েছে মনকে।

"যাবি না কেন ?"

"আমার অন্য কাজ আছে।"

"ভাড়া দেব। যা ভাড়া চাস দেব।"

"না আমি যেতে পারব না।"

পাঁচ—দশ—বিশ—পঞ্চাশ—একশ' টাকা পর্যন্ত দিতে চাইলে উমেশ। লোকটা অবিচলিত। কিছুতেই যাবে না সে। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল উমেশের।

"আমি মিলিটারির লোক জানিস !"

লোকটা নিরুত্তর।

"ইচ্ছে করলে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারি জানিস ?"

শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে লোকটা উত্তর দিলে—"আমি কিছুতেই যাব না।"

"দেখি তুই কেমন না যাস !"

উমেশ ঠিক করে ফেললে থানায় গিয়ে স্বয়ং দারোগাকে নিয়ে এসে এই

ত্যাঁদড় লোকটাকে যেতে বাধ্য করবে সে। থানায় দারোগাও মেজর ইউ, সি, চ্যাণ্ডার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না নিশ্চয়। থানা কিন্তু নদীর ঘাট থেকে প্রায় একক্রোশ দূরে। তা হোক—তবু যাবে সে। অন্য উপায়ও তো নেই। গট গট করে অন্ধকারে এগিয়ে গেল সে থানার দিকে।

…একটু পরে অন্ধকার নদীতীরে আর একজন এসে দাঁড়াল। শুধু পা, পরনে হাঁটু পর্যন্ত গুটানো খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। নবীন। তাকেও ওপারে যেতে হবে। কিন্তু খেয়া চলে গেছে। ছোট নৌকোর মাঝিটি যেন তারই অপেক্ষা করছিল।

"দাদাঠাকুর এলে নাকি ?"

নবীন এগিয়ে এল।

"কে, আরে বিশু যে হঠাৎ এখানে—"

"আমি এপারে মাছ ধরতে এসেছিলাম দাদাঠাকুর। মধুর কাছে শুনেছিলাম তুমি ওপারে গেছ সালিসির বৈঠকে। আমার সামনেই খেয়ার নৌকোটা গেল বেরিয়ে। ভাবলাম, একটু অপিক্ষে করে যাই, দাদাঠাকুর যদি এসে পড়েন, ফাঁপরে পড়ে যাবেন এই রাত্তিরে—"

"তা বেশ করেছিস্। চল্—"

"জান দাদাঠাকুর, এই একটু আগে এক ব্যাটা মিলিটারি এসে তম্বি শুরু করেছিল—"

গল্পটা বলতে বলতে নৌকো ছেড়ে দিলে সে।

নবীন ডাক্তার হতে পারেনি।

হয়েছিল দেশ-সেবক।

ঘটনা

আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়ি।

তখনও মড়া কাটা চলছে। হাত, পা, পেট, বুক হয়ে গেছে, গলা এবং মাথা বাকি। আমাদের নিয়ম ছিল কোন অংশ ব্যবচ্ছেদ করবার পূর্বে সেই অংশটির অস্থিগুলির সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞানার্জন করতে হ'ত। না করতে পারলে সেই অংশটি ব্যবচ্ছেদ করবার অনুমতি কর্তৃপক্ষরা দিতেন না। অস্থি-বিষয়ক একটা পরীক্ষা দিতে হ'ত—তাতে পাশ করলে তবে পার্ট পাওয়া যেত। গ্রের অ্যানাটমি

খুলে গলার কয়েকটা হাড় এবং মড়ার মাথা নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই তাই পড়তে বসেছিলাম সেদিন। ডাক্তার বসাক বড় কড়া পরীক্ষক, তাঁর কাছে ফাঁকি চলবে না। মড়ার মাথাটাও দিন দুই পরে মুন্না ডোমকে ফেরত দিতে হবে। কলেজের সম্পত্তি। বকশিশের লোভে লুকিয়ে আমাকে দিয়েছিল। মাথায় এমন অনেক পাতলা কাগজের মত হাড় আছে যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঠিক পাঠোপযোগী করা দুঃসাধ্য, সে সব হাড় তাই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। আমরা অনেকেই তা কিনতে পারতাম না। কলেজে প্রফেসারের পড়াবার জন্য অবশ্য একাধিক 'সেট' থাকত মুন্না ডোমের জিম্মায়। আমরা তাকে বক্‌শিশ দিয়ে সেই সব হাড় একদিন কিম্বা দু'দিনের কড়ারে মেসে নিয়ে এসে পড়তাম। মড়ার মাথাটা মুন্নাই দিয়েছিল। বেশী বড় নয়, ছোট্ট মাথাটি।

সেদিন পড়া আরম্ভ করবার আগেই কেন জানি না—রেণুকে মনে পড়ল। প্রায় বছর ছয়েক পূর্বে রেণু মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, রেণুর বাবা যোগেনবাবু কি একটা আপিসে চাকরি করতেন। কোথা থেকে যেন বদলি হয়ে এসে আমাদের প্রাতবেশী হয়েছিলেন অল্প কিছুদিনের জন্য। তখন আমরা পাটনায় থাকি—আমি সবে তখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছি। বয়স মাত্র পনের বছর। কিন্তু সেই বয়সেই বেশ মনে আছে রেণুর প্রেমে পড়েছিলাম। রেণুর বয়সও তখন দশ-এগারোর বেশি নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, রেণুও আমার প্রেমে পড়েছিল। কারণও ছিল একটু। যোগেনবাবু আমাদের স্বজাতি এবং পালটি ঘর ছিলেন, আমার সঙ্গে না কি রেণুর বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি বাবার কাছে। তাই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রেমের উদ্ভব হয়েছিল। একটু রোগা কালো ছিপছিপে ধরনের চেহারা ছিল রেণুর। ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ দু'টি। জানালার গরাদ ধরে সে প্রায়ই আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে থাকত, আমার সঙ্গে চোখো-চোখি হলেই পালিয়ে যেত। বিয়ের প্রস্তাব অবশ্য বেশি দূর এগোয় নি—বাবা আমল দেন নি বিশেষ। উপার্জনক্ষম না হলে ছেলের বিয়ে দেবেন না এই তাঁর মত ছিল। কিছুদিন পরে যোগেনবাবু বদলি হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। রেণুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ আর কোন সম্পর্ক রইল না। রেণুকে কিন্তু অনেকদিন ভুলতে পারিনি আমি। তার রোগা মুখের বড় চোখ দুটো অনেকদিন পর্যন্ত আমার মনে ছিল, পরে অবশ্য ভুলে গেছি। সেদিন পড়তে বসার আগে এবং অনেকদিন পর অকারণে রেণুকে মনে পড়ল আবার। কেন জানি না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। বেশিক্ষণ কিন্তু নয়। মিনিট দুই পরেই তোয়ালে কাঁধে শিবু-দা প্রবেশ করলেন। ঘর্মাক্ত কলেবর। ডন বৈঠক সেরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। বললেন, "আমি

স্লাইডটা পরীক্ষা করে দেখলাম হে। প্রচুর গনোককাস। ও ব্যাটাকে আর রাখা চলবে না—" বলেই বেরিয়ে গেলেন। সেদিন সকালে আমাদের মেসের ঠাকুরটা শিবু-দার হাতে মার খেয়েছিল খুব। আমরা সকালে স্নান করতে গেছি নীচের কলতলায়—শিবু-দা দেখি ঠাকুরটাকে ঠেঙাচ্ছেন।

কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন গনোরিয়া হয়েছে ব্যাটার।

মাধববাবু—(শিবু-দার সহপাঠি—তিনিও স্নান করছিলেন) বললেন—"গনোরিয়া হয়েছে আগে সেটা প্রমাণ কর। আগে থাক্‌তেই মারছ কেন ব্রাহ্মণকে—"

"গল গল করে পুঁজ বেরুচ্ছে—আর অন্য কি হবে। আচ্ছা একটা স্লাইড নিচ্ছি আমি—"

শিবু-দা একটা স্লাইডে পুঁজ মাখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফলটা আমাকেও জানিয়ে গেলেন। ঠাকুরটা যে দুশ্চরিত্র তাতে আর সন্দেহ রইল না।

বাজে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে পড়া শুরু করলাম। অনেক পড়তে হবে। রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত পড়লাম। তবু সবটা শেষ হল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে অ্যানাটমি বন্ধ করে মড়ার মাথাটা শেলফের উপর তুলে রেখে শুয়ে পড়তে হল। মনে ক্ষীণ আশা নিয়ে শুলাম যে ভোরে উঠে বাকিটা পড়ে ফেলতে পারব। আশা কিন্তু অতিশয় ক্ষীণ। কারণ আমি কোনদিনই ভোরে উঠতে পারি না। আমার রুম-মেট জিতেন রোজ আমাকে আটটার সময় টেনে তোলে। জিতেনও বাড়ি গেছে, সুতরাং ভোরে ওঠার আশা কম। তবু শুয়ে পড়লাম।

সেদিন কিন্তু খুব আশ্চর্য কাণ্ড হল—রাত দু'টোর সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। পাশের বাড়ির ঘড়িতে টং টং করে দু'টো বাজল স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি—কিছুতেই ঘুম আসে না। একবার মনে হল ঘুম যখন আসছে না তখন উঠে পড়তে আরম্ভ করি—কিন্তু কুঁড়েমি করে উঠতেও ইচ্ছে করছে না—উঠি-উঠি করে চোখ বুজেই পড়ে আছি বিছানায়। এমন সময় গাড়িবারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ পেলাম। মনে হ'ল কে যেন আমার ঘরের দিকে আসছে। আমার ঘরের কোণে প্রকাণ্ড একটি কুঁজোয় গ্লাস ঢাকা জল থাকত। শিবু-দা পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে জল খেতে আসতেন। আমরা থাকতাম দোতলায়। রাত্রে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ থাকত খালি—আমাদের সকলের ঘরের দরজা খোলা থাকত। মনে করলাম শিবু-দাই আসছেন বোধহয় জল খেতে। প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করছি এইবার কুঁজোর ভক্ ভক্ শব্দটা শুনতে পাব। কোন

শব্দ হল না। পায়ের শব্দটা যেন আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে থেমে গেল। কে এসেছে দেখবার জন্ত উঠে বসলাম। দেখি কলেজ স্কোয়ার থেকে এক ঝলক আলো এসে আমার দরজার-সামনে পড়েছে আর সেই আলোয় শ্বেতবসনা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলাম না যদিও কিন্তু সে যে মেয়ে তাতে সন্দেহ ছিল না। মনে হ'ল নির্নিমেষে আমারই দিকে চেয়ে আছে যেন।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"কে ?"

কথাটা উচ্চারিত হবামাত্র মেয়েটি ঘরের ভিতর ঢুকে অপর দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমার ঘরের সামনা-সামনি দুটো দরজা ছিল—একটা গাড়িবারান্দার দিকে আর একটা বাথরুমের দিকে। মনে হল মেয়েটি বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। ঠাকুরটা তার প্রণয়িনীকে ডেকে আনেনি তো! তৎক্ষণাৎ আলো জেলে অনুসরণ করলাম।

বাথরুমে কেউ নেই। সিঁড়ির দরজা খিল লাগানো। তেতলার ছাদে উঠে গেলাম সেখানেও কেউ নেই। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজলাম কোথাও কারও চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সিঁড়ির দরজা খুলে নীচে নেমে গেলাম। দেখি ঠাকুরটা নিজের ঘরে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ওঠালাম তবু তাকে।

"এই, কে এসেছিল এখন ?"

"কই, কেউ তো না বাবু।"

চোখ মিট মিট করে বিস্মিত ঠাকুর চেয়ে রইল আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হল সত্যিই সে কিছু জানে না।

আশ্চর্য! কোথা গেল মেয়েটা। স্বচক্ষে স্পষ্ট দেখলাম অথচ—। নানারকম ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল মড়ার মাথাটা। শূন্য অক্ষি-কোটর দুটো যেন নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে। গা ছম ছম করতে লাগল। শিবু-দার ঘরে গিয়ে তাঁর লেপের তলায় ঢুকে পড়লাম। শিবু-দা জিগ্যেস করলেন—"কে যতীন নাকি—"

"হ্যাঁ। ওঘরে ভয় কচ্ছে একা—"

শিবু-দা 'হুঁঃ' জাতীয় একটা শব্দ করে সরে শুলেন একটু।

ভোর হতে না হতেই মড়ার মাথাটা নিয়ে হাজির হলাম মুন্না ডোমের কাছে।

"এটার বদলে আর একটা মাথা দে আমাকে।"

তার নিজস্ব বাঁকা বাংলায় মুন্না বললে—"কেন বাবু, এ তো বেশ ভাল স্কাল্ আছে। আপনাদের জন্তে আলিদা বানিয়ে রেখেছি—"

"প্রফেসার যেটা থেকে পড়ান সেইটে দে আমাকে।"

"উ হোবে না বাবু। নির্মলবাবুকে উঠো দিয়েছিলাম। সাহেব কি করে টের পেয়ে গেলেন। হামার পাঁচ টাকা জোরমানা করে দিলেন। একটা ফিমেল বডি থেকে তাই এ মাথাটা আপনাদের জন্যে আলিদা বানিয়ে রেখেছি—"

"ফিমেল বডি থেকে ?"

"হাঁ বাবু। মোটর একসিডেন্টের একটা বেওয়ারিশ বডি মর্গে এসেছিল—তাই থেকে বানিয়েছি—"

চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

মুন্না বলতে লাগল—"খুব মেহন্নত্‌সে ভাল করে বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। মার্কিং তো খুব ভাল আছে বাবু—"

"না, এটা চাই না, আর একটা দে—"

দাঁত বের করে মুন্না বললে—"আর একঠো টাকা লাগবে বাবু। খুবি জরুরৎ হুজুর—"

সেলাম করলে একবার।

"আচ্ছা দেব। এটা বদলে দে তুই।"

মুন্না ডোম আর একটা মাথা বার করে দিলে।

পরীক্ষায় যথাসময়ে পাশ হলাম—পার্ট পেলাম।

মাসখানেক পরে মায়ের চিঠি এল একটা।

নানা কথার পর মা লিখেছেন—"রেণুকে মনে আছে তোর ? আহা বেচারীর কি শোচনীয় মৃত্যুই হয়েছে। কোলকাতায় কোথায় নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল তার। যোগেনবাবু তাঁর অফিসের একজন লোকের সঙ্গে তাকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। কথা ছিল যোগেনবাবুর এক বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠবে। সেখানেই তাকে বরপক্ষের লোকেরা দেখতে আসবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই পারেনি বেচারী। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল, মোটরে মোটরে ধাক্কা লাগে। রেণু এবং সেই লোকটি দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশে তাদের নাকি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। রেণু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, অপর লোকটি দশদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন, তারপর ক্রমশ ভাল হন। রেণু বেচারীর সৎকার পর্যন্ত হয় নি—ডোমেরা নাকি ফেলেছে। যোগেনবাবু চিঠি লিখেছেন, তুই যদি একটু খোঁজ করিস—"

চিঠিটা পেয়ে চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। রেণুর মুখখানা মনের উপর ফুলে উঠল আবার।

বিবেকী শিবনাথ

সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবনাথ বিপদে পড়িয়া গেল। কলেজের অধ্যাপক ও সহপাঠিগণের প্রশংসা তাহাকে যে স্বর্গে তুলিয়াছিল পাশ করিবার পর সে স্বর্গ হইতে তাহার পতন হইল। অর্থাৎ কলেজ জীবন শেষ হইয়া গেল। এম. এ. পড়িবার সঙ্গতি ছিল না, সার্থকতাও নাই। বাবার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে। অবিলম্বে উপার্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপার্জন মানে, চাকরি কিম্বা 'বিজনেস'? 'বিজনেস' নামক ইংরাজী শব্দটি আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলের মানসলোকে যে মায়াজগতের ছবি ফুটাইয়া তোলে, যাহার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি মাড়োয়ারির ঐশ্বর্যে, ভাটিয়াদের লক্ষ্মী-শ্রীতে, পার্শিদের চাকচিক্যে, কচ্ছিদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে, গুজরাটিদের মহিমাচ্ছটায় তাহা শিবনাথকেও প্রলুব্ধ করিয়াছিল। তাহার অধ্যাপকবর্গের সুপারিশের জোরে এবং তাহার শ্বশুরের প্রাণপণ চেষ্টায় সে একটা স্কুল মাস্টারি জোগাড় করিতে পারিয়াছিল বটে কিন্তু বেতন মাত্র পঞ্চাশ টাকা শুনিয়া সে পিছাইয়া আসিল। ঠিক করিল 'বিজনেস'ই করিবে। কিন্তু কি 'বিজনেস'?

শিবনাথ ছেলেটি ধীমান এবং বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। ধীমান বলিয়াই সে স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায়টি পত্তন করিয়াছিল কিন্তু বিবেকই শেষ পর্যন্ত তাহার সর্বনাশ করিল।

শিবনাথ ভাবিয়া দেখিল যে দুধ জিনিসটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পরিচিত প্রত্যেক পরিবারই প্রত্যহ কিছু না কিছু দুধ কিনিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা কিনিয়া থাকেন তাহা দুধ নয়, জল। সে যদি চেনা-শোনা প্রত্যেক পরিবারে খাঁটি দুধ সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে যুগপৎ দেশের ও নিজের কাজ করা হয়। অনুসন্ধান করিয়া সে দেখিল যে একটু চেষ্টা করিলে সে এই শহরে প্রত্যহ একমণ দুধ অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারে। গ্রাজুয়েট শিবনাথ দুধের ব্যবসা করিতেছে শুনিয়া অনেক ভদ্রলোকই তাহাকে 'ব্যাক' করিতে রাজী হইয়া গেলেন। শহরে দুধ টাকায় দেড় সের। শিবনাথ দেহাতে গিয়া সেখানকার গোয়ালাদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিল যে টাকায় আড়াই সের দরে প্রত্যহ একমণ দুধ পাওয়া সম্ভব। তাহারা সামনে দুহিয়া দিতে রাজী আছে। ওই দুধ শহরে দেড় সের দরে বিক্রয় করিলে অঙ্ক কষিয়া শিবনাথ উপলব্ধি করিল যে, ঠিকমত চালাইতে পারিলে খরচ-খরচা বাদ দিয়াও তাহার মাসে প্রায় দুই শত টাকা আয় হইবে। শিবনাথ লাগিয়া পড়িল। অর্থাৎ দৈনিক দুইটাকা বেতন দিয়া সে একটি চাকর রাখিল এবং দুইখানি 'মান্থলি' টিকিট খরিদ করিয়া ফেলিল। যে দেহাত হইতে

দুধ আনিতে হইবে তাহা শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরে। পনর মাইল ট্রেনে গিয়া এবং পাঁচ মাইল বাইক করিয়া সেস্থানে পৌঁছিতে হয়। সেখানকার গোয়ালারা দুধ দোহন করে ভোর পাঁচটায়। সেই সময় সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে হইলে রাত্রি দুইটায় যে ট্রেনটা ছাড়ে সেই ট্রেনে প্রত্যহ যাইতে হইবে। সকাল সাতটায় ফিরিবার ট্রেন আছে। সামনে দুধ দোহাইয়া তাহা লইয়া অনায়াসে ফেরা যাইতে পারে। অঙ্কে কিন্তু একজায়গায় ভুল হইয়াছিল। এলার্ম ঘড়িতে যে ঘুম ভাঙিবে না তাহা শিবনাথ কল্পনা করে নাই। চাকরটা অবশ্য স্টেশনে গিয়া শুইত এবং প্রত্যহ ট্রেন ধরিত। কিন্তু সদ্য-বিবাহিত শিবনাথের পক্ষে রোজ স্টেশনে গিয়া শোওয়া সম্ভবপর হইল না। সুতরাং ভুটকাই রোজ দুধ আনিতে লাগিল। খরিদ্দারগণ নিয়মিতভাবে দুধ পাইতে লাগিলেন, কিন্তু শিবনাথের মনে সন্দেহ জাগিল। যাহা সে খাঁটি বলিয়া চালাইতেছে তাহা ঠিক খাঁটি তো! ভুটকাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেই সে পা ছুঁইয়া এমন সব কঠিন শপথ উচ্চারণ করিতে থাকে যে শিবনাথ আর বেশি কিছু বলিতে পারে না। ক্রেতাদের মধ্যে খুব যে একটা আলোড়ন হইল তাহাও নয়। তাঁহারা আজীবন জুয়াচুরিতেই অভ্যস্ত। শিবু যে অদ্ভুতরকম কিছু একটা করিয়া ফেলিবে এ আশা কেহ করেন নাই। তাঁহারা গোয়ালার জোলো দুধ যে মূল্য দিয়া পান করিতেছিলেন শিবুর জোলো দুধও সেই মূল্যে পান করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলোড়ন জাগিল কিন্তু শিবুর মনেই। তাহার বিবেক তাহাকে বলিল, খাঁটি দুধের নামে জোলো দুধ বিক্রয় করিয়া অন্যায় করিতেছ। ঠিকমত খাঁটি দুধ যদি সরবরাহ করিতে না পার, এলার্ম ঘড়িতে যদি কিছুতেই তোমার ঘুম না ভাঙে, ব্যবসা উঠাইয়া দাও।

তাহাই করিল। সে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট গিয়া অকপটে সমস্ত কথা ব্যক্ত করত দুগ্ধ ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ব্যবসাটা চালাইতে লাগিল ভুটকা।

শিবনাথের এই ব্যবহারে ক্রেতাদের মধ্যে কেহ বিস্মিত হইলেন, কেহ বিদ্রূপ করিলেন, কেহ উপদেশ দিলেন। মুগ্ধ হইলেন কেবল একটি লোক। তিনি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। তাঁহারই চেষ্টায় এবং সুপারিশে শিবু ইহার কিছুদিন পরে পুলিশ লাইনে ঢুকিবার সুযোগ পাইল। সে সানন্দে দারোগা হইবার জন্য ট্রেনিং লইতে চলিয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি শিবনাথ ছোকরাটী বিবেকী। অপবিত্র পুলিশ লাইনে একটা পবিত্র আদর্শ-স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া সে সত্যই পুলকিত হইয়া উঠিল!

প্রথম থানার চার্জ পাইবার সপ্তাহ খানেক পরে শিবনাথ উপর-ওলার নিকট হইতে একটি জরুরি পত্র পাইল। তাহার এলাকায় কোন জমিতে কত ফসল

হইয়াছে তাহার একটি নিখুঁত বিবরণী যত শীঘ্র সম্ভব সদরে দাখিল করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, বৃষ্টিপাত কত ইঞ্চি হইয়াছে, বৃষ্টিপাতের প্রভাব বর্তমান ফসলের উপর কিরূপ জল সেচনের কোথায় কি কি বন্দোবস্ত আছে, এসব খবরও দিতে হইবে। থানায় বৃষ্টি মাপিবার যন্ত্র ছিল না। যন্ত্রটি পাঠাইয়া দিবার জন্য একটি পত্র লিখিয়া শিবনাথ টুরে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এলাকা দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল প্রস্থে কুড়ি মাইল। এই ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি জমি মাপিতে হইবে এবং কোথায় কোন ফসল কিরূপ হইয়াছে তাহার ফর্দ করিতে হইবে। বিবেকী শিবনাথের মনে হইল গভর্ণমেণ্টের স্ট্যাটিস্টিকস এই সব হইতেই প্রস্তুত হয় সুতরাং ভুল থাকিলে চালবে না।

মাস দুই উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া শিবনাথ জরিপ শেষ করিল এবং একটি নির্ভুল বিবরণী প্রস্তুত করিয়া থানায় ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। দেখিল সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতেছে।

"আপনি কে!"—বিস্মিত শিবনাথ প্রশ্ন করিল।

"আমি এই থানার দারোগা।"

"বলেন কি! এ থানার দারোগা তো আমি।"

"ও আপনিই শিবনাথবাবু? আপনার তো আর চাকরি নেই। আমি আপনার জায়গায় এসেছি।"

"চাকরি নেই! কেন?"

"আপনি এতদিন ছিলেন কোথায়? ওপর থেকে রিমাইনডার আসছে ক্রমাগত, আপনার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দুটো খুন হয়ে গেছে এ এলাকায়, চুরি হয়েছে পাঁচটা, আপনার কোনও পাত্তা নেই। এস. পি. টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করেও আপনার জবাব পান নি। চাকরি থাকবে কি করে। আপনি ছিলেন কোথা বলুন তো?"

শিবনাথ সমস্ত ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া প্রৌঢ় দারোগাবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আপনি নিজে জমি মেপে বেড়াচ্ছিলেন? উফ্"—হাঁটু চাপড়াইয়া আবার তিনি হাসিতে লাগিলেন।

"এর থেকে স্ট্যাটিসটিক্স্ তৈরী হবে কি না তাই ভাবলাম নিজে দেখে ঠিক ফিগারগুলো দেওয়া উচিত।"

"গবর্ণমেণ্টের এই সব স্ট্যাটিস্টিক্সের ফিগার কারা দেয় জানেন?"

"কারা ?"

"চৌকিদারের বৌয়েরা। আমরা ফরমাস করি চৌকিদারদের, আমার বিশ্বাস, তারা খবরটা সংগ্রহ করে তাদের বৌয়েদের কাছ থেকে। আমরা সেটা টুকে পাঠিয়ে দিই আগের দু'তিন বছরের ফিগারের সঙ্গে 'কম্পেয়ার' করে। আপনি নিজে জমি জরিপ করতে গেছেন ?"

দারোগাবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিবনাথ অপ্রস্তুত-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই তীরে

শতজীর্ণ বাড়িটা। তবু কিন্তু চিনতে পারলাম। উঠোনে ঘাস গজিয়েছে। অধিকাংশ ঘর পড়ে গেছে। দক্ষিণ দিকের ঘরেই আলো জ্বলছে দেখলাম। এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। ঘরের কপাট নেই, ঝাঁপ রয়েছে একটা। কেরোসিনের ডিপে জ্বলছে ঝাঁপের ভিতর দিয়েই দেখতে পেলাম।

"কেউ আছ এখানে ?"

"কে ?"

"আমি।"

ঝাঁপ খুলে বেরিয়ে এল সে।

"বিধুর কেউ আছে এখানে ?"

"আমি তার স্ত্রী।"

আমার বয়স তখন যদিও পঞ্চাশ তবু মনটা দুলে উঠল। বুড়ির মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। পলিত কেশ, দাঁত নেই, মুখময় বলি-রেখা, কোটরাগত চক্ষু। তবু তার দিকে চেয়ে দ্রুততর হ'য়ে উঠল হৃৎস্পন্দন। অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। এই সেই ? চকিতে মানসপটে একটি ঢলঢলে মুখের আভাস যেন ভেসে উঠল। উঠেই মিলিয়ে গেল আবার। পল্লীগ্রামের ঝিল্লীমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষত করে পেচকের কর্কশ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল সহসা।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—"বাড়ির পিছনে বিধু যে তালগাছটা লাগিয়েছিল সেটা এখনও আছে কি ?"

আমার আকস্মিক অভ্যাগমে এবং অদ্ভুত আলাপে এমনিই একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল সে। এই প্রশ্নে আরও একটু হ'ল। একটু চুপ করে থেকে বললে,

"আছে! বছর দুই আগে ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। বেঁকে চুরে বেঁচে আছে তবু এখনও।"

বারান্দা থেকে নেমে খিড়কি দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ির পিছনের পুকুর ধারে। দেখলাম ন্যুব্জদেহ তালগাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো।

ফিরে এসে বললাম, "আচ্ছা চললাম আমি।"

"কে তুমি পরিচয় তো দিলে না। হঠাৎ এলে, হঠাৎ চলে যাচ্ছ—"

"আমি? আমি বিদেশী একজন। বিধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। এই নাও।"

গোটা কয়েক টাকা তার কম্পিত প্রসারিত হাতের উপর রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আর দাঁড়ালাম না। সোজা চলে এলাম বিয়ে বাড়িতে।

আমার বাল্যবন্ধু যতীনের ছেলের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যখন এসেছিলাম তখন কল্পনাও করিনি যে এই সোনাপুর গ্রামে এসে বিস্মৃতির যবনিকা এমনভাবে স'রে যাবে। স'রে যাওয়া যে সম্ভব তা-ও ভাবিনি কখনও। অসম্ভব কিন্তু ঘটল। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়ি চড়ে কিছুদূর এসেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মনে হ'ল এ সব যেন আমার চেনা। কিছুদূর গিয়েই সেই বিরাট বটগাছটা আছে, তারপর একটু গিয়েই বাঁ হাতেই আছে একটা পুকুর—পদ্ম-দীঘি—তার পাড়ে আছে বুড়ো শিবের মন্দির। ঠিক মিলে যেতে লাগল। সোনাপুর গ্রামের সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠল তার সামনে। মাখন তেলির বাড়িটা, কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে—সব।

•

"তুমি এসেই কোথা ডুব মেরেছিলে বল তো হে", যতীন প্রশ্ন করলে। বিয়ে বাড়ি থেকে হঠাৎ আমার অন্তর্ধানে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

"গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখছিলাম"—অবিশ্বাস্য সত্য কথাটা বলতে পারলাম না।

"এই রাত্রে? আচ্ছা সখ তো। অন্ধকারে পথ চিনলে কি করে?"

"টর্চ ছিল।"

এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে কন্যাপক্ষীয় একটি যুবক বললেন—"কাল সকালে সব দেখিয়ে আনব আপনাকে। সেকেলে গড় আছে এখানে একটা। আরও দ্রষ্টব্য জিনিস আছে কিছু কিছু। যেমন ধরুন…"

দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকা বলে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছিল না। বিধুর স্ত্রীর চেহারা আর কথাগুলোই মনে হচ্ছিল আমার বারবার।

"বংশে তো কেউ বেঁচে নেই। নিজের কাজ করবার সামর্থ্যও গেছে। ভিক্ষে করি, কি আর করব।"

অথচ আমি এখন লক্ষপতি।

•

সেই গুহাটা ভেসে উঠল মানস-পটে। আর সেই সাধুর চোখ দুটো।···সে অনেক দিনের কথা। তখন আমি স্কুলে পড়ি। একদিন শুনলাম গঙ্গার ধারের গুহাটায় একজন সাধু এসেছেন। তখন জটাধারী সাধু-মাত্রকেই ভণ্ড বলে মনে করা শিক্ষিত সমাজের রেওয়াজ ছিল। সুতরাং খবরটা শুনে বিশেষ বিচলিত হইনি। তাঁকে দেখতে যাবার প্রবৃত্তিও হয়নি। অশিক্ষিত জনতা অবশ্য ভীড় করে তাঁকে দেখতে যেত। একদিন শুনলাম সাধুর নাকি অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তবু আমি যাইনি। আমি বোর্ডিংয়ে থাকতাম, বোর্ডিংয়ের দু-চারজন ছেলে গেল, আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে হল না তবু। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একদিন অপ্রত্যাশিত-ভাবে। সেদিন রবিবার। গঙ্গার ধারে লুকিয়ে মাছ ধরতে গেছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম জটাধারী সাধু স্নান করছেন। মনে হ'ল সেই-সাধুই বোধ হয়। স্নান করতে করতে সাধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দু-একবার চাইলেন আমার দিকে। যদিও অস্বস্তি হচ্ছিল তবু আমি বসেই রইলাম।

স্নান শেষ করে আমার দিকে ফিরে সাধু বললেন, "উঠে আয়—"

আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।

গুহার ভিতর ঢুকে সাধু আমার দিকে ফিরে বললেন, "পূর্বজন্মের সুকৃতির জোরে তেলি থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছিস। মাছ ধরছিস কেন? পরের জন্মে জেলে হবার সখ হয়েছে নাকি।"

"তেলি ছিলাম?"

"হ্যাঁ, পূর্বজন্মে তুই সোনাপুর গ্রামে তেলি ছিলি। তোর নাম ছিল বিধু, তোর বাপের নাম ছিল মাখন।"

হেসে ফেলেছিলাম মনে পড়ছে।

দুর্লভ

রাজকন্যা ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করবেন।

তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে রাজ্যে বিপুল সাড়া পড়েছে। রাজা-রাণী সেনাপতি পাত্র-মিত্র প্রজাবৃন্দ সকলেই এই শুভদিনটিকে সার্থক করবার আগ্রহে আকুল হয়ে উঠেছেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বসবে সভা। এই বিশেষ দিনের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণীয় ক'রে তুলতেই হবে। জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রার আয়োজন হবে সর্বত্র। বিচিত্র-বর্ণদীপ্ত আলোকোৎসবের জল্পনা চলছে সারা দেশ জুড়ে। সজ্জিত হবে গ্রাম, অলঙ্কৃত হবে নগরী। নানাবর্ণের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দশদিক। লক্ষ লক্ষ আতসবাজী মূর্ত ক'রে তুলবে রাজকন্যার যৌবনশ্রীকে বিস্ময়কর উর্ধ্বোৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে।

ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা হবে অমিত প্রাচুর্যে। দীনদুঃখীরা পাবে মিষ্টান্ন, পরিধেয়, পুরস্কার। সম্মানিত হবেন পূজনীয়গণ। সর্বশ্রেণীর পুরবাসীগণের অপরিমেয় আনন্দ লাভের আয়োজনে উন্মুক্ত থাকবে রাজকোষ।

কবিরা রচনা করবেন কাব্য, চিত্রকর খুলে বসবে রঙের পসরা। মুখরিত হয়ে উঠবে গায়কের কণ্ঠে সপ্তস্বর, বাদকের হস্তে বাদ্যযন্ত্র। হর্ম্য-শিল্পী, পথ-শিল্পী, আলোক-শিল্পী, সভা-শিল্পী আমন্ত্রিত হবেন সকলেই। প্রতিভার উৎসমুখ হবে অবারিত। অর্থসচিব আশ্বাস দিয়েছেন উদ্দীপ্ত প্রতিভার মর্যাদা রক্ষিত হবে রাজকীয় বদান্যতার অকুণ্ঠিত ঔদার্যে।

রাজকুমারীর জন্মদিনটি রূপে রসে রঙে সার্থক হয় যেন।

রাজ-অন্তঃপুরের একটি বিশেষ কক্ষে ছোট একটি মন্ত্রণা সভা বসেছে। রাজকন্যাকে সেদিন যে হার উপহার দেওয়া হবে সভার আলোচ্য বিষয় তাই।

রাজকবি ও রাজশিল্পী পরামর্শ করে ঠিক করেছেন হারটি হবে সূর্য-হার। ষোলটি সুবর্ণ-সূর্য গাঁথা থাকবে সাতনরী রত্নহারে। রাজ্যের ষোলজন বিখ্যাত কবি এই উপলক্ষে রচনা করবেন ষোলটি দ্বিপদী। সেগুলি লেখা থাকবে প্রত্যেকটি স্বর্ণ-সূর্যের উপর বিচিত্র বর্ণ রত্ন-অক্ষরে। নিযুক্ত হবেন ষোলজন নিপুণ শিল্পী—প্রত্যেকে প্রস্তুত করবেন এক একটি স্বর্ণ-সূর্য।

মন্ত্রী বললেন—এত কাণ্ড এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে উঠবে কি? মৃদুহাস্য করে উত্তর দিলেন অর্থ সচিব—দক্ষিণার কার্পণ্য করব না আমরা, সম্ভব হবে নিশ্চয়ই।

রাজকবি ও রাজশিল্পীর এ পরিকল্পনা সমর্থন করলেন সবাই। একটি বিষয়ে কেবল মতভেদ হল দুজনের। হারের মধ্যমণি কি হবে? রাজকবির মতে হীরক নির্মিত একটি শঙ্খ হওয়া উচিত। রাজ-শিল্পীর মতে পদ্মরাগ মণির তৈরি একটি পদ্ম হলেই বেশি মানাবে।

ধৈর্যসহকারে উভয় পক্ষের যুক্তি শ্রবণ করে রাজা বললেন—রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন। তার যা পছন্দ তাই হোক।

রাজকন্যা ছিলেন সে সভায়। আনত-নয়নে শুনছিলেন সব। পিতার কথায় আরক্তিম হয়ে উঠল তাঁর কর্ণমূল।

রাজকবি বললেন—আপনার কি ইচ্ছা বলুন রাজকন্যা।

রাজশিল্পী বললেন—হাঁ, বলুন।

ক্ষণকাল নীরব থেকে রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা একটু অন্য রকম—

কি বলুন—সমস্বরে বলে উঠলেন কবি ও শিল্পী।

রাজকন্যা বললেন—আমার ইচ্ছা রত্ন না দিয়ে আমার বাগানে যে চাঁপা গাছটি আছে তারই একটি ফুল ঝুলিয়ে দেওয়া হোক মাঝখানে—

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কেউ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাজা শেষে বললেন—বেশ তাই হোক।

নির্দিষ্ট দিনে সমস্ত রাজ্য মেতে উঠল উৎসবে।

নগরে গ্রামে জয়ধ্বনি-মুখরিত শোভাযাত্রা বেরুল আনন্দ কলরবে, ভাট-বৈতালিক-গায়কগণ নিজেদের অন্তর উজাড় করে দিলেন বিবিধ বন্দনার বিচিত্র সুরে। তোরণে তোরণে বাজল নহবৎ, মণ্ডপে মণ্ডপে বসল সভা। নৃত্যপরা হলেন নর্তকী, অভিনয় করলেন নট, প্রশস্তি পাঠ করলেন পুরোহিত, ছন্দে ভাবে বিগলিত হলেন কবি। আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল অভাব-মুক্ত দরিদ্রগণ, আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন পূজনীয়বর্গ। পথে ঘাটে নদীতে প্রান্তরে পর্বতে সমুদ্রে মূর্ত হয়ে উঠল রাজৈশ্বর্যের অনবদ্য মহিমা-লীলা?

সূর্যহারের প্রত্যেকটি সূর্য জলজল করে উঠল বিচিত্র শিল্পীদের অক্লান্ত চেষ্টায়।

একটি জিনিস কিন্তু হ'ল না। চাঁপা ফুলটি ফুটল না। কারণ অর্থের লোভে বা প্রয়োজনের তাগিদে ফুল ফোটে না। ফোটে সময় হ'লে আপন খুশিতে।

গভীর রাত্রি।

পূর্ণিমার আলোয় আকাশ বাতাস স্বপ্নাতুর। থেমে গেছে জনতার কোলাহল,

নিষ্প্রভ হয়ে গেছে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর। ধীর মন্থর পদে রাজকুমারী এসে বসলেন চাঁপা গাছটির তলায়। অঙ্গে নেই অলঙ্কারের ঝনৎকার, সাধারণ কাপড় পরা, সাধারণ মেয়ে যেন। সামান্য উদ্ভিদটি তুচ্ছ করেছে সমস্ত ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে আজ। রাজকন্যা ভিখারিণীর মতো এসে বসলেন গাছতলায়। ধীরে ধীরে মাথা নত হ'ল, নিমীলিত হল আঁখি-পল্লব! উদ্ভিদের নিগূঢ় সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাটি মেলাবার আকুল আগ্রহ স্তব্ধ করে দিলে তাঁর বাইরের চাঞ্চল্যকে। স্তব্ধ হয়ে নতশিরে বসে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কতক্ষণ তা খেয়াল নেই। টুপ করে উপর থেকে কি যেন পড়ল। চেয়ে দেখেন কোলের উপর পড়ে আছে একটি চাঁপা ফুল।

বিশুদ্ধ কৌতুক

পৃথিবীর বহু জিনিস ঠেলা যায় না (এই যেমন ধরুন হিমালয়), বন্ধুবর পরিমলের অনুরোধও তেমনি আমার পক্ষে ঠেলা কঠিন! তাঁহারই অনুরোধে একটি বিশুদ্ধ কৌতুকরসের গল্প আপনাদের প্রীত্যর্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

…বেশী দিনের কথা নয়। সেদিন চমৎকার দখিনা হাওয়া বহিতেছে, হাতেও বিশেষ কাজকর্ম নাই, দিবানিদ্রাটি বেশ মনোমত হইয়াছে, বেড়াইতে বাহির হইলাম। কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া সবে সিগারেটটি ধরাইয়াছি এমন সময় লোকটি আসিয়া হাজির হইল। চেহারাটি চমৎকার, সাজসজ্জাও মনোরম। পরিধানের গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে পাম-শু, অনামিকায় পাথর-বসানো আংটি। পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ঈষৎ কাত হইয়া পানের পিচটি ফেলিয়া মৃদু হাসিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আমাকে কিছু 'হেল্‌প' করতে পারেন সার? বেশী নয়, গোটা পাঁচেক টাকা। বড় বিপদে পড়ে গেছি—"

এইবার গল্প সুরু হইয়া গেল।

গম্ভীরভাবে বলিলাম,—"মাপ করবেন।"

"আপনার কাছে পাঁচটা টাকা নেই?"

"আছে কিন্তু দেবো না। কারণ আপনাকে দেখে দরিদ্র বলে মনে হয় না।"

"এককালে বড়লোক ছিলাম, এসব তারই চিহ্ন। বাইরের পোশাক দেখে আমাকে বিচার করবেন না সার। এখন সত্যিই আমি গরীব।"

"আপনি যে মিথ্যে কথা বলছেন না তার প্রমাণ কি ?"

"আমার বাড়ি গিয়ে দেখে আসুন।"

"কোথায় আপনার বাড়ি ?"

"মেটিয়াবুরুজে।"

কেমন যেন রোখ চড়িয়া গেল।

"বেশ আপনি আমাদের মেসে গিয়ে অপেক্ষা করুন তা হলে। আপনার ঠিকানাটা দিন, সত্যিই যদি দেখি আপনার অবস্থা খারাপ, অবশ্যই সাহায্য করব।"

"কিন্তু মেটিয়াবুরুজ যেতে-আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে যে সার। আমি কতক্ষণ আপনার মেসে বসে থাকব! তার চেয়ে চলুন না আপনার সঙ্গে যাই।"

আমি যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আমার জবাব হইতেই বাছাধন সেটি টের পাইয়া গেলেন।

"আপনি যদি গুণ্ডা হন ? আমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে যদি কিছু করেন ? তখন ? সেটি হবে না ! আমাদের মেসে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।"

"কিন্তু আসতে যেতে বড্ড বেশী সময় লাগবে যে সার।"

"আমি ট্যাক্সি করে যাব আর আসব। বেশী দেরি হবে না।"

সত্যই আমার রোখ চড়িয়া উঠিয়াছিল।

* * *

কিছুদূর গিয়া ট্যাক্সি আর যাইতে চাহিল না। কারণ, যাইতে পারিল না। গলির গলি তস্য গলির পরও সঙ্কীর্ণতার গলি আর একটা ছিল। ট্যাক্সি সেখানে ঢুকিতে পারিল না। আমাকে নামিতে হইল। সেই আঁকা-বাঁকা অন্ধকার গলি বাহিয়া যতদূর পারিলাম গেলাম ; তাহার পর দেখিলাম আমিও আর যাইতে পারিতেছি না। সম্মুখে একটা রুদ্ধ দ্বার পথরোধ করিতেছে। কয়েকবার করাঘাত করিবার পর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইল। লণ্ঠন লইয়া এক বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিলেন।

"কি চান ?"

"ওয়ান-হানড্রেড-ফরটি-ফোর-বাই-থারটিন-এ কোন্ বাড়িটা হবে বলতে পারেন ?"

বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলিলেন না।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন,—"মুক্তেশ্বরের বাড়িটা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই দুটো বাড়ির পাশ দিয়ে যে সরু গলিটা গেছে সেইটে ধরে সোজা চলে গেলে একটা কাঠের গুদাম পাবেন, তার পিছনে ওর বাড়ি।"

নির্দেশ অনুসরণ করিতে-উদ্যত হইয়াছি এমন সময় বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "ইচ্ছে করেন তো ফেরবার পথে আর একবার দেখা করে যাবেন।"

কেন বলিলেন বুঝিলাম না। তবু প্রতিশ্রুতি দিলাম।

…কাঠের গুদামের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটু দিশাহারা হইয়া পড়িতে হইল।

"মুক্তেশ্বরবাবু বাড়ি আছেন? মুক্তেশ্বরবাবু—"

কয়েকবার এই ধরনের চীৎকার করাতে ফল ফলিল। গুদামের পশ্চাৎভাগ আলোকিত হইল এবং একটু পরেই কেরোসিনের ডিবা হস্তে প্রায়-উলঙ্গ একটি শীর্ণকায় বালক বাহির হইয়া আসিল।

"কাকে খুঁজছেন?"

"মুক্তেশ্বরবাবুকে।"

"তিনি বাড়িতে নেই।"

"কোথা গেছেন?"

"নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।"

"সে কি। কেন?"

"পাওনাদারের তাগাদার চোটে।"

(আপনাদের মনে কৌতুকরস সঞ্চারিত হইল বোধহয়!)

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?" বালকটি প্রশ্ন করিল।

আমি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম, সহসা কোনও জবাব দিতে পারিলাম না। সহসা দেখিতে পাইলাম, ছেলেটির পিছনে একটি নারীও আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং সম্ভবত লজ্জা নিবারণার্থেই বুকের সামনে একটা গামছা ধরিয়া আছেন। পরনের কাপড় শতছিন্ন।

"ওঁর কোনও বিপদ-টিপদ হয়নি তো?"

কম্পিত নারীকণ্ঠে এই উক্তি শুনিয়া আমি বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

"না। আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল, তাই খবর নিতে এসেছি।"

"আসুন।"

না গেলেই বোধহয় ভাল করিতাম! গিয়া দেখিলাম, একশত টাকার ধাক্কা। একঘর ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত, কাহারও অঙ্গে কাপড় নাই। দুইজন জ্বরে শয্যাশায়ী। কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। ক্ষীণভাবে একটু

অনুতাপ হইল। তখনই যদি পাঁচ টাকা দিয়া দিতাম, এত হাঙ্গামায় পড়িতে হইত না।

* * *

এই পর্যন্ত শুনিয়াও যদি আপনাদের মনে কৌতুক-সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর একটু শুনুন।

গলি হইতে বাহির হইয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃদ্ধের সহিত দেখা করিলাম এবং বলিলাম—"যা দেখলাম তা তো ভয়ঙ্কর মশাই।"

বৃদ্ধ মাত্র দুইটি কথা বলিলেন।

"সব সাজানো।"

"অ্যাঁ, বলেন কি।"

"আজকাল লোকে চালাক হয়েছে, চাইলেই ভিক্ষে দেয় না। ভিক্ষুকরাও চালাক হযেছে। আপনার মতো দু'একজন দযালু বিবেকী লোক খোঁজ-খবর নিয়ে ভিক্ষে দিতে চান। মুক্তেশ্বর তাই কতকগুলো রেফিউজিকে তার কাঠের গুদামের পিছনটায আশ্রয় দিযেছে আর শিখিয়ে রেখেছে যে, কেউ খোঁজ করতে এলে যেন বলে যে, দেনার দায়ে সে বিবাগী হয়ে গেছে।"

"বলেন কি?"

বৃদ্ধ স্বল্পভাষী। আর একটি কথা মাত্র বলিলেন।

"কোকেন।"

তাহার পর স্মিতমুখে কপাটটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

* * *

এখনও কি আপনাদের মনে কৌতুক উপজে নাই। যদি না উপজিয়া থাকে আসল ব্যাপারটা শুনুন তাহা হইলে। গল্প যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা গল্পই। আসল ঘটনা এই। লোকটি যখন দেখিল আমি কিছুতেই তাহাকে সাহায্য করিব না, তখন সে পকেট হইতে একটি হোললাইফ শেফার্স বাহির করিযা বলিল—"এই কলমটা রেখে তাহলে পাঁচটা টাকা দিন।"

বুঝিলাম চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিলাম না। নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম এবং মনে করিতে চেষ্টা করিলাম সকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। কলমটি সত্যই চমৎকার। ওই কলম দিয়াই আজকাল চোরা বাজারের বিরুদ্ধে চুটাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেছি।

গহিন রাতে

সেদিন ট্রেনটি লেটও ছিল। পুরন্দর টর্চ জালিয়া রিস্ট ওয়াচ দেখিল। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বেশ একটু কাতর হইয়া পড়িল। কেবল বিরহে নয়, দুই মাইল দীর্ঘ মাঠটির কথাও তাহার মনে পড়িল। এই রাত্রে একা অন্ধকারে ওই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা জানেনা যে সে যাইবে। শ্বশুর বাড়ির কর্তৃপক্ষকে সে ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই। বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যেও গোপন অভিসার করার মধ্যে একটু মজা আছে বই কি। তা ছাড়া তাহার শ্বশুর বাড়ির লোকগুলি কেমন যেন একটু কাঠখোট্টা বেরসিক গোছের। তাহারা ধনী এবং ভিতরে ভিতরে ক্রমশই আরও ধনী হইয়া উঠিতেছে এই তাহাদের একমাত্র পরিচয়। লেখাপড়ার ধার কেহ ধারে না। শ্বশুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও একটা দৈত্য যেন। বড় ওজনের আড়াই সের খাঁটি মহিষের দুধ প্রত্যহ হজম করেন। দাঁত একটিও পড়ে নাই। জুলফি এবং গুম্ফ সংযোগে মুখের উপর এমন একটা কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন যে স্বয়ং সিংহও তাহা দেখিলে ভড়কাইয়া যাইবে। তাহার পুত্রগুলিও (অর্থাৎ পুরন্দরের শালারা) পিতৃপথ অনুসরণ করিতেছেন। প্রত্যেকেরই বিদ্যা গ্রামের পাঠশালা পর্যন্ত। ডন কুস্তি লাঠি খেলার চর্চাই তাহারা অধিক পরিমাণে করিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই বড় বড় গোঁফ। বেশ বড় গৃহস্থ। হাজার বিঘা জমি আছে। কিন্তু বাহিরে কোনও বড়মানুষী চাল নাই। এরোপ্লেন কিনিবার সামর্থ্য রাখেন। কিন্তু মোটরটি পর্যন্ত কেনেন নাই। খান কয়েক মহিষের গাড়ী আছে। মহিষের গাড়ী ছাড়া অন্য কোনও প্রকার যান ওসব রাস্তায় অচলও।

পুরন্দর ঘড়ি দেখিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। ঘোর অন্ধকার। এখনও দুইটি স্টেশন বাকি। ব্রাঞ্চ লাইনেরও ব্রাঞ্চ লাইন এটি, ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ইহার নিকট শিশু, এই ধরনের দুই চারিটি অসংলগ্ন চিন্তা করিবার পর সুভদ্রার কথাই তাহার মনে স্থায়ী হইল আবার। সুভদ্রা নিশ্চয়ই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। হয়তো বাতায়ন পার্শ্বেই। বিবাহের পর সুভদ্রাকে সামান্য বাঙলা লেখাপড়া সে-ই শিখাইয়াছিল চিঠিপত্র লিখিবার জন্য। সুভদ্রার বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠিগুলি কি মধুর। এবার পুরন্দর এক কাণ্ড করিয়াছে। সহজবোধ্য কবিতায় চিঠি লিখিয়াছে সুভদ্রাকে। তাহার আসিবার খবরটি এমনকি তারিখটি সময়টি পর্যন্ত কবিতায় গাঁথিয়া দিয়াছে।

দিন কাটে হায় প্রিয়ে মিনিট গুণে।
যাইব গহিন রাতে আটাশে জুনে।

আর একবার সে হাত ঘড়ি দেখিল। হায় কবে সে যে সুভদ্রাকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিতে পারিবে! বি-এ পরীক্ষাটা পাশ করিয়া ফেলিতে পারিলে তাহার বাবা তাহাকে একটা চাকুরী নিশ্চয় যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, কারণ তিনি নিজে একজন বড় চাকুরিয়া। কিন্তু বি-এ টা সে কিছুতেই পাশ করিতে পারিতেছে না। আর বাবারও ধনুর্ভঙ্গ পণ উপার্জনক্ষম না হইলে কিছুতেই সুভদ্রাকে তিনি বাড়ি আনিবেন না। হস্টেল হইতে পালাইয়া কাঁহাতক আর এ ভাবে শ্বশুর বাড়ি আসা যায়।

স্টেশনে নামিয়া পুরন্দর দেখিল একটা বাজিয়াছে। দুই মাইল দুস্তর মাঠটি এইবার পার হইতে হইবে। স্টেশনের বাহিরে কোন প্রকার যানবাহনও নাই। সুতরাং হাঁটিয়া পার হইতে হইবে। টর্চটা অবশ্য আছে আর আছে ধ্রুবতারা সুভদ্রা। স্টেশন হইতে নামিয়াবেশ হন হন করিয়াই চলিতে সুরু করিয়া দিল সে।

…একাগ্র চিত্তে সুভদ্রার মুখ ধ্যান করিতেছিল বলিয়াই হউক কিম্বা তমিস্রার সূচীভেদ্যতার জন্যই হউক তাহার যে প্রাণ সংশয় হইয়া আসিয়াছে ইহার আভাস ঘুণাক্ষরে সে পূর্বে জানিতে পারিল না। পারিলে ছুটিত কিংবা চীৎকার করিতে পারিত। লাঠিটা হাতে লাগিয়া যখন টর্চটা পড়িয়া গেল তখন আর কিছু করিবার সময় ছিল না। কারণ পরমুহূর্তেই একজন তাহাকে পিছন হইতে ধরিয়া মুখটা বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর নিমেষের মধ্যে চার পাঁচ জনে মিলিয়া যে কাণ্ডটা করিল তাহা অর্থনীতির দিক দিয়া শোচনীয় তো বটেই মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও ভয়ানক। তাহার হাত ঘড়ি, সোনার আংটি, সোনার বোতাম, সিল্কের পাঞ্জাবী, এমন কি ধুতিটা পর্যন্ত তাহারা খুলিয়া লইল। লোকগুলি খুবই তৎপর। নিমেষের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

স্বপ্ন নয় তো? কিংকর্তব্যবিমূঢ় উলঙ্গ পুরন্দর এই ধারণাটাকে আঁকড়াইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইল। তাহার পর সহসা তাহার মনে হইল সময় নষ্ট হইতেছে। মুখে যে কাপড়টা বাঁধা ছিল তাহা খুলিয়া ফেলিল। বিস্তৃত করিয়া সেটাকে একটা গামছা বলিয়া মনে হইল। সেইখানা কোমরে জড়াইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। সুভদ্রার কাছে আবার লজ্জা কি!

সুভদ্রা বাতায়নপার্শ্বেই ছিল সম্ভবত। পুরন্দরের ফিস ফিস ডাকেই সাড়া দিল। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সুভদ্রার চক্ষু কপালে উঠিল।

"এ কি!"

"ডাকাতদের হাতে পড়েছিলাম। চট্ করে একখানা কাপড় নিয়ে এস দেখি। ছি, ছি। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে নিশ্চয়। দাদারা কোথায়, সব ভালো তো।"

"দাদারা বাড়ী ছিলেন না, তাঁরাও একটু আগে ফিরেছেন।"

"কাপড় আন আগে একখানা। উঃ কি কাণ্ড!"

পুরন্দর কথায় বার্তায় স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা করিতেছিল। সুভদ্রা বাহির হইয়া গেল এবং বারান্দায় দড়িতে যে কাপড়টা ঝুলিতেছিল সেইটাই পুরন্দরকে আনিয়া দিল।

কাপড়টা পরিতে গিয়া পুরন্দর বিস্মিত হইল।

"এ কি, এ কাপড় এখানে কোথা থেকে এল। এই কাপড় পরেই যে আমি এসেছিলাম! এখানে আসব বলেই সখ করে জরিপেড়ে শান্তিপুরীখানা কিনেছি একবার মাত্র ধোপার বাড়ি দিয়েছি, দেখি, আরে আমাদের ধোপার ছাপ রয়েছে"—

সুভদ্রার মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল।

"পর। পরে খেয়ে নাও। ওই তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে"—

"আরে কাপড়টা এখানে কি ক'রে এল তাই বল আগে।"

সুভদ্রার মুখভাব পরিবর্তিত হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে সে বলিল, "গোল করো না। এরা সবাই ডাকাতি করছে আজকাল। বাবা দাদা সবাই। আগে গুজব শুনতাম, এখন দেখচি সত্যি। তুমি খেয়ে থানায় চলে যাও।"

"সে কি।"

"এরা ভয়ানক লোক, যদি জানতে পারে যে, ওদের ভিতরের খবর তুমি জেনে ফেলেছ তাহলে খুন করে ফেলবে তোমাকে, এদের অসাধ্য কিছু নেই। পরশু যে খুনটা হয়ে গেছে তা এরাই করেছে বোধ হয়। তুমি চট্ করে খেয়ে থানায় চলে যাও। থানার রাস্তাটা চেন তো?"

"চিনি।"

"আর দেরী কোরো না তাহলে।"

থানায় উপস্থিত হইয়া প্রথমেই যাহা পুরন্দরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দারোগাবাবুর হাতে যে রিস্টওয়াচটি রহিয়াছে সেটি তাহারই। ব্যাণ্ডের উপর শখ করিয়া সে যে 'পি' অক্ষরটি লিখিয়াছিল সেটিও তাহার নজরে পড়িল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করিয়া বলে—ওরে হারামজাদা চোর, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "ধর্মাবতার"! সে হাত জোড় করিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।*

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

তার কথা

তার কথা মনে হ'লে এখনও দুঃখ হয় আমার। মনে হয় যদিও আমরা নিজেদের সভ্য বলে আস্ফালন করি (ওই আস্ফালনটার মধ্যেই অসভ্যতা নিহিত নেই কি ?) তবু আমরা এখনও ঠিক—মানে, এখনও আমরা গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে ফুলদানি সাজাই এবং পরের দিন যখন সেটা ফেলে দিই তখন একটুও দুঃখিত হই না।

…তার কথা মনে হলে—'তার কথা' বলছি, কারণ ওই শবদেহটা সে নয় —সে চলে গেছে। এসেছিল চলে গেছে। ফুলের দল যে দেশ থেকে আসে এবং এসেই চলে যায় সেই দেশেরই লোক সে। পথ ভুল করে এসেছিল, এসেই চলে গেছে। ওই সব দেহটা 'সে' নয়, ওটা তার বাসা ছিল। আমি, অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার একজন, আমি বলছি যে ওটা বাসা মাত্র। ওটা ছোট জানালা একটা, যার সামনে সে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্ষণকালের জন্য।

…আমার ডাক্তারি জীবনে এ কথাটা আরও বহুবার মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আজ মনে হচ্ছে।…ডাক্তার হিসেবেই প্রথম পরিচয় আমার সঙ্গে। তখন আমি প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। (সরকারী ডাক্তারদের একাধারে সবরকমই হতে হয়, কখনও প্যাথোলজিস্ট, কখনও ধাত্রী-বিদ্যা-পরঙ্গম, কখনও সার্জন, কখনও চক্ষু-বিদ্যাবিশারদ, কখনও কেরানী, কখনও অ্যানিস্থেটিস্ট, কখনও সিভিল সার্জন !) প্যাথোলজিস্ট হিসাবেই প্রথম পরিচয় তার সঙ্গে। সে আমার কাছে রক্ত পরীক্ষা করাবার জন্যে এসেছিল। যে চিকিৎসকটি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন ওর রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে কি না। আমরা, মানে ডাক্তারেরা যখন হালে পানি পাই না, তখন সিফিলিস সন্দেহ করি। রোগী বা রোগিনীর অস্বীকৃতিকে অবিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি আতুর মাংসপিণ্ডটার চিরন্তন দুর্বলতার উপর। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব, সংযম বা শ্লীলতা থাকতে পারে এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে মানা। আমরা সেটা যাচিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই—তাও হই না অনেক সময়, কারণ আমাদের কষ্টিপাথরটাও নিখুঁত নয়।

তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কারণ এত রূপ সচরাচর দেখা যায় না। খুব যে ফরসা ছিল তা নয়। কিন্তু তার আঁখিপল্লবে, গ্রীবাভঙ্গীতে, তনুদেহের লাবণ্যলীলায় এমন একটা সলজ্জ মাধুরী ছিল যা দুর্লভ। বর্ণ, ছন্দ এবং লালিত্যের

এমন সমন্বয় চোখে পড়েনি আমার কখনও। ক্ষুব্ধ হলাম সে বাইজি শুনে। স্বচ্ছ জলটা ঘোলা হয়ে গেল যেন সহসা। রক্ত নিলাম। পরীক্ষা করে যা পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে আগে থাকতেই নিঃসংশয় হয়েছিলাম। পরীক্ষা করে কিন্তু সংশয় কমল না। বাড়ল। রক্তে সিফিলিসের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না! বিস্মিত হলাম একটু। কিন্তু তা ক্ষণকালের জন্য! পরমুহূর্তেই মনে পড়ল—আমাদের পরীক্ষা-গুলোও তো খুব নির্ভরযোগ্য নয়। সিফিলিস নিশ্চয়ই। হয়তো—। খানিকটা 'সিরাম' বেশী ছিল, আবার পরীক্ষা করলাম। আবার নেগেটিভ হল। সব চেয়ে বিস্মিত হলাম সে যখন রিপোর্ট নিতে এল। রক্তে সিফিলিসের বিষ পাওয়া যায় নি একথা শুনে সাধারণত লোকে আনন্দিত হয়, সে কিন্তু দুঃখিত হল। সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। রিপোর্ট নিয়ে চলে গেল নিঃশব্দে। যিনি তার চিকিৎসা করছিলেন তিনি নিশ্চয়ই রিপোর্টটা বিশ্বাস করেন নি। আমিও করি নি। তার কোমর ব্যথার কারণ যে সিফিলিস অথবা গনোরিয়া—অথবা দুইই—এ সম্বন্ধে আমারও কোনও সন্দেহ হল না। 'কুসুমে-কীট' জাতীয় কয়েকটা শস্তা উপমা মনে এল। তার পর ভুলে গেলাম সব।

…ছ' মাস পরে আবার সে এল আমার কাছে। রূপ তার তখনও অম্লান। বাইরের ঐশ্বর্য কিন্তু কিছু কমেছে মনে হল। ওড়নাখানা যেন তত সুন্দর নয়। শাড়ীটা আধ-ময়লা। গায়ে গয়নার অভাবও লক্ষ্য করলাম। তার কোমরের ব্যথা তখনও সারে নি। বহু ডাক্তারের কাছে ঘুরেছে সে। দিল্লী, বম্বে, কোলকাতা, পাটনা ঘুরে আবার এসেছে সে এখানে। এখানে এক বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারের খুব নাম-ডাক শুনে তাঁর কাছে গিয়েছিল। তিনি আবার রক্ত পরীক্ষা করতে বলছেন।

করুণ কণ্ঠে বললে—"একটু ভাল করে দেখুন ডাক্তারবাবু রক্তে যদি কিছু থাকে…।"

এবারও রক্তে কিছু পাওয়া গেল না। সিফিলিসের বিষ তার শরীরে নেই।

"নেই?"

"না।"

"কিচ্ছু পাওয়া গেল না?"

"না।"

চোখ দুটি ছল ছল করতে লাগল তার।

আমি না জিগ্যেস করে আর পারলাম না—"এর জন্যে দুঃখ কেন তোমার এত? ও বিষ শরীরে নেই এটা তো ভালই।"

"সব ডাক্তারবাবুই বলেছেন যে কোমরের ওই বেদনাটার কারণ যদি সিফিলিস হয় তাহলে সারবার আশা আছে। সিফিলিস না হলে ও আর সারবে না। আমি সেইজন্যে প্রায় সর্বস্বান্ত হ'য়ে বহু জায়গায় রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি —কিন্তু সকলেই বলছে নেগেটিভ। একজন ডাক্তারবাবু আমাকে কয়েকটা ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু কিছু হ'ল না। কি যে করব—"

"কোমরে ব্যথাটা কি খুব বেশী ?"

"এমন খুব বেশী নয়, কিন্তু ও নিয়ে নাচা চলবে না। নাচাই যে আমার পেশা ডাক্তারবাবু। এ পেশা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমাকে—"

লজ্জায় মুখ নীচু করলে সে। চোখ থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল।

প্যাথোলজিস্ট হিসাবে তার উপরোক্ত ইতিহাসটুকু জানতাম। পুলিশ সার্জন হিসাবে কিছুক্ষণ আগে তার শবদেহ থেকে তিনটে বুলেট বার করলাম শুনলাম দুজন যুযুধাণ প্রণয়ীর মাঝখানে পড়ে তাদের কলহ থামাতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে।

স্বপ্ন-কাহিনী

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। একটা স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন।

আণবিক যুগের এক অদ্ভুত যানে চড়িয়া যেন আকাশ-যাত্রা করিয়াছি। কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না। মনে হইতেছে যেন নিজের বৈঠকখানায় সোফায় বসিয়া আছি। বিজ্ঞানের সহায়তায় বাংলা দেশের আবহাওয়াকেই যেন আমার চতুর্দিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি। পাশে বাতায়নটি খোলা আছে। নানাবিধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। দেখিতে দেখিতে পৃথিবী ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। উর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে নানা আকৃতির নানা বর্ণের মেঘ ভাসিতেছে। ক্রমশ মেঘলোকও ছাড়াইয়া গেলাম। তাহার পর একটু অন্ধকার, একটু পরে সহসা আবার সর্বাঙ্গ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেল। চন্দ্রলোকের কাছাকাছি আসিয়াছি। যে চন্দ্রকে দূর হইতে ছোট একটা থালার ন্যায় দেখিতাম সহসা তাহার বিরাট মূর্তি দেখিতে পাইলাম। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল আবৃত করিয়া তুষারাবৃত প্রকাণ্ড একটা গোলক আবর্তিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলোকও পার হইয়া গেলাম। তাহার

পর আবার অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে বাতায়ন দিয়া দেখিলাম অতি দ্রুতবেগে আমরা আর এক জ্যোতির্ময় লোকের সমীপবর্তী হইতেছি।

চালক বলিলেন, "নীচের দিকে দেখুন।" দেখিলাম সবুজাভ গোলকের ন্যায় কি যেন একটা আকাশপটে শোভা পাইতেছে। এমন শ্যামোজ্জ্বল বর্ণ ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

"কি ওটা?"—প্রশ্ন করিলাম।

চালক বলিলেন, "আমাদের পৃথিবী। আরও খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকুন, আর একটা জিনিস দেখিতে পাইবেন।"

চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম জ্যোতির্ময়লোক হইতে মাঝে মাঝে এক একটা কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে। স্পর্শ করিবামাত্র সেই শ্যামগ্রহের অঙ্গে যেন শিহরণ জাগিতেছে, তাহার শ্যাম দ্যুতি প্রতি স্পর্শে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

পুনরায় প্রশ্ন করিলাম,—"ব্যাপার কি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

চালক বলিলেন, "আমরা ওই যে জ্যোতির্ময়লোকের নিকটবর্তী হইয়াছি তাহার নাম সম্ভবলোক। যে কিরণ-রেখা আসিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করিতেছে তাহার নাম জন্মধারা, ওই আলোকধারা বাহিয়া অসংখ্য জড় ও জীবের সম্ভাবনা পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। কালক্রমে তাহারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে মূর্ত হইবে।"

"আমরা কি সম্ভবলোকেই যাইতেছি?"

"না, আমরা চলিয়াছি মহাকালের উদ্দেশে।"

শুনিয়া একটু ভীত হইলাম।

"মহাকাল তো ধ্বংসের দেবতা। আমরা কি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছি?"

"ধ্বংসই তো নবজীবনের ভূমিকা। ভয় পাইতেছেন কেন?"

"সম্ভবলোকটা একটু দেখিয়া গেলে হয় না।"

সানুনয়ে অনুরোধ করিলাম।

"বেশ, আপনার কৌতূহল থাকে, চলুন। আমার কৌতূহল নাই। আমি তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারিলেই বাঁচি!"

চালক সুইচ টিপিলেন। আমাদের যান সম্ভবলোক অভিমুখে দ্রুততর বেগে ছুটিতে লাগিল।

"ওই দেখুন।"

দূর হইতে যাহাকে সূক্ষ্ম কিরণ-রেখা মনে হইতেছিল তাহারই বিস্তৃততর রূপ দেখিতে পাইলাম। একটা আলোকের প্রপাত নিঃশব্দে অবতরণ করিতেছে এবং

সেই আলোক নির্ঝরে ক্ষুদ্রায়িত রূপে নিখিল বিশ্বের সব কিছুই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে নামিতেছে। ভবিষ্যৎ-হিমালয়-ভ্রূণকে বল্মীক-স্তূপের আকারে দেখিলাম; বিরাট বিরাট জীবজন্তু, ওষধি বনস্পতি যেন ছোট ছোট পুতুলের মতো, সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুদ্র, মানুষের চিহ্ন কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ কোটি কোটি আরও কি যেন সব ভাসিয়া চলিয়াছে, উহারাই হয় তো মানুষ।

…দেখিতে দেখিতে সেই আলোক-প্রপাতকে দূরে রাখিয়া আমরা আরও অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সম্ভবলোক।

অবতরণোন্মুখ আর একটি আলোক-প্রপাত বিরাট নিস্তরঙ্গ তরঙ্গিণীবৎ দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার দুই তীরে শুভ্র কুজ্ঝটিকার প্রাকার। অসংখ্য কাশ ফুল যেন আকাশ পর্যন্ত স্তূপীকৃত রহিয়াছে। মনে হইতেছে পুঞ্জীভূত হইয়া কিসের যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। এক অত্যুজ্জ্বল আলোক পরিমণ্ডলী সমস্ত জ্যোতির্ময়-লোককে বেষ্টন করিয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সেই বিশাল পরিমণ্ডলীর একপ্রান্তে আমাদের যান ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গের ন্যায় মহাশূন্যে স্থির হইয়া আছে। আমার দৃষ্টিও স্বপ্নাতুর। রূপকথালোকের রূপসাগরে সমস্ত মন যেন ডুবিয়া গিয়াছে। অবতরণোন্মুখ আলোক-প্রপাতের আরও নিকটবর্তী হওয়াতে অতি ক্ষুদ্র মানব শিশুদেরও এবার দেখিতে পাইতেছি। অসংখ্য পশু-পক্ষী, হস্তী-ব্যাঘ্র, অরণ্য-পর্বত, জনপদ-মহাদেশ আরও স্পষ্টভাবে নয়ন গোচর হইতেছে। সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া মানবশিশুদের আনন্দ কলরব মর্মরধ্বনির মতো শুনিতে পাইতেছি। আলোক-প্রপাত তখনও গতিহীন, তখনও তাহার অবতরণ আরম্ভ হয় নাই। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছি কখন কি ঘটে।

সহসা মহাশূন্য যেন কথা কহিয়া উঠিল। গভীর মধুর কণ্ঠে কে যেন কহিল—"সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তোমার এইবার সময় হইয়াছে, তোমাকে এইবার মর্তলোকে অবতরণ করিতে হইবে। তোমার জীবনব্যাপী সাধনায় পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার অকৃত্রিম দেশপ্রেমে প্রীত হইয়া তিনি তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তোমার সাধ ছিল—যদি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হয়, বাংলা দেশেই আবার যেন ফিরিয়া আসি। আদিজনক চতুরানন তোমার সে সাধ পূর্ণ করিবেন। তুমি যে রূপে যে গৃহে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাও, বল, সেই রূপে

সেই গৃহেই তোমাকে প্রেরণ করা হইবে। তোমার কর্মফলে প্রীত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা এ স্বাধীনতাটুকুও তোমাকে দিয়েছেন। তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।"

শুভ্র কুজ্ঝটিকা জাল ভেদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের, আমাদের সেই অতিপরিচিত সুরেন্দ্রনাথের, সৌম্য জ্যোতির্ময় মূর্তি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আমি আর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না।" আকাশবাণী পুনরায় ধ্বনিত হইল—"তুমি না চাহিলেও তোমাকে বঙ্গদেশেই যাইতে হইবে। পিতামহের বিধান অমোঘ, তোমাকে কেবল এই স্বাধীনতাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তুমি যে রূপে যেখানে যাইতে চাইবে সেই রূপেই তোমাকে সেখানে পাঠান হইবে। অভিমত ব্যক্ত করিতে বিলম্ব করিও না, জ্যোতির্ময়ী জন্মধারা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কি রূপে সেখানে যাইতে চাও, বল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ উত্তর দিল—"পাথর।"

চালক সুইচ টিপিলেন।

আমাদের যান আবার দ্রুতপদে মহাকালের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিল।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

একজন উৎসাহী যুবক টেবিলের উপর প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বললেন, "নিশ্চয়ই, বিজ্ঞানেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।"

কর্ণেল মুখার্জি এতক্ষণ কিছু বলেন নি! তিনি ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসে সিগার টানতে টানতে পৌত্র ও দৌহিত্রদের তর্কটা উপভোগ করছিলেন। এইবার তিনি কথা বললেন। সিগারে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, "সব সময়ে হয় না। আমি অন্তত একটা ঘটনা জানি হয় নি, বিজ্ঞানকে হার মানতে হয়েছিল।"

"কি রকম?" তাঁর বি-এসসি পাশ নাতিটি প্রশ্ন করলে।

"তাহলে গল্পটা শোন, গল্প নয় সত্যি কথা।"

সিগারের ছাইটি সন্তর্পণে ঝেড়ে শুরু করলেন কর্ণেল মুখার্জি।

"তখন বাংলায় ডাক্তারী পড়া হত, বুঝলে, অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন সবে আই, এম, এস পাশ করে সার্ভিসে ঢুকেছি। সদরে কাজ করা ছাড়া

আমাদের আর একটা কাজ ছিল, মফঃস্বলে দাতব্য চিকিৎসালয়গুলোর তদারক করা। স্টেশনের কাছে-পিঠে যে সব ডিস্‌পেনসারি থাকতো সেগুলোতে যথারীতি যেতাম আমরা। কিন্তু স্টেশন থেকে যেগুলো অনেক দূর সে সব জায়গায় প্রায়ই যাওয়া ঘটতো না। সেখানে ডাক্তারবাবুরাই রাম-রাজত্ব করতেন।”

সিগারে একটি টান দিয়ে কর্ণেল মুখার্জি সামনের দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল স্মিতমুখে। যেন তিনি অতীতের ঘটনাটাকে প্রত্যক্ষ করছেন আবার।

“তারপর ?”

পৌত্রের উগ্র প্রশ্নে স্বপ্নলোক থেকে নেমে এলেন আবার।

“বলছি। আমি একবার ঠিক করলাম যে স্টেশন থেকে যে সব ডিস্‌পেন-সারিগুলো অনেক দূরে আছে সেগুলোতে হানা দিতে হবে। অন্তত একবার করে। ডিস্‌পেনসারির নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিরণপুর, না হরিণপুর, যাই হোক, ঠিক করলাম যাব সেখানে। তিন বছরের মধ্যে সেখানে যায়নি কেউ। স্টেশন থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। কিছু দূর যেতে হবে নৌকায়, কিছুদূর ঘোড়ায় চড়ে। দুর্গম মেঠো পথ। যাই হোক ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা। গ্রীষ্মকাল। ডাক্তারবাবু দেখি ডিস্‌পেনসারিতে নেই। দেখলাম একটু দূরে একটা বিরাট বটগাছের নীচে খুব ভীড় হয়েছে। শুনলাম ডাক্তারবাবু ওখানেই আছেন। কম্পাউণ্ডারবাবু খবরটা দিলেন। তিনি ডাক্তারখানায় ছিলেন। ভিড়ের দিকে অগ্রসর হলাম আমি। গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু খালি গায়ে বসে আছেন। ভদ্রলোকের পিঠে বুকে প্রচুর চুল, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচা-পাকা এক ঝুড়ি গোঁফ। আমি ভীড় ঠেলে যখন তাঁর কাছে গেলাম তখনও তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন না। তন্ময় হয়ে তিনি প্রেসকৃপশন লিখে যাচ্ছিলেন। আমার কোটপ্যান্ট-পরা চেহারা দেখে একজন রুগী তাঁর কানে কানে কি বললে। বলতেই তিনি চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে।

“কি চান ?

“ইন্‌স্‌পেক্‌শন। আমি সিভিল সার্জন এ জেলার।”

শুনেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন এবং লম্বা এক সেলাম করলেন আমাকে।

“ইনেস্‌পেক্‌শন করতে চান চলুন দেখাই আপনাকে। এই এরা সব আমার পেশেন্ট।”

“চলুন ডিস্‌পেনসারিতেই যাওয়া যাক।”

এলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে সার্জিকাল যন্ত্রপাতি যে আলমারিটায় থাকে সেইটে খুলতে বললাম। হঠাৎ নজরে পড়ল এককোণে থার্মোমিটার রয়েছে একটি।

বললাম—"ওটা এখানে কেন? ব্যবহার করেন না?"

"আজ্ঞে না।"

"কেন?"

"দরকার হয় না।"

কেমন যেন সন্দেহ হল ভদ্রলোক এর ব্যবহার জানেন না ঠিক। থার্মোমিটার জিনিসটার তখনও ছড়াছড়ি হয় নি এমন।

"ও জিনিসটা কি তা জানেন আশা করি।"

"জানি। তাপমান যন্ত্র।"

"ওদিয়ে কি করা হয়?"

"শরীরের তাপ নিরূপণ।"

"সাধারণ মানুষের শরীরের তাপ কত?"

"কার?"

"এই ধরুন, আপনার।"

"আটানব্বই।"

"আপনার স্ত্রীর?"

"আশী।"

"আপনার ছেলের?"

"ওর আর কত হবে—ষাট।"

বুঝলাম এ বিষয়ে ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। শরীরের তাপ সম্বন্ধে আমি যা যা জানতাম বুঝিয়ে বললাম। থার্মোমিটারের ব্যবহার কি তাও বুঝিয়ে দিলাম। চুপ করে ভদ্রলোক সুবোধ বালকের মত আমার প্রত্যেকটি কথা ঘাড় নেড়ে নেড়ে শুনলেন। আর দু'চার কথার পর আমি বললাম—"কই আপনার ভিজিটার্স বুক বার করুন। আমার মন্তব্য লিখে দিয়ে যাই এবার।"

একটু কড়া মন্তব্যই লিখলাম।

লিখলাম—"ডাক্তার অত্যন্ত সেকেলে। আপ-টু-ডেট চিকিৎসার তেমন কিছু জানেন না। মাইনে দিয়ে এরকম লোক রাখার অর্থ গভর্ণমেন্টের পয়সার অপব্যয় করা।"

ইংরেজীতে লিখছিলাম। লেখা শেষ করতেই ডাক্তারবাবু বললেন—"কি লিখলেন, বলুন, আমি ইংরেজী জানি না।"

তর্জমা করে শুনিয়ে দিলাম।

শুনেই ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখও লাল হল। চোখের দৃষ্টি থেকে স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল যেন।

"আমি ঐ কাঁচের কাঠিটার বিষয়ে তেমন কিছু জানি না দেখেই আপনি ঠিক করলেন যে চিকিৎসার আমি কিছু জানি না? কত হাজার হাজার রোগী আমার হাতে ভাল হয়েছে, কত বড় বড় অপারেশান আমি করেছি তা জানেন? দু'শ রোগী উপস্থিত আছে তাদের কথা তো আপনি কিছুই জিগ্যেস করলেন না? আমার পরিচয় তো তাদের কাছেই পাবেন। ঐ কাঁচের তাপমান যন্ত্র দিয়েই কি আপনি আমার বিদ্যাটাও মেপে ফেললেন? কেটে দিন ওটা, পাতাটা ছিঁড়ে ফেলুন।"

"তার মানে? কি ছিঁড়ব।"

"ঐ যা লিখেছেন ছিঁড়ে দিন। তারপর ঐ রোগীদের কাছে গিয়ে আমার কথা জানুন, ওরা যা বলবে তাই লিখে যান।"

"আমি আশ্চর্য হচ্ছি আপনার স্পর্ধা দেখে।"

"আমি যা বলছি তা যদি না করেন এখান থেকে যেতে পারবেন না। ওরে কে কোথায় আছিস্ আয় এদিকে—"

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক ছুটে এসে ঘিরে ফেলল আমায়। গতিক খারাপ দেখে আমি খাতার পাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম। ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম ডিস্‌পেনসারি থেকে। আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে সরে পড়লাম।

"তারপর।"

"তারপর সদরে ফিরে গিয়ে ডিস্‌মিস্ করলাম সে ডাক্তারকে, পাঠালাম আর একজন। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না সে ডাক্তারের। সে পাশেই ডিস্‌পেনসারি ফেঁদে সুরু করল প্র্যাক্‌টিস। দুর্দান্ত প্র্যাক্‌টিস। আমি যে ডাক্তার পাঠিয়েছিলাম তার নামে দরখাস্ত আসতে লাগল ঘন ঘন। শেষকালে তাকে ধরে মার দিল একদিন সবাই। পালিয়ে গেল ছোকরা।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি, বিজ্ঞানের হার হল, জিত হল মানুষের।"

হরবিলাসের মৃত্যুরহস্য

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। একদল নীতিবিদ বলিবেন, যে পাষণ্ড পর-স্ত্রী হরণ করিয়া কেবল টাকার জোরে সমাজের বুকে এতদিন বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছিল, তাহার মৃত্যুতে ভূ-ভার লাঘবীকৃত হইয়াছে। আর একদল বলিবেন (ইহারাও নীতিবিদ) যে, আইনতঃ ললিতা হয়তো পর-স্ত্রী ছিল, কিন্তু ধর্মতঃ হরবিলাসই তাহার স্বামী, কারণ ললিতা যতদিন জীবিত ছিল, হরবিলাস নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছে। আইনতঃ যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন, তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব। ললিতার পিঠের উপর তাঁহার কত জোড়া জুতো যে ছিঁড়িয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই; রাখিলে তাহা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকমাত্রেরই চিত্তে বিস্ময়, আতঙ্ক ও সহানুভূতির উদ্রেক করিত। মোট কথা ললিতার স্বামী বঙ্কেশ্বর বক্সী অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রূর ও নীচমনা ব্যক্তি ছিলেন। উহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকর্মের জন্য কেহই তাঁহাকে বাহবা দেন নাই, আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ-রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজসংস্কারের জন্য হরবিলাসের মতো সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি। লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কত রকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হইল! অসুখের কোনও লক্ষণই তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন: "ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি, তার কিছুদিন পরে বঙ্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কি লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন,—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে

আনতে পারি। কিন্তু ও কুলটার মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।"

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বক্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়তো প্রসাদের সহিত বিষ ছিল···

বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিতও হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল: "তুই যা আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?"

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারদের অভিমত হইল। হরবিলাসের হৃদযন্ত্র যে দুর্বল ছিল, তাহা আর একজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না, সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই সে বেশ বাঁচিয়া ছিল। সহসা এমন কি হইল···'। থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তুই প্রথমে কি করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?"

"বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম···"

"ও—"

ফোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল! হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল। ভদ্রলোক ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন, সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনও মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: "সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এখানে। ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিস করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে! রাত্রে ঘুমের ঘোরে যে রকম কর, ভয় হয়—"

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন: আপনার হার্ট খারাপ তাই শ্বাসকষ্ট হয়,—"

হরবিলাস বলিল: "আমি তো তেমন টের পাই না।"

"আর কিছুদিন পরে পারেন।"

"কি করব তাহলে?"

"মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার—।"

"ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।"

"জানলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।"

হরবিলাস চুপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন: "আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

হরবিলাসের মাথার শিয়রের জানলায় গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রী ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাহার পর বেশীদিন তিনি ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে?

"আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর আর কেউ কি এসেছিল ?"

"আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।"

"পাঞ্জাবী জ্যোতিষী ? কবে ?"

"দিন পনর আগে।"

"কি বললে সে ?"

"তাতো জানিনে বাবু। তবে অনেকক্ষণ ছিল।"

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল ! হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিল। উইলে ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষা-প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাঁহার বিষয় প্রভৃতি বিক্রয়ের ভার লইবেন। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকেন, গবর্ণমেন্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিত-ভাবে ডায়েরি লিখিত, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছে।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ছিল : আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল—"আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো ?"

বলিলাম, "না রাগ করিব কেন, কি জানিতে চান বলুন।"

সে বলিল, "আপনি কি কখনও পর-স্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন ?"

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, "ধরুন যদি করিয়াই থাকি…।" জ্যোতিষী বলিল, "তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।"

এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্য বাণীটি তুচ্ছ করিবার মতো নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক এসিড আনাইব। শুনিয়াছি, ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।...

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কেন, জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ওই ছিদ্রপথে সত্যই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?"

"তা পারতাম বই কি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?"

"না, এমনি—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

"হার্ট ফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি?"

"তা বটে।"

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

মাস খানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটি বিক্রয় করিবার জন্ত সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি

মাপিতেছিল। সেই সময় একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়াছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা ছিল। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পড়া যাইতেছিল। কি মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কি ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল, ঠিক তেমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কি হয়? হয়তো কিছুই হইবে না। কিংবা হয়তো একটা গেঞ্জি বা কয়েক জোড়া মোজা বা ওই ধরনের কিছু একটা আসিয়াও পড়িতে পারে। দেখাই যাক না কি হয়।...

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল, তাহা নয়, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়তো হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

দিন দশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিলে। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।"

"ভি পি? ক'টাকার?"

"দশ টাকা পনের আনা।"

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহর্ষে স্বগতোক্তি করিল: "দেখা যাক কি এসেছে।" অবিকল সেই রকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি, তাহা বুঝিতে

সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর!

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যুরহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্কেশ্বর বক্সীর লোক। সহসা একটা শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন

ভূতি সাণ্ডেলের ছেলে অপূর্ব সানিয়েল সত্যই অপূর্ব ব্যক্তি। অভিব্যক্তি বলিলে আরও লাগ-সই হয়। শোনা যায় ভূতি সাণ্ডেলের পত্নী এই পুত্ররত্নকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, সাত মাসেই প্রসব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন তেজীয়ান সন্তানকে সাত মাসই যে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যবশতই, কারণ এমন ছেলে সাধারণত বাঁচে না। অপূর্ব কিন্তু বাঁচিয়া গেল। অপূর্বের বাল্যলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার যাঁহারা মিল দেখিতে পান (বলা বাহুল্য, তাঁহাদের অধিকাংশই অপূর্বর মাসি পিসি ঠাকুমা-দিদিমার দল) তাঁহারা অপূর্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যটি ধরিতে পারেন নাই। বাড়িতে ননীর অভাব ছিল না, কিন্তু অপূর্ব চুরি করিত সিগারেট। বাজারে নানারকমের বাঁশী চিরকালই আছে, অপূর্ব কিন্তু 'সিটি' মারিত; গোপীদের বস্ত্রহরণ করিবার চেষ্টা সে করে নাই, স্কুল কলেজের মেয়েদের জুতার ফিতা কিন্তু সুবিধা পাইলেই সে চুরি করিত; নাগকেও সে দমন করিয়াছিল, কিন্তু তাহা কালীদহের সর্পরূপী দানব নহে, বেলতলার নাগ পণ্ডিত, তাহার প্রাইভেট টিউটার। অভিনবত্বই অপূর্ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাল্যকাল হইতেই এ পরিচয় সে দিয়া আসিতেছে।

অভিনব উপায়ে পরীক্ষাগুলিও সে পাশ করিয়া ফেলিল। আর কিছুই নয়, হাত-সাফাই। একবার প্রশ্নপত্র চুরি করিল, আর একবার পরীক্ষার খাতা বদল করিল। তৃতীয়বারে পরীক্ষককে ঘুস দিবার সময় সে অভিনব হাত-সাফাইয়ের যে পরিচয় দিল তাহা সত্যই অপূর্ব। সোজা পরীক্ষকের নিকটে গিয়া সে দশখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল এবং হাসিয়া বলিল—"যোগেনবাবু আপনার পাওনা টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বললেন, কোনও রসিদ দিতে হবে না।"

"যোগেনবাবু? কোন্ যোগেনবাবু?"

বিস্মিত পরীক্ষক প্রশ্ন করিলেন।

অপূর্বের দন্তপাঁতি আরও বিকশিত হইল।

"তাতো জানি না সার। তিনি আমাকে ডেকে আপনার বাড়িটা দেখিয়ে বললেন, এই একশ টাকা ওঁকে দিয়ে এস তো বাবা। অনেকদিন আগে ধার নিয়েছিলাম। শোধ দিতে পারি নি। নিজে লজ্জায় তাই যেতে পারছি না। তুমি গিয়ে বল যোগেনবাবু দিলেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন উনি।"

বিস্মিত পরীক্ষক আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজেই বহুলোকের নিকট ঋণী হইয়া আছেন। পাওনাদার এড়াইতে গিয়াই কলিকাতার বহু গলির নাম তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি আবার উত্তমর্ণ হইলেন কবে? কে এই রহস্যময় যোগেনবাবু? আশ্চর্য কাণ্ড!

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম অপূর্ব সানিয়াল। এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি, রোল নম্বর বাহাত্তর।"

এক নিশ্বাসে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল! ফল যে ফলিয়াছিল তাহা সকলেই জানে। অপূর্ব সত্যই সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই অপূর্বতাই অপূর্ব সানিয়ালের বৈশিষ্ট্য।

অপূর্ব দুই চোখেই সমান দেখিতে পায় কিন্তু বাঁ চোখটা সর্বদাই একন কায়দা করিয়া বুজিয়া থাকে যে মনে হয় বাঁ চোখে কিছু পড়িয়াছে বুঝি! সকলে যাহাতে হাসে অপূর্ব তাহাতে হাসে না। যাহা শুনিয়া সকলের মুখ গম্ভীর হইয়া যায়, অপূর্ব সেখানে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। বিবাহ না করাটাই আজকালকার ফ্যাসন বলিয়া অপূর্ব বিবাহ করিয়াছে, একটা নয় দুইটা। দুইটাই গোপনে, কারণ প্রকাশ্যে বিবাহ তো সকলেই করে, তাহাতে আর অপূর্বতা কি!

এই যুগ্ম বিবাহের চাপেই কিন্তু অপূর্বকে শেষে চিরাচরিত পথে পা বাড়াইতে হইল! কিন্তু তাহাতেও সে নিজের বৈশিষ্ট্য দেখাইতে ছাড়িল না।

চ্যানাচুররর—

দোকানের নাম বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে। চানাচুরের দোকান নয়, ধর্মগ্রন্থের দোকান। বলাবাহুল্য, দোকানের সত্বাধিকারী অপূর্ব সানিয়াল। তাহার ধারণা সত্যযুগ আসন্ন, তাই সকলের মধ্যেই ধর্মভাব প্রবল হইয়াছে। এখন ধর্মগ্রন্থেরই চাহিদা বেশী হইবে। অপূর্ব বলে—একটি কথা কিন্তু ভুলিলে

চলিবে না। ধর্মভাব প্রবল হইলেও লোকে তাহা এখন প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। পূর্বে লোকে কাম-বিষয়ক পুস্তক যেমন গোপনে খরিদ করিত এখন ধর্ম-বিষয়ক পুস্তকও তেমনি গোপনে খরিদ করে। সুতরাং দোকানের নাম 'ধর্মগ্রন্থালয়' বা 'ধর্মমন্দির' রাখিলে প্রকৃত খরিদ্দার সেখানে আসিতে ইতস্ততঃ করিবে। লোকে কোকেন খাইতে চায়, কিন্তু পানের ভিতর লুকাইয়া। তাই কোকেনখোরদের ভীড় ঔষধের দোকানে হয় না, হয় পানের দোকানে। দোকানের নাম 'চ্যানাচুররর—' রাখিলেই ধর্মপ্রাণ খরিদ্দারেরা হু হু করিয়া আসিবে ইহাই অপূর্ব সানিয়ালের বিশ্বাস।

ঢিলা পাজামা, বুশ শার্ট, নীল চশমা, ফ্রেঞ্চকাট গোঁফদাড়ি লইয়া অপূর্ব দোকানে দিনের পর দিন বসিয়া থাকে খরিদ্দারের আশায়। প্রথমে কয়েকদিন ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়াছিল চানাচুর কিনিবার জন্যই। কিন্তু অপূর্ব যখন চানাচুরের বদলে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্ম্য' আগাইয়া দিল তখন তাহারা অবাক হইয়া গেল। এমন কি 'বৃহদারণ্যক' অথবা 'গীতা-রহস্য' দেখাইয়াও তাহাদের মুগ্ধ করা গেল না। তাহারা মুচকি হাসিয়া সরিয়া পড়িল। অপূর্ব সানিয়ালও মনে মনে মুচকি হাসিল—"ঠিক লোকে সন্ধান পায়নি এখনও, যখন পাবে তখন তাদের ঠেকাবার জন্যেই লোক রাখতে হবে আমাকে হয়তো। পাবলিসিটিটা দরকার—!"

'চ্যানাচুররর—'বিদ্যুতান্বিত হইয়া উঠিল একদিন রক্তবর্ণ আলো বিকীর্ণ করিয়া। একবার নেবে আবার জ্বলিয়া ওঠে। জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে শব্দ হয় "চ্যানাচুররর—"।

ঠিক লোকেরা কিন্তু সন্ধান পায় না তবু। ধর্মপিপাসুদের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির দিকেই লক্ষ্য! আশ্চর্য!

অপূর্ব কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। সে বিদ্রোহী, সে দুর্দম, সে অপূর্ব, সে অভীক। দেখা গেল ঠিক লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সে যাহা শুরু করিয়াছে তাহাকে কৃচ্ছ্র-সাধন আখ্যা না দিলে সংস্কৃত ভাষার মান থাকে না! দেখা গেল সে তাহার বুশ শার্টের একটি হাত সম্পূর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছে। আস্কন্ধ তাহার রোমশ দক্ষিণ বাহুটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। বাম বাহুতে কেবল হাতা আছে। মাথায় পরিয়াছে মৌলবীর টুপি, মুখে ঝুলিতেছে পাইপ। বাম চক্ষুটি বুজিয়া টেবিল চাপড়াইয়া গান ধরিয়াছে—"একলা চলরে!"

দোকানের সামনে ভীড় করিয়া লোক দাঁড়াইল। পুলিশ আসিল। আসিল না কেবল খরিদ্দার। ঠিক লোকেরা বেঠিক পথেই চলিতে লাগিল। এসব সত্ত্বেও। আশ্চর্য!

হঠাৎ একদিন অপূর্ব একদিকের গোঁফটা কামাইয়া ফেলিল। বাকি সব পূর্ববৎ। এবারও লোক জমিল, হৈ হল্লা হইল, কিন্তু ধার্মিক ক্রেতারা আসিল না।

"কোথায় তারা, কোথায় তারা"—গানই বাঁধিয়া ফেলিল অপূর্ব। তবু তারা আসে না। আশ্চর্য!

অবশেষে একদিন সকলে চমকিত হইয়া দেখিল অপূর্ব সানিয়াল তাহার বৃদ্ধ পিতা ভুক্তি সাণ্ডেলকে ধরিয়া জুতাইতেছে। তাঁহার টাক বাহিয়া রক্ত পড়িতেছে, মারের চোটে বৃদ্ধ মুক্তকচ্ছ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন।

সকলে অপূর্বকে বলিল—"ছি ছি একি করছ তুমি। বাপকে জুতো মারছ কেন?"

অপূর্ব অট্টহাস্য করিয়া উত্তর দিল—"কেউ মারে না বলে মারছি। আমার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বলে মারছি। তারা আসছে না কেন, আমার দিকে ফিরে চাইছে না কেন! এইবার আমি ল্যাংটো হয়ে নাচব রাস্তায়, চরম পাবলিসিটি কোরব, চ্যানাচুররর—"

সত্যসত্যই উদ্বাহু হইয়া অপূর্ব সানিয়াল অপূর্ব ভঙ্গীতে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া নাচিতে লাগিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

উক্ত অপূর্ব সানিয়াল আমাদের 'বায়ুদমন' ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঠিকানা—বায়ুদমন কার্যালয়।
বড়াখাম্বা রোড,
নিউদিল্লী।

দেশ-দরদী কেনারামের রোজনামচা

আপনারা কখনও দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। হয়তো করেন নাই, হয়তো করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ প্রত্যহ অনুভব করি তেমনভাবে আর কেহ করে কি না। আমি প্রত্যহ তিনখানি সংবাদপত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচলিত হই, বিগলিত হই, বিহ্বল হই। ইচ্ছে করে চীৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু কাঁদিতে পারি না। মনে হয় আমার অশ্রুর উৎস বোধহয় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু না,

সেদিন চোখে কাঁকর পড়িয়াছিল, অনেক জল তো বাহির হইল! তাহা হইলে বোধহয় দেশের দুর্দশার কথা ভাবিবামাত্র অশ্রু জমাট হইয়া যায়, ঝরিয়া পড়িতে পারে না। হয়তো আমার মর্মলোক উত্তর-মেরু হইয়া গিয়াছে। কে জানে…।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সত্যই অন্যমনস্ক হইয়া যাই। আজ সহসা লক্ষ্য করিলাম চা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চা-য়ে একটি মাছি পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা উপমা জাগিল। মনে হইল স্বাধীনতা-কাপে পড়িয়া দেশও ওইরূপ হাবুডুবু খাইতেছে। দেশও মাছি হইয়া গিয়াছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিল।

চাকরকে আর এক কাপ চা আনিতে বলিলাম।

তাহার পর আর এক কাপ।

তাহাতেও শানাইল না, তৃতীয় কাপের ফরমাস দিয়া পায়ের পাতা নাচাইতে নাচাইতে পুনরায় সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা হইল সম্পাদকের পদধূলি চাঁছিয়া আনিয়া সর্বাঙ্গে মাখি। আহা, কি লেখাই লিখিয়াছে। বাসনা জাগে সম্পাদক হইব। কিন্তু হায় পরক্ষণেই মনে হয় বামন হইয়া চাঁদে হাত কি করিয়া দিব? তাহা যে অসম্ভব!

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম।

মনে হইল দেশ গেল যে, আমি কি করিতেছি।

এক কাপ কফি প্রস্তুত করিতে বলিলাম।

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাইতেছিলাম। পথে দেখিলাম একটি বালিক ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল নিশ্চয়ই দুখিনী, নিশ্চয়ই পাকিস্থান হইতে আসিয়াছে! আমার হৃদয়-গামছাকে কে যেন নিঙড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল কিছু অর্থ সাহায্য করি। পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি এমন সময় বিবেক বলিল—পয়সা দিয়া কি তুমি উহার দুঃখ দূর করিতে পার? ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে। বেচারী যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে, আর কেন! পয়সা বাহির করা হইল না, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলাম না। গটগট করিয়া সোজা ক্লাবে চলিয়া গেলাম। গিয়াই প্রথমে ভূতনাথের সহিত দেখা হইল। ভূতনাথ বলিল, "কেনারামবাবু, আপনার গা থেকে চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে তো! সেন্ট মেখেছেন না কি?"

সত্য কথাই বলিলাম।

"হ্যাঁ, ইভনিং ইন প্যারিস।"

বিশ্বনাথ পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

সে বলিল—"আপনার আদ্দির পাঞ্জাবিটিও চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে—"

কম্পিতকণ্ঠে আবেগভরে বলিলাম—"ভাই বিশ্বনাথ, আমাদের দেশেই এককালে ঢাকাই মসলিন হ'ত সে কথা ভুলে যেও না। এ আদ্দি তার কাছে চট। আমি চট পরে বেড়াচ্ছি ভাই। আমার দুঃখ তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন, এক হাত ব্রীজে বসা যাক"—ভূতনাথ বলিল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ব্রীজ খেলিলাম। ব্রীজ খেলার ফাঁকে ফাঁকেও দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। উদ্বাস্তুদের অসীম দুর্দশা, ঘন ঘন ট্রেন কলিশন, খাদ্য সঙ্কট, কর্তৃপক্ষদের অপটুতা, অসাধুতা প্রভৃতি চিত্তকে এমন উদ্বেলিত করিল যে উপর্যুপরি দুইবার হারিয়া গেলাম।

বাসায় ফিরিয়া মাংসের কোর্মা-সহযোগে লুচি আহার করিতে করিতে বারম্বার মনে হইতে লাগিল আহা, কত লোক যে অনাহারে আছে। খাদ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য বাহির হইয়াছে সেগুলি মনে পড়িল। অমন একটা নামজাদা লোকের এই ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ! অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অন্য-মনস্ক ভাবে অনেকগুলি লুচি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। নেটের মশারি-আবৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া আরও কাতর হইলাম। মনে পড়িল কত লোক ফুটপাথে শয়ন করিয়া আছে। শিয়ালদহের দৃশ্য মনে পড়িল। তাহারা কি আমার ভাইবোন নয়? চক্ষু সজল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইল না। একটা চাপা কষ্টে যেন দম বন্ধ হইবার মতো হইল! অনেকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নজর পড়িল আমার বালিশের উপর প্রত্যহ যে রোমশ তোয়ালেখানি বিছানো থাকে, তাহা নাই। গৃহিণী সেকেণ্ড শো-য়ে সিনেমায় গিয়াছেন, আমার বালিশের উপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কি না দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা-সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সেও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটি বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্য-মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ! এ দেশের কি কোনও দিন উদ্ধার হইবে? মনের কষ্ট মনে চাপিয়া স্বহস্তেই বালিশের উপর রোমশ তোয়ালেটি বিছাইয়া লইলাম।

১২-৭-৫০

সকালে বাগানে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একটি কালো জিনিস নজরে পড়িল। তুলিয়া দেখিলাম আমসি! আমসি!! একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইল আমাদের দেশের অবস্থাও কি এইরূপ নয়? আমাদের দেশও একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইবামাত্র হৃদয়বালুতি দুঃখবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া দেশের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাস্তায় যে ম্লানমুখী বালিকাটিকে দেখিয়াছিলাম তাহার কথা মনে পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া খিলি দুই পান এবং একটু জরদা মুখে দিলাম। কাশীর জরদা পূর্বে কত ভালো ছিল, কৌটা খুলিলে কি চমৎকার গন্ধই ছাড়িত, এখন কিছু নাই। হায় হায়, দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল।

১৪-৭-৫০

প্রতিটি খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে ক্রমাগত দুঃসংবাদ পড়িয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে হইতেছিল বুঝি পাগল হইয়া যাইব। কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য অবশেষে তাই সিনেমায় গেলাম। খুব ভীড়। অতি কষ্টে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিতে পারিলাম। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কিন্তু ভারী আনন্দ হইল। যখনই সিনেমা দেখিতে যাই, তখনই এই ধরনের আনন্দ হয়। একসঙ্গে এতগুলি দেশের লোক আনন্দ লাভের আশায় একত্রিত হইয়াছে ভাবিলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। রোমাঞ্চিত কলেবরে গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলাম। আমার বাম পাশের আসনটি দেখিলাম তখনও খালি রহিয়াছে। একটি সিগারেট ধরাইয়া কল্পনা করিতে বসিলাম বাম পাশের আসনটিতে কে বসিবে? নারী না পুরুষ? কোন্ বয়সের? স্বদেশী না বিদেশী? বেশীক্ষণ কিন্তু এ চিন্তা করিবার অবসর মিলিল না, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, চিত্রপটে একের পর এক বিজ্ঞাপনের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর বড়ই বিষণ্ণ বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল বিদেশী বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি কি সুন্দর, দেখিলেই জিনিসটি কিনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওই প্যাঁচামুখীকে দেখিবার পর কি আর স্নো কিনিতে ইচ্ছা করিবে? আমাদেরই যদি স্বদেশী জিনিস কিনিতে অনিচ্ছা জন্মে স্বদেশী ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? স্বদেশী ব্যবসায় যদি না চলে···আর ভাবিতে পারিলাম না। মনে হইল সীমাহীন বেদনা-সমুদ্রে অন্তর

ভরিয়া গিয়াছে, তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়-শোলা দিশাহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ছবির পর ছবি আসিতে লাগিল, আমি বেদনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তাহার পর আসল ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। দশটি যুবতীর নৃত্য-ভেলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া গজল শুনিতে শুনিতে বেদনা-সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে সান্ত্বনা-সৈকতও দেখা গেল, কিন্তু হায়, আবার ঝটিকা আসিল। মনে হইল বাম পার্শ্বের আসনটিতে একটি মহিলা আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমি কেনারাম ঘোষ, চিরকালই ভীতু স্বভাবের লোক। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে সাহস করিলাম না। অন্ধকারও ছিল। দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বোম্বাই-মার্কা নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।···ইন্টারভাল হইল। তখন অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম সেই ম্লানমুখী বালিকাটি বসিয়া আছে—সেদিন যাহাকে পথে দেখিয়াছি। প্রখর বিদ্যুতালোকে দেখিলাম বালিকা নয়, যুবতী। আমার ভয় যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। একটু ইতস্তত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"মাপ করবেন, আপনার বাড়ি কি পাকিস্তান?" মেয়েটির ম্লান মুখ যেন আরও ম্লান হইয়া গেল। যদিও সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "না, আমার বাড়ি এখানেই" কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না। দেশের দুঃখ অনলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমার দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। আমি তাহার বেদনা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার মুচকি হাসি তাহার বেদনাকে আরও যেন স্পষ্ট করিয়া তুলিল। আমি ইহাও বুঝিলাম যে, তাহার বাড়ি পাকিস্তান বলিলে পাছে আমি তাহার প্রতি অনুকম্পাশীল হই তাই সে সত্য গোপন করিতেছে। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কর্তব্যবোধেই আমিও তখন চাতুরী অবলম্বন করিব স্থির করিলাম। বলিলাম, "কিছু মনে করবেন না, আমার একজন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া পাকিস্তানে ছিল, সে ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে।" মেয়েটি আর একটু মুচকি হাসিল। চানাচুরওলাকে ডাকিয়া দুই ঠোঙা চানাচুর কিনিলাম।

"আপনি খাবেন? নিন না। আমার যে আত্মীয়াটির কথা বলছিলাম, সে চানাচুর খেতে খুব ভালবাসত। জানি না সে এখন কোথায়।"

"বেশ দিন।"

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি লইল এবং যে ভাবে খাইতে লাগিল তাহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমার বিস্ময় ক্রমশ কষ্টে রূপান্তরিত হইল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম বেচারী অনাহারে আছে। মনে হইল আমি যেন দময়ন্তীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় চাতুরীর আশ্রয় লইলাম।

বলিলাম, "আমার সেই আত্মীয়াটি ফিরপোতে খেতে খুব ভালবাসত। আপনার যদি অসুবিধা না হয় চলুন না ফিরপোতে যাই।"

"বেশ, সিনেমার পর যাওয়া যাবে।"

পাছে আমি তাহাকে গরীব এবং অসহায় মনে করিয়া কৃপা-পরবশ হই সেইজন্য বোধহয় খুব সপ্রতিভভাবে কথাগুলি বলিল। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। দেশের দুর্দশা যে কত গভীরে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে। তিনটি দৈনিকপত্র প্রত্যহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করত যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আমি লাভ করিয়াছি তাহা যে মর্মভেদী। প্রিণ্টেড্ শাড়ি দিয়া সে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যাইবে না! খুবই কষ্টভোগ করিতে লাগিলাম। সিনেমা শেষ হইবামাত্র ভাল একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়ে চড়িয়া বসিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরপো অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম।

* * *

দেশদরদী কেনারাম ঘোষের রোজনামচার উপরোক্ত অংশটুকু তাঁহার ত্রিতল বাটির সম্মুখস্থ ডাস্টবিন হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দেশদরদী কেনারাম পত্নীর সহিত তুমুল কলহ করিয়া যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেদিন তাঁহার পত্নী ত্রিতলের বাতায়ন হইতে যে সকল কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন সেই কাগজপত্রের মধ্যে উপরোক্ত অংশটুকু ছিল। বাকী অংশটুকু বোধহয় আর পাওয়া যাইবে না, বহু অমূল্য জিনিসের সহিত ধাপার মাঠে তাহা বোধহয় মারা গিয়াছে।

জীবন-দর্শন

স্বাধীনতা দিবসে নিজের বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিবার বাসনা সকলেরই হয়, ভুবন মাইতিরও হইল। ভুবন মাইতির পিতা জীবন মাইতি সামান্য কেরানী মাত্র, বহুকালাবধি দশটা-পাঁচটা আপিস করিয়াছেন, কোনও হুজুকে মাতিবার মতো মানসিক তারুণ্য তাঁহার আর নাই। কিসে চাকুরিটি বজায় থাকে ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। বাটির সম্মুখভাগ সুসজ্জিত করিলে যদি চাকুরির কোনও সুবিধা হইত জীবন মাইতি নিশ্চয়ই তাহা করিতেন। কিন্তু তিনি জানেন বাটির সম্মুখভাগ লতাপাতা দিয়া সাজাইয়া 'জয় হিন্দ' টাঙাইয়া দিলে বর্তমান বড়বাবুর চিত্তে বিশেষ কোনও সুপ্রভাব বিস্তার করা যাইবে না। বিপরীত ফল হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ বোধ করেন নাই।

নূতন ধরনের একটা চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় প্রত্যূষেই তিনি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র ভুবন মাইতি কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের সম্মান রক্ষা করিতে উৎসুক। সে শিক্ষিত লোক, কবি লোক। সুতরাং গতানুগতিক পন্থায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়াইয়া, কিম্বা গোটাকতক লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া এই মহদ্দিবসকে সম্বর্ধনা করিবার প্রেরণা সে পাইল না। সে এমন কিছু করিতে চাহিল যাহা অনন্য, যাহা অনবদ্য, যাহা তাহার কবি হৃদয়ের পরিচায়ক। যে স্বাধীনতার জন্য সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চিত্তরঞ্জন, নেতাজী···তাহার মগজের মধ্যে স্বাধীনতার সমস্ত ইতিহাসটা থলবল করিয়া উঠিল। "কি করা যায়···মান,"—নিপুণভাবে একটি সিগারেট ধরাইয়া প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ করত সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় সিগারেটটি নিঃশেষ করিবার পর হঠাৎ তাহার মাথায় ঝড়াৎ করিয়া 'আইডিয়া' আসিয়া গেল একটা। ঠিক! উঠিয়া সিগারেটটি জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে মালকোঁচা মারিতে লাগিল। তাহাদের বাড়ি হইতে দুই ক্রোশ দূরে যে জঙ্গলটি আছে সেই জঙ্গল হইতে ফুল লতাপাতা আনিয়া সে বাড়ি সাজাইবে। ভারতের সভ্যতা একদিন অরণ্যের ক্রোড়েই লালিত হইয়াছিল, সেদিন বনমহোৎসবও হইয়া গিয়াছে। ঠিক! ভুবন মাইতি বাইকে চড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

* * *

একগোছা হলুদ রঙের ফুল পাড়িয়া তাহার মনে হইল, ইহাই কি কর্ণিকার? যে কর্ণিকারের কথা কবি কালিদাস বলিয়াছেন, ইহা কি তাহাই? প্রাণ্ড কিন্তু। ইহা যদি কর্ণিকার নাও হয় তাহা হইলেই বা কি আসে যায়। আমি ইহাকে কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই তুলিব, কালিদাসের কর্ণিকার ভাবিয়াই ঘর সাজাইব। কালিদাস ভারতীয় সংস্কৃতির অলঙ্কার, আজ স্বাধীনতা দিবসে···সমস্ত গাছটা সে মুড়াইয়া ফেলিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল একগোছা লালফুল। ঊর্ধ্বমুখী শাখায় গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। রডোডেনড্রন কি রকম ফুল? লাল, না, সাদা? পুনরায় সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করার ফলেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক একটা নূতন কথাও মনে হইল তাহার। ওগুলো অশোক ফুল হইতেই বা বাধা কি! আগস্ট মাসে কি অশোক ফুল ফোটে? কে জানে! কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া সে স্বগতোক্তি করিতে বাধ্য হইল—আর দ্যাৎ,

ওসব লইয়া বৃথা মাথা ঘামাইতেছি। আমি নিজে যদি উহার নূতন নামকরণ করি আটকায় কে। দুইজন ভারতীয় কবির ব্যবহৃত দুইটি ফুলের যদি সন্ধি করিয়া অশোকেনড্রন করিয়া দিই কি এমন ক্ষতি। স্বাধীনতা দিবসে এটুকু স্বাধীনতা যদি না থাকে তাহা হইলে আর···।

এ গাছটাকে সে মুড়াইয়া ফেলিল।

দুই রকম ফুল সংগ্রহ হইল! এইবার কিছু পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। বনে পাতার অভাব ছিল না। দুই হাতে সে পাতা ছিঁড়িতে লাগিল। স্বাধীনতা দিবসটা চুটাইয়া পালন করিতে হইবে! সহসা কিন্তু তাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। হাত ঘড়িটি কখন খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে সে টের পায় নাই। কি সর্বনাশ! চতুর্দিকেই ঝোপঝাড়, কোথায় সে খুঁজিবে। কিন্তু খুঁজিতেই হইবে।

···একটা ঝোপের ভিতর কিছুদুর হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিয়া ভুবন মাইতি পুনরায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হইল। অদূরে আর একটি ঝোপের অন্তরালে আর একটি লোক ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে! ভাল করিয়া তাহার মুখটা যদিও দেখা যাইতেছে না কিন্তু তবু যেন চেনা চেনা ঠেকিতেছে। জামার ছিটটা তো খুবই পরিচিত। ভুবন মাইতি বহুপ্রকার ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। তাহার মাথার ভিতর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। একটা কথা কিন্তু সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, এই ব্যক্তিটি কি করিয়া জানিতে পারিল যে সে আজ রোলড গোল্ড রিস্টওয়াচ পরিয়া এই জঙ্গলে ফুল সংগ্রহ করিতে আসিবে এবং অসাবধানতা বশত সেটি হারাইয়া ফেলিবে। সে কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে আধুনিক অনেক চোর না কি টেলিপ্যাথি বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়াছে। জ্যোতিষ বিদ্যাতেও। কিন্তু এরূপ কৃতবিদ্য চোর মুচিগ্রামের জঙ্গলে আসিয়া হানা দিবে ইহাও কল্পনা করা শক্ত। অনেকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ভুবন মাইতি অবশেষে একটি দুঃসাহসিক কার্য করিয়া ফেলিল। সে জানিত বেকায়দায় পড়িলে ইহারা আচমকা পিস্তল বাহির করিয়া বসে এবং পিস্তলের গুলি মোক্ষম স্থানে লাগিলে অক্কা পাওয়াও বিচিত্র নয়—মনে মনে এই কথাগুলি সে আবৃত্তিও করিল কিন্তু তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। তাহার মনে হইল আজ স্বাধীনতা দিবস, আজ অন্তত ভীরুতা প্রকাশ করিলে চলিবে না!···

"কে—"

সাহস সংগ্রহ করিয়া সে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

যিনি ঘাপটি মারিয়া বসিয়াছিলেন তিনি ঘাড় ফিরাইলেন। ভুবন মাইতি এবার সত্যই অবাক হইয়া গেল। সেই ঝোলা গোঁফ, নাকের পাশে সেই কালো

আছিল—না, ভুল হইবার নয়, বাবাই। কিন্তু বাবা এখানে অমনভাবে বসিয়া আছেন কেন! জীবন মাইতি পুত্রের মুখের দিকে নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তিনিও তাঁহার একমাত্র তনয়কে এস্থানে দেখিবেন কল্পনা করেন নাই।

"তুমি এখানে কি করছ বাবা?"

গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

"আমি?"

ভুবন মাইতির কুঞ্চিত ভ্রূ মসৃণ হইয়া মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাব ফুটিয়া উঠিল। পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া সে তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল, চলিত বাংলায় যাহাকে 'ঢোঁক' বলে।

"তুমি এখন এখানে কেন বাবা?"

জীবন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

"স্বাধীনতা দিবসে বাড়িটা একটু সাজাব মনে করেছি তাই ভাবলাম ইয়ে মানে—"

"বুঝেছি। ফুল লতাপাতা সংগ্রহ করতে এসেছ। বুঝেছি। কিন্তু ওতে ভবি ভুলবে না বাবা।"

"ভবি?"

"হ্যাঁ। ও সব সৌখিন টুকিটাকিতে ভোলাবার লোক বড়বাবু নয়। আমিও স্বাধীনতা দিবস করতেই বেরিয়েছি।"

ভুবন অসহায়ভাবে নির্নিমেষে পিতৃমুখ সন্দর্শন করিতে লাগিল। জীবন বলিলেন—"ব'স, বুঝিয়ে বলি তাহলে কথাটা। তোমাকে আমার অফিসে ঢোকাতে চাই। বড়বাবুর কাছে কথাটা পেড়েছিও. কিন্তু তিনি হুঁ হাঁ কিছুই করেন না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন তাঁকে হুঁ হাঁ করাতে গেলে যে পরিমাণ রেস্ত থাকা দরকার, তা আমার নেই। আমাকে বিক্রী করলেও জুটবে কি না সন্দেহ। আমি প্রথম যখন চাকরিতে ঢুকি তখন যিনি বড়বাবু ছিলেন একছড়া কাঁচকলা মাঝে মাঝে দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি ডিস্‌-পেপসিয়ার রুগি ছিলেন, কাঁচকলা পেলে ভারী খুশী হতেন। তারপর যিনি এলেন তাঁকে ডালি দিতে হত। অন্য কিছু নয়, পুজোর সময় ফলটা পাকড়টা, আমের সময় কিছু ল্যাংড়া আম। এর বেশী নয়। তারপর এলেন বিশ্বম্ভর গোঁসাই। তাঁকে কিছু দিতে হ'ত না, তাঁর কাছে কেবল বলতে হত যে তাঁর যিনি গুরুদেব—১০৮ শ্রীঅলখ অবধূত—তিনিই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অবতার, তিনি নিজের ঢোল নিজে বাজাচ্ছেন না বলে লোকে তাঁকে চিনতে পারছে না। এই বললেই

গোঁসাইজি খুশী হতেন। গোঁসাইজির পরে এলেন মিষ্টার পাকড়াশি। একের নম্বর হারামজাদা। কিন্তু একটি বোতল মদ দিলেই শিবটি। যা চাও তাই দেবে। এখন দেশের স্বাধীনতা হয়েছে। আমাদের বড়বাবু খদ্দর পরছেন। শুনলাম আমাদের নরেনের ভাইপোর চাকরিটি হয়েছে একটি রেডিও দিয়ে। নগদ সাতশ' টাকা লেগেছে। বড়বাবুর এখন একটা রেফ্রিজারেটারের দিকে ঝোঁক হয়েছে না কি শুনলাম। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব আমি। তাই শজারু খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"শজারু ? কেন ?"

"বড়বাবুর পেটে কি এক ব্যথা হয়েছে, একজন হাকিম না কি বলেছে শজারুর মাংস খেলে ভাল হয়ে যাবে। বড়বাবু চারিদিকে শজারুর সন্ধান করছেন। ভৌমিক আমাকে বলেছিল এই বনে নাকি শজারু আছে। সেই খোঁজে আজ বেরিয়েছিলাম তাই। আজ স্বাধীনতা দিবসে বড়বাবুকে যদি একটা শজারু ধরে দিতে পারি হয়তো খুশী হবেন। ওই ঝোপের পাশে একটা গর্তর মতো দেখলাম, শজারুর কাঁটাও পড়ে আছে দু'একটা। চলতো দেখি একবার ভাল করে।"

পিতা ও পুত্র উভয়েই গুঁড়ি মারিয়া ঝোপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। ফুল ও পাতাগুলি শুকাইতে লাগিল।

কেডলী স্যুপ

নাম যদিও ব্রহ্মানন্দ আনন্দ পান কিন্তু মাংসে। মুর্গিতে ষোল আনা লোভ। সেই জন্যেই বন্ধুত্ব হয়েছিল খলিলের সঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও। খলিলের বাড়িতে বিনা খরচায় ব্রহ্মানন্দ মুর্গ-মুসল্লমের যে আস্বাদ পেয়েছিলেন তা ভোলবার নয়। লীগ মিনিস্ট্রির তিক্ততাও সে মাধুর্যকে কমাতে পারে নি এক তিল। খলিলের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের বন্ধুত্ব বরাবর অটুট ছিল। খবরের কাগজের সম্পাদকীয় দুর্গ-নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি একটুও চিড় খাওয়াতে পারে নি তাতে। শুধু মুরগি নয়, আর একটা কারণও ছিল। লীগ মিনিস্ট্রির কল্যাণে খলিল বন্দুক পেয়েছিল একটি। সেই বন্দুক দিয়ে ঘুঘু, শরাল, বুনো হাঁস প্রভৃতি শিকার করে খলিল মিঞা যে সব মোগলাই ভোজ্য বানাত বন্ধু ব্রহ্মানন্দও তার অংশ পেতেন প্রচুর। সুতরাং গান্ধী-জিন্না প্যাক্ট বারবার বিফল হচ্ছিল যদিও, ব্রহ্মানন্দ-খলিল সৌহার্দ্য ঠিক ছিল। দৃঢ়তর হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু গড়বড়িয়ে গেল সব। দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের সমস্ত আনন্দ অন্তর্হিত হল। খলিল হিন্দু পাড়ায় বাস করত। পালাতে হল তাকে। ভয়েই পালিয়েছিল

সম্ভবত। বন্দুকটাও নিয়ে যেতে পারে নি। ব্রহ্মানন্দের কাছে থেকে গেল সেটা। অদৃষ্টের পাকে চক্রেই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, তা না হলে মুসলমানের বন্দুক হিন্দুর হাতে পড়বার কথা নয়। বন্দুকের ঘোড়াটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল একটু। ব্রহ্মানন্দের পরিচিত একটি মিস্ত্রি থাকায় নিখরচায় বন্দুকটি মেরামত হয়ে যাবে বলে খলিল বন্দুকটি ব্রহ্মানন্দকে দিয়েছিল। ঠিক তারপরই মার মার শব্দে দাঙ্গা বেধে গেল, পালাতে হল খলিলকে। ব্রহ্মানন্দ বেকায়দায় পড়ে গেলেন একটু। স্থকতো, চচ্চড়ি, কলাইয়ের ডাল, বড়জোর মৌরলা মাছের টক্ কাঁহাতক আর খাওয়া যায়! মুরগির কথা কল্পনাও করা যায় না, প্রথমত দাম, দ্বিতীয়ত বাড়িতে ঢুকতে দেবে না পিসিমা। মাঝে মাঝে রেস্তোঁরায় ঢুকে চপটা কাটলেটটা খেয়ে আসেন ব্রহ্মানন্দ, কিন্তু জুৎ হয় না। এই ভাবেই দিন কাটছিল, এমন সময় তাঁর সেই পরিচিত মিস্ত্রিটি খলিলের বন্দুকটা সারিয়ে দিল তাঁকে। ব্রহ্মানন্দ যেন অকূলে কূল দেখতে পেলেন। যদিও তিনি বন্দুক ছোঁড়েন নি কোন দিন (খলিলই বরাবর শিকার করত, তিনি দ্রষ্টা ছিলেন মাত্র) তবু তিনি অকূলে কূল পেলেন। তার বিশ্বাস হল চেষ্টা করলে তিনিও বন্দুক ছুঁড়তে পারবেন। মানুষেই তো বন্দুক ছোঁড়ে, তিনিই বা পারবেন না কেন? পারতেই হবে। মৌরলা মাছের টক খেয়ে কাঁহাতক থাকা যায়! স্থতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে তাঁর মেসোমশায়ের খুড়শ্বশুরের দ্বারস্থ হলেন। সেই খুড়শ্বশুরের সঙ্গে নাকি কংগ্রেস-ওয়ার্কার হরকালী নাগের খুব দহরম মহরম। নাগমশাই যদি একটি চিঠি দিয়ে দেন তাহলে পুলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট নির্ঘাত ব্রহ্মানন্দ সাণ্ডেলকে বন্দুক ব্যবহারের যোগ্যপাত্র বলে বিবেচনা করবেন। তিনি যদি যোগ্যপাত্র বলে মনে করেন তাহলে বন্দুকের লাইসেন্স পেতে দেরী হবে না। আর বন্দুকের লাইসেন্স পেলে মৌরলা মাছের বদলে শরাল হাঁস, না হয় ঘুঘু, না হয় হরিয়াল, একটা না একটা কিছু জুটবেই। ব্রহ্মানন্দ অনন্য-কর্ম হয়ে দিবারাত্রি তদ্বির করতে লাগলেন। দেখা গেল হরকালী নাগের সত্যিই কলমের জোর আছে। তাঁর একটি চিঠিতেই কাজ হয়ে গেল। ব্রহ্মানন্দ বন্দুকের লাইসেন্স পেয়ে গেলেন। টোটাও কিনে ফেললেন। একটি আপদ কিন্তু জুটল। ওই হরকালী নাগের ভাই শিবকালী। সে ছোকরা বলে বসল—"শিকারে কবে বেরুচ্ছেন সাণ্ডেলমশাই। আমরা খবর টবর যেন পাই। একলাই খাবেন না—"

ব্রহ্মানন্দকে জিভ কেটে বলতেই হল—"আরে না, না, সে কি কথা। পরশু দিন সকালেই শিকারে বেরুবো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তুমি আমার বাসায় খেও।"

"আচ্ছা আসব।"

২

সমস্ত দিন নাওয়া খাওয়া নেই। বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ব্রহ্মানন্দ। তিনটি ফায়ার করেছিলেন কিন্তু একটিও ব্রহ্মাস্ত্র হয়নি। একটি পাখীর একটি পালকও খসেনি। আশপাশের কাকগুলো সচকিত হয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কেবল। ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করলেন শরাল হাঁস মারা সহজ নয়, ঘুঘুও অত্যন্ত চালাক পাখী। রোক চড়ে গেল তাঁর, মারতেই হবে একটা কিছু। শিবকালী ছোকরা আবার সন্ধ্যাবেলা খেতে আসবে। ওই একটা ঘুঘু না? কলাগাছের ফাঁক দিয়ে ল্যাজটা দেখা যাচ্ছে? কাদের বাগান এটা? গুঁড়ি মেরে মেরে অগ্রসর হতে লাগলেন ব্রহ্মানন্দ। গুড়ুম গুড়ুম—পর পর দুটো ফায়ারই করলেন একটু পরে। এবার ফল ফলল।

"কে বন্দুক ছুঁড়ছে!"

বাগানের গেট খুলে ঝাঁকড়া গোঁপ-ওয়ালা এক বলিষ্ঠ ব্যক্তি বেরিয়ে এল। কালো মুশকো চেহারা। মাথার চুল তো বটেই ভুরুগুলো পর্যন্ত খাড়াখাড়া।

"ঘুঘুটা পড়েছে নাকি"—

সপ্রতিভ হাসি হেসে এগিয়ে এলেন ব্রহ্মানন্দ।

"ঘুঘু? আপনি বন্দুক ছুঁড়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কি সর্বনাশ করেছেন দেখবেন আসুন।"

"সর্বনাশ, মানে?"

"আসুন না স্বচক্ষেই দেখবেন।"

দুরু দুরু বক্ষে স্খলিত চরণে ব্রহ্মানন্দ বাগানে প্রবেশ করলেন।

"ওই দেখুন, কাঁদির প্রত্যেকটি কলা জখম হয়েছে।"

ব্রহ্মানন্দ নির্নিমেষে ছররা-বিধ্বস্ত কলার কাঁদির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

"ঘুঘুটাকে মিস্ করেছি।"

"কলার দামটা দিয়ে যাবেন অনুগ্রহ করে।"

"দাম?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাম। দাম না দিলে বন্দুকটি কেড়ে রেখে দেব। আমার নাম ভৈরব নিউগি—"

ব্রহ্মানন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ঘি, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, হলুদ, ধনে, জিরেবাটা, তেজপাতা, গরম মসলা, এমন কি জাফরান পর্যন্ত। খেতে বসে শিবকালী একটু চেখে বললেন—"এ কিসের মাংস মশাই ?"

"খেয়েই দেখুন না।"

শিবকালী আর একটু খেয়ে বললেন—"এ যে কাঁচকলার ঝোল মনে হচ্ছে ! কি বলুন তো ব্যাপারটা।"

"কেডলী স্যুপ।"

"কেডলী ? কদলীকে কেডলী করেছেন নাকি ?"

"আরে না, না, খেয়েই দেখুন না। গোয়ানিজ প্রিপারেশন—"

দেশী ও বিলাতী

তখন হাসপাতালে চাকরি করি।

মফঃস্বলের একটি কলে বাহিরে গিয়াছি। স্থানটি পল্লীগ্রাম, শহর হইতে বেশ কিছু দূরে। পাঁচ ক্রোশ পথ গো-শকটের সাহায্যে অতিক্রম করিয়া গিয়া দেখি রোগটি অতিশয় সাঙ্ঘাতিক।

একটি শিশুর ডিপথিরিয়া হইয়াছে। শ্বাসনালিটি অবরুদ্ধ, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের খুবই কষ্ট হইতেছে। শ্বাসনালিতে অস্ত্রোপচার করিয়া শ্বাস কষ্টটা লাঘব করিলাম বটে, কিন্তু ডিপথিরিয়ার ইনজেকশন না দিলে যে ছেলেটির জীবন সংশয় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

পল্লীগ্রামে ডিপথিরিয়া অ্যাণ্টিটক্সিন পাওয়া গেল না। আমাদের হাসপাতালের ভাণ্ডার পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। শহরের দোকানগুলিতে খুঁজিয়াও পাইলাম না। নিরুপায় হইয়া তখন কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিতে হইল।

প্রথমে একটি বিখ্যাত দেশী দোকানেই করিলাম। লিখিলাম, "একটি মুমূর্ষু রোগীর জন্য ঔষধটি অবিলম্বে প্রয়োজন। টেলিগ্রাম পাইবামাত্র পাঠাইয়া দিবেন।" তাহার পর কি মনে করিয়া একটি বিলাতী দোকানেও করিলাম। মনে হইল কি জানি এক স্থানে যদি টেলিগ্রামের গোলমাল হইয়া যায়। যদি দুই স্থান হইতেই ঔষধ আসে ক্ষতি নাই। যাহা বাঁচিবে আমি হাসপাতালেই কিনিয়া লইব।

…পরদিন পোস্টাফিসে লোক বসাইয়া রাখা হইল। পার্শেলটি আসিবামাত্র ছাড়াইয়া আনিবে, অযথা দেরী যেন না হয়।…

…কিছুদিন পরে লোকটি আমার বাসায় আসিয়া খবর দিল যে একটিও পার্শেল আসে নাই।

বড়ই হতাশ হইলাম। মুমূর্ষু শিশুটির জন্ত দুঃখও হইতে লাগিল। আহা, ঔষধটা ঠিক সময়ে পড়িলে ছেলেটা বোধ হয় বাঁচিয়া যাইত।

অদৃষ্ট এবং ভগবানের ইচ্ছার দোহাই পাড়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাহাই করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলাম।

হাসপাতালে আসিয়া দেখি একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

"আপনিই কি ডাক্তার মুখার্জি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"এই চিঠি আর এই ওষুধ নিন।"

দেখিলাম লোকটি সেই বিলাতী দোকান হইতে আসিয়াছে।

দোকানের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন:

"প্রিয় ডাক্তার মুখার্জি,

আপনার টেলিগ্রাম যখন পাইলাম তখন ডাকে পাঠাইবার সময় ছিল না। আপনি জানাইয়াছিলেন রোগীটি মুমূর্ষু তাই লোক মারফৎ ঔষধটি পাঠাইতেছি। আশা করি ঔষধটি ঠিক মতো আপনি পাইবেন। ঔষধের বিলও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনার রোগী যদি অবস্থাপন্ন লোক হন, তাহা হইলে আমাদের কর্মচারীর যাতায়াতের ভাড়াটাও দিয়ে দিবেন। ইতি…"

তাহার পর দিনও দেশী দোকান হইতে ঔষধ আসিল না।

তাহার পর দিনও না।

সাতদিন পরে তাঁহাদের একটি পত্র পাইলাম।

তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"প্রিয় মহাশয়,

আজকাল নিম্নলিখিত হারে ডিপথিরিয়া অ্যান্টিটকসিনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বর্ধিত হারে আপনি ঔষধ লইবেন কি না জানাইবেন। আপনার পত্র পাইলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইবে। ইতি…"

ইঁহাদের আর পত্র লেখার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ আমার রোগীটি ভাল হইয়া গিয়াছিল।

সত্য

সত্য কথাটা ভুলে যাই আমরা বারবার। গল্পটা শুনুন তবে। সেদিন স্টেশনে লোকে লোকারণ্য। একে জংশন স্টেশন, তার উপর তিন চারখানা ট্রেন লেট। হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারি, পেশোয়ারি, ফিরিঙ্গি সবরকম লোক কিলবিল করছে। ওয়েটিং রুমে স্থান নেই। প্লাটফর্মের উপর উপচে পড়েছে যাত্রীর ভীড়। শিশুর চীৎকার, ফেরিওয়ালার চীৎকার, এনজিনের শব্দ, কুলিদের কলহ মিলে একটা হট্টগোল চলেছে। আমি পুঁটুলিটি হাতে করে একধারে দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে ইংরেজরা চলে গিয়ে কি দুর্গতিই হয়েছে আমাদের। ইংরেজদের আমলে দেশ-সুদ্ধ চোর যেন মুখোস পরে ছিল। তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখোস খসে পড়ে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে সকলের। চাষী, মজুর, চাকুরে, ব্যবসাদার সবাই যেন পাল্লা দিয়ে জোচ্চুরি করছে। নেতারা পর্যন্ত স্যাতা হয়ে গেল। আমার চিন্তাটা অবশ্য ঠিক যে একরঙা ছিল তা নয়। আমি এর অপর দিকটাও ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক অব্যবহিত পরে অন্যান্য দেশের অবস্থা কি আমাদের চেয়ে ভাল ছিল? সাধারণ লোকে কি আমাদের চেয়ে সুখে থাকত? ফরাসী বিদ্রোহের ঠিক পরের অবস্থা তো সাংঘাতিক হয়েছিল। বলশেভিকরা যখন রাজ্য অধিকার করল তখন সাধারণ লোকেদের অবস্থা যা হয়েছিল তা—সহসা আমার চিন্তায় সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রং লাগল এক পোঁচ। জেনানা ওয়েটিং রুমে আমার স্ত্রীকে ঢুকিয়ে দিয়েছি, যা ভীড়, বেচারি বসতে পেয়েছে কিনা কে জানে। খোকাটাকে কোলে করে যদি দাঁড়িয়ে থাকত হয়, কোলে করেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যা দামাল দুরন্ত···আমার এ চিন্তাকেও ছিন্নভিন্ন করে পরমুহূর্তে বেজে উঠল একটা ঘন্টা—ঢননং ঢননং ঢননং ঢননং। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম কোন গাড়ীটা আসছে। জানা গেল আমাদের কারও গাড়ী নয়। আগের স্টেশনে অনেক বাস্তুহারা এসে জমেছিল, তাদের নিয়েই স্পেশাল ট্রেন আসছে একটা, আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না, সমস্যা বরং জটিল হবে, কারণ ওই এক গাড়ী বাস্তুহারা এসে এই প্লাটফর্মেই নামবে। এমনিতেই তো তিল ধারণের স্থান নেই। তার উপর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। মন্থর গতিতে বিরাট ট্রেনটা এসে দাঁড়াল একটু পরে। আর তার থেকে নামতে লাগল ভীত চকিত অসহায় মানুষের দল। মানুষ, না পশু? পরমুহূর্তেই মনে হল, না,

ওরা হিন্দু বাঙালী, এই ওদের একমাত্র অপরাধ ! সমস্ত মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। চোখ বুজে বসে পড়লাম। মুদিত চোখের সামনে কৃতী হিন্দু বাঙালীরা যেন মিছিল করে এল আর চলে গেল। এঁরাই না স্বাধীনতা মন্ত্রের উদ্গাতা ? এঁদেরই উত্তরাধিকারী আমরা কোথায় তলিয়ে গেলাম ! আমরা তবু কোনক্রমে টিকে আছি কিন্তু আমাদের বংশধরেরা কি পারবে ? খোকার মুখটা সহসা মনে ভেসে উঠল আবার। এই প্রাদেশিকতা-সঙ্কীর্ণ ভারতের আত্মকেন্দ্রিক জনতায় আমার খোকন কি আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে কোনদিন ? চোখ বুজে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ চীৎকার চেঁচামেচিটা বেড়ে যাওয়াতে উঠে দাঁড়াতে হল। দেখলাম জনতার মধ্যে কলহ শুরু হয়ে গেছে।

কান পেতে শুনলাম—কে একজন তারস্বরে বলছেন— "আরে রেখে দিন মশাই, ওসব প্যাক্টের ভাঁওতায় ভোলবার ছেলে আমরা নই। ওসব কেবল আই ওয়াশ, মনকে চোখ ঠারা। বাঙালী হিন্দু মরছে মরুক তার জন্যে জহরলাল মাথা ঘামাতে যাবে কেন। কাশ্মীরে সোলজার পাঠিয়েছিল কেন জানেন ? নিজে কাশ্মীরী যে। হায়দ্রাবাদ বাংলাদেশ হলে হায়দ্রাবাদেও সোলজার যেত না।"

আর একজন কে প্রত্যুত্তর করলেন শুনতে পেলাম। তাঁর গলার আওয়াজও কম নয়।

"দেখুন মশাই, আপনি যা বললেন তাতে আপনার বুদ্ধির পরিচয় পাচ্ছি না, পরিচয় পাচ্ছি নীচ মনের। পাকিস্তান একটা ডোমিনিয়ন সে কথা মনে রাখবেন। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে হয়তো থার্ড ওয়ার্লড ওয়ার বেধে যাবে। একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন যে পাকিস্তান হচ্ছে ইংরেজদের সৃষ্টি ভারতের স্বাধীনতাকে খর্ব করবার জন্যে। এরা তো চাইছেই যে আমরা যুদ্ধটা ঘোষণা করি।"

"কেন যুদ্ধ ঘোষণা করলে কি হত ?"

"পাকিস্তানের নামে আমেরিকান সুপার ফোর্ট্রেস এসে পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই আমাদের ঠাণ্ডা করে দিত। যাদের হাই তুলতে গেলে চোয়ালে খিল ধরে যায় তাদের বন্দুক কাঁধে করতে না যাওয়াই ভাল।"

"দেখুন মশাই, আমাদের আর সেদিন নেই—"

কোলাহল ক্রমশ এত তুমুল হয়ে উঠল যে আর কিছুই শুনতে পেলাম না। দু'জন বাঙালীই বোধহয় তর্কটা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অবাঙালীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। অনুভব করলাম প্রো-জহরলাল এবং অ্যান্টি-জহরলাল দুটো দল হয়েছে এবং বাংলা, হিন্দী, ইংরেজি ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিচ্ছে। গালাগালি শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হবার

উপক্রম হল। প্রায় সাতফুট লম্বা চাপ-দাড়ি একজন পাঞ্জাবী সরদার চক্ষু রক্তবর্ণ করে এমন আস্ফালন-করতে লাগলেন যে মনে হতে লাগল বুঝি তিনি কাউকে মেরেই বসবেন বা।

এমন সময় আমার কাছায় টান পড়ল। ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আলুথালু বেশে দাঁড়িয়ে আছেন। "খোকনকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়েছিলুম, টুক করে হামা দিয়ে কখন সে বেরিয়ে গেছে। আমি পাশের একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম একেবারে টের পাইনি।"

সর্বনাশ! এই ভীড়ে ওইটুকু শিশু একেবারে পিষে যাবে যে! অসহায়ভাবে জনতার দিকে চেয়ে দেখলাম। তাদের উষ্মা বেড়েছে বই কমেছে বলে মনে হল না! পাঞ্জাবী সরদারের চোখ আরও রক্তবর্ণ হয়েছে।

"কোন দরজা দিয়ে বেরিয়েছে দেখতে পাওনি?"

"পেলে তো ধরেই ফেলতাম। তবে ওদিকের দরজাটাও খোলা আছে। প্লাটফর্মের দিকে বেরুলে ঠিক দেখতে পেতাম, ঠিক ওই দিকেই বেরিয়ে গেছে।"

প্লাটফর্মের এই বিরাট জনতায় খোকনকে খোঁজবার চেষ্টা করা মানে যে কি তা ভাবতেও হৃদ্‌কম্প হচ্ছিল আমার। আগে বাইরের দিকটাই দেখে আসা যাক। বেরিয়ে গেলাম। কোথায় খোকন? তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম চারিদিক, এমন কি স্টেশনের বাইরে গাড়ির স্ট্যাণ্ড, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কোথাও খোকন নেই। যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই প্রশ্ন করলাম—"একটি ছোট ছেলেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখেছেন ওয়েটিং রুম থেকে?" কেউ দেখেনি। একজন অযাচিত উপদেশ দিলেন, "সাবধান মশাই, চারিদিকে ছেলেধরা ঘুরছে, পুলিশে খবর দিন যদি না পান।"

…প্লাটফর্মে এসে ঢুকলাম আবার। এই ভীড়ে কি করে যে খুঁজব! প্লাটফর্মে ঢুকেই কিন্তু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। গোলমাল থেমে গেছে। তর্কাতর্কি, কলহ, চীৎকার একদম নেই। মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজ উঠছে বরং। ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একি, খোকন সবার কোলে কোলে ঘুরছে। আমি যখন কাছাকাছি এলাম সরদারজি তখন খোকনকে কোলে নিয়েছেন এবং খোকন দুহাত দিয়ে তাঁর চাপদাড়ি মুঠো করে ধরেছে। হঠাৎ যেন এক ডিক্‌টেটার এসে থামিয়ে দিয়েছে সব গোলমাল। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। একটু আগেই মনে হচ্ছিল ভবিষ্যতে খোকনরা কি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে নিজেদের? এই তো এখনই পেরেছে! যা প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর, তার আধিপত্যকে অস্বীকার করবে কে!

ছোট্ট গল্পের গল্প

অদৃশ্য মানসিক টেলিফোনে বারম্বার 'রিং' করিবার পর অবশেষে ছোট গল্পের সাড়া পাইলাম।

"কি বলছেন ?"

"তোমার যে দেখাই পাই না আজকাল, ব্যাপার কি !"

"আজকাল পুজোর মরশুম যে! সব লেখকই ডাকাডাকি করছেন। মোটে অবসর নেই। আপনার কলমের ডগাতেও হাজির হতে হবে নাকি !"

"হবে বই কি। আমারও তো পুজোর মরশুম—"

"বেশ যাব। কখন আপনার অবসর ? আগে তো রাত বারোটার পর লিখতেন !"

"এখন বিয়ে করে সংসারী হয়েছি। এখন—"

"কখন যাব তাহ'লে বলুন।"

"এখনই এস না।"

"এখনই ?"

"কেন, কোনও অসুবিধে আছে কি ?"

"আচ্ছা যাচ্ছি।"

অদৃশ্য ট্যাক্সি চড়িয়া ছোট গল্প আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। সেই তন্বী কিশোরীটি, যাহাকে আমি চিনিতাম, সে কোথায় ? এই ভীমকান্তি মহিলাটি তো সে হইতে পারে না ! তন্বী কিশোরীকেও ভীমকান্তি মহিলায় রূপান্তরিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এত অল্প সময়ে তাহা তো হয় না। সেদিনই তো রাস্তার মোড়ে অন্ধ ভিখারীটির পাশে তাহার দেখা পাইয়াছিলাম। বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিন থাক চিবুকের খাঁজে খাঁজে পাউডার, বৃত্তাকার সকজ্জল চক্ষু, সুপুষ্ট অধরোষ্ঠে সুপুষ্ট রং, বিরাট দেহ ঘিরিয়া জমকালো একটা বেনারসী শাড়ী, ব্লাউজের হাতায় সোনার জরি, দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অলঙ্কারের বাহুল্য, আংটি গোটা তিনেক। রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেলাম।

"চিনতে পারছেন না নিশ্চয়—"

মহিলা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিটি ঠিক তেমনি আছে! দেহটা এমনভাবে বদল হইল কি করিয়া! ছিঃ, ছিঃ।

"সত্যি চিনতে পারছি না। অসম্ভব মনে হচ্ছে একেবারে। এ কি কাণ্ড!"

"প্রকাশকের বাড়ী থেকে সোজা চলে আসছি কিনা। 'মেক-আপ'-টা ছাড়া হয়নি এখনও। আমি এখন ছোট গল্প নই মশাই। আমি এখন উপন্যাস। আধুনিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সমন্বিত, পাঁচজন অধ্যাপক, তিনজন সমালোচকের প্রশংসাপত্র সম্বলিত জগদ্দল কাণ্ডকারখানা।"

মুখোসটা সহসা খুলিয়া ফেলিল। সেই লাবণ্যময় মুখ, চোখের দৃষ্টিতে সেই সকৌতুক হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

"এত মোটা হলে কি করে?"

"খড়, তুলো আর নারকোল ছোবড়ার সাহায্যে।"

"এ রকম করবার মানে?"

"প্রকাশকদের কাছে ছোট গল্পের আদর নেই! ছোট গল্পের আদর মাসিকের পাতায়। প্রকাশকদের কাছে যেতে হলে তাই উপন্যাসের 'মেকআপ' নিয়ে যাই! পাশের ঘরটা খালি আছে কি? এগুলো তাহলে ছেড়ে ফেলি।"

"খালি আছে।"

"ট্যাক্সি থেকে আমার সুটকেশটা নিয়ে আসি তাহ'লে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেব কি? কতক্ষণ দেরী হবে আপনার।"

"ট্যাক্সি ছেড়ে দাও।"

ক্ষণকাল পরে সুটকেশ হস্তে ছোট গল্প প্রবেশ করিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া 'মেক-আপ' ছাড়িতে লাগিল। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল স্বপ্ন নয় তো!

"একটা সাবান আর একটু জল পেলে ভাল হ'ত! দিতে পারেন?"

ঘরে ভিতর হইতেই সে বলিল।

"ঠিক পাশেই চানের ঘর। ঢুকে যাও সব পাবে।"

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ছোট গল্প স্বস্থ হইয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল! এবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। তাহার যে রূপ আমাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, সেই অর্ধস্ফুট মাধুরী আবার প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার চোখের দিকে চাহিয়া তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা সকৌতুক হাসি জলজল করিয়া উঠিল।

"আপনার কি মনে হচ্ছে জানি, দোহাই আপনার, বলবেন না সেটা। আমার সময় নেই। আপনি কি চান বলুন।"

"তোমাকে চাই। ছোট গল্পকে—"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু কি 'মেক-আপ' চান বলুন। সামাজিক, রাজনৈতিক, তত্ত্বমূলক, তথ্যমূলক, দার্শনিক না ঐতিহাসিক, ধাঁচটা কি রকম হবে ?"

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।

"বুঝতে পারছি না ঠিক—গল্প চাই, মানে—"

"বুঝতে পারছেন না ? আচ্ছা, একটা মজা করি দাঁড়ান। আমি একজনের কাজে ম্যাজিক শিখেছি একটা। চোখ বুজুন, এখনই বুঝতে পারবেন।"

"চোখ ? কেন, কি করবে ?"

"চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেব। তারপর আপনি—বুজুনই না চোখ দুটো—দেখতেই পাবেন এখুনি।"

চোখ বুজিলাম। ছোট গল্প আমার চোখের পাতার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমশ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। খানিকক্ষণ পরে অনুভব করিলাম, আমার চোখের পাতায় আর কেহ হাত বুলাইতেছে না। ধীরে ধীরে চোখ খুলিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত।

দেখিলাম আমার টেবিলে বই, খাতাপত্র কিছু নাই, কেবল সারি সারি নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সাজানো রহিয়াছে। রুটি, পরোটা, লুচি, কচুরি, সিঙ্গাড়া, নিমকি, খাজা, গজা, বালুশাই, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, হালুয়া এবং ইহাদের পাশে (একটু বেমানান ভাবেই) এক-কড়াই ময়দার আটা, চলিত বাংলায় যাহাকে লেই বলে। অবাক হইয়া গেলাম। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম ছোট গল্প নাই, কোথায় গেল সে ? সহসা তাহার গিটকিরিভরা কলহাস্য বাতায়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশের পটভূমিকায় একটি সবুজ গমের শীষ বাতাসে ধীরে ধীরে দুলিতেছে।

...গমের শীষ কথা বলিতে লাগিল।

"...টেবিলের ওপর যা দেখছেন ওর প্রত্যেকটি আমারই রূপান্তরিত অবস্থা। ঐ একধারে যে লেইটা আছে ওটাও। যে আমি একদিন উদার আকাশের তলায় শ্যামল মাঠে সবুজ গমের শীষ ছিলাম, সেই আমি নানা রকম 'মেক-আপ' নিয়ে ওই অত রকম হয়েছি। আমার প্রত্যেক 'মেক-আপ'টাই বাজারে চলছে। এইবার দেখুন—"

দেখিলাম, কেকের সহিত বিস্কুটের মারামারি বাধিয়াছে। সহসা দুইটি কাগজ শূন্য হইতে ভাসিয়া আসিল। দুইটি অদৃশ্য হস্ত কাগজ দুইটিতে খস্ খস্ করিয়া কি যেন লিখিয়া চলিয়াছে। লেখা শেষ হইলে দেখিলাম, দুইটি হস্তই নিজের নিজের কাগজে বেশ করিয়া লেই মাখাইয়া দুই দিকের দেওয়ালে সাঁটিয়া

দিল। একটি কাগজে বিস্কুটের জয়গান, আর একটি কাগজে কেকের। আরও দেখিলাম, বিস্কুটের দিকে নিমকি, সিঙাড়া, কচুরি, পরোটা যোগদান করিয়াছে, কেকের দিকে লুচি, রুটি, হালুয়া, খাজা। গজা এবং পাঁউরুটি কোন দিকে যোগদান করে নাই, শান্তির বাণী আওড়াইতেছে, শূন্য হইতে ক্রমাগত কাগজ ভাসিয়া আসিতেছে আর অদৃশ্য হস্ত দুইটি ক্রমাগত লিখিয়া চলিতেছে। দুই দিকের দেওয়াল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

গমের শীষ বলিল, "সবুজ গমের শীষ বাজারে কেউ চায় না আজকাল। নিছক ছোট গল্পেরও বাজার দর নেই। একটা ছাপ চাই। কি ছাপ নিয়ে আপনার কাছে আসব বলুন ?"

"আমি ছাপ চাই না! আমি সবুজ শীষের গল্পটাই শুনতে চাই। তোমার কথা, তোমার ব্যথা, তোমার আনন্দ, তোমার কল্পনা—যা তুমি কাউকে কোনদিন বলনি,—কিন্তু যা তোমার মর্মে অহরহ জাগরূক হয়ে আছে সেইটি আমি চাই—"

"সে যে বড় ছোট হবে। একটি মুহূর্তের ঘটনা—"

"হোক ছোট, তাই বল তুমি—"

গমের শীষ ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার কথা শুনিতে পাইলাম।

"একদিন ভোরে আকাশ থেকে এক ঝলক রাঙা আলো এসে পড়েছিল আমার মুখে। আর ঠিক সেই সময়ে মৃদু একটি হাওয়া এসে দোল দিয়েছিল আমার সর্বাঙ্গে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ফড়িং লাফিয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। বিব্রত হয়ে পড়লাম আমি। একটু পরে যখন সামলে নিলাম তখন দেখি তারা চলে গেছে। সেই রাঙা আলোর ঝলক আর মৃদু হাওয়ার পরশ আর আসেনি আমার জীবনে। আমার সমস্ত 'মেক-আপ' এর মধ্যে এ কথাটি কিন্তু আমি ভুলিনি যে তারা এসেছিল। এখনও আশা করে আছি হয়তো আবার আসবে···

"হ'ল তো ? চললুম।"

সুটকেস হাতে লইয়া ছোটগল্প বাহির হইয়া গেল।

উৎসব-দেবতা

স্বপ্ন নাকি সফল হয়েছে, উৎসবের ধুম পড়ে গেছে তাই।

বাজছে কাড়া-নাকাড়া, বাজছে জগঝম্প। লাফাতে লাফাতে ঢাকিগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাস উঠছে, তবু থামবার উপায় নেই। উৎসব যে, থামলে চলবে না। লাফাতে লাফাতে বাজিয়ে চলেছে তাই ক্রমাগত। থামলেই চাকরি যাবে। বাঁশি-ওলা, কাঁসি-ওলা, সানাই-ওলা, সকলেরই ওই এক দশা।

শব্দ হচ্ছে ভয়ঙ্কর। সাধারণ লোকের কথাবার্তা শোনা যায় না। উৎসবের হট্টগোলে চাপা পড়েছে সব।

উৎসব-দেবতা স্থাপিত হয়েছেন উৎসব-মণ্ডপে। সাড়ম্বরে সজ্জিত করা হয়েছে তাঁকে—বহু বর্ণে, বহু অলঙ্কারে। বহু ঋত্বিক, বহু পুরোহিত, বহু অধ্বর্যু, বহু উদ্‌গাতা সমবেত হয়েছেন। উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ চলছে, আরতি হচ্ছে নানা ভঙ্গিতে, শঙ্খঘণ্টার রোলে দশ দিক প্রকম্পিত হচ্ছে মুহুর্মুহু।

কবি দাঁড়িয়েছিলেন নাটমন্দিরের প্রাঙ্গণে উৎসব-দেবতার প্রতিমূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে। তিনি অনুভব করলেন, উৎসব-দেবতা আসেন নি। যাকে ঘিরে কোলাহল চলেছে, তা খড়-মাটি রঙ-রাংতার পিণ্ডমাত্র, উৎসব-দেবতা আবির্ভূত হন নি ওর মধ্যে।

অভিমান হ'ল কবির। স্বপ্ন সফল হয়েছে, অথচ উৎসব-দেবতা এলেন না কেন? নিজের ঘরে গিয়ে তিনি সেতারে বাজাতে লাগলেন ভৈরবী। ভৈরবীর করুণ-মধুর সুরের পথ ধ'রে গেলেন তিনি উৎসব-দেবতার দ্বারে।

এস এস, কবি এস, তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। উৎসব-দেবতা উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন কবিকে। কবি বললেন, আমাদের উৎসবে গেলেন না কেন আপনি? ডাক তো আসে নি। কোন সাড়াশব্দও তো পাই নি। এত ঢাক-ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজছে—

কই, শুনি নি তো।

তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে দেখলেন।

হ্যাঁ, কতকগুলো লোক লম্ফঝম্প করছে বটে, কিন্তু উৎসবের বাজনা তো শোনা যাচ্ছে না!

কবিও এগিয়ে গিয়ে দেখলেন। ঠিকই তো, লাফালাফিটাই দেখা যাচ্ছে কেবল, সুর শোনা যাচ্ছে না।

উৎসব-দেবতা মৃদু হেসে বললেন, আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ এতদূর পর্যন্ত

এসে পৌঁছয় না। ও তোমাদের মণ্ডপেই নিবদ্ধ আছে। উৎসব কিন্তু জমেছে এক জায়গায়। চল, সেইখানে যাই।

কোথায় ?

চলই না।

নিমন্ত্রণ পাই নি যে !

এখনই পাবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক। একটা অদৃশ্য আনন্দ-সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

হ'ল তো ? কত সহজ সরল ওদের নিমন্ত্রণের ভাষা ! চল, যাই।

এই বেশে ?

এই বেশে কি যাওয়া যায়। বেশ পরিবর্তন করতে হবে। ওরা যেন বুঝতেও না পারে যে, আমরা গেছি। নিমন্ত্রণও করেছে অজ্ঞাতসারে, আমরা উৎসবে যোগও দেব ওদের অজ্ঞাতসারে। জানাজানির-টানাটানিতে উৎসব যায় মাটি হয়ে।

গলির গলি, তস্য গলি। সেখানে নর্দমার ধারে খেলা জমেছে দুটি শিশুর। ধুলো স্তূপীকৃত ক'রে মন্দির তৈরী করছে তারা। ধুলোর মন্দির ধূলিসাৎ হচ্ছে বার বার। কিন্তু ব্যর্থতার গ্লানি জমছে না একটুও, ভেসে যাচ্ছে অনাবিল হাসির তোড়ে। ঠিক তাদের পিছনে নামহীন এক বন্যগুল্মে ফুল ফুটেছে একটি, আর সেই ফুলকে ঘিরে গুঞ্জন করে চলেছে এক মধুকর। গাছের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদের টুকরো এসে পড়েছে তাদের উপর।

স্বাধীনতার জন্ম

ডিমের ভিতরে ভ্রূণ একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপ্ন। আকাশে উড়িবে। আকাশ কি জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল। আকুলতা ছিল, আগ্রহ ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে। কিন্তু বাধা দুস্তর। একটা লালার সমুদ্রে সে হাবুডুবু খাইতেছে। সে সমুদ্রও সীমাবদ্ধ। ঊর্ধ্বে নিম্নে দক্ষিণে বামে কঠিন অস্বচ্ছ প্রাচীরের পরিবেষ্টনী। প্রাচীর অতিক্রম করিয়াও স্বাধীনতা নাই। আছে পালকের জঙ্গল। পক্ষীমাতার কুক্ষিগত সে। স্বাধীনতা কোথায় ?

সহসা বাহিরের বাতাস যেন তাহাকে স্পর্শ করিল। সহসা যেন সে অনুভব করিল, পক্ষপুটের আবরণ নাই। স্বপ্নের ঘোরেই সে প্রশ্ন করিল, আমি কোথায় আছি ?

স্বপ্নের ঘোরেই শুনিল, আমার হাতের উপর।

কে তুমি?

মানুষ।

কোথায় লইয়া চলিয়াছ?

এখনই বুঝিতে পারিবে।

তুমি কি আমাকে স্বাধীনতা দিবে?

নিশ্চয়ই!

যে খোলা আমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ভাঙিয়া দিবে?

অচলায়তন ভাঙিয়া ফেলাই তো আমার কাজ।

ঠক ঠক ঠক ঠক···

ভ্রূণের অন্তরে শিহরণ জাগিল। প্রাচীর ভাঙিতেছে।

এ কি—এ কি—কি করিতেছ তুমি?

ফ্যানাইতেছি।

গেলাম—গেলাম—বাঁচাও—বাঁচাও—কি যন্ত্রণা!—তপ্ত কটাহের ফুটন্ত তৈলে ভ্রূণের আর্তনাদ থামিয়া গেল।

ভ্রূণ মরিল, কিন্তু স্বপ্ন মরিল না।

সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল, এ কি করিলে?

ওম্‌লেট।

স্বপ্ন স্তম্ভিত হইয়া রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর নীত হইল ভ্রূণান্তরে। আবার স্বাধীনতা-স্বর্গ রচনা করিতে লাগিল রূপকথালোকে।

আবার মানুষ আসিল।

কে তুমি?

মানুষ।

আবার স্বাধীনতা দিতে আসিয়াছে?

হাঁ।

তাহার ইচ্ছা হইল, বলে—যাইব না। কিন্তু প্রতিরোধ করিবার শক্তি তো নাই। পক্ষীমাতা সভয়ে সরিয়া গিয়াছে।

মানুষ অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া লইল।

ক্ষীণকণ্ঠে একবার শুধু সে আবেদন জানাইল, এবার আমাকে আর ওম্‌লেট বানাইও না।

যদি ঘি দিয়া ভাজি ?

না।

বেশ, ওমলেট বানাইব না।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব। ওমলেট না বানাইয়া তরকারি বানাইল।

এইভাবে চলিতে লাগিল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

যুগের পর যুগ কাটিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

ডিমের স্বাধীনতা-প্রয়াস মূর্ত হইল নানারূপে নানা মানুষের প্রতিভায়। বিবিধ পাচক, বিবিধ মসলা, বিবিধ ফোড়ন।

কারি, পোচ, ডেভিল, চপ, দোলমায় বিচিত্র সম্ভারে সুসজ্জিত হইল বহুবিধ মহার্ঘ প্লেট দেশে দেশান্তরে।

এ দেশের লোকেরা সুর তুলিল, স্বদেশের ডিমে স্বদেশী খাবার বানাইতে হইবে। তাহাই হইল। ভাতে সিদ্ধ করিয়া, ব্যাসন দিয়া বড়া ভাজিয়া, দেশী ডালনার মসলা দিয়া প্রস্তুত হইল বহুবিধ স্বদেশী ব্যঞ্জন। কচুসহযোগে একজন রাঁধুনী এমন ডিমের ঘন্ট করিলেন যে, সকলের তাক লাগিয়া গেল।

তর্ক বাধিয়া গেল। কোনটা ভাল, দেশী না বিদেশী।

তর্ক পরিণত হইল যুদ্ধে।

একটি ঘটনা কিন্তু ঘটিয়া গেল ইতিমধ্যে।

সু-উচ্চ শাখায় ক্ষুদ্র একটি নীড়ে পক্ষীমাতার চঞ্চু আঘাতে ডিমের খোলা ফাটিয়া গেল একদিন। পক্ষীশাবক বাহির হইয়া আসিল। কুৎসিত কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, সুর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ প্লেটের উপরে নয়, অতি-তুচ্ছ খড়-কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশেপাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেন, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য শত্রু চতুর্দিকে। ও কি বাঁচিবে ?

মৃত্যুহীন স্বপ্নের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয় বাঁচিবে। ও-ই একদিন আকাশে উড়িবে। উহার মধ্যেই নিহিত আছে গরুড়ের শৌর্য, রাজহংসের মহিমা। উহারি পালকে জাগিবে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার, উহারই কণ্ঠে ফুটিবে অনবদ্য সঙ্গীত-মাধুরী। এখন কিন্তু কিছুই নাই। আছে কেবল অসংখ্য অভাব, অসহ্য ক্ষুধা, ব্যায়ত আনন। ক্ষুধার তাড়নায় ক্রমাগত হাঁ করিতেছে। পক্ষীমাতা, কোথায় তুমি, খাবার আন, খাবার আন, খাবার—খাবার—খাবার—

পক্ষী-পুরাণ

সুবিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার 'পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, কি করিয়া পেঙ্গুইন পাখিরা মনুষ্যে রূপান্তরিত হইল এবং নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের কি পরিণতি ঘটিল। পাখিকে মানুষে পরিণত করিবার জন্য কোনও দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা হইল—পাখিরা মানুষ হোক, অমনই তাহারা মানুষ হইয়া গেল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আনাতোল ফ্রাঁস বোধ হয় খবরটি টের পান নাই, পাইলে তাহা নিশ্চয় উক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করিত।

প্রাচীন আর্যগণ বাংলা দেশের তদানীন্তন অধিবাসীদের পক্ষীজাতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুধী-সমাজে এ কথা সুবিদিত। যে কথাটি সুবিদিত নয়, তাহাই আমি বর্ণনা করিতেছি।

পিতামহ ব্রহ্মা একদা নিভৃতে নীরবে মননশক্তি-সহযোগে দেবী সরস্বতীর সহিত নিরুক্ত আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা একটা বেসুরা বিকট চীৎকারে আলোচনা বিঘ্নিত হইল। তিনি উঠিয়া আসিয়া একজন দেবদূতকে চীৎকারের কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ করিলেন।

দেবদূত একটু পরে আসিয়া শুদ্ধ ভাষায় খবর দিল, কমলযোনি, বঙ্গদেশবাসী পক্ষীকুল কলরব করিতেছে। তাহাদের নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনিল না।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পিতামহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীণাপাণির দিকে তাকাইলেন।

ওদের মানুষ ক'রে দিন। মানুষ হ'লে ওরা সভ্য হবে।

বীণাপাণি হাসিয়া অনুরোধ করিলেন।

পিতামহ বাংলা দেশের পক্ষীজাতিকে মানুষ করিয়া দিলেন। মনুষ্যীভূত পক্ষীগুলি কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। পক্ষীরূপে তাহারা মন্দ ছিল না। এদিক ওদিক হইতে খুঁটিয়া আহার করিত, গাছের ডালে রাত কাটাইত, যৌবনকালে মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটাইয়া প্রণয় করিত, খড়-কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় বাঁধিত, ডিম পাড়িত, ডিমে তা দিত, শাবকগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের

প্রতিপালন করিত, তাহার পর তাহাদের পালক গজাইলে তাহারা উড়িয়া চলিয়া যাইত। সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল তাহাদের। মানুষ হইয়া তাহারা বিপদে পড়িয়া গেল। অত সহজে খাবার, বাসা, সঙ্গী, সঙ্গিনী কিছুই পাওয়া যায় না।

এখন যেমন আমরা কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দৌড়াই, তখন মর্তবাসীরা তেমনই সোজা বিধাতার কাছে দৌড়াইতে পারিত। বিধাতাকে খুব বেশি বিরক্ত করার ফলেই বোধ হয় অধুনা আমরা এই সুবিধাটুকু হারাইয়াছি।

বঙ্গদেশ হইতে কান-ছোট সম্প্রদায়ের দলপতি নিখিল-নব-সৃষ্ট-মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিরূপে একদা পিতামহের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। নব-সৃষ্ট-মনুষ্য-সমাজও নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কান-ছোট, নাক-লম্বা, চুল-কোঁকড়া, চোখ-কটা, চিরুন-দাঁত, নাদা-পেটা প্রভৃতি নানারূপ শ্রেণী-বিভাগ ছিল তাহাদের। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময় কান-ছোট সম্প্রদায়ের খুব বাড়-বাড়ন্ত।

কান-ছোট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পিতামহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, প্রভো, আমরা মহা অসুবিধায় পড়িয়াছি। পক্ষীরূপে আমরা সুন্দর ছিলাম, মানুষ হইয়া আমাদের কষ্টের অবধি নাই। উপার্জন করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া উপার্জন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য-প্রদেশবাসীরা শুনিয়াছি ব্যবসায় করে, কিন্তু ধন না থাকিলে ব্যবসায় করা যায় না। আমাদের কিছু ধন দিন।

পিতামহ রেবতী নক্ষত্র-মণ্ডলীতে একটি নব সৌরলোকের পরিকল্পনায় তন্ময় ছিলেন। কল্পনা বাধা পাওয়াতে অষ্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্রকর্ণ খর্বকায় ব্যক্তিটির দিকে চাহিলেন। তাহার পর ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেককেই তো ধন দিয়েছি, আবার ঘ্যান ঘ্যান করছ কেন?

প্রতিনিধিটি সভয়ে শুদ্ধ বাংলা বলিতেছিলেন। পিতামহের মুখে চলতি বাংলা শুনিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। সাহসও পাইলেন।

বলিলেন, কই, আমরা তো কিছুই পাই নি পিতামহ!

আরে, কি আপদ! ধন মানে শক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর শক্তি দিই নি? যাও চ'রে খাওগে, বিরক্ত করো না।

শুধু শক্তিতে কিছু হয় না পিতমহ। মনুষ্য-সমাজে ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই। কিছু মূলধন দিন আমাদের।

তা হ'লে বিশ্বকর্মার কাছে যাও। বিশু, ও বিশু!—পিতামহের হাঁকা-হাঁকিতে বিশ্বকর্মা দ্বার-প্রান্তে আসিয়া উঁকি দিলেন।

আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, এ কি চাইছে একে দাও, যত সব আপদ জোটে এসে। মূলধন! বিশ্বকর্মার ইঙ্গিতে প্রতিনিধিটি বিশ্বকর্মার কক্ষে গিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বকর্মা আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোযোগ-সহকারে তাঁহার সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল! একে ভাঁড়ারে মাল কম, তার উপর পিতামহ আবার একটা নূতন সৌরলোক নিয়ে মেতেছেন, অহরহ নানা রকম ফরমাশ করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেমন ক'রে হোক মাল যোগান দিতে হচ্ছে। দেখি, বাড়তি যদি কিছু থাকে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বসুন একটু।

বিশ্বকর্মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখুন, কিছু রঙ, কিছু বাঁশ, কিছু কাগজ আর খানিকটা আগুন আপনাকে দিতে পারি। এ ছাড়া বাড়তি আর কিছু নেই।

ও-সবে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে?

আপনারা ব্যবসা করতে চান তো? এর প্রত্যেকটি নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারেবেন!

কিছু সোনা বা রূপো—

বাড়তি নেই। পিতামহ যদি বলেন, তা হ'লে দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে সৌরলোক সৃষ্টি করছেন, তাতে সব রকম ধাতু অজস্র লাগছে। সোনার হিমালয়, রূপোর বিন্ধ্যাচল হচ্ছে সেখানে। পারদ-সমুদ্র হবে না কি। কোনও রকম ধাতুই তিনি এখন ভাঁড়ার থেকে বাইরে যেতে দেবেন না; সেদিন স্বয়ং পার্বতীর এক জোড়া দুলের জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিছু সোনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, দিলেন না।

তবু চেয়ে দেখব?

দেখতে পারেন।

আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিনিধিটি ব্রহ্মার ঘরে গিয়া দেখিলেন, চতুরানন নিমীলিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধ্যান ভগ্ন করিতে আর সাহস করিলেন না। বিশ্বকর্মা প্রদত্ত রঙ, বাঁশ, কাগজ এবং আগুন লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে।

সহসা পিতামহের এক দিন খেয়াল হইল, বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ হে বিশু, বাংলা দেশ থেকে সেই যে এক ছোকরা মূলধন চাইতে এসেছিল, তাকে কিছু দিয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল ভাল জিনিসই দিয়েছিলাম। রঙ, বাঁশ, কাগজ আর আগুন। এর যে-কোনও একটা দিয়েই তারা বিশাল ব্যবসা করতে পারে।

নিশ্চয়ই, এত দিনে বোধ হয় ফেঁপে উঠেছে সব। উঁকি মেরে দেখ তো, কি তাদের অবস্থাটা।

বিশ্বকর্মা স্বর্গের বাতায়ন হইতে ঝুঁকিয়া বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখতে পাচ্ছ কিছু? খুব ধূমধাম বোধ হয়? অমন চারটে জিনিস নিয়ে গেছে, বড় বড় বাড়ি হাঁকড়েছে নিশ্চয়?

আজ্ঞে না, বাড়ি-টাড়ি তো তেমন দেখছি না!

কি দেখছ তা হ'লে? জিনিস চারটে নিয়ে কি করলে তা হ'লে ওরা?

ফানুস বানিয়েছে বোধ হয়।

ফানুস?

রঙ-বেরঙের ফানুসই তো উড়ছে দেখছি।

বল কি!

উপকরণ-সংগ্রহ (১)

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে পুষ্টকান্তি গদাধর বলিলেন, "আইস ভাই রামতনু, এবার আমরা সাহিত্য চর্চা করি।"

ক্ষীণকায় রামতনু মিটমিট করিয়া চাহিয়া উত্তর দিলেন, "কেন, রাজনীতি কি ছাড়িয়া দিবে?"

"দিব। কারণ গলার জোর, পয়সার জোর কোনটাই নাই। ওপথে যাওয়াই আমাদের ভুল হইয়াছিল।"

রামতনু হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশিটি হইতে সন্তর্পণে একটু নস্য ঢালিয়া ছোট একটি টিপ দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মনোনিবেশ সহকারে সেটি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কোন জবাব দিতেছ না যে?"

"ভাবিতেছি।"

নস্যের টিপটির প্রতি আর একবার চাহিলেন।

"কি ভাবিতেছ বল না।"

"ভাবিতেছি, সাহিত্য-চর্চাও কি আমরা পারিয়া উঠিব? শুনিয়াছি এসব ব্যাপারে প্রতিভার প্রয়োজন। আমাদের কি তাহা আছে? রাজনীতিতে যেমন গলার জোর, পয়সার জোর চাই, এসব ব্যাপারে তেমনি কল্পনার জোর চাই।"

সূক্ষ্মভাবে আলগোছে নস্য লইতে লাগিলেন।

উত্তেজিত গদাধর উত্তর দিলেন—"আমি কাল্পনিক সাহিত্য-চর্চা করিব না। ওসব সাহিত্যের দিন গিয়াছে। আমি প্রত্যক্ষ সাহিত্য-চর্চা করিতে চাই। যাহাদের দিকে ভাল করিয়া কেহ চাহিয়া দেখে নাই তাহাদের আমরা দেখিব, যাহাদের কথা ভাল করিয়া কেহ শোনে নাই তাহাদের কথা আমরা শুনিয়া পাঁচজনকে শুনাইব—"

"কাহাদের কথা?"

"যাহারা বড়লোক নয়, যাহাদের মোটর গাড়ী নাই, যাহারা চকচকে জামা-কাপড় পরিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় না, যাহারা মাঠে ধান কাটে, বাজারে মোট বয়, বাড়িতে বাসন মাজে—"

"ও! তুমি গণ-সাহিত্যের কথা বলিতেছ? বেশ তো! কি করিবে ঠিক করিয়াছ?"

রামতনুর উৎসাহ-অগ্নি সহসা যেন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

"উহাদের সত্য পরিচয়, উহাদের জীবনধারার খুঁটিনাটি প্রথমে জানিতে হইবে। প্রথমে উপকরণ-সংগ্রহ করা দরকার। ওঠ, বাহির হইয়া পড়ি।"

"এখনই?"

"হাঁ, শুভস্য শীঘ্রম্।"

"বেশ, চল।"

রামতনু সজোরে নস্যর টিপটি নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া চক্ষু আরক্ত করিয়া ফেলিলেন, গদাধর ধরাইলেন একটি মোটা সিগার।

"একটি খাতা আর পেন্সিল লওয়া দরকার।"

"কেন?"

"যাহা দেখিব সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া ফেলিব।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক। লও—"

"কিছু খাবার সঙ্গে লইলে কেমন হয়?"

"উত্তম হয়। কতক্ষণ ঘুরিতে হইবে স্থিরতা নাই।"

"চিঁড়া আছে। কিছু গুড়ও লইতে পারি।"

"খাসা হইবে।"

দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িলেন।

গদাধর ঈষৎ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রখর রৌদ্র। মেঠো পথ। সহসা তিনি ভিন্নমুখী হইয়া যদু মিত্রের প্রাচীর পরিবৃত বাগান-বাড়ির দিকে সবেগে পদচালনা করিতে লাগিলেন।

রামতনু। ওদিকে যাইতেছ কেন?

গদাধর। ওই দেয়ালটার পাশে একটু ছায়া আছে। আইস প্রথমে একটু বিশ্রাম করিয়া লই। ভাই রামতনু, এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু তো চোখে পড়িল না।

রামতনু। পড়িবে, ব্যস্ত হইও না। জিরাইয়া লইতে চাও, লও।

উভয়ে গিয়া প্রাচীর-সন্নিহিত ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

গদাধর। খাওয়াটা শেষ করিয়া লইবে কি?

রামতনু। [সবিস্ময়ে] ইহার মধ্যেই ক্ষুধা পাইয়া গেল? একটু আগেই তো একতাল হালুয়া খাইয়া আসিয়াছ।

গদাধর। [কান চুলকাইয়া] না, ক্ষুধা পায় নাই, কাজটা সারিয়া রাখিব ভাবিতেছিলাম।

রামতনু গদাধরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই গদাধর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারিলেন না, সন্তর্পণে ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে রামতনুর দিকে আবার চাহিলেন। রামতনুকে তাঁহার বড় ভয়। কথায় কথায় মাথা খোঁড়ে, আত্মহত্যা করিতে যায়। রামতনুকে না হইলে তাঁহার চলেও না। বাল্যবন্ধু এবং অক্লান্ত কর্মী। রামতনুর মুখের দিকে চাহিয়া গদাধর দেখিলেন তিনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতেছেন।

গদাধর। ভাই রামতনু, ক্ষমা কর, আহার-প্রসঙ্গ আর তুলিব না।

রামতনু। চুপ, চুপ, শুনিতে পাইতেছ না?

গদাধর ঘাড় কাৎ করিয়া উৎকর্ণ হইলেন এবং শুনিতে পাইলেন, নারীকণ্ঠের চাপা ক্রন্দন।

গদাধর। [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] ভাই রামতনু, আর তো বসিয়া থাকা যায় না। চল, ওঠ, কারণ-নির্ণয় করি।

রামতনু। চল। কিন্তু সাবধানে যাইতে হইবে। তাড়াহুড়া করিও না। আস্তে আস্তে হাঁট। তোমার পামসু বড় বেশি মশমশ শব্দ করিতেছে।

দেওয়ালের ওপাশ হইতে ক্রন্দনধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। দেওয়ালের ধারে ধারে গুঁড়ি মারিয়া উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেওয়ালটা বাঁকিয়া গিয়াছিল। সেই বাঁকের মুখে দাঁড়াইয়া উভয় বন্ধু উঁকি দিয়া দেখিলেন একটি ফয়সাগোছের লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার পাশে একটি কৃশাঙ্গিনী নারী শতছিন্ন মলিন আঁচলে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে একটি ছোট শিশু খেলা করিতেছে।

রামতনু। [নিম্নকণ্ঠে] তুমি এখানে বস। আমি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিয়া আসি।

গদাধর। [আবেগরুদ্ধ স্বরে] বোধ হয় কোনও জমিদার বা সুদখোর মহাজন উহাদের উচ্ছেদ করিয়া গৃহহারা করিয়াছে।

রামতনু। অনুসন্ধান করিলেই বোঝা যাইবে।

রামতনু খুর্ খুর্ করিয়া চলিয়া গেলেন। গদাধর সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া নিজের ঝাঁকড়া-গোঁফে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ভাবাধিক্য হইলে গদাধর এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজেকে তিনি আর সংযত করিতে পারিলেন না। খাতা পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিতে শুরু করিয়া দিলেন।

"আজ দেখিলাম মিত্রদের বাগান বাড়ির দেওয়ালের পাশে জনৈক শ্রমিক এবং জনৈকা শ্রমিকা বসিয়া আছে। শ্রমিকের চোখের দৃষ্টি অসহায়, শ্রমিকা কাঁদিতেছে। আহা, বোধ হয় উহারা ধনিক-সম্প্রদায় কর্তৃক অত্যাচারিত। বন্ধুবর রামতনু অনুসন্ধান করিতে গিয়াছে।..."

এই পর্যন্ত লিখিয়া গদাধরের চিন্তাধারা ভিন্নপথ ধরিল। সহসা ব্যাগ হইতে চিঁড়া বাহির করিয়া চট করিয়া একমুঠা মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া চিবাইতে লাগিলেন।

রামতনু ফিরিলেন মিনিট দশেক পরে।

গদাধর। কি, ব্যাপার কি?

রামতনু। বলিতেছি, শোন। যে লোকটি উবু হইয়া বসিয়া আছে তাহার নাম ভগ্‌গু। ভগবানের অপভ্রংশ সম্ভবতঃ। স্ত্রীলোকটির নাম বুধিয়া। বুধিয়াকে ভগ্‌গু তিন বৎসর পূর্বে 'চুমানা' অর্থাৎ 'নিকে' করিয়াছে। ভগ্‌গুর প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় ভগ্‌গু বুধিয়াকে জীবনের দ্বিতীয়া সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগ্‌গু বলিতেছে, প্রথমা স্ত্রী তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ওই যে ছোট মেয়েটি দেখিতেছ ওটি ভগ্‌গুর সন্তান নয়—ইহার গর্ভেও ভগ্‌গুর কোনও সন্তানাদি হয় নাই। এ মেয়েটি বুধিয়ার প্রথম স্বামীর। প্রথম স্বামীকে বুধিয়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

কেন ত্যাগ করিয়াছে তাহা কিছুতেই বলিল না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কাল বুধিয়া মাঠে কাজ করিয়া নিজের মজুরি হইতে কিছু শকরকন্দ আলু কিনিয়া আনে। রাত্রে কয়েকটি খাইয়া বাকিগুলি সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল সকালে খাইবে বলিয়া। সকালে উঠিয়া দেখে একটিও নাই। ভগ্‌গুও নাই। বুধিয়ার সন্দেহ হইল তাহার সতীনই নিশ্চয় আলুগুলি আত্মসাৎ করিয়াছে। কিন্তু সতানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার ফলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ভয়াবহ। সতীন (বুধিয়া উচ্চারণ করিতেছিল সৌতিন) তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া ঠাস ঠাস করিয়া তাহাকে চড়াইতে থাকে। বুধিয়া তাহার পেটে কামড়াইয়া না ধরিলে বোধ হয় চড়াইতে চড়াইতে মারিয়াই ফেলিত। চুলের ঝুঁটি ছাড়িয়া দিতেই বুধিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর হইতে ছুটিয়া চলিয়া আসে। তাহার শিশু কন্যাটিও তাহার পিছন পিছন দৌড়াইতে থাকে। পথের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ভগ্‌গুর সহিত বুধিয়ার দেখা হইয়া গিয়াছে। বুধিয়া বলিতেছে—'আমার দুই চক্ষু আমাকে যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেইখানেই যাইব।' ভগ্‌গু বলিতেছে—'আমিও যাইব।' বুধিয়া ঝঙ্কার দিয়া যখন বলিল—'তোমার বড় বউ আমার শকরকন্দ কেন খাইবে?'

ভগ্‌গু উত্তর দিল—'বড় বউ খায় নাই, আমি খাইয়াছি। ক্ষুধার তাড়নায় ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়াই শকরকন্দগুলি দেখিতে পাইলাম। খাইয়া কাজ খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই যোগাড় করিতে পারি নাই।'

ইহা শুনিয়া বুধিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। এই হইল ঘটনা, অবশ্য উহাদের মুখ হইতে যতটা শুনিলাম।

"তুমি কিছু লিখিয়াছ না কি। না শুনিয়াই কি লিখিলে?"

রামতনু খাতাটি তুলিয়া গদাধরের লেখাটুকু পড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন—"শ্রমিক শব্দটা কাটিয়া দাও। ভগ্‌গু শ্রমিক নয়।"

"কি তবে?"

"বাদশা।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, কুঁড়ের বাদশা। দুইটি বিবাহ করিয়াছে এবং দুই স্ত্রীর উপার্জনে বসিয়া বসিয়া খায়। কুটাটি পর্যন্ত নাড়ে না।"

"তবু উহাকে আমি শ্রমিক বলিব। ওই ধরনের দুইটি স্ত্রীকে সামলানো কম শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়।"

গদাধর প্রশংসমান দৃষ্টিতে ভগ্‌গুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। রামতনু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন গদাধরের উদ্ভাসিত মুখের উপর।

উপকরণ-সংগ্রহ (২)

কিশোর বালকেরা অনেক সময় বাড়িতে যে ভাবে লেখে গদাধরও তাহাই করিতেছিলেন। একটি চৌকিতে উপুড় হইয়া শুইয়া উত্থিত বাম হস্তের উপর মুণ্ড-ভার রক্ষা করত আপন মনে তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিয়াছিলেন। পদদ্বয় মধ্যে মধ্যে লম্বাকারে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কখনও বাঁকিয়া পৃষ্ঠচুম্বনের প্রয়াস পাইতেছিল, কখনও চৌকিতে শায়িত হইতেছিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির ঝি দুখিয়া সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন।

—"দুখিয়া অতিশয় নোংরা। সর্বদা ময়লা কাপড় পরিয়া থাকে। মাথার চুল রুক্ষ। গায়ে যে কুর্তাটি আছে সেটিও ময়লা—যদিও ছিটটি শৌখিন। মুখ বোধ হয় ভাল করিয়া ধোয় না। দাঁতগুলি হলুদ রঙের, চোখে সর্বদাই পিঁচুটী লাগিয়া আছে। কিছুদিন হইল তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে। গোলগাল নাদুসনুদুস শিশুটি। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে রূপের অভাব ঢাকিয়া গিয়াছে। গোল গোল চোখ দুইটি সর্বদাই যেন সবিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। নাক নাই বলিলেই হয়। নাকের ছিদ্র দুটিই শুধু দেখা যায়, তাহাও সর্দিতে বোজা। হাঁ করিয়া নিশ্বাস লয়। দুখিয়া কাজ করে আর দুখিয়ার বোন রুকমিনিয়া সেটাকে টাঙাইয়া লইয়া বেড়ায়। দুখিয়া যেখানে বসিয়া বাসন মাজে সেইখানেই ধূলার উপর মেয়েটাকে মাঝে মাঝে শোয়াইয়া দেয়। মেয়েটাও বেশ শুইয়া থাকে, বাসন মাজিতে মাজিতে দুখিয়া তাহার সহিত কথা কয়, তাহাতেই সে মহাখুশি। হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে এবং ওং ওং বলিয়া মায়ের কথার জবাব দেয়। ক্ষুধা পাইলে কাঁদে। তখন দুখিয়া তাহাকে ময়লা হাতেই দুই কনুই ও বাহুর সাহায্যে বুকে তুলিয়া লইয়া দুধ খাওয়ায়। মেয়েটি বড়ই নোংরা। হাত ধুইয়া ছেলেকে লইলেই পারে। দুখিয়ার স্বামী রংলাল দেহাত ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছে। কারণ তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ দুখিয়া) শহর ছাড়িয়া দেহাতে যাইতে রাজী নয়, অথচ দেহাতে তাহাদের কয়েক বিঘা জমি আছে। দুখিয়ার আর এক ভগ্নী সুখিয়ার বিবাহ হইয়াছে দুখিয়ারই ভাসুর চমকলালের সহিত। চমকলাল সুখিয়াকে লইয়া দেহাতেই থাকে। কিন্তু দুখিয়া বলে সুখিয়া সুখে নাই। স্বামীটি 'মারখুন্ডা', শাশুড়ি 'খানভারনী'। ইহার উপর আছে 'জড়াইয়া বোখার' এবং পেটের অসুখ। কিছুদিন পূর্বে সুখিয়া ছেলে হইবার জন্ত আসিয়াছিল। ছেলেটা বাঁচিল না, আঁতুড়েই মারা গেল! সুখিয়াও যায় যায়

হইয়াছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। তাহার শরীর সারিতে না সারিতেই মহিষের শিঙের মতো গোঁফ উঁচাইয়া লাঠি ঘাড়ে চমকলাল আসিয়া হাজির হইল এবং সুখিয়াকে লইয়া গেল। সুখিয়ার দুরবস্থা দেখিয়া দুখিয়া সাবধান হইয়াছে। সে আর দেহাতে যাইবে না। স্ত্রৈণ রংলালও স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া সহরে আসতে দুখিয়ার সুবিধাই হইয়াছে। কিন্তু একটু মুশকিলও হইয়াছে। জামাই স্বন্ধারূঢ় হওয়াতে দুখিয়ার মা একটু ঘ্যানঘ্যান শুরু করিয়াছে। রংলাল একটু বাবু প্রকৃতির লোক, প্রায়ই দেখা যায় সে একটি ফরসা ফতুয়া গায়ে দিয়া গুজরাটি কন্‌ট্রাক্টরবাবুর মোটর ড্রাইভারটির সহিত গল্প করিতেছে। শ্রমসাধ্য কাজে বড় ভিড়িতে চায় না। কোদালপাড়া, মোট বওয়া, রিক্সা টানা, রাজমিস্ত্রির সহিত জনখাটা এসব করিতে পারিলে শহরে কাজের অভাব হয় না। কিন্তু রংলাল সে সব করিবে না। একটা মাড়োয়ারির রঙের কারখানায় দিনকতক ছাপার কাজ করিয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন সেখানে টিকিতে পারিল না। বড় খাটুনি। তাছাড়া সর্বাঙ্গে রং লাগিয়া যায়। আজকাল মাড়োয়ারিরা গঙ্গার ধারে যজ্ঞ করাইতেছে, সেখানে তাহারা একটা জলসত্র খুলিয়াছে। রংলাল তাহাতেই ছোলা গুড় এবং জল বিতরণের চাকরি করিতেছে। দৈনিক দেড়টাকা মজুরি, তাহার উপর খাইতে পায়। কাজটি রংলালের মনোমত। বেশি পরিশ্রম নাই। তৃষ্ণার্ত ভিখারীদের উপর একটু আধটু 'তম্বি' করিবার সুযোগ আছে। যজ্ঞ কিন্তু অনন্তকাল চলিবে না। তখন যে রংলাল কি করিবে তাহা ভাবিয়া দুখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের বাক্যবাণ ক্রমশ যেরূপ তীক্ষ্ণ হইয়া আসিতেছে তাহাতে বেকার রংলাল বেশিদিন যে শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে পারিবে তাহা মনে হয় না—

গদাধর এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন এমন সময় রামতনু প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। আজ বাহির হইবে না?

গদাধর। নিশ্চয় হইব।

রামতনু। কি লিখিতেছিলে?

গদাধর। কাল দুখিয়ার সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি তাহা লিখিয়া ফেলিলাম।

রামতনু তীব্র দৃষ্টিতে গদাধরের দিকে চাহিলেন।

রামতনু। এতক্ষণে লিখিলে? কালই সন্ধ্যায় লিখিয়া শেষ করা উচিত ছিল। কাল সন্ধ্যায় কি করিতেছিলে?

গদাধর। [কাচুমাচু] একজায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল, তাহাই রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। [সহসা উৎফুল্ল] বেশ ভাল খাওয়াইল।

রামতনু। খাওয়া কমাও, নতুবা বিপদে পড়িবে।

অপ্রতিভ গদাধর উঠিয়া পড়িলেন এবং রামতনুর দিকে পিছন ফিরিয়া জামা পরিতে লাগিলেন।

গদাধর। আজ কোন্ দিকে যাইবে?

রামতনু। নাক-বসা ভজুয়ার বাড়ির দিকে।

গদাধর। [উল্লসিত] ও! সে একজন আসল শ্রমিক। যে আগে তোমার বাড়ির চাকর ছিল সেই তো? এখন চানাচুর ফেরি করিয়া বেড়ায়?

রামতনু। হ্যাঁ সেই। সেই শ্রমিক ভজুয়ার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিব মনস্থ করিয়াছি। ভিতরের খবর ঠিক মতো জানিতে হইলে অন্তঃপুর পরিদর্শন করা প্রয়োজন।

গদাধর। [বিস্মিত] তাহা কি করিয়া সম্ভব? সে তোমাকে অন্তঃপুরে ঢুকিতে দিবে কেন! দিলেও সব সামলাইয়া সুমলাইয়া ফেলিবে, তাহাদের স্বরূপ জানিতে পারিবে না।

রামতনু। চল না, সমস্ত ভাবিয়া রাখিয়াছি।

উভয়ে ভজুয়ার বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া রামতনু গদাধরকে থামিতে বলিলেন। তাঁহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া ইঙ্গিতে অনুসরণ করিতে বলিলেন। আঁদাড়-পাঁদাড় ভাঙিয়া অবশেষে ভজুয়ার বাড়ির পিছন দিকে একটি গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন উভয়ে। গাছটি বিশাল এবং শাখাপত্রবহুল।

রামতনু। গাছে উঠিতে হইবে।

গদাধর। এই গাছে? বল কি?

রামতনু। [দৃঢ়কণ্ঠে] হ্যাঁ।

গদাধর। আমি ভাই পারিব না।

রামতনু। কঠোরদৃষ্টিতে একবার তাহার স্ফীতোদরের দিকে চাহিলেন। আড়চোখে রামতনুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া গদাধরকে মুখ অন্য দিকে ফিরাইতে হইল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি ধীরে ধীরে গোঁফে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। বেশ, আমিই উঠিব, তুমি গাছের নীচেই বসিয়া থাক।

রামতনু ক্ষিপ্রতা সহকারে মালকোচা মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়িলেন এবং অবলীলাক্রমে শাখা হইতে শাখান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিস্মিত গদাধর কিছুক্ষণ উর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে একটি বসবার স্থান নির্বাচন

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসা যাইবে না। গুঁড়িটি কুম্ভীর পৃষ্ঠের মত অমসৃণ। গাছের ঠিক নীচে বসিবার উপায় নাই। টিনের কৌটা, ভাঙ্গা শিশি, ভাঙ্গা হাঁড়ি, কাঁটা গাছ প্রভৃতিতে স্থানটি পরিপূর্ণ! গদাধর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, নিকটেই আর একটি বাড়ির দেওয়ালের নীচে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি চমৎকার স্থান রহিয়াছে। ত্বরিতপদে সেখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। আরাম করিয়া সিগারেটটি ধরাইবেন এমন সময় মাথার উপর আচম্বিতে খানিকটা আবর্জনাবৃষ্টি হইয়া গেল। গদাধর ঘাড় ফিরাইয়া বুঝিলেন দেওয়ালের ওপার হইতে নিশ্চয় কেহ ফেলিয়াছে। উঠিয়া গা-মাথা ঝাড়িতেছেন এমন সময় রামতনুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—গদাধর, তুমি কোথায় গেলে—।

গদাধর দ্রুতপদে বৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দেখিলেন রামতনু শূন্যে ঝুলিতেছেন। তাঁহার কাছা একটা ডালে আটকাইয়া গিয়াছে। সহসা গদাধরের দেহে ও মনে অপ্রত্যাশিত শক্তি সঞ্চারিত হইল। জীবন তুচ্ছ করিয়া তিনি গাছে উঠিয়া পড়িলেন।

রামতনু। [ঝুলিতে ঝুলিতে] তোমার মাথায় ছাই কেন ?

গদাধর। দেওয়ালের ধারে বসিয়াছিলাম। দেওয়ালের ওপার হইতে কেহ ফেলিয়া থাকিবে।

রামতনু। তোমাকে গাছের তলায় বসিতে বলিয়াছিলাম।

গদাধর। তোমার এমন অবস্থা কি করিয়া হইল তাহাই আগে বল !

রামতনু। ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইতেছিলাম। কাছা ডালে আটকাইয়া যাওয়াতে রক্ষা পাইয়াছি।

গদাধর। ঘাড়ে ভর দাও, আমি ডালটা ছাড়াই।

গদাধর সন্তর্পণে রামতনুকে গাছ হইতে নামাইয়া আনিলেন।

গদাধর। কি দেখিলে বল, টুকিয়া লই।

রামতনু। একটি জাঁতা, একটি উনুন, একটি উদুখল চোখে পড়িল। উনানটি গোবরমাটি দিয়া নিকানো। ছাগী আছে, তাহার দুইটি বাচ্চা হইয়াছে। একটি কালো, একটি বাদামী। আঙিনার একধারে রহিয়াছে ক্ষারসিদ্ধ কাপড়ের স্তূপ আর একধারে ভজুয়ার বড় মেয়ে লছমী সেজ মেয়ে ছিরিয়ার মাথার উকুন বাছিতেছে। ভজুয়া কিম্বা তাহার স্ত্রী বাড়িতে নাই। ইহার বেশি আর লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলাম না। কারণ ঠিক ইহার পরেই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতেই ধৈর্য হারাইলাম, মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। দ্রুতপদে নামিতে গিয়া পায়ের নীচের ডালটি ভাঙিল।

গদাধর। সে বস্তুটি কি ?

রামতনু। গাড়ু। আমার গাড়ুটি হারাইয়াছিল, স্পষ্ট দেখিলাম তাহা ভজুয়ার ঘরের কোণে রহিয়াছে। আমি পুলিশে খবর দিব।

গদাধর। [আবেগ কম্পিত কণ্ঠে] ভাই রামতনু, ও কাজ করিও না। ভজুয়া বড় দুঃখী। একে অশিক্ষিত, তাহার উপর অভাবগ্রস্ত। শিক্ষিত ধনীরা দুই হাতে ডাকাতি করিতেছে, তাহাদের যদি ধরিতে পার পুলিশে খবর দিও। দুঃস্থ ভজুয়াকে কিছু বলিও না।

রামতনু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্তও বিগলিত হইতে লাগিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৩)

প্রতিবেশী মাণিক ভাদুড়ীর কাহিনী শুনিয়া রামতনু অদূরে উপবিষ্ট গদাধরের দিকে তাকাইলেন। পাড়ার সমস্ত চাকর পলাইয়াছে। এত বক্তৃতা সমস্ত ব্যর্থ হইল। নির্বাক গদাধরের নয়নযুগলে যে ভাষা জলজল করিতেছিল তাহা উত্তেজিত রামতনুর অন্তরকে উত্তপ্ততর করিল মাত্র।

মাণিক চলিয়া যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—"আমি মাথা খুঁড়িব।"

ভাগ্যে তিনি গদাধরের বিছানায় বসিয়াছিলেন। নিকটেই যে তাকিয়াটা ছিল তাহার উপরেই তিনি মাথা খুঁড়িতে শুরু করিয়া দিলেন। নিমিষে গদাধরের জলমান চক্ষু শঙ্কাতুর হইয়া উঠিল, তিনি ছুটিয়া গিয়া রামতনুকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনে হইল রামতনুর মাথা যদিও ফাটিবে না, কিন্তু এই বাজারে তাকিয়া ফাটাও তো কম শোচনীয় ব্যাপার নয়।

রামতনু। না, আমাকে বাধা দিও না। আমি—

গদাধর। হঠকারিতা করিও না। এই বাজারে তোমার মাথা কিম্বা আমার তাকিয়া কোনোটাই তুচ্ছ করিবার মতো বস্তু নয়। আমার কথা শোন, যুক্তিযুক্ত কথাই বলিব—

রামতনু। বল।

গদাধর। তোমার ক্ষোভের কারণ আছে তাহা স্বীকার করিতেছি। নবাগত ঘুষখোর দারোগাটার বিরুদ্ধে সে দিন চাকরদের আড্ডায় গিয়া যে বক্তৃতাটা দিয়াছিলে তাহা খুবই ওজস্বিনী হইয়াছিল একথাও আমি মানি এবং সেই দারোগাটা 'তু' করিয়া ডাকিবামাত্র এত বক্তৃতা সত্ত্বেও তোমার, মাণিকবাবুর

এবং পাড়ার প্রায় সকলেরই চাকর সেই দারোগাটার কাজ করিবার জন্ত উর্ধ্বশ্বাসে চলিয়া গেল এ ঘটনাও খুব হৃদয়বিদারক তাহাতে সন্দেহ নাই, কেবল একটি বিষয়ে তোমাকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

রামতনু। কি বিষয়ে বল ?

গদাধর। দেখ, আমাদের উদ্দেশ্য উপকরণ সংগ্রহ করা, উপকরণ দেখিয়া বিচলিত হওয়া নয়। বৈজ্ঞানিকের মতো নিষ্কাম নিষ্ঠাভরে···

রামতনু। তুমি কদলী অথবা কচু খাও।

অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা পাওয়াতে গদাধরের চক্ষু দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবার মতো হইল। রামতনু দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন।

গদাধর। কদলী বা কচু ! খাইব !

রামতনু। কি করা উচিত সহজ কথায় সেটা বলিতে পারো না রাক্কোস, কেবল কথার মারপ্যাঁচ কষিতেছো !

রামতনু মাঝে মাঝে গদাধরকে রাক্কোস (রাক্ষস) বলেন, সম্ভবতঃ তাহার ভোজনপটুতার জন্য।

গদাধর। [অপ্রতিভ] মানে, আমি বলিতেছিলাম—

রামতনু। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বল এখন কি করা উচিত।

গদাধর। যেখানে আমাদের চাকরেরা গিয়েছে সেইখানে যাওয়া উচিত।

রামতনু। থানায় ?

গদাধর। তোমার বক্তৃতা শুনিলে দারোগা হয়তো—

রামতনু। বেশ চল।

রামতনু যুক্তির দাস। অবিলম্বে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

২

পদব্রজে দুইক্রোশ দূরবর্তী থানায় যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পদদ্বয় ধূলি-ধূসরিত, দেহ অবসন্ন, অন্তর ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর। রামতনুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, গদাধরের ভ্রূক্ষেপ করিবার সাহস নাই। আর একটা ব্যাপারেও উভয়েই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এটা থানা কিনা তাহাই তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। মনে হইতেছিল যেন জমিদারের কাছারি। কানে কলম গুঁজিয়া বারান্দায় সারি সারি যাঁহারা খেরোর খাতায় নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদের গোমস্তা বলিয়া মনে হয়।

পুলিশ কর্মচারীর এরূপ মূর্তি কল্পনা করা শক্ত। সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গণটা বহুলোক মিলিয়া পরিষ্কার করিতেছে। প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটাইবারও আয়োজন চলিতেছে। থানার সহিত কোনও সাদৃশ্যই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল যেন কোন জমিদারবাড়িতে বৃহৎ একটা উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। থানার কোন চিহ্ন নাই। অথচ সকলেই বলিতেছে এইটাই না কি থানা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়ে উভয়ের বহুবার দৃষ্ট মুখচ্ছবি পুনরায় অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"সেলাম হুজুর।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ভগ্‌গত, ফৈজু, চমকলাল, ছেদি, ছককু, বানার্সি অর্থাৎ পাড়ার সমস্ত পলাতক ভৃত্য সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিতেছে।

রামতনু ভাঙা হিন্দিতে রুক্ষকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন তাহারা এমনভাবে একযোগে পলাইয়া আসিল কেন।

ছেদি (মাণিক ভাদুড়ীর চাকর) শুদ্ধ হিন্দিতে সবিনয়ে যে উত্তর দিল তাহার সংযত বাংলা অনুবাদ করিলেও দাঁড়াইয়া যায়—"পলাইয়া আসিব কেন হুজুর, কোন পাপ তো করি নাই। এখানে দৈনিক তিনটাকা মজুরি এবং একবেলা খাওয়া পাইতেছি, আসিব না কেন ?"

ছেদিকে সরাইয়া দিয়া রামতনুর পুরাতন ভৃত্য নাক-বসা ফৈজু আগাইয়া আসিল। তাঁহার সহিত রামতনু নিম্নলিখিতরূপে আলাপ করিলেন।

রামতনু। তোমাদের কি কাজ করিতে হয় ?

ফৈজু। থানার হাতা পরিষ্কার।

রামতনু। এ কাজে তোমাদের কে বাহাল করিয়াছেন ?

ফৈজু। দারোগাবাবু নিজে।

রামতনু। এতগুলি লোককে তিনিই মজুরি দিতেছেন ?

ফৈজু। হাঁ হুজুর।

রামতনু। তিনি কোথায় ?

ফৈজু। ভিতরে আছেন। না, না, ওই যে আসিতেছেন।

—ভৃত্যের দল নিমেষের মধ্যে সরিয়া গিয়া স্ব স্ব কর্মে মনোনিবেশ করিল। দারোগা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। বিশাল বপু, বিশাল গোঁফ। তিনি আসিয়াই যাহা করিলেন তাহা আরও চমকপ্রদ। গদাধরের দিকে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া সোচ্ছ্বাসে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন "একি, পণ্ডিত মহাশয়, আপনি এখানে কি করে এলেন—?"

গদাধরের উদীয়মান ক্রোধ আচমকা বিস্ময়ে রূপান্তরিত হওয়াতে তাঁহার

বাকরোধ হইল। শুধু তাই নয়, অতীত জীবনের কয়েকটি আলেখ্যও দ্রুতভাবে মানসপটে প্রকট হইয়া পড়াতে তিনি রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথম যৌবনে মালদহ জেলার একটি গ্রামে যখন তিনি মাইনর স্কুলে হেড-পণ্ডিতি করিতেন তখন এই রাম-বনস্পতি পাণ্ডে তাঁহার ছাত্র ছিল। সে-ই দারোগা হইয়াছে! এত বড় গোঁফ তাহার! ব্যাকুল গদাধরকে ব্যাকুলতর করিয়া রাম-বনস্পতি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহার পর যে সব আলোচনা অনিবার্য-ভাবে আসিয়া পড়ে সে সবও আসিয়া পড়িল।

রামতনু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া হঠাৎ তিনি দারোগাকে বলিলেন, "আপনার সহিত আমাদের কয়েকটি কথা আছে। আপনি যখন গদাধরের ছাত্র তখন আমারও ছাত্রস্থানীয়, আশা করি আমার প্রশ্নগুলির সরল উত্তর দিবেন।"

দারোগা। [স-সম্ভ্রমে] নিশ্চয় দিব। আগে হাত-পা ধুন, আহারাদি করুন, বিশ্রাম করুন, তাহার পর—

রামতনু। কথা না বলিয়া কিছুই করিব না।

দারোগা। বেশ। আসুন তবে—

তিনজনে একটি ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

রামতনু। গদাধর তুমিই প্রশ্ন কর।

গদাধর। আচ্ছা, রাম, তুমি ঘুষ লও?

দারোগা। লই বই কি, না লইলে চাকরি থাকে না। উহাই আজকাল নিয়ম।

গদাধর। কি রকম?

দারোগা। এই দেখুন না আজকাল আইন করিয়া বিহার হইতে বাঙ্গলা-দেশে লবণ পাঠানো নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের লোক লবণ খাইবেই, বিহারের ব্যবসায়ীরাও লবণ বিক্রয় করিবেই। সুতরাং প্রতিদিন নৌকা করিয়া হাজার হাজার মণ লবণ পাঠানো হইতেছে। আমি আমার এলাকায় ঘাটে ঘাটে পুলিশ মোতায়েন করিয়া নৌকাগুলি ধরিতেছি এবং মণ পিছু এক টাকা করিয়া আদায় করিতেছি। ইচ্ছা করিলে বেশিও লইতে পারিতাম। লই নাই। ইহাতেই আমার দৈনিক গড়ে এক হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা আয় হইতেছে। কিছুটা উপর-ওয়ালাদের দিতে হয়। বারান্দায় যাহারা বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে তাহারা এই সবেরই হিসাবপত্র করিতেছে। সব টাকাটা আমি লই না। দেশের আজকাল দুর্দিন, কিছু টাকা আমি এখানকার গরীবদের দিই, অবশ্য মজুরি হিসাবে। যে কোনও

একটা অজুহাতে তাহাদের নিযুক্ত করিয়া মোটা মজুরি দিই। এখানকার সমস্ত জঙ্গল, পুষ্করিণী পরিষ্কার করাইব মনস্থ করিয়াছি। আজ একটা খ্যামটা নাচের দল আসিয়া আমাকে ধরিয়াছে। দেশের এই দুর্দিনে তাহাদের নাকি অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহাদের নাচিতে বলিয়াছি। আমার হাত দিয়া যে যতটা পাইয়া যায় যাক—

গদাধর। ইহাদের সকলকে খাইতে দাও ?

দারোগা। অনেক চোরাই চাল আটক করিয়াছি তাহাই খাইতে দিই। চালগুলো পচাইয়া কি হইবে ?

রামতনুর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল।

রামতনু। কিন্তু এসব কি অন্যায় নহে ?

দারোগা। খুবই অন্যায়। কিন্তু—

রামতনু। তুমি পাষণ্ড !

দারোগা। খুব সম্ভব।

গদাধর গলা ঝাঁকারি দিলেন।

গদাধর। আসল কথাটি বলি শোন। বেশি মজুরির লোভে আমাদের সমস্ত চাকর তোমার কাছে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের সংসার অচল—

দারোগা। আমি যতদিন আছি ভাবনা নাই। কে কে আপনাদের চাকর দেখাইয়া দিন তাহারা এখনই আপনাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইবে। মজুরি আমিই দিব।

রামতনু। কিন্তু এরকম করিলে—

দারোগা। [করজোড়ে] আপনারা গুরুজন, আপনাদের সহিত তর্ক করিতে আমি অপারগ। বাক্-বিতণ্ডা আমি করিব না।

৩

ভূরিভোজনান্তে রামতনু ও গদাধর যখন পাল্‌কিযোগে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন তখন সন্ধ্যা আসন্ন। গরুরাও ধূলি উড়াইয়া গোহালে ফিরিতেছিল। পাল্‌কির পিছনে এক হাঁড়ি দই, এক কলসী দুধ এবং একটি প্রকাণ্ড মাছ লইয়া ফৈজু, ছেদি ও বানার্সি আসিতেছিল।

পাল্‌কির ভিতর রামতনু ও গদাধর নির্বাক হইয়া বসিয়াছিলেন।

উপকরণ-সংগ্রহ (৪)

দাঙ্গা বাধিয়া যাওয়াতে একটু মুশকিল হইল। স্থূলকায় গদাধর ক্ষীণকান্তি রামতনু উভয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এ অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো সমীচীন কি-না। গদাধর গোঁফের ভিতর অঙ্গুলি-চালনা করিতেছিলেন এবং রামতনু গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া ললাটদেশ কুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর করিতেছিলেন। উভয়সঙ্কটে পড়িলে রামতনু ইহাই করিয়া থাকেন। রামতনু বুঝিতেছিলেন যে প্রাণের ভয়ে কর্তব্যকর্ম হইতে বিরত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু ভয় সত্যই করিতেছিল এবং অকপটে তাহা প্রকাশ করিতেও পারিতেছিলেন না। গদাধরের নিকটে খেলো হওয়া অসম্ভব। বরাবর তাহার কাছে নিজেকে তিনি নির্ভীক প্রাণ-তুচ্ছকারী কর্মী রূপে পরিচিত করিয়াছেন।

গদাধরের প্রকৃত মনোভাব জানিবার জন্য রামতনু অবশেষে একটি টোপ ফেলিলেন।

রামতনু। শ্রমিক-চরিত্রের একটি দিক হয়তো অপ্রত্যাশিতভাবে খুলিয়া গিয়াছে। এ সুযোগ কি পরিত্যাগ করা উচিত?

গদাধর টোপ গিলিলেন না। কোন উত্তর না দিয়া গোঁফে আঙুল চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

রামতনুর কোটরস্থ অক্ষিযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল।

রামতনু। তুমি কি মনে কর না, এই দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক-জীবনের একটা নূতন দিক দেখা যাইবে? তাহাদের এই দাঙ্গা-উন্মত্ত রূপটা কি তুচ্ছ করিবার মতো? রাস্তায় রিকশ নাই, কুলি নাই, বাজারে মাছ নাই, তরকারি নাই। উপর্য্যুপরি নিরামিষ আহার করিয়া জীবনে বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে এবং এ সকলের কারণ কি শ্রমিকদের দাঙ্গা-লোলুপতা নয়?

গোঁফের ভিতর গদাধরের চলমান অঙ্গুলিদ্বয় থামিয়া গেল।

গদাধর। শ্রমিকেরা দাঙ্গা করিতেছে না।

রামতনু। [বিস্মিত] কাহারা করিতেছে তবে?

গদাধর। ধনিকরা! [সহসা আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে] ধনিকের হিংসা-লালসার বহ্নিতে শ্রমিকেরা এতদিন ধীরে ধীরে পুড়িতেছিল, এবার হু হু করিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। ভাই রামতনু, ভুল করিও না, শ্রমিকেরা ইন্ধন মাত্র। চিন্তা কর।

চিন্তা করিবার অবসর কিন্তু পাওয়া গেল না।

"হুজুর গেট খোলিয়ে···" উচ্চকণ্ঠে নিঃসৃত এই আবেদনে উভয়েই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন লম্বা-লাঠি-ঘাড়ে নাক-বসা ভজুয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পিছনে বিরাট মোট মাথায় লইয়া নানা বয়সের বালক-বালিকা। কাহারও হাতে খন্তা, কাহারও হাতে বঁটি, কাহারও হাতে কুঠার।

গদাধরের মুখ শুকাইয়া গেল। রামতনুর তালুও।

"কি মাংতা হ্যায়···" ক্ষীণ কণ্ঠে গদাধর প্রশ্ন করিলেন।

"গেট খোল দিজিয়ে।"

বাড়ি রামতনুর। সে বাড়ির গেট খুলিবার অধিকারও স্বভাবতঃই রামতনুর। সুতরাং গদাধর রামতনুর মুখের দিকে তাকাইলেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া রামতনুর ভ্রূযুগল আরও কুঁচকাইয়া গেল। কয়েক দিন পূর্বেই ইহার বাড়ির পিছনের গাছে তিনি চড়িয়াছিলেন। ব্যাটা হয়তো এই সুযোগে প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল সটান উঠিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিতে। গদাধর না থাকিলে হয়তো তাহাই করিতেন। কন্তু চরিত্রের সামান্যতম দুর্বলতার জন্য যে গদাধরকে সর্বদা তিনি যৎপরোনাস্তি ভৎ সনা করিয়া থাকেন তাহার সম্মুখে এমন ভীরুতা প্রকাশ করা অপেক্ষা ভজুয়ার লাঠির তলায় মাথা পাতিয়া দেওয়া তাঁহার নিকট সহজ বলিয়া মনে হইল। তবু মনে বল পাইতেছিলেন না। কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়াতে বল পাইলেন। হঠাৎ প্রতাপাদিত্য হইতে শুরু করিয়া সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী বীরবৃন্দের কাহিনী নিমেষ-মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্কটাকে যেন ঝড়ের বেগে নাড়া দিয়া গেল। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন গদাধর তখনও স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া অকম্পিত হস্তে গেট খুলিয়া দিলেন।

ভজুয়া লাঠি মারিল না।

উপরন্তু সে যাহা বলিল তাহাতে রামতনুর চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাহার বাড়ির নিকটেই মুসলমান বস্তি। তাহারা রাত্রে যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে এই ভয়ে ভজুয়া তাহার পুরাতন মনিবের বাড়িতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে। সপরিবারে আসিয়াছে, সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া। রামতনু খুশি হইলেন। ভজুয়া চোর, তাড়ি খায়, উপদংশ-জর্জরিত—এ সবই রামতনু জানেন তবু খুশি হইলেন। গদাধরের অন্তরেও পুলক জাগিল, কারণ বাড়ির বাহিরে পদক্ষেপ না করিয়াও নানারূপ উপকরণ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া গেল।

দিন দুই মন্দ কাটিল না।

গদাধর লক্ষ্য করিলেন ভজুয়ার কন্যা হিরিয়ার রোজ জ্বর হয়, পেটে প্লীহা বাড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পাড়ার ডাক্তারবাবুটি করুণা-পরবশ হইয়া বিনামূল্যে যদিও তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন, কালাজ্বরের দুই একটি ইনজেকশনও দিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি হিরিয়া তাঁহার কাছে আর যায় না। কারণ অন্য কিছু নয়, সুইয়া (ইনজেকশন) লইতে তাহার বড় ভয় করে। রামতনু তাহাকে নির্ভয় করিবার জন্য ভাঙা হিন্দীতে অনেক কথা বলিলেন, হিরিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া মুচকি হাসিতে হাসিতে সব শুনিল, কিন্তু গদাধর এবং রামতনু উভয়েই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ও কিছুতেই ইনজেকশন লইবে না। মরিয়া যাইবে, তবু লইবে না। গদাধর আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিলেন। ইহাদের চুল দাঁত চোখ চামড়া কাপড় জামা তো নোংরা বটেই, ভাষাও অত্যন্ত নোংরা। মা মেয়েকে যে ভাষায় গালি দিতেছে, এমন কি, যে ভাষায় আদরও করিতেছে তাহা লেখা যায় না। সমস্তই কাঁচা খিস্তি, অনেক ক্ষেত্রে যদিও ব্যাকরণ-সম্মত সমাসবদ্ধ। এ বিষয়ে রামতনুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হঠাৎ তিনি বলিলেন—"তোমার কাছে যাহা অশ্লীল মনে হইতেছে উহাদের কাছে সেটা স্বাভাবিক, অশ্লীল নয়।" রামতনুর দিকে আড়চোখে একবার চাহিয়া গদাধর থামিয়া গেলেন। রামতনুও দুইটি ঘটনা লক্ষ্য করিতেছিলেন তাহা গদাধরকে 'নোট' করিয়া লইতে বলিলেন। প্রথম—ভজুয়ার বউ কাল তাঁহার বাথরুমে ঢুকিয়া তাঁহার সাবান ব্যবহার করিয়া স্নান করিয়াছে। দ্বিতীয়—হিরিয়ার রুক্ষকেশ সহসা তেল-জবজবে হইয়া উঠিয়াছে যে-তৈল-সহযোগে, তাহা তাঁহারই কেশরঞ্জন তৈল। ভজুয়ার অবশ্য এ সব বিষয়ে লক্ষ্য নাই। সে একটি খুরপি লইয়া হাতা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় রামতনুকে সেলাম করিতেছে। গদাধরকেও। কিছুক্ষণের জন্য মাঝে সে বাহিরে যায় এবং দাঙ্গার লোমহর্ষণ খবর সংগ্রহ করিয়া আনে। এইভাবে দিন দুই মন্দ কাটিল না।

তৃতীয় দিন সকালে যাহা ঘটিল তাহাতে রামতনুর চিন্তা আবার হঠাৎ সপ্তমে চড়িয়া গেল। উপর্যুপরি কয়েকদিন নিরামিষ আহার করিয়া তিনি দুর্বল বোধ করিতেছিলেন। প্রতিবেশী বকুবাবুর কাছে সংবাদটি পাইয়া তিনি আরও দুর্বল বোধ করিতে লাগিলেন।

বকুবাবু প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন, "ভজুয়াকে আশ্রয় দিয়া আপনি ভুল করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সুযোগ লইয়া এইবার শ্রমিকেরা বিদ্রোহ

করিবে শুনিতেছি। আমাদের মতো পেটি বুর্জোয়াদের ঘরে প্রথমে উহারা পূর্ব পরিচয়ের সুযোগে ঢুকিবে, তাহার পর হঠাৎ একদিন একযোগে আক্রমণ করিবে।"

খবরটি বলিয়া বকুবাবু চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ভজুয়া নাই। সমস্ত দিন আসিল না। সন্ধ্যায় গদাধরের দিকে রামতনু বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

রামতনু। সমস্ত দিন যখন আসিল না তখন গতিক খারাপ। তুমি আজ রাত্রে আমার কাছে শুইবে কি?

গদাধর। বল তো শুইতে পারি।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। রামতনু ও গদাধর মুখোমুখি বসিয়া আছেন। রামতনুর ঠাকুর ভাতে-ভাত নামাইয়া আসিয়া রামতনুকে বলিল— "এখনই খাইবেন কি?"

"থোড়া ঠহর যাইয়ে ঠাকুর জি—"

বারান্দায় ভজুয়ার কণ্ঠস্বর শুনিয়া রামতনু চমকাইয়া উঠিলেন। গদাধরের আঙুলিদ্বয় গুম্ফ মধ্যে অনড় হইয়া গেল।

ঠাকুর আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বলছ?"

কাচুমাচু ভজুয়া হিন্দি ভাষায় যাহা বলিল তাহার সার-মর্ম এই যে, সে দুই দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিল যে, মৎস্যাভাবে বাবুর খাওয়া হইতেছে না। তাই সে একটি ছিপ যোগাড় করিয়া নিকটবর্তী খালটায় মাছ ধরিতে গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একটি রোহিত ধরা পড়িয়াছে। ঠাকুর যেন সেটির ঝোল বানাইয়া তবে বাবুকে খাইতে দেয়। সে মাছটি এখনই কুটিয়া দিতেছে। কুঞ্চিত-ভ্রূ রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন। গদাধরের চক্ষু দুইটি হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

উপকরণ-সংগ্রহ (৩)

"ভুজঙ্গী নামটাই খুব খারাপ।"

কথাটা বলিয়া রামতনু গদাধরের দিকে চাহিলেন এবং কোনও উত্তর না পাইয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। গদাধর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কথাটা প্রণিধান করিতে লাগিলেন। সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও দেখিলেন বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। কথাটা শুনিবামাত্র তাঁহার বিবেক যে কথা বলিয়াছিল, এতক্ষণ প্রণিধান করিবার পরও সেই কথাই

বলিতেছে। যাহা বলিতেছে তাহা সাহস করিয়া রামতনুকে বলা যায় না। বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করাও দুরূহ কাজ। সুতরাং মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিলেন।

গদাধর। ভুজঙ্গী নামটা হয় তো শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু চাকরের নাম শ্রুতি-মধুর না-ই বা হইল ভাই, কাজ লইয়া কথা—

রামতনু। কাজের প্রসঙ্গেই কথাটা বলিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি দুইজন ভুজঙ্গীর সংশ্রবে আসিয়াছি। দুইজনেই দাগা দিয়াছে। প্রথমটি ভুজঙ্গী মিস্ত্রি। লোকটা তিলক ফোঁটা কাটে, লম্বা টিকি আছে, ভাবিয়াছিলাম ভাল লোকই হইবে। আমার চৌকিটি মেরামত করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। করিবামাত্রই অগ্রিম টাকা চাহিয়া বসিল। বলিল, জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দিলাম তাহাকে দশটা টাকা। টাকাটি হস্তগত করিয়াই ডুব মারিল। দুই দিন দেখা নাই। তৃতীয় দিনে আসিল একেবারে চিতাবাঘটি সাজিয়া। তাহার পর এমন ভাবে চৌকিটি মেরামত করিল যে খড়ম লইয়া তাহাকে তাড়া করিতে বাধ্য হইলাম। ক্রোধে এমন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম যে মুক্তকচ্ছ হইয়া হোঁচট খাইতে হইল। যন্ত্রপাতি ফেলিয়া সেই যে পলাইয়াছে এখনও পর্যন্ত তাহার পাত্তা নাই। দ্বিতীয় ভুজঙ্গীকে তো তুমি দেখিয়াছ। যতদিন আমার কাছে ছিল ঘুমানো ছাড়া দ্বিতীয় কাজ করে নাই। যখন ঘুমাইত না, তখন বসিয়া ঢুলিত কিম্বা হাই তুলিত।

গদাধর। সে বেচারা যে রুগ্ন ছিল; পরে তাহা তো প্রমাণিত হইল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন উহার পেটে ক্রিমি আছে। উহার আলস্যের কারণ ভুজঙ্গী নাম নয় ভাই, হুক্ ওয়ার্ম।

রামতনু যুক্তির নিকট চিরকাল নতমস্তক। চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি দিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চাপিয়া বাম নাসারন্ধ্র-পথে সশব্দে বায়ু নিঃসারিত করিয়া ফেলিলেন। মাথা কিন্তু সাফ হইল না। কারণ ইহা করিবার পরও দ্বিতীয় ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে তিনি নূতন কোনও যুক্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। কিন্তু একটি সুফল ফলিল। প্রথম ভুজঙ্গীর বিরুদ্ধে আর একটি কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। এটি এতক্ষণ মনে পড়ে নাই।

রামতনু। পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছি ভুজঙ্গী মিস্ত্রি না কি টেটনের বউকে লইয়া সরিয়াছে।

গদাধর। হয়তো সে-ও অসুস্থ। কোনও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিলে হয়তো তাহার মনের ভিতরও কোনও ক্রিমি আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

[সহসা আবেগ ভরে] ভাই রামতনু, উহারা সকলেই অসুস্থ। উহাদের উপর রাগ করিও না।

রামতনু। রাগের কথা নয় গদাই, অভিজ্ঞতার কথা—

গদাধর। মাত্র দুইটি ভুজঙ্গী দেখিয়া যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা তোমার হইয়াছে আজকালকার ভৃত্যসঙ্কটের দিনে যদি কেবল মাত্র তদ্দ্বারাই তুমি চালিত হইতে চাও তোমার মনের জোরের আর একটি অকাট্য প্রমাণ পাইব—

এই পর্যন্ত বলিয়া গদাধর সহসা থামিয়া গেলেন। "কিন্তু ইহা তোমার বুদ্ধির সূক্ষ্মতার নিদর্শন হইবে না"—এই বাক্যটিও তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু জোর করিয়া তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলেন। সামান্য ব্যাপার লইয়া বন্ধুর হৃদয়ে এতটা আঘাত দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

গদাধরের যে ছাত্রটি দারোগা হইয়া আসাতে ইঁহাদের ভৃত্য সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, তিনি সম্প্রতি বদলি হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে সে সমস্যা পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। রামতনুর বিপদ আরও বেশি। কারণ খাঁটি দুধ খাইবার লোভে তিনি গরুও পুষিয়া থাকেন। তাঁহার গোয়ালা চাকরটিও কয়েকদিন হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া রামতনু অবশেষে একটি বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক গদাধর-পরামর্শ-ভেলা সম্বল করিয়াই তিনি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। তাঁহার মনে হইল ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

রামতনু। স্পষ্ট করিয়া বল। এই ভুজঙ্গীকে আমি বাহাল করিব কি না?

গদাধর। আমার মতে করা উচিত। এ লোকটা জাতিতে গোয়ালা, তোমার গরুর সেবাও করিতে পারিবে।

রামতনু। বেশ! তোমার পরামর্শ বরাবরই শুনি, এবারও শুনিব।

একমাস কাটিয়া গেল।

একদিন প্রভাতে সহসা রামতনু পুনরায় গদাধরের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামতনু। গদাধর, তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছ কি?

গদাধর। কি বল।

রামতনু। আমি রোগা হইয়া যাইতেছি। এই দেখ—

রামতনু নিজের কোট কামিজ গেঞ্জি পটাপট খুলিয়া ফেলিলেন। গদাধর দেখিলেন সত্যাই কৃশ রামতনু কৃশতর হইয়াছেন।

গদাধর। হ্যাঁ রোগা হইয়াছ। হেতুটা কি?

রামতনু। ভুজঙ্গীকে দেখ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।

ভুজঙ্গীকে রামতনু সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ডাকিতেই সে ভিতরে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ সে বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] জামা খোল্—

ভুজঙ্গী জামা খুলিল। গদাধর সবিস্ময়ে দেখিলেন ভুজঙ্গী মোটা হইয়াছে।

রামতনু। [ভুজঙ্গীকে] এইবার বাড়ি যা—

ভুজঙ্গী চলিয়া গেল।

গদাধর। ভাই রামতনু, তোমার দেহের মেদমাংস ভুজঙ্গীর দেহে গেল কি করিয়া!

রামতনু। প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছিলাম ভুজঙ্গী নামটা সুবিধার নয়, ও নামের চাকর আমি রাখতে চাই না, কেবল তোমার অনুরোধেই বিবেকবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছিলাম। ভুজঙ্গী এখন কি করিতেছে জান?

গদাধর। বল—

রামতনু। প্রত্যহ গভীর রাত্রে উঠিয়া আমার গাইটি দুহিয়া দুগ্ধপান করিতেছে। সকালে সুতরাং দুধ হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল বাছুর বড় হইয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল। রাত্রি জাগরণ করিয়া একদিন পর্যবেক্ষণ করিলাম। দেখিলাম ভুজঙ্গী দুধ দুহিয়া খাইতেছে। তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ দমন করিয়া রাখিলাম। [তর্জনী আস্ফালনপূর্বক] হাঁ, কেবল তোমার বাক্য স্মরণ করিয়া। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া চিন্তা করিলাম কি করা উচিত। অনেকক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলাম, বাছুরটা সরাইয়া রাখিব। তাহাই রাখিলাম এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া পুনরায় ভুজঙ্গীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহা যুগপৎ চমকপ্রদ ও আতঙ্কজনক।

গদাধর। ক!

রামতনু। দেখিলাম ভুজঙ্গী বাছুরের মতো বাঁধে মুখ লাগাইয়া দুধ খাইতেছে! আমার গাইটি কত শান্ত তাহা তুমি তো জান, সে কোনও বাধা দিতেছে না।

গদাধর গোঁফে আঙুল চালাইতে লাগিলেন।

রামতনু। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] ভুজঙ্গী নামের চাকর এই জন্যই আমি রাখিতে চাহি নাই। তুমিই আমাকে এই প্যাঁচে ফেলিয়াছ, ভুজঙ্গী নামটাই খারাপ—

গদাধর। ভাই রামতনু, যদি অভয় দাও, তাহা হইলে তোমাকে একটি ঘটনা বলি।

রামতনু। বল।

গদাধর। আগে জিনিসটা দেখ।

গদাধর উঠিয়া গেলেন ও পাশের ঘর হইতে অতি কষ্টে একটি ঝুড়ি বহিয়া আনিলেন। ঝুড়ির মুখটি কাপড় দিয়া ঢাকা।

গদাধর। ঢাকা খুলিয়া দেখ।

রামতনু ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন ঝুড়িটি ইট পাটকেলে পরিপূর্ণ!

রামতনু। ইহার অর্থ কি!

গদাধর। অর্থ আজ বুঝিয়াছি। আমার ভগ্নিপতির একটি বাগান আছে। তিনি আমার জন্য কিছু ল্যাংড়া আম পাঠাইয়াছিলেন। ফরসা-জামা-কাপড়-পরা একজন ভদ্রলোকের হাতেই পাঠাইয়াছিলেন। ভদ্রলোক আমার পরিচিত! তিনি ঝুড়িটি নামাইয়া দিয়াই চলিয়া গেলেন। খুলিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আজ এইমাত্র ভগ্নিপতির পত্র আসাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়াছে। ভদ্রলোকটি ভগ্নীপতিরও তেমন পরিচিত লোক নন। তিনি এই দিকে আসিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার হাতে ঝুড়িটি দিয়াছিলেন! ভদ্রলোকের নাম কি শুনবে?

রামতনু। কি বল।

গদাধর। ভুজঙ্গী নয়, বুদ্ধদেব।

নবমঞ্জরী

উৎসর্গ

অগ্রজ কথাশিল্পী

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির)

করকমলে—

পত্নী

মাথার উপর পাখাটা বনবন করিয়া ঘুরিতেছিল। কুমার সুমিত্রানন্দনের অবিন্যস্ত তৈলহীন কেশরাশি হাওয়ার আবর্তে আরও অবিন্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। ঠিক পাশেই মর্মর-নির্মিত তেপায়ার উপর রক্ষিত সুরাপাত্রের ফেনবুদ্বুদমালাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল সে হাওয়ার বেগে। কুমার সুমিত্রানন্দন কম্পিত হস্তে সুরাপাত্রটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিলেন। তাহার পর সম্মুখের দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মদিরাক্ষী তরুণীর ছবি। চোখের দৃষ্টিতে স-কৌতুক হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। কুমার আর এক চুমুক সুরা পান করিলেন। তাঁহার বিহ্বল চোখের দৃষ্টি আবেশময় হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন।

কে, নিখিলবাবু না কি?

হ্যাঁ।

স-সঙ্কোচে প্রৌঢ় ম্যানেজার নিখিলনাথ প্রবেশ করিলেন।

সব ঠিক হয়ে গেল?

হ্যাঁ। বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে, তবে তিনি টাকা দেবেন বলছেন!

মাত্র এক লক্ষ-টাকার জন্যে দশ লক্ষ টাকা দামের বাড়িটা বাঁধা রাখতে হবে?

ম্যানেজার চুপ করিয়া রহিলেন।

কুছ পরোয়া নেই। কাগজপত্তর ঠিক করুন। দেরি করবেন না।

সব ঠিক ক'রে রেখেছি, আপনি সই ক'রে দিলেই হবে খালি।

বেশ, রেখে যান আপনি। আমি সই ক'রে দিচ্ছি একটু পরে। হাতটা এখন স্টেডি নেই।

দলিলটি লইয়া নিখিলনাথ বাহির হইয়া গেলেন।

পুনরায় ছবিটির দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন আপন মনে বলিলেন, তোমার দাম দশ লক্ষ টাকার চেয়েও বেশি—ঢের বেশি।

বাহিরে পদশব্দ হইল। কুমার সুমিত্রানন্দন আবার দ্বারের দিকে চাহিলেন।

নিখিলবাবু না কি?

না, আমি।

ও, বীরু! এস, এস।

বয়স্য বীরেন্দ্রনাথ সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, তোমার পত্নীর খবর কি?

আকাশলোক থেকে আজই নেবে আসবে মনে হচ্ছে।

মনে হওয়ার কারণ?

হীরের হারটা আজই কিনে দেব।

লক্ষ টাকা খরচ ক'রে! অত টাকা পেলে কোথা? তোমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স তো—

বাড়িটা বাঁধা রেখে টাকা ধার করছি।

ও।

বীরেন্দ্রনাথ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টিতেও একটি সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুমার সুমিত্রানন্দন তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, তোমার মনে কিছু একটা জেগেছে বুঝতে পারছি। ব'লে ফেলো। তবে ময়্যাল লেকচার দিও না।

বীরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের ছাত্র।

না, ময়্যাল লেকচার দেব না। আমি খুশিই হয়েছি।

তোমার খুশি হবার কারণ?

মানব নামক পশুর প্রগতি দেখে।

কি রকম, খুলে বল, বুঝতে পারলাম না।

সুমিত্রানন্দন আর এক চুমুক সুরাপান করিয়া বলিলেন, আমার তো ধারণা কিস্‌সু হয় নি। হা-হা-হা-হা—

অট্টহাস্য করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেলেন সুমিত্রানন্দন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কি রকম প্রগতি হয়েছে, শুনি।

তা হ'লে একটা গল্প শোন। আর কিছু নয়, ব্যাপারটা একটু নীট হয়েছে।

বল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক রাজকুমার যে রমনীটির প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যে কি করেছিলেন জান?

কি?

দশ হাজার মানুষকে বলিদান দিয়েছিলেন।

কেন?

তাঁর প্রেয়সীর সখ হয়েছিল লোধ্রফুলের রেণু মাখতে। তিনি বলেছিলেন লোধ্রফুলের একটি বাগান ক'রে দাও আমাকে। রাজা কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও লোধ্রফুলের একটি চারাও বাঁচাতে পারলেন না তাঁর জমিতে। হয়তো সে জমিতে

লোধ্রফুলের উপযোগী সার ছিল না। তাঁর পুরোহিত তাঁকে বললেন যে, ও জমিতে যদি দশ হাজার মানুষ বলিদান দিতে পার, তা হ'লে লোধ্রফুলের চারা বাঁচবে। রাজার অসংখ্য দাস ছিল। পরদিনই দশ হাজার মানবপশুর রক্তে সে জমিতে কাদা হয়ে গেল। ব্যাপারটা একটু স্থূল, এই আর কি। এখনকার ব্যাপার একটু সূক্ষ্ম হয়েছে। ওই এক লক্ষ টাকা ওই মারোয়াড়ীর ব্যাঙ্কে জমেছে হয়তো দশ হাজার লোকের বুকের রক্ত শোষণ ক'রেই, কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছে ওই হীরের হারে।

সুমিত্রানন্দনের চোখের দৃষ্টিতেও কৌতুক ঝলমল করিয়া উঠিল।

এ ব্যাপারে মানব-পশুর বলিদান দেখতে পাচ্ছ না তুমি?

পাচ্ছি, কিন্তু সে একটিমাত্র পশুর।

সুমিত্রানন্দন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, লোধ্রফুল কোথায় পাওয়া যায়, দেখেছ কখনও?

না, দেখি নি। কালিদাসের কাব্যে পড়েছি। উজ্জয়িনীর আশে-পাশেই পাওয়া যায় সম্ভবত। আমি এখন চলি ভাই, সন্ধ্যেবেলা আসব আবার।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেলেন। সুমিত্রানন্দন পরীর ছবির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

পরক্ষণেই ফোনটা বাজিয়া উঠিল।

কে, পরী?...তোমার হার নিয়ে আজ যাচ্ছি সন্ধ্যের সময়...হ্যাঁ, বীরেন এখুনি এসেছিল। ভারি মজার একটা গল্প ব'লে গেল। শুনবে, ফোনটা ধ'রে থাক তা হ'লে—

সুমিত্রানন্দন গল্পটি আগাগোড়া বলিলেন। তাহার পর সহসা তাঁহার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

সত্যি বলছ? নিশ্চয়, যেমন ক'রে পারি যোগাড় করব।

ম্যানেজার নিখিলনাথ দলিলপত্র লইয়া প্রবেশ করিলেন।

নিখিলবাবু, টাকার আর দরকার নেই। আমি এখ্‌খুনি উজ্জয়িনী যাব। লোধ্রফুল যোগাড় করতে হবে। ফোন ক'রে এখখুনি বার্থ রিজার্ভ করুন।

নিখিলনাথ সবিস্ময়ে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গন্ধমূষিক শর্মার আত্মজীবনী

ঈজি-চেয়ারে শুয়ে চালের বাতা গুনছিলাম। আমি যে ঘরটিতে লেখাপড়া করি সেটির ছাদ পাকা নয়, সুতরাং কড়িকাঠ গোনবার সুযোগ নেই। অতিশয় বোকার মত আমি আশা করছিলাম যে, ওই ঘুন-ধরা চালের বাতাগুলির মধ্যেই হয়তো কোনও গল্পের প্লট পেয়ে যাব। মিনিট কয়েক পরে কিন্তু ঘরের মধ্যে একটি নূতন ঘটনা ঘটাতে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হ'ল। দৃষ্টি বা মনকে আর চালের বাতায় নিবদ্ধ রাখতে পারলাম না। কোথা থেকে একটা ছুঁচো বেরিয়ে ঘরের মধ্যে কিচকিচ ক'রে বেড়াতে লাগল। শব্দে আর গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলাম। চেয়ারের উপর পা-টা গুটিয়ে নিলাম ভাল ক'রে। আমার বন্ধু অমর সামান্য একটা ইঁদুরের কামড়ে মর-মর হয়েছিল মনে পড়ল। জ্বর হয়ে বুকে সর্দি ব'সে যায় আর কি বেচারা। ছুঁচো যদি কামড়ায় না-জানি কি কাণ্ড হবে! পা-টা ভাল ক'রে গুটিয়েই বসলাম! তার পরই আবার কপাটে ঠুকঠুক ক'রে আওয়াজ আরম্ভ হ'ল! কপাটে খিল বন্ধ ছিল। ভাবলাম কি আপদ, আজ আর লিখতে দেবে না দেখছি! ঠুক্‌ঠুক্ শব্দ সমানে চলতে লাগল। ছুঁচোটাই শব্দ করছে নাকি? কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ছুঁচো নয়। বাইরে থেকে কেউ কড়া নাড়ছে। উঠে কপাটটা খুলে দিলাম। খুলে যা দেখলাম, তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অপরূপ সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছেন একজন। রাত-দুপুরে কে এল এ! মিঠ্‌ঠু মজুমদার নামে যে মেয়েটি চিঠির পর চিঠি লিখে যাচ্ছে ক্রমাগত, সে-ই সশরীরে এসে হাজির হ'ল নাকি শেষ পর্যন্ত! আসবে ব'লে শাসিয়েছিল। মিঠ্‌ঠু আমার লেখার একজন ভক্ত—সে যা লেখে তার কিয়দংশও যদি সত্য হয় তা হ'লে খুব প্রগাঢ় ভক্তই বলতে হবে; কিন্তু তবু এই রাত-দুপুরে বিনা আমন্ত্রণে সে আমার দ্বারস্থ হবে এতটা বাড়াবাড়ি ভক্তি কল্পনা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম। কিন্তু আর আমার চিন্তা বেশি দূর অগ্রসর হতে পেল না। মহিলাটি সহাস্য দৃষ্টি তুলে নিজেই বললেন, অনেকক্ষণ থেকে কাতরভাবে ডাকছ, তাই এলাম।

অনেকক্ষণ থেকে তো মোধো চাকরকে ডাকছি এক পেয়ালা কফি দিয়ে যাবার জন্যে! আর কাউকে ডেকেছি ব'লে তো মনে পড়ছে না।

সভয়ে প্রশ্ন করলাম, কে আপনি?

আমি সরস্বতী। আমি আরও বিশেষ ক'রে এলাম আর একটা কারণে। এই পুজোর হিড়িকে তোমরা অনেকেই যা তা লিখছ। তাই ঠিক করেছি, তোমাদের লেখাগুলো একবার দেখে দেব। চল—

সরস্বতী দেবী ঘরে এসে ঢুকলেন এবং ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, আমার জন্তে তোমায় কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি আপন মনে যা লিখতে চাও লিখে ফেল। লেখাটা শেষ হ'লে দেখে আমি ব'লে দেব, ছাপাবার উপযুক্ত হয়েছে কি না!

তার পর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, আমি চেয়ারটা আর একটু কোণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি সামনে বসে থাকলে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে।

চেয়ারটা টেনে তিনি অন্ধকার কোণটায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি যে কি করব, কি বলব—কিছুই ভেবে পেলাম না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নিজের চেয়ারটাতে গিয়ে বসলাম।

যে ছুঁচোটা কিচকিচ ক'রে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। গন্ধটা কিন্তু গেল না, বরং মনে হ'ল, সেটা যেন আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। তার পরই দেখতে পেলাম, ছুঁচোটা আমার টেবিলের উপর উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সামনের পা দুটো জোড় ক'রে আমার দিকে চাইছে। ঠিক মনে হ'ল, যেন কোন প্রার্থী হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করছে কিছু। অদ্ভুত কাণ্ড। পর মুহূর্তে যা হ'ল, তা আরও অদ্ভুত। মানুষের ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করলে সে।

বলতে লাগল, আমি ছুঁচো নই, ছুঁচী। আমি সুবিখ্যাত গন্ধমূষিক শর্মার কনিষ্ঠা পত্নী কস্তুরী দেবী। ছুঁচো-সমাজে তিনিই প্রথম বিদ্রোহী, তিনিই প্রথম পৈতে নিয়েছেন, তিনিই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন করেছেন, তিনিই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এত বড় একজন মহাপুরুষের মহজ্জীবনী কি আপনারা প্রচার করবেন না? শুনেছি, আপনারা সুন্দরের উপাসক, মহানের পূজারী—

বিস্ময় সীমা অতিক্রম করেছিল। তবু যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা ক'রে বললাম, যা শুনেছেন তা ঠিক। শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মার জীবনীর উপকরণ যদি পাই, তা হ'লে তা নিশ্চয়ই ব্যবহার করব। কিন্তু উপকরণ পাব কোথা? আপনি সরবরাহ করবেন কি?

শ্রীমতী কস্তুরী মুচকি হেসে বললেন, (বিশ্বাস করুন, ছুঁচীর ছুঁচলো মুখের মুচকি হাসি সত্যই মনোরম) আমি তাঁর জীবনের কতটুকু আর জানি! মাত্র দিন কুড়ি আগে তো ওঁর কাছে এসেছি। আমার আগে উনি অন্তত শ দুই ছুঁচীকে নিয়ে ঘর করেছেন। তারা হয়তো অনেকে কিছু উপকরণ দিতে পারত আপনাকে। কিন্তু তাঁদের সে সব খেয়ালই হয় নি। আমি আধুনিকা, এসেই বুঝেছি যে উনি

সাধারণ ছুঁচো নন, ওঁর জীবনী জনসমাজে প্রচার না করলে জনসমাজের প্রতিই অবিচার করা হবে।

কিন্তু সে জীবনীর উপকরণ পাই কি ক'রে?

উনি নিজেই বলবেন আপনাকে। প্রথম প্রথম উনি রাজি হচ্ছিলেন না। বলছিলেন—নিজের কথা, বিশেষ ক'রে নিজের প্রশংসা কি নিজের মুখে বলাটা ভাল দেখাবে? আমি তখন নজীর দেখালাম, কত বড় বড় লোক এ যুগে আত্মজীবনী লিখছেন। বর্তমান যুগে ওইটেই ফ্যাশন। ওতে দোষের কিছু নেই।

উনি রাজী হয়েছেন?

অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। উনি যদি সব খুলে বলেন, তা হ'লে দেখবেন, কি অদ্ভুত ওঁর জীবন! অনেক বড়লোক শুনেছি নিজের শৈশব-জীবন বা কৈশোর-জীবন থেকে আত্মচরিত শুরু করেন। শ্রীযুক্ত গন্ধমুষিক যদি ইচ্ছে করেন, তা হ'লে নিজের পূর্বজীবন থেকেই আরম্ভ করতে পারেন। কারণ পূর্বজীবনেরও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওঁর চমৎকার মনে আছে। ওঁর বর্তমান-জীবনও রোমাঞ্চকর। কি ক'রে একবার একটা নিষ্ঠুর সাপ ওঁকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, কি ভাবে একবার এক গৃহস্থের 'মীট-সেফে' উনি বন্দী হয়েছিলেন, প্রকাণ্ড একটা দুধের কড়ায় পড়ে গিয়ে কি ক'রে হাবুডুবু খেতে খেতে শেষে উনি বাঁচেন—এ সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মত। উনি যদি প্রাণ খুলে সব বলেন আর আপনি যদি ভাল ক'রে লিখতে পারেন, আপনাদের সমাজে হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে দেখবেন। ওঁর যৌবন-জীবনও অনবদ্য। সবটা বোধ হয় খুলে বলবেন না উনি। কিন্তু একটুও যদি বলেন, দেখবেন, কি দুর্দমই না ছিল ওঁর যৌবন! এখনও তার রেশ আছে। আশা করি, এটাকে আপনি নিছক যৌন-লালসা ব'লে ভুল করবেন না। এর মধ্যে প্রাণপ্রবাহের যে অস্থির চঞ্চলতা আছে তা আপনার মত রসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না আশা করি। আর একটা জিনিসও আপনাকে ব'লে দিচ্ছি। ওঁর গলায় দেখবেন পৈতে রয়েছে, ওঁকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলবেন যে, একবার একটা জালে নাকি আটকে পড়েছিলেন, সেই জাল কেটে যখন পালিয়ে আসেন তখন ওই সুতোটুকু নাকি ওঁর গলায় আটকে থেকে গিয়েছিল। এই মিথ্যাভাষণটুকু উনি করবেন, কারণ উনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের নিগূঢ় ইতিহাস প্রকাশ করতে চান না। আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না এ কথা, বুঝলেন।

ক্রমশই আমি কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, বেশ, নিয়ে আসুন তাঁকে।

আমার টেবিলের উপর ছোট যে বইয়ের শেল্‌ফ্‌টা ছিল, শ্রীমতী কস্তুরী দেবী

তার পাশে অন্তর্হিত হলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হলেন শ্রীযুক্ত গন্ধমূষিক শর্মা। বেশ কেঁদো ছুঁচো একটি। তিনিও এসে পিছনের পা দুটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং সামনের পা দুটি বুকের কাছে জোড় ক'রে মিটমিট ক'রে চাইতে লাগলেন আমার দিকে। গলার সুতোটি দেখতে পেলাম। আরও দেখলাম তাঁর একটি কান একটু মোড়া, গায়ের লোমও উঠে গেছে মাঝে মাঝে, মুখটা খুব বেশি ছুঁচলো নয়, একটু যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

বললাম, নমস্কার, আপনার আত্মজীবনী শুনব ব'লে অপেক্ষা করছি।

ক্ষণকাল ইতস্তত ক'রে গন্ধমূষিক বললেন, আমি ছুঁচো।

ব'লেই থেমে গেলেন তিনি। আমি আরও কিছু শোনবার আশায় চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু গন্ধমূষিক আর কিছু না ব'লে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন শুধু।

বললাম, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো।

আবার থেমে গেলেন।

হ্যাঁ, বলুন।

আজ্ঞে, আমি ছুঁচো ছাড়া আর কিছু নই।

ব'লেই তিনি পট্ ক'রে শেল্‌ফের পাশে অন্তর্ধান করলেন। পর-মুহূর্তেই টেবিলের নীচে আবার কিচকিচ শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হ'ল, কলহ শুরু হয়েছে। ক্ষণকাল প'রে তাও থেমে গেল।

উপরোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছি, এমন সময় অন্ধকার কোণ থেকে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হলেন আবার।

কই, দেখি?

খাতাখানা এগিয়ে দিলাম। পড়তে পড়তে তাঁর মুখে মৃদুহাস্য ফুটে উঠল একটা। খাতাখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ছাপতে দিতে পার।

ছাপতে দেব? কি আছে ওতে?

একটা জিনিস অন্তত আছে।

কি?

শ্রীযুক্ত গন্ধেশ্বর শর্মা তাঁর আত্মজীবনীটি বেশ সংক্ষেপে বলেছেন। সমস্ত বক্তব্যটা খুব কম কথায় গুছিয়ে বলা মস্ত বড় একটা আর্ট। উনি যে একটি ছুঁচো

ছাড়া আর কিছু নন—এই কথাটাই উনি ভ্যানর ভ্যানর ক'রে দশ হাজার পাতাতেও বলতে পারতেন ; কিন্তু সে লোভ উনি সংবরণ করেছেন। আচ্ছা, আমি চললুম।

দেবী অন্তর্হিতা হলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

দুই নারী

১

আমাদের মধ্যে যে পশুটা সর্বক্ষণ উদ্যত হয়ে থাকে, সেই পশুটাকে দমন ক'রে রাখবার শিক্ষা ভাগ্যক্রমে আমি পেয়েছিলাম ব'লে প্রথমবার বেঁচে গিয়েছিলাম। তখন আমি বি. এ. পাশ করেছি। ভর্তি হয়েছি এম. এ. ক্লাসে। আমার দূর-সম্পর্কের এক দাদা তখন তিনপাহাড়ে ছিলেন। পুজোর ছুটিতে তাঁর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার দেহ-মনে তখন দুর্বার যৌবন প্রতি মুহূর্তে বাঁধ ভাঙবার চেষ্টা করছে। আর আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি সে বাঁধকে দৃঢ় করবার। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' সর্বদা সঙ্গে থাকে। শান্তিশতকের সেই শ্লোকটা প্রায়ই আওড়াই মনে মনে, যার অর্থ—যে যুবতীটি একদিন কত মোহের জাল বিস্তার করেছিল, চেয়ে দেখ এখন সে শ্মশানে। খট্টাঙ্গের একপ্রান্তে তার মাথার খুলিটা প'ড়ে আছে, দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, শ্মশানের হাওয়া হু-হু ক'রে তার মধ্যে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সে হাওয়া সবাইকে ডেকে যেন বলছে—কোথায় সেই মুখপদ্ম, কোথায় সেই অধর-মধু, কোথায় সেই বিশাল কটাক্ষ? কোথায় সেই কোমল আলাপ, মদনধনুর মত কুটিল ভ্রূবিলাস? কোথায় সে সব এখন? যোগোপনিষদে শুকদেব যা বলেছেন তা স্মরণ করি রোজ, এই শরীর ব্রণমুখ, দুর্গন্ধ-চর্ম-জড়িত, শত শত কৃমিপূর্ণ, মূত্রবিষ্ঠালিপ্ত, পরিবর্তনশীল, সর্বভোগের বাসস্থান, মরণের কারণ···। মনের যখন এই অবস্থা তখন তিনপাহাড়ে গেলাম। দাদার ঠিক মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল। বউদিকে সেই প্রথম দেখলাম আমি। আমাকেও বউদি দেখলেন। দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। বউদিকে রূপসী বললে কিছুই বলা হয় না, পরমাসুন্দরী বললেও না, ঠিক কি বললে যে তাঁর রূপটি বোঝানো যায় তা আজও ঠিক করতে পারি নি আমি। তাঁকে দেখে একটিমাত্র কথা আমার মনে হয়েছিল, সে কথাটি হচ্ছে 'চুম্বক'।

শিকারী খেলোয়াড় বড় মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে অনেকক্ষণ খেলিয়ে তারপর যেমন টেনে তোলে, টেনে তোলবার আগে আমাকেও তেমনি খেলাচ্ছিলেন বউদি দৃষ্টির বঁড়শিতে গেঁথে। যখনই তাঁর দিকে চাইতাম, চোখাচোখি হয়ে যেত। মনে হ'ত, আমি যখন তাঁকে দেখছি না তখনও যেন তিনি চেয়ে আছেন আমার দিকে। পিঠের কাছে অস্বস্তি বোধ করতাম একটা। ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেই চোখাচোখি হয়ে যেত, বউদির মুখে ফুটত মুচকি হাসি।

আমার যতীনদা ছিলেন শিবটি। বউদিদির এই সব চটুলতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করলে সদ্য-বিবাহিত স্বামীর অন্তরে যা যা হওয়া স্বাভাবিক তা তাঁর হয় নি। তার কোনও লক্ষণ অন্তত দেখি নি। তিনি বেশ প্রসন্ন মনে ভোরে উঠতেন, স্নান করতেন, পূজো করতেন, সকাল সকাল খেয়ে আপিসে চ'লে যেতেন। মাঝে মাঝে বউদির দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে বলতেন, তোমারই মজা হয়েছে দেখছি। একা একা কি করবে ভেবে পেতে না, মন্টু আসাতে বেশ একটি সঙ্গী জুটে গেছে তোমার। একদিন যাও না দুজনে, মতিঝরনায় বেড়িয়ে এস।

আমি কিন্তু বউদিদির ব্যবহারে বিব্রত হয়ে পড়ছিলাম। খুব ভোরে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতেন তিনি।

ওঠ ওঠ, কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে! চা যে জুড়িয়ে গেল—

ঘুমের ঘোরে কাপড়-চোপড় সব সময় ঠিক থাকত না, বিব্রত হয়ে উঠে বসতাম। বউদি মুচকি হেসে বলতেন, আহা, বেচারী! সারারাত একলাটি শুয়ে থাকতে কষ্ট হয় নিশ্চয়। একটেরে ঘর তো—

একদিন দুপুরবেলা ব'সে তেল মাখছি, বউদি একটা মোড়ায় এসে বসলেন উঠোনে। আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি বোধ হয় একসারসাইজ কর, নয়?

কুস্তি করি।

কার সঙ্গে?

আমাদের আখড়ার লোকের সঙ্গে।

এখানে কুস্তি করবার লোক পাচ্ছ না বুঝি! এখানে কে তোমার মত অসুরের সঙ্গে লড়বে, বল! ও কি, হয়ে গেল তেল-মাখা? পিঠটাতে তো কিছুই হ'ল না! দেব মাখিয়ে?

না না, থাক্।

বউদি শুনলেন না। উঠে এলেন, আমার মানা করা সত্ত্বেও আমার পিঠে

তেল মাখাতে লাগলেন। মুচকি হেসে বললেন, পুরুষ মানুষের অত লজ্জা কিসের ?

নির্বাক হয়ে রইলাম। ঠিক করলাম, সেই দিনই স'রে পড়ব। 'ভক্তিযোগে'র অশ্বিনী দত্ত সেই পরামর্শই দিতে লাগলেন আমাকে। যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদা আপিস থেকে এসে বললেন, কাল তোমরা মতিঝরনা ঘুরে এস, ট্রলি ঠিক করেছি।

যতীনদা রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কি একটা কাজ করতেন। ট্রলি এসে হাজির হ'ল তার পরদিন ভোরে। যতীনদা যেতে পারলেন না, তাঁর আপিস ছিল। বউদিকে নিয়ে আমিই গেলাম। যেতে হ'ল। রেল থেকে কিছু দূরে মতিঝরনা। বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। গিয়ে যখন হাজির হলাম, মনে হ'ল, না এলে ঠকতাম। অদ্ভুত দৃশ্য। অদ্ভুত নির্জনতা। মনে হ'ল, অন্য একটা জগতে এসেছি। একটা কুলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বললে, আমি হুজুর খাবার নিয়ে আসি। আপনারা স্নান করেন তো ক'রে নিন।

বউদিদি কাপড়-গামছা এনেছিলেন। শুধু নিজের নয়, আমারও। আমি বললাম, আমি স্নান করব না। শরীরটা ভাল নেই।

আমি কিন্তু করব।—মুচকি হেসে বউদিদি বললেন।

কুলিটা চ'লে গেল। আমি দূরে একটা পাথরের ওপর ব'সে রইলাম। বউদিদি স্নান করতে লাগলেন। তাঁর স্নানলীলা অবর্ণনীয়। প্রতিজ্ঞা করলাম, ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনেই চ'লে যাব।

যাওয়া কিন্তু হ'ল না। যতীনদাই বাধা দিলেন। বললেন, আজ আমাদের এখানে যাত্রা হবে। আজ যাত্রাটা দেখে কাল যেও।

কত রাত হয়েছিল জানি না। যাত্রা দেখছিলাম ব'সে ব'সে। খানিকক্ষণ পরে কিন্তু আর ভাল লাগল না। ঘুম পেতে লাগল। উঠে এলাম। বাইরের ঘরে আমার বিছানা পাতাই ছিল, এসে শুয়ে পড়লাম। ঠিক তন্দ্রাটি এসেছে, খুট ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ঘরে কেউ এসেছে না কি ? পর-মুহূর্তেই আমার হাতটা চেপে ধরলেন বউদি ! উষ্ণ স্পর্শ !

কে ?

কোন উত্তর নেই।

আমি তড়াক ক'রে বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ভোরেই একটা ট্রেন ছিল, সেই ট্রেনেই ত্যাগ করলাম তিনপাহাড়।

২

চ'লে এলাম বটে, কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। সেই উষ্ণ স্পর্শটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। আমার সংযমের হিমালয় গলতে লাগল ধীরে ধীরে। তার পর নূতন বইও পড়লাম কয়েকটা পর পর। 'নষ্টনীড়', 'নানা', 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'মাস্টার প্যাশন', 'রেনস্'। দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে লাগল। মনে হতে লাগল 'ভক্তিযোগ' আর 'গীতা'র রসাস্বাদন করবার যোগ্যই হই নি আমি। রাজসিক জীবন যাপন না করলে আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত মর্ম বোঝা যায় না। আগে ভোগ, তার পর ত্যাগ। পিপাসা না পেলে কখনও শীতল জলের মূল্য বুঝতে পারে কেউ? ইংরেজী বাংলা দু রকম 'ওমর খৈয়াম' কিনে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের গানগুলোর নূতন অর্থ প্রতিভাত হ'ল মনে। আদ্যোপান্ত প'ড়ে ফেললাম, বায়রন কীটস শেলী বার্নস্। মনে হ'ল, জীবনের ঐশ্বর্যকে ত্যাগ ক'রে কোন মরুভূমির দিকে ছুটছি আমি। অনুতাপ হতে লাগল। আমি শুকদেব নই, পাথরও নই, আমি উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করতে গেলাম কেন? উর্বশী তো জীবনে বার বার আসে না, একবার এসেছিল, আর আসবে কি? কবিতা লিখতে শুরু করলাম। কাগজে সেগুলো ছাপাও হতে লাগল। অনেকগুলো কাগজ বউদিকে পাঠিয়েও দিলাম। আশা করতে লাগলাম, উত্তর আসবে একটা। নিশ্চয়ই আসবে। উষ্ণ স্পর্শটা উষ্ণতর হতে লাগল প্রতিদিন। উত্তর কিন্তু এল না। তার পর আর একটা বই হাতে এল। বেট্‌সের লেখা কয়েকটা গল্প। মনে হ'ল, এই তো জীবনের স্বরূপ। এস্থারের ছবিটা আঁকা হয়ে গেল মানসপটে। ছলনাময়ী নারী উদ্দাম পুরুষকে যুগে যুগে আমন্ত্রণ করেছে, উদ্দাম পুরুষ যুগে যুগে বাঁধা পড়েছে তার আলিঙ্গন-পাশে। এই নিয়ম। আমি সে নিয়মের ব্যতিক্রম হব কেন? অনুতাপ হতে লাগল— হায়, হায়, কি সুযোগই হারিয়েছি!

৩

সুযোগ কিন্তু পেলাম আর একবার। বছর দুই পরে। যতীনদা তখন জামালপুরে। তিনিই আমন্ত্রণ করলেন আবার। গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বউদি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন একটু। যতীনদা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সকালের ট্রেনে আসবে। তা ভালই হ'ল। লাইন খারাপ হয়েছে, আমাকে বেরুতে হবে এখুনি। অমিতাকে আর একা থাকতে হ'ল না, আমি একটা কুলিকে রেখে যাব ভাবছিলাম।

যতীনদা চ'লে গেলেন। মুচকি মুচকি হেসে বউদি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। গরম গরম ফুলকো লুচি আর ডিমের ডালনা। খাওয়া শেষ হ'লে বিছানা পেতে দিয়ে বললেন, সমস্ত দিন ট্রেনে এসেছ, শুয়ে পড়।

ঘুম পায় নি। ব'স না তুমি এইখানটায়। আমার কবিতাগুলো পড়েছিলে ?

পড়েছি। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তুমি ওগুলো লিখেছিলে সে চ'লে গেছে !

চ'লে গেছে ?

ম'রে গেছে।

তার মানে ?

তোমার দাদাটিকে চেন না ? অমন পরশপাথরের কাছে লোহা কতক্ষণ লোহা থাকতে পারে বল ? সোনা তাকে হতেই হবে। দেখলে না কেমন বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে চ'লে গেলেন ? আমি আর সে নেই, আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। ঘুমোও। পাখাটা খুলে দিচ্ছি।

পাখাটা খুলে কপাটটা বন্ধ ক'রে বউদি চ'লে গেলেন।

আমি নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইলাম। পাখাটা বনবন ক'রে ঘুরতে লাগল।

নুড়ি ও তালগাছ

বিরাট প্রান্তর। তার মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তালগাছ। কতদিন থেকে কেউ জানে না। আশে-পাশে কোনো গাছ নেই। চতুর্দিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিশাল একটা বিস্তৃতি কেবল।

তালগাছের ঠিক নীচে প'ড়ে আছে, ছোট একটি পাথরের নুড়ি। কতদিন থেকে তা-ও কেউ জানে না। আশে-পাশে তার ছোট-ছোট ঘাস। নুড়ির যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘাস ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি। বর্ষাকালে গজায়, গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। ফের্ বর্ষা এলে আবার জেগে ওঠে, জড়িয়ে ধরে তাকে শ্যামল স্নেহ-ভরে। চিরকালই সে এই দেখেছে। মাটিতে ঘাস হয়, শুকিয়ে যায়, আবার হয়। এই তার অভিজ্ঞতা। মাঝে-মাঝে তার মনে হয়, আমার দৃষ্টির বাইরে আরও কিছু ঘটে না-কি অন্যরকম ?

হঠাৎ একদিন সে তালগাছটার সম্বন্ধে সচেতন হ'লো।

এই কালো মোটা জিনিসটা কি বস্তু। সোজা উপর দিকে উঠে গেছে।

যতদূর মনে পড়ে, একে একই রকম দেখছে সে চিরকাল। ঋজু…বলিষ্ঠ… উর্ধ্বমুখী।

—"শুনছেন ?"

তালগাছ নিরুত্তর।

—"শুনছেন ?"

কোনো উত্তর নেই।

পাথরের নুড়ি ছোট, কিন্তু নাছোড়বান্দা। বহুবার ডেকে-ডেকে তালগাছকে অবশেষে বিচলিত করলে সে।

—"কি বলছ, কে তুমি ?"

—"আমি আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে আছি, ছোট পাথরের নুড়ি। আপনি কে ?"

—"আমি তালগাছ।"

—"ও !"

যদিও তালগাছের তলাতেই সে প'ড়ে আছে এত কাল, তবু তালগাছের নাম শোনেনি সে। একটু অবাক হ'লো। সোজা উঠে গেছে কত উঁচুতে! হঠাৎ মনে হ'লো, ওর অভিজ্ঞতা হয়তো নূতন রকম। একটু থেমে প্রশ্ন করলে :

—"আচ্ছা, আপনি অত উঁচুতে কি দেখেন রোজ ?"

—"আকাশে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়।"

—"তারপর ?"

—"আবার ওঠে"…

টোপ

মাছ ধরা সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এক প্রস্থ চা নিমকি হয়ে গেছে, প্রবীণ মৎস্য শিকারী বিপিন বোস তাঁর প্রাত্যহিক হুইস্কি-সোডাটি ধীরে ধীরে "সিপ" করছেন, গলির ভিতর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, নিবিড় অন্ধকার থমথম করছে চতুর্দিকে। গল্প জমাবার মতো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গল্প জমছিল না ঠিক।

সান্ধ্য বৈঠকটি বসেছিল কানুবাবুকে কেন্দ্র করে। কানুবাবু গয়া-নিবাসী এবং ও অঞ্চলের একজন নামজাদা মৎস্য-শিকারী। তিনি এসেছিলেন তাঁর ভগ্নীপতি অতুলের কাছে। অতুল বিপিন বোসের সাকরেদ। বিপিন বোস যখনই মাছ ধরতে

বেরোন অতুল তাঁর তলপি-তলপা বহন করে। তাঁর পাশে একটা ছিপ নিয়ে বসেও প্রত্যেকবার। পুটি-মাছ, ল্যাটা মাছ, বাটা মাছ ধরেওছে অনেকবার। কিন্তু যা তার স্বপ্ন তা তখনও অগাধ জলের তলায়। বড় মাছ একটাও ধরতে পারেনি বেচারি।

এক্ষেত্রে যা চিরকাল হয় তাই হচ্ছিল। অতুলচন্দ্র তার নামজাদা ভগ্নীপতি কানুবাবুর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল কিভাবে একবার একটা দশ-সেরি রুই 'একটু'র জন্যে ফসকে গিয়েছিল তার ছিপ থেকে।

"মাইরি বলছি, প্রায় টেনে তুলেছিলাম, পট্ করে সুতোটা গেল ছিঁড়ে। বিপিনদাকে জিগ্যেস করুন—" বিপিন বোস স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন। বাইরের লোকের কাছে নিজের শিষ্যকে খেলো করবার লোক তিনি নন।

"প্রায় দশসের হবে মাছটা, নয় বিপিন দা ?"

"বেশী"।

কানুবাবু তাঁর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সূচালো অংশটি পাকাতে পাকাতে বললেন, "আসল জিনিস হচ্ছে টোপ। টোপটি যদি মুখরোচক হয় মাছ হ্যাঁচকা টান মারবেই না। গলায় বঁড়শি বেঁধা সত্ত্বেও মারবে না, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা।"

বিপিন বোস খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন কানুবাবুর মুখের দিকে, তারপর একমুখ হেসে সমর্থন করলেন কথাটা।

"তাতে আর সন্দেহ আছে ? আমারও অভিজ্ঞতা তাই। কি ধরনের টোপ আপনি ব্যবহার করেন ?"

"আমি নানারকম টোপ ব্যবহার করি। কেঁচো, গুগলি, ছোট কাঁকড়া, বোলতার চাক। কিন্তু আমি আর একটি জিনিষ করি !..."

খুব রহস্যময়ভাবে দাড়ির ডগাটি পাকাতে লাগলেন কানুবাবু।

"আর কি করেন ?"

"আমি বেশ করে আচার মাখিয়ে নি' তাতে।"

"আচার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোনো আমের আচার। ব্যবহার করে দেখবেন, খুব ভাল ফল হয়।"

বিপিন বোস গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। অতুল চকিতে একবার চেয়ে দেখলে তাঁর মুখের দিকে। মাছ-ধরা সম্বন্ধে বিপিন বোসকে নূতন কথা শেখাবে এমন লোক জন্মায় নি, অতুলের এই ধারণা। কানুবাবুর আচারের কথা শুনে বেচারা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল মনে মনে। বিপিন বোস কিন্তু সামলে

নিলেন। বললেন, "খোট্টার দেশের মাছেরা আচার দেখে ভুলে যেতে পারে, এদেশের মাছেরা ভুলবে না। আমার একটা কি ধারণা হয়েছে জানেন? পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুসারে মাছেদেরও স্বভাব বদলায়, রুচি বদলায়। আমার জীবনে একবার নয়, দু'দুবার প্রমাণ পেয়েছি এর।"

"কি রকম?"

"আমি তখন ইনকম্‌ট্যাক্স্ অফিসার। বরাবরই তো মাছধরার বাতিক, যেখানে যখন গেছি খবর নিয়েছি কোন পুকুরে মাছ আছে। একবার খবর পেলাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার গোঁসাইজির পুকুরে মাছ আছে অনেক। কিন্তু কাউকে তিনি পুকুরে ছিপ ফেলতে দেন না। কিন্তু আমি ইনকম্‌ট্যাক্স্ অফিসার, আমাকে 'না' বলা শক্ত। খবর পাঠাতেই সাদরে আহ্বান করলেন। গেলাম এক রবিবারে। গিয়ে দেখি বিরাট পুকুর। পুকুর নয় তো যমুনা যেন। টলমল করছে কালো জল। পুকুরের পাড়েই রাধাবল্লভজীর প্রকাণ্ড মন্দির। নানারকম চার আর টোপ নিয়ে গিয়েছিলাম, বাগিয়ে ছিপটি ফেললাম। ও মশাই, আধঘণ্টা একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কেটে গেল একটি মাছ ঠোকরাল না। আশেপাশে বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে বুঝতে পারছি, কিন্তু টোপের কাছাকাছি এসেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেঁচো, কাঁকড়ার বাচ্ছা, মাছের নাড়িভুঁড়ি, মাংসের কিমা—সব আমার সঙ্গে ছিল। একের পর এক টোপ বদলাতে লাগলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, একটি মাছ ঠোকরাল না। সমস্ত দুপুর রোদে ঠায় বসে রইলাম, কিছু হল না। অথচ মাছ প্রচুর। ঠিক করলাম আর একদিন আসব। মন্দিরের একটা রোগা গোছের চাকর ছিল। তাকে কিছু বখশিস দিলাম, আর বললাম—আসছে রবিবারে সকাল থেকেই চার ফেলে রাখিস। আমি দুপুরের দিকে আসব। চাকরটা এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললে—হুজুর, এবার কিছু মালপো সঙ্গে করে আনবেন। এ পুকুরের মাছ কেঁচো টেঁচো খায় না, কোনরকম আমিষ খায় না। রাধাবল্লভজীর পুকুরের মাছ কি না। তাছাড়া এ বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, মাছ মাংসের পাটই নেই—। অবাক হয়ে বললাম—মালপো খাবে? তুই জানলি কি করে? মুচকি হেসে সে বললে—আমি মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে ধরি যে। কাউকে বলবেন না যেন হুজুর। আসছে রবিবার মালপো নিয়ে আসবেন গপ্‌গপ্ করে খাবে দেখবেন। তাই হল। পরের রবিবার মালপো টোপ ফেলে চারটি বড় বড় বৈষ্ণব রুই কাৎলা গেঁথে নিয়ে এলাম।"

এতক্ষণে গল্প জমল। কানুবাবু 'থ' হয়ে গেলেন। অতুলের চোখ দুটো জলজল করে উঠল। বিপিন বোস হুইস্কি-সোডায় আর একটি 'সিপ' দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দ্বিতীয় গল্পটি বললেন তিনি।

"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে মফঃস্বলে ছিল পুকুরটা। কোন এক নবাবজাদার পুকুর। পুকুরের নাম বেগম তালাও। খোঁজ পেয়ে মোটরে করে গেলাম একদিন। দেখি বিরাট একটা পোড়ো বাগান বাড়ি। শ্বেতপাথরের তৈরি ভাঙ্গা মতি-মন্‌জিল্ আর তার সামনে শ্বেতপাথরের বাঁধানো প্রকাণ্ড বেগম তালাও। দেখলাম পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত শ্বেতপাথরের বাঁধানো চমৎকার একটা প্লাটফর্মের মত রয়েছে। তার উপর রয়েছে শ্বেতপাথরেরই ছত্র একটি। রোদ লাগবে না। জলের রংও অদ্ভুত—ঠিক ব্র্যাণ্ডির রঙের মতো। নবাবজাদারা অনেকদিন আগেই নির্বংশ হয়েছেন। থাকবার মধ্যে ছিল একটি পুরানো চাকর। সেই এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল এবং আমার অভিপ্রায় শুনে বললে যে যেদিন খুশী যতক্ষণ খুশী আমি এখানে এসে মাছ ধরতে পারি. সে আমার যথাসাধ্য খিদমৎ করবে। তোড়-জোড় করে গেলাম একদিন। কিছুক্ষণ বসবার পর সেদিনও বেকুব হতে হোল মশাই। বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে, কিন্তু কাছে আসে না কেউ। মালপো ইনসিডেন্টটা মনে পড়ল, ভাবলাম এখানে পোলাও টোলাও আনতে হবে নাকি। ঘন্টা দুই বেকার বসে থাকার পর সেই বুড়ো চাকরটাকে ডাকলাম। বললাম, কি রকম চার, কি রকম টোপ দিলে মাছ আসবে বলতে পার? সে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর যদি গোস্তাকি মাপ করেন তাহলে হদিশ বাতলাতে পারি। বললাম, বাতলাও বখশিস করব তোমাকে। সে বললে, হুজুর, এ বেগম তালাওয়ের মাছ এমনিতে ধরা দেবে না। দুটি খপসুরৎ বাইজি আনতে হবে। তারা এসে আপনার দু'পাশে বসবে, তাদের ছায়া জলে পড়বে, তবে মাছ আসবে। বলা-বাহুল্য, এতটা আমি প্রত্যাশা করি নি। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে আর একবার সেলাম করে বললে, গরীব পরবর, যা বলছি তা করে দেখুন। আমি আপনার সঙ্গে কি দিল্লগি করতে পারি?"

বিপিন বোস হুইস্কি-সোডাতে আর এক 'সিপ' দিয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়তে লাগল কেবল।

"তারপর?"

"পরের রবিবার দুটো বাইজি নিয়েই গেলাম মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ আসতে লাগল। ময়দার টোপ দিয়েই ধরে ফেললাম গোটা আস্টেক কেঁদো কেঁদো মাছ। আমার বুইক গাড়ির কেরিয়ারটা ভরে গেল—"

বিপিন বোস চুপ করতেই কানুবাবু ভক্তি ভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "রাত অনেক হল এবার উঠি—"

অতুলের মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়।

ভূতের প্রেম

"এই দেখ ইন্দুর ডায়েরি। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, তুমি পড়ে দেখ দিকি, কিছু মানে বার করতে পার কিনা।"

বলিষ্ঠকায় ভুজঙ্গধর মরক্কো-চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য খাতাখানি আমার দিকে আগাইয়া দিল।

"উনত্রিশে তারিখে যেটা লিখেছে সেইটে পড়! আরও পাতা উলটে যাও—হ্যাঁ, ওইখান থেকে পড়।"

পড়িতে লাগিলাম। ভুজঙ্গধর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভুজঙ্গধর আমার বাল্যবন্ধু এবং ইন্দুমতীর স্বামী।

ইন্দুমতী লিখিয়াছেন, "কাল রাত্রে যে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে তা এতই অসম্ভব যে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি কাউকে বলিওনি, এমন কি মাণিককেও না। মাণিককে বলতে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে পাছে সে আমাকে ভীতু বলে ঠাট্টা করে। তার চক্ষে নিজেকে ভীতু প্রতিপন্ন করবার ইচ্ছে নেই। সত্যি সত্যি ভীতু আমি নইও। ভীতু হলে জনমানব-বর্জিত এই পোড়ো বাড়িতে এসে থাকতেই রাজি হতাম না কি? ঘটনাটা তবু লিখে রেখেছি। লিখে রাখবার মতো ঘটনা ক'টাই বা ঘটে জীবনে! ভবিষ্যতে কোনও পাঠক বা পাঠিকা হয়তো এটা পড়ে পাগল ভাববেন আমাকে; কিংবা হয়তো কোনও উৎসাহী মনস্তাত্ত্বিক-এর থেকে কোনও তথ্য উদ্ধার করে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করবেন আমার স্বামীকে। সত্যই অদ্ভুত ঘটনাটা।"

কাল রাত দশটার সময় মাণিক হঠাৎ বলল—"ওহো, একটা বড় ভুল হয়েছে, পেট্রোলটা কেনা হয়নি। চল কিনে আনি গিয়ে। দশ মাইল যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে?"

আমার শরীরটা তেমন ভাল ছিল না, কোমরটা ব্যথা করছিল সন্ধে থেকেই। তাছাড়া আগাথা ক্রিষ্টির একখানা বই এমন পেয়ে বসেছিল আমাকে যে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করছিল না।

বললাম, "আমি আর যাব না, থাক না কাল কিনলেই হবে।"

মাণিক বললে, "ওটা হল স্ত্রীবুদ্ধি। আমরা যেরকম অবস্থায় আছি তাতে মোটরে সদাসর্বদা পুরো পেট্রোল থাকা চাই।"

"তাহলে তুমিই গিয়ে নিয়ে এস।"

"তুমি থাকতে পারবে একা? ভয় করবে না তো?"

"আমি যদি ভীতু হতাম তাহলে যা করেছি তা করতে পারতাম না কি !"

মাণিক হঠাৎ ঝুঁকে আমার গালে চপাৎ করে চুম খেল একটা। এমন দুষ্টু আর অসভ্য হয়েছে আজকাল !

"আমি পেট্রোলটা নিয়ে আসি তাহলে। যাব আর আসব।"

মাণিক চলে গেল। আমরা যে বাড়িটাতে এসে ছিলাম সেটা কোন এক মৈথিল জমিদারের বাগান বাড়ি। যদিও এখন পোড়ো বাড়ির মতো হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন যে এর মহিমা ছিল তা একনজরেই বোঝা যায়। জমিদারের বংশধর জীমূতবাহন সিংয়ের সঙ্গে মাণিকের বন্ধুত্ব আছে বলেই বাড়িটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বাড়ির চাবিটা মাণিককে দিয়ে জীমূতবাহন লণ্ডনে পাড়ি দিয়েছেন সম্প্রতি। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড হাতা। আমরা দোতলায় যে ঘরখানা নিয়ে আছি, তার ঠিক সামনেই গাড়ি-বারান্দা, গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সুবিস্তৃত বাগানটা। বাড়ির সামনেই বাগান। এখন অবশ্য বাগানের পূর্বশ্রী নেই। ফাঁকা মাঠের মতো খানিকটা জমি পড়ে আছে খালি। বাগানের ওপারে গেট। গেটেরও ভগ্নদশা। কপাট নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম দুটো দাঁড়িয়ে আছে কেবল।

সেদিন জ্যোৎস্না উঠেছিল খুব। ফিনিক ফুটছিল বা চতুর্দিকে। ইজি-চেয়ারটায় শুয়ে শুয়েই আমি টের পেলাম মাণিক মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর কতক্ষণ কেটেছিল, আমার মনে নেই ঠিক। আমি তন্ময় হয়ে বই পড়ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অনেকগুলো ঘোড়া যেন টগবগ করে ছুটে আসছে। মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে, কেন জানি না হঠাৎ মনে হল অনেকদিন ধরে আসছে ! শব্দটা প্রথমে ক্ষীণ ছিল, তারপর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ! খটবট খটবট খটবট খটবট—ক্রমশই যেন এগিয়ে আসছে। আমি বইটার দিকে চেয়ে বসেছিলাম কিন্তু পড়ছিলাম না। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। কার বা কিসের, তা জানি না, কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছিল চরাচরও যেন অপেক্ষা করছে রুদ্ধশ্বাসে। কি হয় তা দেখবার জন্যে সবাই যেন উৎসুক। ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর প্রতিটি পদক্ষেপ-ধ্বনি সবাই যেন শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। এগিয়ে আসছিল শব্দটা···কাছে···আরও কাছে···গেট দিয়ে ঢুকল। তারপরই আমি ধড়মড় করে দাঁড়িয়ে উঠলাম। মনে হল ঘোড়াগুলো বুঝি হুড়মুড় করে আমার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে ওঠামাত্র শব্দটা কিন্তু থেমে গেল হঠাৎ। হলের দরজাটা খোলা ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা লোক।

"আমি তোমাকে নিতে এসেছি ইন্দুমতী।"

"কে ?"

ঘরের ভিতর ঢুকল এসে। শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারা। মাথায় স্বর্ণমুকুট, অঙ্গে কারুকার্য খচিত অঙ্গচ্ছদ, কর্ণে মণিকুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর। চোখ দুটো যেন জলজল করছে। কুচকুচে কালো গোঁফ, কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো এক মাথা চুল। আমি তো অবাক।

"কে আপনি—?"

"অয়ি মানস-সরোবর-বিহারিণী রাজহংসী, তুমি কি সত্যিই চিনতে পারচ না আমাকে।"

আমি নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কোথাও একে দেখেছি কি না। সে বলতে লাগল—"একটু ভেবে দেখ মনে পড়বে। নারদের বীণাচ্যুত মালার আঘাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে তো একদিনের জন্যও ভুলিনি। বারবার এসেছি তোমার কাছে। নানারূপে এসেছি। তুমিও তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করনি সখি। অয়ি রম্ভোরু, অয়ি অনবদ্যা ভোজনন্দিনী, ভুলে গেছ কি সব ? অর্জুনরূপে এসেছিলাম সুভদ্রার কাছে, পৃথ্বীরাজরূপে এসেছিলাম সংযুক্তার কাছে···আমাকে তো তুমি প্রতিবারই চিনেছ···।"

আমি তখন আত্মস্থ হয়েছি।

বললাম, "ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন। স্পষ্ট করে বলুন আপনি কে ?"

"আমি অজ।"

"অজ ? সে আবার কে !"

"মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ—"

"কি চান আপনি—"

"তোমাকে চাই। তুমি আমার। স্বয়ংবর সভায় মলয়রাজের যে ঐশ্বর্য তোমাকে ক্ষণিকের জন্যও বিচলিত করেছিল তা আমি আহরণ করেছি ইন্দুমতী। অয়ি মত্ত-চকোর-লোচনে, নিতম্বগুর্বি, আমিও তোমার জন্য তাম্বুললতাপরিবৃত, পূগতরুশোভিত, এলালতালিঙ্গিত, চন্দনবৃক্ষ সুরভিত, তমালমালা-আকীর্ণ মনোরম কানন নির্মাণ করে রেখেছি নিষ্কলুষ মানসলোকের উত্তুঙ্গ মলয় শিখরে। চল সখি সেখানে। আমি রথ এনেছি তোমার জন্যে। চল···"

লোকটা ঘরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ তার অনুসরণ করলাম। গিয়ে দেখি সত্যিই চতুরশ্ববাহিত বিরাট এক রথ দাঁড়িয়ে

রয়েছে নীচে। ওরকম বলিষ্ঠ ঘোড়া আমি আর দেখিনি এর আগে। যেন মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী!

"আর বিলম্ব কোরো না, চল।"

লোকটা আমার হাত ধরতে যাচ্ছিল। আমি চীৎকার করে উঠলাম। মাণিকের কথা মনে পড়ল আমার!

"ভয় পেয়ো না, আমি ভদ্রবংশজাত, আমি বলাৎকার করব না। যাবে না তুমি আমার সঙ্গে?"

"না—"

"কেন—"

"আমি মাণিককে ভালবাসি।"

"মাণিক? সে কে!"

"আমাদের মোটর ড্রাইভার ছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু এখন সেই আমার সব—"

"ও। আচ্ছা আমি অপেক্ষা করব। একটা কথা শুধু বলে যাচ্ছি, আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। আবার আসব আমি···"

পরমুহূর্তেই সব অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এইখানেই ডায়েরি সমাপ্ত হইয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিলাম ভুজঙ্গধর তখনও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইন্দুকে তুমি ফিরিয়ে এনেছ?"

"হ্যাঁ, চুলের ঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে এনেছি—"

"আর মাণিক?"

"তাকে গুলি করে ওইখানকারই একটা ইঁদারায় ফেলে দিয়েছি।"

"কি সর্বনাশ!"

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ভুজঙ্গধর বলিল—"ইন্দুকে সত্যিই আমি ভালবাসি ভাই। ওর জন্যে ফাঁসি যেতেও আমার আপত্তি নেই।"

"এত রাত্রে তুমি আমার কাছে এসেছ কেন বল তো?"

"পরামর্শ করতে। ইন্দুকে কি লুম্বিনী পার্কে পাঠাব?"

"ডায়েরিটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো পাগল হয়ে গেছে?"

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল ভুজঙ্গধরের চাকর ঘনাই। বোঝা গেল ঘনাই উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়াছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে বলিল, "বাবু, মাঠান আবার বেরিয়ে গেলেন—"

"সে কি রে।"

"হ্যাঁ বাবু। প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে, কি বড় বড় ধবধবে সাদা ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভিতর থেকে চোগোঁপ্পা একটা লোক মুখ বার করে বললে—'ইন্দুমতী, এস।' মাঠাকরুণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন, আর টগবগ টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে!"

"তাই নাকি!"

আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে অকুস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কেহ কোথাও নাই, চতুর্দিক নিস্তব্ধ। ইন্দুমতী আর ফেরে নাই।

মন্মথ

১

কয়েকটি ট্যাবলেট বিলটুর হাতে দিয়ে বললাম, "দুটো করে ট্যাবলেট তিন ঘণ্টা অন্তর খাবে। কাল এসে একবার খবর দিও। যদি দরকার হয় অন্য ওষুধ দেব। এতেই ভাল হয়ে যাবে আশা করি—"

"কি খাব ডাক্তারবাবু—"

"আজ শুধু জল খেয়ে থাক—"

"শুধু জল?"

"শুধু জল না পার পাতলা করে বার্লি খেও।"

বিলটু মুখ বাঁকিয়ে বলল, "বার্লি? বার্লি একেবারেই সয় না আমার। খেলেই বমি হয়ে যাবে—"

"পেটের অসুখ করেছে, উপোস দেওয়াই তো ভাল—"

"উপোস দিতে পারি না যে।"

"তাহলে মাকে বোলো গরম ফ্যান একটু নুন আর লেবুর রস দিয়ে—"

"ফ্যান তো গরুতে খায়, আমি কি গরু—"

"গরু ভাতও খায়, তরকারিও খায়। তুমি ভাত তরকারি খাও না?" বিলটু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।"

"মাছের ঝোল চলবে?"

"চলবে, যদি তোমার মা মশলা না দিয়ে করে দেন। স্টু খেতে পার—"

"রসগোল্লা?"

"না।"

"রসটা নিংড়ে ফেলে যদি ছানাটা খাই ?"

"না—

বিলটু অপ্রতিভ মুখে বসে রইল। বিলটুর বয়স বারোর কাছাকাছি। আমাদের পাড়াতেই থাকে। কিছুদিন আগে পিতৃহীন হয়েছে। আমরা সবাই তাই গার্জেন হয়ে উঠেছি ওর। অসঙ্কোচে ফাই ফরমাস করি, অসঙ্কোচে শাসন করি, অসঙ্কোচে উপদেশ দি। বিলটু আপত্তি করে না। সকলেরই ফরমাস খাটে, ভান করে যেন সকলেরই উপদেশ শুনছে। আমার নাতিকে যে প্রাইভেট টিউটারটি পড়ান তার কাছে বিলটুও এসে বসে মাঝে মাঝে, হাতের লেখা লেখে, অঙ্ক কষে। ওর মা আশা করে আছে আমি আগামী বছর ওকে স্কুলেও ভরতি করে দেব। আমার কাছেই বিলটু একটু আধটু আবদারও করে। কয়েকদিন আগেই তাকে ঘুড়ি লাটাই কিনে দিয়েছি।

বিলটু নাকি সুরে বললে---"কি খাব তাহলে বলুন না—"

"বললাম তো, ষ্টু খাও গে।"

"মা অত হাঙ্গামা করতে রাজি হবে না।"

"বেশ, আমাদের বাড়িতে এস, আমি ব্যবস্থা করব।"

বিলটু হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে চট করে উঠে পড়ল সে। প্রবেশ করলেন পুরুষোত্তমবাবু। মনুষ্যরূপী মহিষ একটি। শুধু মহিষও নয়, মহিষ এবং শজারুর সমন্বয়। মাথায় একজোড়া শিং সর্বদা উদ্যত হয়ে থাকে ভদ্রলোকের, সর্বাঙ্গে নানারকম কাঁটাও। মনে মনে তিনি বাস করেন পবিত্র অতীত যুগে—যে যুগে সবই ভালো ছিল—চাল ডাল দুধ ঘি সস্তা ছিল, নারীদের সতীত্ব ছিল, পুরুষদের ধর্মজ্ঞান ছিল, ঠিক সময়ে বৃষ্টি হত, ছেলেমেয়েদের ঠিক সময়ে বিয়ে হত, সন্তান হত। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ফের সশরীরে তাঁকে বর্তমান যুগে সজ্ঞানে বাস করতে হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে আমার সামনে এক বাণ্ডিল চিঠি ফেলে দিয়ে বললেন—"এই নিন। ফনতির বাক্স থেকে পেয়েছি। এর যদি ব্যবস্থা একটা না করেন আই শ্যাল শুট হিম।"

পুরুষোত্তমবাবুর বন্দুক ছিল না, কিন্তু কথায় কথায় তিনি সকলকে 'শুট' করতে চাইতেন। চিঠিগুলি খুলে খুলে দেখলাম। গোলাপী রঙের শৌখীন কাগজ। কাগজে এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করছে। ভাষা আরও রঙীন আরও সুরভিত। সামান্য একটু উদ্ধৃত করছি—"নিদ্মহলের আলোছায়ায় রজনীগন্ধার আবেশের মতো যে স্বপ্ন আমাকে উতলা করে তোলে তা কি তুমি জানো না ? মর্মের

মর্মর-শয্যায় যে রাজকন্যা শতদলের পাপড়ির উপর ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙাবার সোনার কাঠি কোথায় পাব ! প্রাণের বন্ধু, তুমিই বলে দাও কোথায় পাব··· ।"

এই ধরনের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা ।

লম্বা ঘুঁটকো গালের-হাড়-উঁচু মন্মথর মুখটা ভেসে উঠল মনে। বিবাহিত, চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে, বউটি আসন্ন-প্রসবা। ওই ছোকরার এই কাণ্ড ! ও যে এমন ভাল বাংলা জানে তাই বা কে জানত !

"মন্মথ কোথায়, ডাকুন তাকে।"

"সে একটা ইনজেকশন্ দিতে গেছে। আসবে একটু পরে। আপনি বাড়ি যান, আমি জিজ্ঞেস করব তাকে। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে, চিঠিই তো লিখেছে আর তো কিছুই করে নি—"

"কিছুই করে নি ? এ কথা আপনার মত বিজ্ঞ লোকের কাছে আশা করিনি। করবার আর বাকী কি রেখেছে ! ভদ্রঘরের নিষ্পাপ কুমারীকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করাটা কিছুই নয় না কি আপনার চক্ষে—!"

"না, না তা বলছি না, অন্যায় খুবই করেছে। আরও গড়াতে পারতো তো—"

"আমার বাড়িতে পারতো না। এখনও পারে না ! কিন্তু চিঠি বন্ধ করি কি করে বলুন। বাড়ির সব জানলা কপাট তো চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখতে পারি না। আপিস কামাই করে বসেও থাকা যায় না মেয়েকে পাহারা দিয়ে—"

"তা তো বটেই—"

ইচ্ছে হল বলি, কাউকেই কেউ পাহারা দিয়ে সৎপথে রাখতে পারে না, নিজেই নিজেকে পাহারা দিতে হয়। কিন্তু একথা বললে পুরুষোত্তম বোমার মত ফেটে পড়বেন। তাই বললাম, "আমি মন্মথকে শাসন করে দেব। আপনি আর এ নিয়ে বেশী হৈচৈ করবেন না। এ ধরনের কথা চাউর হয়ে গেলে বুঝছেন না—"

"চাউর হয়েগেছে ! তাই না আপনার কাছে এসেছি। বাড়ির ঝি চাকর পর্যন্ত জেনেছে। এখন আর চাপা দেওয়া যাবে না, খোলাখুলি তদন্ত করতে হবে—"

"খোলাখুলি তদন্ত করার বিপদও আছে। ধরুন যদি ব্যাপারটা সত্যিই হয়, আপনি কি মন্মথর সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন ?"

"বিয়ে দেব ? আই শ্যাল শূট হিম—"

"কিন্তু আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এ রকম একটা খোলাখুলি তদন্ত হওয়ার পর কোনও ভদ্রঘরে কি তার আর বিয়ে দিতে পারবেন—"

"তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব যদি প্রমাণিত হয় যে সেও চিঠি লিখেছে, আপনার মন্মথকে সেইটেই জিজ্ঞেস করুন। আই ওয়াণ্ট প্রুফ, সলিড প্রুফ—"

পুরুষোত্তম হুঙ্কার দিয়ে টেবিলে ঘুসি মারলেন একটা। দেখলাম তার নাকের ফুটো খুব বড় হয়ে গেছে, ডগাটা কাঁপছে।

"বেশ, আপনি বাড়ী যান এখন। মন্মথ আসুক তাকে জিজ্ঞেস করি। সন্ধ্যের পর আসবেন একবার তখন বিচার করা যাবে—"

হঠাৎ পুরুষোত্তম আমার পা দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

"আমি গরীব কেরাণী হতে পারি, তা বলে কি আমার মান ইজ্জত কিছুই নেই, কত বড় বংশের ছেলে আমি—"

"উঠুন, উঠুন, বাড়ি যান এখন। সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবছেন কেন—"

পুরুষোত্তম চলে গেলেন।

২

মন্মথ দেখলাম আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। আমাকেও মাঝে মাঝে 'কলে' বেরুতে হয়েছে। দুপুরে যখন ফিরলাম তখন আড়াইটে বেজে গেছে। মন্মথ তখনও দেখলাম কাজে ব্যস্ত রয়েছে খুব। প্রসঙ্গটা তখন উত্থাপন করা সমীচীন হল না। কি জানি উত্তেজিত হয়ে বা অভিভূত হয়ে যদি প্রেসক্রিপশন সার্ভ করতে ভুল করে, মুশকিল হবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাকলাম তাকে।

"মন্মথ শোন, একটা কথা আছে—"

ডিসপেন্সারীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না, সুতরাং সুবিধে হল।

"কি বলছেন।"

"পুরুষোত্তমবাবু আজ সকালে আমাকে এই চিঠিগুলো দিয়ে গেছেন। এগুলো তুমি লিখেছ?"

দেখলাম মন্মথর চোখেমুখে একটা মরীয়া ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—

"হ্যাঁ, এগুলো আমারই লেখা।"

এ রকম সাফ জবাব প্রত্যাশা করিনি।

"ভদ্রলোকের মেয়েকে এরকম চিঠি লেখার মানে—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে—"

"আমি ওকে ভালবাসি, স্যার।"

লক্ষ্য করলাম গলা একটু কেঁপে গেল।

"তুমি উগ্রক্ষত্রিয়, বিবাহিত, ছেলে-পিলে আছে তোমার, তুমি হঠাৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে ভালবাসতে গেলে কেন—"

"মাপ করবেন স্যার। এ 'কেন'র জবাব দিতে বড় বড় কবিরা পারেন নি, আমিও পারব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যিই আমি তাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু এরকম ভালবাসার পরিণাম কি জান?"

"জানি—"

"তবে—?"

মন্মথ চুপ করে রইল। জবাব সে আগেই দিয়েছিল। বড বড় কবিরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি, সে প্রশ্নের নিরুত্তরই উত্তর।

"ফন্তুর সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে।"

"একদিন দেখলাম সে তাদের বাইরের বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে। আমি যাচ্ছিলাম সেদিক দিযে। জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদছ কেন। সে বললে বড্ড মাথা ব্যথা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম—ওষুধ খাওনি কিছু? বললে—বাবা এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন সাতদিন পরে আর এক ডোজ দেবেন। আমি ফিরে এসে তাকে অ্যাসপিরিনের গুলি পাঠিয়ে দিলাম একটা। তার পর মাঝে মাঝে লুকিয়ে সে অ্যাসপিরিনের গুলি নিতে আসত। বিলটুকেও পাঠাত মাঝে মাঝে। এই রকম করেই আলাপ শুরু হয়।"

"তারপর—?"

মন্মথ চুপ করে রইল।

"চিঠি লিখতে আরম্ভ করলে কবে থেকে?"

"তার কিছুদিন পর থেকে।"

"চিঠি নিজেই গিয়ে দিয়ে আসতে?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে—?"

"বিলটুর হাতে পাঠাতাম।"

"তোমার চিঠির জবাব পেয়েছ কিছু?"

"অনেক। রোজই পাই—"

"রোজই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় রোজই। ফনুতুও আমাকে সত্যি ভালবাসে স্যার। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় দেখাচ্ছি আপনাকে তার চিঠি—"

মন্মথ চলে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে সে-ও এক বাণ্ডিল চিঠি নিয়ে এল। চক্ষুস্থির হয়ে গেল আমার। প্রতি চিঠিতেই সম্বোধন—প্রাণেশ্বর। বানানটা অবশ্য ঠিক করে লিখতে পারে নি, লিখেছে—"প্রাণেরসর"। অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই সব চিঠি যদি পুরুষোত্তমবাবু দেখেন তাহলে—।

মন্মথকে বললাম, "আচ্ছা, তুমি যাও, চিঠিগুলো থাক আমার কাছে—"

মন্মথ চিঠিগুলোর দিকে একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চলে গেল।

ঠিক সন্ধ্যা বেলায় মন্মথ গেল ইনজেকশন দিতে। একটু পরে পুরুষোত্তমবাবু এলেন। আমি ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি বের করে রেখেছিলাম।

"আপনার মেয়ের হাতের লেখা খানিকটা চাই। মন্মথর কাছ থেকে কোনও চিঠি যদি বেরোয় মিলিয়ে দেখতে হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে তাঁকে দিয়ে খানিকটা বাংলা লিখিয়ে আনুন। নিজের সামনে লেখাবেন।"

"নিশ্চয়ই।"

পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে ফনতুব হস্তাক্ষর দাখিল করলেন আমাব সামনে।

"আপনার সামনে লিখেছে তো—"

"নিশ্চয়ই। আমি 'ভক্তিযোগ' থেকে ডিকটেট করেছি সে লিখেছে—"

লেখা দেখে আশ্বস্ত হলাম। একেবারে আলাদা হস্তাক্ষর। কিন্তু ও চিঠিগুলো কার লেখা তাহলে।

বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনার মেয়ে মন্মথকে কোনও চিঠি লেখেনি।"

"কি করে জানলেন—"

"মন্মথর কাছে যে চিঠি পেয়েছি তার হস্তাক্ষর একেবারে আলাদা।"

"আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই সেটা—"

দেখালাম একখানা চিঠি।

পুরুষোত্তমবাবুর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। বললাম—"মন্মথকে শাসন করে দেব আমি। আর-ও চিঠি লিখবে না। আমি গ্যারান্টি রইলাম। ফের যদি চিঠি পান, আমাকে এনে দেখাবেন, আমি দূর করে দেব ওকে—"

সন্তুষ্ট হয়ে পুরুষোত্তমবাবু চলে গেলেন।

আমি কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ফনতির নাম দিয়ে ও চিঠিগুলো কে লিখলে।

বিলটুকে ডেকে পাঠালাম।

"আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ। কেমন আছ তুমি।"

"ভাল আছি। ও বেলা স্টু খুব ভাল লেগেছিল। এ বেলা দুখানা রুটি খাব?"

"আগে একটা কাজ কর দেখি। তোমার পুরোনো বাংলা হাতের লেখার খাতা আছে—"

"এইখানেই তো আছে—"

"নিয়ে এসো।"

"কি করবেন খাতা নিয়ে—"

"দরকার আছে। আন না—"

বিলটু এক ছুটে গিয়ে খাতা নিয়ে এল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিলটুই যে চিঠিগুলির লেখক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। মন্মথ ইনজেকশন দিতে গিয়েছিল, সে-ও এসে ঢুকল।

বললাম—"মন্মথ, তোমার চিঠির একখানাও ফনতির লেখা নয়—"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিলটুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

"ফনতুরই লেখা স্যার। বিলটুকে জিজ্ঞাসা করুন।"

একখানা চিঠি বার করে বিলটুকে দেখালাম।

"এসব চিঠি কে লিখেছে—"

বিলটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"সত্যি কথা বল—"

"আমি লিখেছি। শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদি যা যা বলে দিত আমি লিখে দিতুম। ফনতিদি একদিনও লেখায় নি—"

"তুমি লিখতে কেন—"

"উত্তর এনে দিলে কম্পাউণ্ডারবাবু আট আনা পয়সা দিতেন যে। সেই পয়সা দিয়ে আমরা সবাই মিলে রসগোল্লা খেতাম।"

মন্মথকে বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে আর বকতে পারলাম না।

বর্ণে বর্ণে

১

একটি বাদামি, অপরটি কালো। দুইটিই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সতেজ এবং কচি। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা দুইটিকেই দেখিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাদামি বলিল, "আমাকেই পছন্দ করবে দেখিস।"

কালো উত্তর দিল, "কি করে জানলি সেটা ?"

"দেখলি না আমার দিকে কেমন করে চাইছিল।"

"আমার দিকেও তো চাইছিল।"

"তোর দিকে যে ভাবে চাইছিল তা আমি দেখেছি। কিন্তু তুই শুধু চাউনিটাই দেখেছিস, ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা উঁকি দিচ্ছিল তা দেখিস নি।"

উভয়ে তর্ক করিতে লাগিল।

যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন কাহাকে পছন্দ হইল খবর পাঠাইবেন।

২

ঠিক পাশের বাড়িতে আর একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। সে বাড়িতেও একটি বাদামি, আর একটি কালো। যাঁহারা পছন্দ করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা নানাভাবে দুইটিকে দেখিলেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহারও যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে পরে খবর পাঠাইবেন কাহাকে পছন্দ হইল।

দ্বিতীয় বাড়ির বাদামি এবং কালো তর্ক করিল না। তাহারা তাহাদের অভিমত আপন আপন অন্তরেই নিবদ্ধ রাখিল।

বাদামি ভাবিল, "পছন্দ আমাকেই করবে, ওই কুচকুচে কালোকে কেউ আবার পছন্দ করে না কি—"

কালো ভাবিল, "রং আমার কালো বটে কিন্তু আমার চোখ, আমার নাক, আমার মুখের গড়ন এ সবের কি কোন দাম নেই ? ওর রংটা হয় তো একটু ফিকে কিন্তু ওই থ্যাবড়া নাক, বসা চোখ, প্রকাণ্ড হাঁ কি পছন্দ করবার মতো ?"

৩

প্রথম বাড়িতে পছন্দ হইল কালোটিকে। কারণ শ্যামাপুজোয় কালো পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম।

দ্বিতীয় বাড়িতে পছন্দ হইল বাদামিকে। কারণ যিনি তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবেন তিনি কালো মেয়ে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না।

পক্ষী বদল

ইন্দুবালার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

ইন্দুবালা যা বলছে সেটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমি নিজের চোখে যেটা রোজ দেখছি সেটাকে তো অস্বীকার করা যায় না। জিতেনবাবুর, (মানে ইন্দুবালার স্বামীর,) স্বভাব সত্যিই বদলেছে খুব। বিলেত যাবার আগে যে জিতেনবাবুকে আমি চিনতাম তাঁর সঙ্গে সত্যিই এঁর আকাশ-পাতাল তফাত। তিনি সিগারেট দূরের কথা পানটি পর্যন্ত খেতেন না, অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী নির্বিবাদী লোক ছিলেন, কারও সাতে-পাঁচে থাকতে দেখিনি কখনও তাঁকে। খুট্ খুট্ করে নিজের কাজকর্ম করতেন, আর অবসর পেলে দাওয়ায় বসে কৃত্তিবাসী রামায়ণটি পড়তেন। রাস্তায় দেখা হ'লে মৃদু হেসে সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াতেন এক ধারে, যেন রাস্তায় সামনা-সামনি দেখা হয়ে যাওয়াটা মস্ত অপরাধ। কোন বিষয়ে তাঁকে প্রতিবাদ করতেও শুনিনি, জীবনের সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঝামেলাকে তিনি সবিনয়ে মেনে নিয়েছিলেন, সমস্ত অত্যাচার অবিচারকেও। অর্থাৎ তিনি জীবন যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন না। জীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল অনেকটা স্টেশন প্লাটফর্মের যাত্রীর মনোভাবের মতো। একটু পরেই ট্রেন এলেই তো চলে যেতে হবে, প্লাটফর্ম নিয়ে বা প্লাটফর্মে সমবেত যাত্রী-যাত্রিনীদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। যতক্ষণ ট্রেনটা না আসছে ততক্ষণ ভদ্রতা বজায় রেখে কোন রকমে গা বাঁচিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। এই তাঁর মনোভাব।

কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে এসে যে জিতেনবাবুকে আমি দেখলাম তিনি একেবারে অন্যলোক। টিন টিন সিগারেট ওড়াচ্ছেন, ক্রমাগত পান জরদা খাচ্ছেন, হাফশার্ট পরে বাটারফ্লাই গোঁফ রেখে একটা মোটর সাইকেল চড়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। নেতাও হয়েছেন একটা উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের। বিলেত যাবার আগে আমি যে জিতেনবাবুকে চিনতাম তিনি সসঙ্কোচে সব কিছুই মেনে নিতেন, এ ভদ্রলোক যেন কিছুই মানতে চান না। এখানকার প্রবীণ উকিল গোলকবাবুই ছিলেন আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাঁকে সরাবার কল্পনাও কেউ কখনও করিনি আমরা। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তাঁকে পদচ্যুত করে জিতেনবাবু নিজেই চেয়ারম্যান হয়েছেন। যে লোক ধীর স্থির বিনয়ী নির্বিবাদী ছিল সে যে এমন অশান্ত চঞ্চল উগ্র একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত। এ যা ধরবে তা করবেই।

মাথায় গুরুতর আঘাত লাগলে চরিত্রের এ রকম পরিবর্তন হয় শুনেছি। গল্পে উপন্যাসে পড়েছি, সিনেমাতেও তো হরদম দেখছি অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, বোবা কথা কইছে, শয়তান দেবতা হয়ে যাচ্ছে। জিতেনবাবুও মাথায় গুরুতর আঘাতই পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে একবার তিনি গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন। গাছের প্রকাণ্ড একটা ডাল ভেঙে নাকি তাঁর মাথায় পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতও হয় একটা। জিতেনবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জিতেনবাবুর সঙ্গে ছিল জিতেন-বাবুরই চাকর হারু। সে-ই দৌড়ে গিয়ে লোকজন ডেকে আনে। সবাই ধরাধরি করে অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়িতে তুলে আনে তাঁকে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। চোখ বন্ধ, নিশ্বাস পড়ছে না, নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সবাই ভেবেছিল সে মরেই গেছে। এমন কি বিনোদ ডাক্তার পর্যন্ত। জিতেনকে খাটিয়ায় তুলে শ্মশানের উদ্দেশ্যেও নাকি যাত্রা করেছিল সবাই। পথের মাঝে এক গাছতলায় খাটিয়া নামাবার পর দেখা গেল জিতেনের হাত-পা নড়ছে, নিশ্বাস পড়ছে একটু একটু। তারপর চোখ খুলে চাইলেন। শুনেছি একটু হেসেও ছিলেন না কি! তখন সবাই আবার তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। যে আঘাত তাকে মৃতবৎ করে ফেলেছিল তা যে খুবই সাংঘাতিক তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই, তাতে চারিত্রিক পরিবর্তন হতেও পারে। চারিত্রিক পরিবর্তন যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তার স্ত্রী ইন্দুবালা যা বলছে তা কি বিশ্বাস্য? আদালত তা বিশ্বাস করবে? আমার মনে হয় না। কিন্তু জিতেনবাবুও না-ছোড়, তিনি আদালতে কেস ঠুকে দিয়েছেন। মকোদ্দমায় শেষ পর্যন্ত কি হবে তা বলা শক্ত।

জিতেনবাবুকে একদিন বলেছিলাম, "ইন্দু যখন আপনাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে গেছে তখন আপনি আবার একটা বিয়ে করুন না। আপনার যখন ছেলেপিলে হয় নি করতে বাধাটা কি। কেউ দোষ দেবে না আপনাকে।"

জিতেনবাবু কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, তারপর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ইন্দুকেই আমার চাই। এর জন্য যদি সর্বস্ব পণ করতে হয় তাও করব।"

ইন্দু দূর সম্পর্কের বোন হয় আমার। মরা জিতেনবাবু বেঁচে ওঠবার পরেই সেই যে সে কোলকাতায় তার বাপের বাড়ি চলে গেছে, আর ফেরেনি। আর ফিরবেও না চিঠি লিখেছে। জিতেনবাবু কিন্তু ছাড়বেন না। আইনত লড়ে দেখতে চান তিনি। তাঁর ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে আইনত যদি তিনি ইন্দুকে আনতে না পারেন, বে-আইনী উপায় অবলম্বন করতেও ইতস্তত করবেন না।

মনে করলাম নিজেই একবার কোলকাতা চলে যাই, ইন্দুকে বুঝিয়ে দেখি সে

যদি আসতে রাজি হয়। আদালতে এ নিয়ে কেলেঙ্কারি করাটা সব দিক থেকেই অশোভন। ইন্দুর বাবাকে চিঠি লিখে কোনও ফল হয় নি। তিনি উত্তর দিয়েছেন, "ইন্দু তার স্বামীর ঘর করুক এটা আমারও কম কাম্য নয়। তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, কি করব বল। মেয়েকে তো আর দূর করে দিতে পারি না। তুমি এসে যদি বুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে পার আমি আনন্দিতই হব।"

একদিন চলেই গেলাম। গিয়ে দেখি ইন্দু বিধবার বেশ পরে আছে। আড়ালে ডেকে বললাম, "ব্যাপার কি বল দেখি। স্বামী থাকতে বিধবার বেশ কেন?"

"উনি আমার স্বামী নন।"

"স্বামী নন তো কে?"

"উনি বীরেনবাবু—"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ইন্দু বললে, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন বীরেনবাবু বলে একজন ভদ্রলোক আমাকে বিয়ে করবাব জন্যে খুব ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তিনি কায়স্থ ছিলেন বলে বাবা বিয়ে দেন নি। বীরেনবাবু তারপর আমাকে চিঠি লেখেন যে আমি তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি আছি কি না। লোকটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। কড়া গোছের একটা উত্তব লিখে দিলাম। চিঠি পেয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন। আমাব বিশ্বাস তারই প্রেতাত্মা আমার মৃত স্বামীর দেহে ভর করে আছে।"

আমি সবিস্ময়ে ইন্দুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

পাগল টাগল হয়ে যায় নি তো।

"হঠাৎ তোমার এমন আজগুবি ধারণা হল কেন?"

"এঁর চাল-চলন কথাবার্তা, চোখের চাউনি ঠিক বীবেনবাবুর মতো, আমার স্বামীর মতো একটুও নয়। তা ছাড়া আর একটা কাণ্ড যা ঘটেছিল তা শুনলে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।"

"কি কাণ্ড?"

"গত মাঘ মাসে একদিন অনেক বাত করে উনি বাড়ি ফিরলেন। ওর খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। আমি জেগেছিলাম খালি। আব সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে উনি বসে খাচ্ছিলেন, আমি সামনে বসেছিলাম। খেতে খেতে হঠাৎ বললেন, আমাকে একটু পেয়ারার জেলি এনে দাও তো। জেলি ছিল ভাড়ার ঘরে। প্রকাণ্ড উঠান পেরিয়ে সেই শীতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে জেলি আনতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বললাম, কাল এনে রাখব। আজ গুড় দিয়ে ওই রুটিখানা খেয়ে

নাও না। উনি বললেন, জেলি আমার এখনই চাই, কাল পর্যন্ত তর সইবে না। জীবনে যখনই যা চেয়েছি না নিয়ে ছাড়িনি। জান ত' কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। আমারও যায়নি। জাতিভেদের অজুহাতে বীরেন মিত্তিরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে, কিন্তু তা যে পারনি সেটা তুমি অন্তত বুঝেছ এত দিনে।"

ইন্দুর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আপনারাও হচ্ছেন নিশ্চয়।

বললাম, "তার মানে তুমি বলতে চাও খাঁচাটা ঠিক আছে পাখীটা বদলে গেছে?"

ম্লান হেসে ইন্দু বললে, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

কার্য কারণ

১

বৃষ্টি পড়িলে এখনও আমার পীরু মিঞা এবং ভূতনাথের কথা মনে পড়ে। কার্য-কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা কেবল স্থূল স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু হিসাবের মধ্যে ধরিতে চান না, তাঁহারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হযতো পীরু মিঞা এবং ভূতনাথের আচরণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন স্বার্থ নিহিত ছিল, বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই, কারণ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

২

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

দুই দিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল। মুষলধারা বৃষ্টির সহিত উন্মত্ত পবন মিলিয়া যে কাণ্ড করিতেছিল, তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। সভ্যতা হইতে বেশ কিছু দূরে (স্টেশন হইতে দশ ক্রোশ পোস্টাপিস হইতে দুই ক্রোশ) যে গ্রামে তখন আমাদের বাস ছিল, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অকথ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একটি গাছ খাড়া ছিল না, খড়ের চাল উড়িয়া গিয়াছিল, মাটির দেওয়ালগুলি ভূশায়ী হইয়াছিল, নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট জলে কর্দমে পরিপূর্ণ হইয়া যে দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের চিত্তে কি ভাব জাগাইত জানি না, আমার হৃদয়ে তাহা এক অপ্রত্যাশিত ভাব সঞ্চার করিয়াছিল, মনে পড়িতেছে। আমি মুগ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বর্ষার শোভা দেখিয়া নয়, ইট,

চুন, সুরকি ও সিমেন্টের মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া। গ্রামের মধ্যে একমাত্র আমাদের বাড়িটিই পাকা। ঝড়বৃষ্টির বিপুল তাণ্ডবে সেটি অক্ষত ছিল।

আমার সেই মুগ্ধ ভাবও কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিঘ্নিত হইতেছিল। আমি একজনের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। প্রিয়ার নয়, পিওনের। তখন প্রিয়া-বিরহে ব্যাকুল হইবার বয়স হয় নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিলাম। কলিকাতার বন্ধু ছকুকে টাকা দিয়া আসিয়াছিলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্র তারযোগে যেন আমাকে জানায়। সে জানাইবে ঠিক, কিন্তু এই দুর্যোগে এক্সপ্রেস তারও কি এই সুদূর মফঃস্বলে পৌঁছিবে? পোস্টাপিস দুই ক্রোশ দূরে, টেলিগ্রাম যদি পৌঁছিয়াও থাকে, এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া পিওন কি আসিতে পারিবে? পিওনকে অবশ্য বারবার বলিয়া আসিয়াছি, বকশিশের লোভও দেখাইয়াছি, কিন্তু যে রকম দুর্যোগ…

আর একটা কারণে আশা করিতেছিলাম যে, পিওন হয়তো আসিতে পারে। আমি এবং ওপারের ভূতনাথ এ অঞ্চলের মাত্র এই দুইটি বালকই এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবার সুযোগ পাইয়াছে। দশ ক্রোশের ভিতর একটি লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছাড়া আর কোনও বিদ্যালয় সেকালে ছিল না। সুতরাং আমাদের পরীক্ষার ফল কি হয়, জানিবার জন্য সকলেই উৎসুক। সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা এ অঞ্চলের মান রাখিতে পারি কি না।

বাহিরের ঘরটিতে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম। বৃষ্টির বিরাম নাই। ভেক-কুলের আনন্দ-কলরবে চতুর্দিক মুখরিত। বাতায়ন দিয়া যতটুকু দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহাতে হতাশই হইতেছিলাম। জনপ্রাণী কেহ নাই, কেবল বাতাসের বেগে সদ্যচ্ছিন্ন পত্ররাশি মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিয়া কাদায় লুটাইয়া পড়িতেছে। ডোবার ধারে কয়েকটি বক চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে। এই দুর্যোগেও তাহাদের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই। মাঝে মাঝে ছাগলের ডাকের মতো শব্দ পাইতেছিলাম, আমাদের চাকরটা বলিল যে, উহাও ব্যাঙের ডাক।

সূর্যদেবের দেখা নাই। আকাশ মেঘময়। সকাল এবং বিকালের একই রূপ। কিন্তু সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন সে-রূপ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। বাতাসের বেগ আরও বাড়িল, আকাশে আরও মেঘ ঘনাইয়া আসিল, বিদ্যুৎ-স্ফুরণে বজ্রগর্জনে চতুর্দিক সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, বুঝি প্রলয়ের কালরাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে।…ঠিক করিলাম বাহিরের ঘরেই শুইব। পিওনের আসিবার আশা নাই। কিন্তু যদি আসে…

৩

গভীর রাত্রে খড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। জোরে শব্দ হইল। বাজ পড়িল না কি? কান পাতিয়া রহিলাম। বাহিরে বাতাস ও বৃষ্টির মাতামাতি সমানে চলিয়াছে। আবার শব্দ হইল। কড়া-নাড়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাট খুলিলাম। তবে কি…

কপাট খুলিতেই কিন্তু আপাদমস্তক সিক্ত ও কর্দমাক্ত যে ব্যক্তিটি হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, সে পিওন নয়, পীরু মিঞা। তাহার বাঁকা নাক এবং সামনের ফোকলা দাঁত ভুল হইবার নয়। কিন্তু এ সময়ে, এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে জমিদার জবরদস্ত খাঁর গোমস্তা পীরু মিঞাকে দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই।

"আরে খোকাবাবু তুমি বাইরে আছ, ভালই হয়েছে, তোমার কাছেই এসেছি, বড় জরুরি দরকার—"

"কি বলুন তো?"

"এই চিঠিখানা পড। চেঁচিয়েই পড়—"

পড়িলাম—কে একজন বিনোদ সিংহ লিখিতেছে—"মিঞা সাহেব, আদাব জানিবেন। খোদার মরজিতে আশা করি খুশমেজাজে আছেন। আপনার মনিব শেখ জবরদস্ত খাঁ আগামী শুক্রবার ফিরিবেন। তাঁহার জন্য ঘাটে প্রত্যূষে যেন নৌকা প্রস্তুত থাকে। তাঁহার হুকুমে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।"

চিঠি পড়া শেষ হইবামাত্র পীরু মিঞা প্রশ্ন করিলেন—"প্রত্যূষ মানে কি?"

"প্রত্যূষ মানে ভোর।"

"ভোর মানে কি?"

"ভোর মানে সকাল।"

"কি বিপদ! সকাল মানে কি। যখন পহেলা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল, যখন দোসরা মোরগ ডাকে, তখনও সকাল। প্রত্যূষ মানে কোন্ সকাল?"

বিরক্ত হইলাম। অভিধান খুঁজিলেও এ প্রশ্নের সদুত্তর মিলিবে কিনা সন্দেহ। পীরু মিঞার কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধিল। বলিয়া দিলাম—"যখন পহেলা মোরগ ডাকে তখনই প্রত্যূষ।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। জানতাম, তোমার কাছে এলেই হদিস পাব।"

"এই জন্যেই আপনি এসেছিলেন ?"

"এই জন্যেই—"

বিস্মিত হইলাম।

"এই দুর্যোগ মাথায় করে একটা কথার মানে জানতে এসেছেন।"

"কাল ঠিক 'প্রত্যূষে' যদি নৌকা হাজির না থাকে, তাহলে দুর্যোগ আরও ভয়ানক হবে। জবরদস্ত খাঁকে তুমি চেন না খোকাবাবু।"

পীরু মিঞার চোখে একটা গর্ব যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

"কেন, কি করবেন তিনি ?"

"একদিন কি করেছিলেন দেখ—"

পীরু মিঞা তাঁহার বাঁকা নাক ও ফোকলা দাঁতের দিকে এমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রহিলেন, যেন আমাকে কাহারও মহৎ কীর্তি দেখাইতেছেন।

"তখন আমারও জোয়ান বয়েস, খাঁ-সাহেবেরও জোয়ান বয়েস। তোমাদের তখন জন্ম হয় নি। ফুনশিয়ার মাঠে বগেরি শিকার করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, আমি যেন ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে হাজির হই। আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল আমার। ঠিক মুখের উপর বুটসুদ্ধ এইসা লাথি ঝাড়লেন যে—"

পীর মিঞা বাক্য শেষ করিলেন না। ফোকলা দাঁত দুইটি আরও প্রকটিত করিয়া একটু হাসিলেন শুধু।

"কিসে করে এলেন এতদূরে আপনি ?"

"মোষের গাড়িতে। হাঁটতেও হয়েছে একটু। গাছ পড়ে রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেছে যে। আচ্ছা, আমি আর বসব না। নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে গিয়ে—"

পীরু মিঞা চলিয়া গেলেন। আমি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি পীর মিঞা প্রাণের ভয়েই এতটা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ?

আধঘণ্টা পরে আর এক কাণ্ড ঘটিল। আপাদমস্তক ভিজিয়া ভূতনাথ আসিয়া হাজির হইল। তাহার বাড়ি নদীর ওপারে। সাঁতরাইয়া আসিয়াছে।

"তুই ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিস।"

"কি করে জানলি ?"

"কোলকাতার চিঠি পেলাম একটু আগে। পিওনটা সন্ধের পর এল। তোর টেলিগ্রাম নিশ্চয় আসে নি। আসবে কি করে ? টেলিগ্রাফের তারই ছিঁড়ে গেছে। আমি ভাবলাম, তোকে সুখবরটা দিয়ে আসি।"

"তুই ?"

"আমি ফেল মেরেছি।"

ভূতনাথের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হইয়া গেল।

"আমি আর বসব না ভাই। মা ভাববে। মাকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

মুচকি হাসিয়া ভূতনাথও চলিয়া গেল।

ভূতনাথের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ক্লাসের ওঁছা ছেলে বলিয়া তাহাকে ঘৃণাই করিতাম। গুণ্ডামি করিয়া বেড়ানোই তাহার কাজ ছিল। সে কেন···

কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। আজও পাই নাই।

অনেক দিন পরে পীরু মিঞার সম্বন্ধে খুব বিশ্বস্তসূত্রে আর একটি খবর শুনিয়া আরও বিস্মিত হইয়াছি। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াই নাকি পীরু মিঞার নাক বাঁকিয়াছিল, দাঁত ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনিব জবরদস্ত খাঁ যে সত্য সত্যই জবরদস্ত, একথা সকলের কাছে সগর্বে প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে তিনি সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন না। প্রভু যে লাথি মারিয়া তাঁহার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন, এই মিথ্যা কথা বলিয়া তিনি আনন্দিত হন, লজ্জিত হন না!

মহীয়সী মহিলা

ট্রেনে বেশ ভীড় ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী ফিরছিলাম। থার্ড ক্লাসের টিকিট। আমি একটি কামরার এক কোণে অতি কষ্টে বসবার জায়গা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আর বসবার জায়গা ছিল না। দাঁড়িয়েছিল অনেকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক একসঙ্গে জুটেছিলাম সেই কামরাটিতে। বাঙালী, বিহারী, মাড়োয়ারী, সাঁওতাল, পাঞ্জাবী সরদার এবং আরও বহুপ্রকার ইতর অথবা ভদ্র চেহারার লোক কেবলমাত্র দেখে যাদের জাতিনির্ণয় করা অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে অমিল ছিল অনেক, মিলও হয়তো ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সর্বতোভাবে একমত হয়েছিলাম। কামরায় আর যেন কেউ উঠতে না পারে। ওঠবার সম্ভাবনাও অবশ্য কম ছিল, কারণ, কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন একজন ভোজপুরী সিপাহী। তার মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে বিরাট লাঠি। চোখ মুখের দৃষ্টিও কমনীয় নয়। আর বাঁদিকের দরজায় ছিলেন সরদারজি। ঘন ভ্রূ, ঘন চাপদাড়ি, গোঁফও নানানসই-রকম ঘন—মনুষ্যবেশী সিংহ একটি।

প্রায় কোনও ষ্টেশনেই কেউ উঠতে সাহস করছিল না। বড় বড় ছুটো জংশন পেরিয়ে গেল, সিপাহিজী এবং সরদারজিকে দরজার কাছ থেকে একচুল নড়াতে প্যারল না কেউ। সিপাহিজী এবং সরদারজীর উপর সমস্ত কামরাটির ভার দিয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ দ্বারে অবশেষে শত্রু হানা দিল। স্টেশনটি খুব ছোট। সিপাহিজী ভাবতেই পারেন নি যে, এই স্টেশনে এমন একটা পল্টন এসে হাজির হতে পারে। তিনি তাই খৈনি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ বাম করতলের উপর কিছু তামাক পাতা এবং চুন রেখে দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে মর্দন করছিলেন সেগুলি। তাঁর ছুটি হাত এবং মন, কোনটাই দ্বাররক্ষায় ব্যাপৃত ছিল না।

হঠাৎ বামাকণ্ঠে ভুল হিন্দিতে শোনা গেল—"রাস্তা ছোড়িয়ে না। কেবাড়িকা পাশ সংকা মাফিক খাড়া হ্যা কাহে—। হটিয়ে হটিয়ে—"

দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল একটি বলিষ্ঠা মহিলা গাড়ির হাতল ধ'রে ঝুলছেন। প্রকাণ্ড গোল মুখ, গোল গোল চোখ, চিবুকের তলায় ছ' থাক চর্বি, নাকে নথ, নথে টানা। মাথার কাপড় খুলে পড়েছে, আলুলায়িত কুন্তল লুটিয়ে পড়ছে পিঠের উপর। সিঁথিতে জলজল করছে সিঁদুর।

"হটিয়ে হটিয়ে। ট্রেন বেশী নেই থামে গা, গার্ড সাহেব ঝণ্ডি দেখাতা হ্যায়। হটিয়ে না—"

সিপাহিজী এ মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন একটু। কারণ, তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং মুখভাবে একটু কোমলতার আমেজ পাওয়া গেল।

"কুছভি জগা নেই হ্যায় মাইজি—"

"আপ খোলিয়ে না, হটিয়ে না, হামলোক খাড়া হোকে যাজে। ই ট্রেণ ফেল করনে সে বাবুজিকা নোকরি চলা যাগা, কাল জয়েনিং তারিখ হ্যায়—হটিয়ে—"

"মগর।"

মহিলা আর অধিক বাক্যব্যয় না করে কপাট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। সিপাহিজী আর তাঁকে বাধা দিতে সাহস করলেন না। তাঁর ঈষৎ অনুকম্পাও হয়েছিল বোধহয়। কারণ পরে জানা গেল তিনও ছুটির শেষে কাজে জয়েন করতে যাচ্ছেন। ছুটির শেষে কাজে জয়েন না করলে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে তা তাঁর জানা ছিল।

কপাটটা ভাল করে খুলে দিয়ে ভোজপুরী পুরুষপ্রবরকে স্থানচ্যুত করে ভদ্রমহিলা সমস্ত দরজাটি দখল করে হাঁক দিলেন—"ওরে তোরা আয়, মন্টু,

আগে ওঠ, জিনিসপত্তরগুলো গোছাতে হবে, ঘন্টু কোথা গেলি ; শন্টু মিন্টু কানটু, বানটু—আয় না তাড়াতাড়ি সব ওঠ, ছাবলি ওদিকে হাঁ করে দেখছিস কি, উঠে পড় না টপ করে—”

পিল পিল করে নানা বয়সের একদল ছেলেমেয়ে উঠে পড়ল। সরদারজি একটু এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন—“ইয়ে তো জুলুম কি বাত হ্যায় মাতাজি,—”

“আপ চুপ রহিয়ে।”

ভদ্রমহিলার ধমকে সরদারজী থতমত খেয়ে সরে দাঁড়ালেন।

“এই কুলি, ইধার ইধার—”

তোরঙ্গ, সুটকেস, হোলড্অল্, নানা আকারের পুঁটুলি, ঝুড়ি গোটা দুই, প্রকাণ্ড একটা টিফিন কেরিয়ার, গোটা চারেক হাঁড়ি, গোটা তিনেক প্রকাণ্ড তরমুজ, একটা বঁটি, তা ছাড়া একটা মুখ বাঁধা প্রকাণ্ড বস্তা...। প্রকাণ্ড কুঁজো।

ভদ্রমহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, কুলিরা এইসব তুলতে লাগল।

“আওর দো কুলি উপর চলা আও, চীজ বাস্ সরিয়াকে রাখখো। ওই উধারকা বাক্স মে সব এলোমেলো হোকে হ্যায়, পহলে সব ঠিক করে দেও।...”

যে সব যাত্রীর জিনিস উক্ত বাঙ্কে ছিল তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুসলমান মৌলভীটি তাঁর ফেজ আর বদনাটি নামিয়ে নিজের কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করলেন। ফেজটি শিরে ধারণ করলেন, বদনাটি অঙ্কে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও তাঁর ছোট ট্রাঙ্কটি কোথায় রাখবেন ভেবে বিব্রত বোধ করছিলেন, ভদ্রমহিলা আশ্বস্ত করলেন সবাইকে।

“সব ঠিক করকে গুছায়কে রাখ দেঙ্গে, আপলোক ঘাবড়াইয়ে নেই—”

সত্যিই দেখা গেল বাঙ্কের জিনিসপত্রগুলো অগোছাল হয়েই ছিল। গুছিয়ে রাখাতে অনেকখানি জায়গা বেরোল। আমাকে সম্বোধন করে ভদ্রমহিলা বললেন, “খোকা, তুমি বাবা পা-টা গুটিয়ে বোস তো, হ্যাঁ,—ওইখানে হোল্ড্অল আর বোরাটা থাক, বেঞ্চি দুটোর ফাঁকে। ওগুলোর উপরেই তুমি পা রাখ। তুমি বাবা পা দুটো একটুখানি সরিয়ে নাও,—হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে” তারপর তিনি কামরাটার চারদিকে চেয়ে দেখলেন একবার।

“এই কুলি ট্রাঙ্কঠো ওই উধারকা কোণা মে লে চলো। দোনো বেঞ্চকা বিচ মে দে দেও। আপলোক মেহেরবানি করকে পয়ের মোড়কে বৈঠিয়ে—। শন্টু, মন্টু, ট্রাঙ্কের উপর গিয়ে ব’স তোরা।”

শৌখীন-পাঞ্জাবী-গায়ে নীল চশমা পরা একটি ছোকরা কোণে বসে’ বসে’ পা

দুলিয়ে দুলিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। সে একটু ঝেঁজে বলে উঠল—"আপনি এমন ভাবে হুকুম করছেন যেন আমরা আপনার চাকর—"

"চাকর কেন হতে যাবে বাবা। তোমরা সব ছেলে। পা-টা গুটিয়ে বস লক্ষ্মীটি। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেল। সবাইকেই তো যেতে হবে। সব গুছিয়ে দিচ্ছি দেখ না, কারও কোন কষ্ট হবে না—। হ্যাঁ, ওই কোণে কুঁজোটা থাক।"

তারপর একটু হেঁট হয়ে দেখলেন বেঞ্চির তলাগুলো সব খালি আছে কি না।

"মিন্টু, পুঁটুলিগুলো আর তরমুজ তিনটে এই বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দে। আর ঘন্টুকে কোলে করে তুই ওই কোণটায় চলে যা। ও বাবা পাগড়ি, মেয়েটাকে একটু দাঁড়াতে জায়গা দাও বাবা—"

একটি ক্রিশ্চান দম্পতি একটু বেশী জায়গা নিয়ে একধারে বসেছিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের সাহেবী পোশাক দেখে তাঁকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করে নি। ভদ্রমহিলা করলেন। তিনি কানটু আর বানটুকে চালান করে দিলেন সেদিকে।

"তোরা ওই দিকে গিয়ে মেম-মাসীমার কাছে বস গিয়ে। হাবলিও যা—"

ক্রিশ্চান দম্পতি আপত্তি করলেন না। ভ্যানিটি ব্যাগ, অ্যাটাশে কেস প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গা করে দিলেন শিশুগুলির। ক্রিশ্চান ভদ্রমহিলা তো বানটুকে কোলেই বসিয়ে নিলেন। ক্রিশ্চান ভদ্রলোকেরও শিভ্যলরি উদ্বুদ্ধ হ'ল সহসা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে বললেন—"আপ ভি বৈঠ যাইয়ে। মায় খাড়া রহুঙ্গা।"

"না না, তুমি বাবা ব'স। আমার বসবার দরকার নেই। ওগো, তুমি কোথা গেলে, এইবার তুমি ওঠ না, ওঠ, ওঠ, ট্রেন আর কতক্ষণ দাঁড়াবে।"

আড়ময়লা পাঞ্জাবীপরা ঝোলা-গোঁফ শীর্ণকান্তি একটি ভদ্রলোক উঠলেন।

"তুমি একটু জায়গা করে নাও কোথাও—"

"ইউ কাম হিয়ার, দেয়ার ইজ এনাফ্ স্পেস—"

ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলেন তিনি।

আমি তখন ভদ্রমহিলাকে আহ্বান করলাম—"আপনি এসে এই হোল্ড্-অল্টার উপর বসুন। আমি পা গুটিয়েই বসছি—"

"তোমার কষ্ট হবে না তো বাবা?"

"না কিছুমাত্র না।"

"আজকালকার ছেলেরা সোণার চাঁদ সব। হীরের টুকরো।"

ভদ্রমহিলা এসে গদীয়ান হয়ে হোল্ড্-অল্টির উপর অধিষ্ঠিতা হলেন। সব যখন মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে তখন ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল মিন্টু ঘন্টুকে

কোলে করে কোণঠাসা হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি—"মিন্টু, তুই এসে এখানে ব'স। আমি দাঁড়িয়ে থাকছি।"

"আপনি দাঁড়াবেন কেন। ওদের জায়গাও করে দিচ্ছি। শেঠজি আপ থোড়া সে হাটকে বৈঠিয়ে।" শেঠজির মুখে একটু বিরক্তভাব ফুটে উঠল, কিন্তু তবু তিনি সরে বসলেন একটু। এতে কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। ওইটুকু জায়গায় ঘন্টুকে কোলে নিয়ে মিন্টুর বসা অসম্ভব। শেঠজির পাশেই বসেছিল একটি সাঁওতাল যুবক। বলিষ্ঠ কালো চেহারা, চোখে মুখে নির্ভীক সরলতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। তার দিকে চাইতেই সে উঠে পড়ল এবং দরজার ধারে গিয়ে সরদারজির পাশে দাঁড়াল। ঘন্টুকে কোলে নিয়ে মিন্টু বসল তার জায়গায়। সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। আমি একটু বিস্মিত হচ্ছিলাম ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে। এত ছোট ষ্টেশনে দু-তিন মিনিটের বেশী দাঁড়াবার কথা নয়। কুলীরা পয়সা নিয়ে নেবে গেল। তবু ট্রেন ছাড়ে না। হঠাৎ দেখলাম স্টেশন মাষ্টারমশাই পা-দানির উপর দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে দেখছেন।

"ও, আপনারা এইখানে উঠেছেন বুঝি। জিনিসপত্তর সব উঠে গেছে? বড্ড 'রাশ' আজকে। ট্রেন তাহলে ছাড়ি?"

একমুখ হেসে ভদ্রমহিলা বললেন—"হ্যাঁ আমরা গুছিয়ে বসেছি। অনেক কষ্ট দিলুম বাবা আপনাকে, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, না, কষ্ট আর কি।"

নেমে গেলেন স্টেশন মাষ্টার।

তারপরই শোনা গেল—"অল্ রাইট, অল্ রাইট।"

ট্রেন ছাড়ল।

ভদ্রমহিলার এই অতর্কিত আক্রমণে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন দু'একজন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সব ঠিক হয়ে গেল।

ভদ্রমহিলাও আমাকে বললেন—"ওই টিফিন কেরিয়ারটা বাক্স থেকে নাবিয়ে দাও তো বাবা—"। নামালাম।

বিরাট টিফিন কেরিয়ার। বেশ ভারী।

টিফিন কেরিযারটি খুলে ফেললেন তিনি। দেখলাম, প্রচুর লুচি, তরকারি আর রসগোল্লা রয়েছে। ভদ্রমহিলা দু'খানি করে লুচি, একটু করে তরকারি এবং একটি করে রসগোল্লা প্রত্যেককে বিতরণ করতে শুরু করলেন। দু'একজন নিতে আপত্তি করলে, কিন্তু কিছুতেই তিনি শুনলেন না।

"হাম আপকো মা-ই হ্যায়, লিজিয়ে, লজ্জা কি বেটা—"

সকলকেই নিতে হল। সেই নীল চশমা পরা ছোকরাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"তোমাকে বাবা একটু বেশী করে দিচ্ছি। ছেলেমানুষ তুমি, দুখানিতে তোমার কি হবে—"

ট্রেন চলছে। মুখও চলছে প্রত্যেকের। সমস্ত কুয়াশা কেটে গেল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সবাই আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে উঠলাম তাঁর এবং তিনিও অসঙ্কোচে হুকুম করতে লাগলেন সকলকে। কোনও স্টেশনে আমরা তাঁর পান কিনে দিলাম, একটা জংশনে সকলকে চা খাওয়ালেন তিনি। সিপাহিজী আর একটা স্টেশনে রসগোল্লা কিনে আনলেন আবার। সর্দারজি কুঁজো হাতে ছুটলেন জল ভরতে। চানাচুরওলার কাছ থেকে চানাচুর কিনে আবার বিতরণ করতে লাগলেন তিনি সকলকে। সেই গরমে, সেই ভীড়ে, সেই থার্ডক্লাস গাড়িতে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল।

পুকুরে

শামুক। আমার বিশ্বাস ভিতরে গলদ আছে।

গুগলি। গলদ তো আছেই, তা নাহলে নিজেদের সমাজ ত্যাগ করে কেউ!

পাঁক। যখনই দেখলাম ও বারফটকা হয়েছে—তখনই বুঝলাম গতিক খারাপ।

চুনোমাছ। গোড়াতেই তোমার শাসন করা উচিত ছিল। তুমি হলে আমাদের সমাজপতি।

পুঁটিমাছ। সমাজপতি উনি কি শ্যাওলা সে বিষয়ে মতভেদ আছে, সেকথা থাক, কিন্তু ওঁরই শাসন করা উচিত ছিল, উনিই তো মানুষ করেছেন।

পাঁক। আমি শাসনের ত্রুটি করিনি ভাই। অনেক বুঝিয়েছি, অনেক বকাঝকা করেছি। কিন্তু জানই তো ভাই, আমি খুব বেশী কড়া হতে পারি না, আমি তো পাথর নই।

গুগলি। তুমি পাথর হলে আমরা কি বাঁচতাম! তোমাকে পাথর হতে হবে না, একটু রাশ টেনে ধর খালি।

ন্যাটা মাছ। এখন আর কিছু করা যাবে না!

শামুক। কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত। আমার বিশ্বাস ভিতরে ভীষণ একটা গলদ আছে।

মশার বাচ্চা। আমি জানি কি হয়েছে। আমি তো ক্রমাগত নীচ থেকে উপরে যাচ্ছি। আমি জানি কি হয়েছে—

পাঁক। কি বল তো?

মশার বাচ্চা। কতকগুলো বাজে মাছির সঙ্গে ভাব হয়েছে। তারা ওর কাছে ক্রমাগত ঘুরঘুর করছে—ভনভন করছে—

গুগলি। তাই নাকি। আমার মাঝে মাঝে কিন্তু সন্দেহ হয় মাথাই খারাপ হয়ে গেছে ওর। কেমন করে যেন চেয়ে থাকে উপর দিকে মুখ করে। মাঝে মাঝে দোলে—

চুনো। এ সব দুর্লক্ষণ।

পুঁটি। এ আমরা সহ্য করব না। পাঁক যদি এর কোনও ব্যবস্থা না করতে পারে আমরা শ্যাওলার শরণাপন্ন হব। এ রকম বেলেল্লাপনা বরদাস্ত করা অসম্ভব। [গুগলিকে] যা ভাবছ তা মোটেই নয়, মাথা টাথা কিছুই খারাপ হয়নি। ওসব ন্যাকামি, ঢং—

ন্যাটা মাছ কিছু না বলে হাসলেন।

দ্বিতীয় মশার বাচ্চা। [চুপি চুপি] আমি কিন্তু শুনেছি ও নাকি একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে।

শামুক। ওই শোন।

গুগলি। তাই নাকি?

দ্বিতীয় মশার বাচ্চা। [চুপি চুপি] হ্যাঁ গো, আলো তার নাম।

শামুক। আমি তো বলেছিলুম ভিতরে গলদ আছে।

পুকুরের জল। আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি। তোমাদের কথা শুনছিলাম খালি। তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আসল ব্যাপারটি শোন তাহলে। ওর মাথাও খারাপ হয়নি, প্রেমেও পড়েনি। ও পাগলও নয়, প্রেমিকও নয়, ও বিশ্বাসঘাতক। ও ষড়যন্ত্র করছে। কার সঙ্গে জান? সূর্যের সঙ্গে, যে সূর্য প্রতিমুহূর্তে আমাকে শোষণ করছে—

এই ভীষণ সংবাদে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

চুনো। কি করা যায় তাহলে?

পুঁটি। কেন, আন্দোলন! আন্দোলন করলে কি না হয়। দেখতে দেখতে বাছাধন ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন—

সকলে সমস্বরে। বেশ তাই হোক তবে।

আন্দোলন সুরু হয়ে গেল।

পাঁক ঘুলিয়ে উঠল।

কমল ফুল কিন্তু যেমন বিকশিত হয়ে ছিল, তেমনি বিকশিত হয়েই রইল।

খাপ্‌ পোড়

সন্ধ্যায় সময় যে রোগীটির বাকী 'ফি' দিয়ে যাবার কথা সে এল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল; ওষুধের দাম বা 'ফি' বাকি পড়লে তা আর সহজে আদায় হয় না। বেশী তাগাদা করলে লোকে বলে চামার। সুতরাং তা-ও করা যায় না। যিনি 'ফি' বা ওষুধের দাম বাকী রেখেছেন, তাঁরও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, সুতরাং তিনিও যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতে চান। রাস্তায় দেখা হলে হয় ভান করেন যেন আমাকে দেখতে পান নি বা পট্‌ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েন। পুনরায় যখন ওষুধ বা ডাক্তারের দরকার হয়, তখন আমার কাছে আর আসেন না, আর কারও শরণাপন্ন হন। মানুষের অকৃতজ্ঞতায় মন বিষিয়ে ওঠে। ভদ্রলোকের বাড়িতে উপর্যুপরি চারদিন দু'বেলা গেছি, একটি পয়সা দেন নি এখনও। আজ বলেছিলেন নিশ্চয় দিয়ে যাব, কিন্তু কই এখনও তো দেখা নেই। রাত ন'টা হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না ভদ্রলোক। কি দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি! উঠব উঠব করছি এমন সময় দ্বারপ্রান্তে গণেশদা দেখা দিলেন। গণেশদা বেকার লোক। অনেক দিন হল চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক দিন আগে, ছেলেমেয়েদের যা হোক হিল্লে হয়ে গেছে, সুতরাং তাঁর এখন নিজের কোনও কাজ নেই। অপরের হাঁড়ির খবর নেওয়া, নিম্নকণ্ঠে এর কথা ওর কাছে বলা, নানাবিধ গুজব সংগ্রহ করে সেগুলি প্রচার করা, কোন মন্ত্রী কি করছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো—এই সব নিয়েই থাকেন তিনি আজকাল। অর্শ, গেঁটে বাত, একজিমা প্রভৃতি কয়েকটি পোষা ব্যাধি আছে তাঁর। এর মধ্যে যেটা যখন চাগায় আমার কাছে এসে ওষুধ নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, বিনা মূল্যে।

গণেশদা এসেই বললেন, "ডাক্তারি করা ছেড়ে দাও, রোগ ধরতে পার না, আপ-টু-ডেট ওষুধের নাম জান না,—ডাক্তারি করার দরকার কি" বলেই তিনি হেসে ফেললেন।

"কেন, কি হয়েছে—"

"মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটাকে তুমি দেখছিলে কি?"

"গত চারদিন থেকে দেখছি! এখনই তাদের বাড়ি থেকে লোক আসবার কথা, ফি বাকী আছে—"

"আর তারা আসবে না, সিভিল সার্জনকে ডেকেছে। বলে' বেড়াচ্ছে তুমি না কি রোগ ধরতে পার নি—"

"সত্যি?"

"স্বকর্ণে শুনে এলাম।"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলতে লাগল। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলাম না। মৃদু হেসে কেবল বললাম, "ভাল।"

গণেশদা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "আমার অর্শটা আবার কাল থেকে খুব বেড়েছে, বুঝলে—দেবে না কি কিছু একটা—"

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে উত্তর দিলাম, "দিতে পারি যদি ওষুধের নগদ দাম দেন। এদেশে কারও উপকার করবার প্রবৃত্তি আর নেই।"

"ও বাবা, একবারে সপ্তমে চড়ে' গেলে যে! আজ তাহলে যাই, শেঁক-টেক দিই গে। কাল আসব। আশা করি ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—"

গণেশদা মুচকি হেসে চলে গেলেন।

গুম হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ।

"কম্পাউণ্ডারবাবু, ওষুধের বিল সবসুদ্ধ কত বাকি আছে দেখুন তো—"

"প্রায় আড়াই শ' টাকা হবে।"

"কাল তাগাদায় পাঠিয়েছিলেন?"

"পাঠিয়েছিলাম।"

"আদায় হযেছে কিছু?"

"না।"

"নালিশ করব ব্যাটাদের নামে। সব জোচ্চোর, অকৃতজ্ঞ—"

কম্পাউণ্ডার নীরব।

"দেখুন, কম্পাউণ্ডারবাবু, আপনি নিজে কাল একবার বেরিয়ে মিত্তিরদের ওখানে আমার বিলটা দিযে আসবেন। চার দিনের ফি বত্রিশ টাকা, আর ওষুধের দাম—"

"যে আজ্ঞে—"

"আশ্চর্য দেশে জন্মেছি। একটি ভদ্রলোক নেই, সব জোচ্চোর, ধড়িবাজ আর নিমকহারাম—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাপ্পোড়টি খেলাম।

দ্বারপ্রান্তে একটি যুবক এসে দাঁড়াল। কখনও দেখেছি বলে' মনে হল না।

"এইটেই কি ডাক্তার সামন্তের ডিসপেন্সারি?"

"হ্যাঁ—"

"ডাক্তার সামন্ত কোথায়।"

"আমিই ডাক্তার সামন্ত। কি দরকার বলুন।"

যুবকটি একটু ইতস্তত করতে লাগল। মনে হল যেন লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। তারপর ঘরে ঢুকে প্রণাম করলে আমাকে।

"আমি রতনদীঘি থেকে আসছি—"

প্রথম পাশ করেই রতনদীঘি গ্রামে প্রাকটিস করব বলে' বসেছিলাম। বছরখানেক সেখানে ভ্যারেণ্ডা ভেজে চলে' এসেছিলাম প্রায় তিরিশ বছর আগে। সেখান থেকে এতদিন পরে কে এল।

"আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

মৃদু হেসে যুবক বললে, "চেনবার কথা নয়। আমার মা-কে হয়তো চিনতে পারেন। আমার মায়ের নাম রাসমণি। আমি যখন হই তখন মায়ের বড় কষ্ট হয়েছিল, আপনি না থাকলে মা বোধহয় বাঁচতেন না।"

সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল। ষোল সতের বছরের একটি প্রসববেদনাতুরা নববধূর আর্ত মুখ ফুটে উঠল মানসপটে।

...রাসমণিও আমাকে একটি পয়সা দেয় নি, বলেছিল, "আপনার ঋণ শোধবার নয় ডাক্তারবাবু। তবু কিছু প্রণামী আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব আপনাকে যেমন করে হোক। বিশ্বাস করুন আমার কথা—"

একটু ইতস্তত করে যুবকটি বললে—"মা বছর দশেক হল মারা গেছেন। মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন আমি নিজে রোজগার করে অন্তত একশ' টাকা যেন আপনাকে দিয়ে আসি। আপনার আশীর্বাদে রোজগার কিছু কিছু হচ্ছে, তাই এই সামান্য কিছু এনেছি—"

একটি হাজার টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে যুবকটি কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনার ঠিকানা খুঁজে বার করতে দেরি হল। তা না হলে আমি আগেই আসতাম।"

প্রেরণা

১

হরিরঞ্জনবাবু কাছারী থেকে ফিরে সেদিনও যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্র গোপাল লেখাপড়া কিচ্ছু করেনি, ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে কাটিয়েছে, তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, ছাতা নিয়ে তেড়ে গেলেন। নিক্ষিপ্ত ছাতাটিকে এড়িয়ে গোপাল যেই পালাতে যাবে, অমনি হরিরঞ্জনবাবু ধরে ফেললেন তাকে।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই হরিরঞ্জনবাবু মুক্তকচ্ছ এবং গোপাল অশ্রুসিক্ত হয়ে গৃহস্থালী-কাব্যের যে নূতন পর্বের সূচনা করছিলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তার রূপ বদলে গেল। গেটে মোটরের হর্ন শোনা গেল এবং হরিরঞ্জনবাবু উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, তাঁর ওপর-ওলা নব-নিযুক্ত ছোকরা জজ সাহেবের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং উষ্মা দমন করে কাছাটি গুঁজে হাসিমুখে বেরিয়ে আসতে হল তাঁকে। এই জজ সাহেবেরই আপিসের কেরাণী তিনি। জজ-সাহেবটি সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছেন এখানে। বয়স যদিও কম কিন্তু ছেলে নাকি খুব ভালো। চাকরির পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন না কি। কড়া মেজাজের লোক, কোথাও (বিশেষ) যান না। কিন্তু হরিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন। এই নিয়ে তিনবার এলেন তাঁর বাড়িতে।

"নমস্কার। গোপালের কান্না শোনা যাচ্ছে যেন। ব্যাপার কি—"

"আজ্ঞে না, ও কিছু নয়—"

"শাসন হচ্ছিল বুঝি—"

জজসাহের বারান্দায় উঠলেন এসে!

"পড়াশোনায় একদম মন নেই স্যার। কেবল ঘুড়ি আর লাটাই। আমাদের দাইয়ের একটা ছেলে জুটেছে তার সঙ্গে সমস্ত দিন মাঠে মাঠে টো-টো করে বেড়াবে। একটিবার বই ছোঁবে না।"

"বটে—"

গোপাল ঘাড় হেঁট করে প্রাণপণে চোখ কচলাচ্ছিল দু'হাত দিয়ে। জজসাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে স-স্নেহে বললেন, "কিসের মাঞ্জা দিলে ঘুড়ির সুতো মজবুত হয় বল তো?"

চোখ কচলাতে কচলাতেই ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে গোপাল উত্তর দিলে—"বেলের আঠা আর কাঁচের গুঁড়ো।"

"আচ্ছা, আর একরকম ভালো মাঞ্জা তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি—"

গোপাল আড়চোখে জজসাহেবের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে এক ছুটে চলে গেল বাড়ির ভেতর।

"মা, জজসাহেব আবার এসেছে আজ মোটরে করে। কি চমৎকার মোটরটা মা—"

"দেখেছি।"

হরিরঞ্জনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, "গরীবের বাড়িতে এক কাপ চা খাবেন স্যার? করে আনতে বলি?"

"চা আমি খেয়ে বেরিয়েছি। তা বলুন, খাওয়া যাক আর এক কাপ—"

হাতল-ভাঙা কাঠের চেয়ারটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন হরিরঞ্জন। "বসুন স্যার। এক্ষুনি করে এনে দিচ্ছি।"

শশব্যস্ত হরিরঞ্জন দ্রুতপদে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। "শুনছ মিনু, জজসাহেব চা খাবেন। চট করে করে দাও দিকি এক কাপ। সেদিন যে নতুন টি-পটটা কিনেছি সেইটেতেই কোরো, বুঝলে। গোপ্‌লা গজুবাবুর বাড়ি থেকে ভাল একটা চায়ের পেয়ালা চেয়ে আন্‌ দিকি। খিড়কি দিয়ে যা, উনি যেন দেখতে না পান—"

২

চা পর্ব শেষ হয়ে গেল।

গোপালের পাঠে অমনোযোগের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। হরিরঞ্জনবাবু ব'লছিলেন যে, পয়সার জোর থাকলে তিনি একজন প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারতেন। তাহলে হয়তো কিছু কাজ হ'ত।

জজসাহেব হেসে বললেন, "তার কোনও মানে নেই হরিবাবু। একটা গল্প বলি তাহলে শুনুন। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। একটি ভদ্রলোকের ছেলে ছিল দুটি। তারা যেন প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, কিছুতেই লেখাপড়া করবে না। তাদের বাবা মাস্টারের পর মাস্টার বদলাতে লাগলেন, স্কুলের পর স্কুল বদলাতে লাগলেন, কোনও ফল হল না। রোজ তারা স্কুল পালাত; বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার পড়ার প্রসঙ্গ তুললেই সরে পড়ত, মায়ের আদুরে ছেলে, গায়ে হাত তোলবারও উপায় ছিল না কোনও মাস্টারের। তবু একজন মাস্টার বিরক্ত এবং মরিয়া হয়ে গোবেডেন করেছিলেন তাদের। কিন্তু কোনও ফল হয় নি। বাপের পয়সার অভাব ছিল না। তিনি শেষকালে কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, যে শিক্ষক আমার ছেলেদের পড়ায় মন বসিয়ে দিতে পারবেন, মাসিক বেতন ছাড়া তাঁকে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। জুটল একজন ছোকরা শিক্ষক। তিনি প্রথম প্রথম এসে পড়াশোনার কথাই তুললেন না। গুলি খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, কাগজের নৌকা তৈরী করা এইসব নিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন ছেলে দুটিকে। কিছুদিন কাটল। তারপর মাস্টার ছেলেদের নিয়ে মাঠে বেড়াতে গেলেন একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দু'একটি তারা উঠেছে আকাশে। মাস্টার একটি তারা দেখিয়ে বললেন, "ওই দেখ একটি তারা উঠেছে।"

বড় ছেলেটি বললে—"ওই যে আর একটা—"

"ক'টা হল, তাহলে।"

"দুটো—"

"ওই দেখ আর একটা। কটা হ'ল।"

"তিনটে। ওই এদিকে আর একটা স্যার।"

"কটা হ'ল ?"

"চারটে—"

"ওই গাছটার উপর দেখ আর একটা। চার আর একে পাঁচ হল তাহলে ? কি বল ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

ছোট ছেলেটি এতক্ষণ একটি কথা বলে নি।

সে দাদার দিকে চেয়ে বললে, "দাদা মাস্টার কিন্তু পড়াচ্ছে—"

বলেই সে ছুটল বাড়ির দিকে। দাদাও ছুটল তার পিছু পিছু। মাস্টার সেইখান থেকেই বিদায় নিলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল এ ছেলেদের কিছু হবে না।"

জজসাহেব চুপ করলেন।

"তারপর ?"

"বড় ছেলেটি কলেরায় মারা গেল দিন কতক পরে। ফলে ছোট ছেলেটি আরও আদুরে হয়ে উঠল। পড়াশোনার ধার দিয়েও আর যেত না সে।"

আবার চুপ করলেন জজসাহেব।

"অত আদর দিলে কি আর লেখাপড়া হয় স্যার ?" আদরের অপকারিতা বিষয়েই জজসাহেব বলছেন ভেবে কথাগুলি বললেন হরিরঞ্জন।

জজসাহেব বললেন—"অত আদর সত্ত্বেও কিন্তু ছেলেটির লেখাপড়ায় মন বসল হঠাৎ একদিন। টপাটপ পরীক্ষা পাশ করতে লাগল সে।"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ। কখন কিভাবে যে কি হয় তা বলা যায় না।"

"আজ্ঞে স্যার, তা তো বটেই, তা তো বটেই।"

"আচ্ছা এবার উঠি আমি। এমনিই এসেছিলাম। আপনার বাড়ির সব খবর ভালো তো—"

"আজ্ঞে হাঁ।"

জজসাহেব চলে গেলেন। তিনি যে গল্পটি বললেন সেটি অসম্পূর্ণ। তার শেষের অংশটুকু ইচ্ছে করেই চেপে গেলেন তিনি। সে অংশটুকু হচ্ছে এই যে,

পাশের বাড়ির ন'বছরের মেয়ে মিনুর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল ছেলেটির। আড়ালে তাকে সে একদিন নাকি বলেছিল—মিনু, আমাকে যদি তুই বিয়ে করিস বেশ হয়। করবি? উত্তরে মিনু বলে, তোমার মতো মুখ্যু ছেলেকে আমি বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে? আমার বর হবে বিদ্বান। তারপর থেকেই নাকি ছেলেটির পড়ায় মনে বসে। আর একটা কথাও তিনি বলেননি। ছেলেটি অপর কেউ নয়, তিনি নিজেরই বাল্য কাহিনী বিবৃত কবছিলেন।

লাল কালো

বাবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মা পাগল, ম্যাট্রিক ফেল দাদা চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, আট বছরেব ছেলে টুনুই সংসাব চালায় ভিক্ষে করে। ভিক্ষে করে প্রায় বারো আনা রোজগার করে সে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ে, প্রতি দ্বারে দ্বারে হাত পাতে, প্রতি পথিকের করুণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করে। কেউ পযসা দেয, কেউ গালাগালি দেয়, উপদেশও দেয় কেউ কেউ।

টুনুর বাঁধা ঘর আছে কযেকটি। সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। বড়লোকের বাড়ির দিকে বড একটা ঘেঁসে না সে। তাঁদের মধ্যে দয়ালু লোক হয়তো আছেন, কিন্তু তাঁদেব বড গেট পেরিযে তাঁদের কাছাকাছি যাওয়াই শক্ত। গেটে দারোয়ান থাকে, কুকুরও থাকে।

টুনুর বাঁধা ঘরের মধ্যে নানা জাতের লোক আছে। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারি, বেহারী, ডাক্তার, দোকানী, উকীল, কেরাণী—সব রকম। সে সকলেরই ধাত চিনত। চিনতে পারেনি কেবল রামচরণবাবুকে। ওই উস্‌কো-খুস্‌কো-চুল রক্তচক্ষু লোকটিব চরিত্র খুবই অদ্ভুত মনে হত তার কাছে। প্রতিদিনই তার একটা অপ্রত্যাশিত নূতন রূপ যেন দেখতে পেত সে। রামচরণবাবু রোজই যে তাকে পযসা দিতেন তা নয়, কিন্তু টুনু রোজই যেত তাঁর কাছে—হয়তো তাঁর অপ্রত্যাশিত রূপ দেখবে বলেই। সন্ধ্যার সময় সে যেত রোজ। গিয়ে কোনদিন দেখত রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে পড়ছেন। টুনু যদি বুঝতে পারত রামচরণবাবু কি পড়ছে তাহলে সে আরও আশ্চর্য হয়ে যেত এই ভেবে যে, রামচরণবাবু প্রতিদিনই নূতন রকম বই পড়েন, কোনদিন গীতা, কোনদিন ডিটেকটিভ নভেল, কোনদিন কোনও রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা, কোনদিন বা পাঁজি, কোনওদিন বা রেলোয়ে টাইমটেবল। টুনু দেখত রামচরণবাবু পড়ছেন এবং তাঁর ভুরু কুঁচকে

আছে, যেন তিনি যেটা পড়ছেন সেটাকে ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত সন্দেহের চক্ষে যাচাই করে নিচ্ছেন মনে মনে। টুনুর সঙ্গে চোখোচোখি হলেই একটা পয়সা বা ডবল পয়সা বা আনি যা হাতের কাছে পেতেন ছুঁড়ে দিতেন। কোনওদিন হয়তো যাওয়ামাত্র খেঁকিয়ে উঠতেন—"আবার এসেছে হারামজাদা। যেন বাপের জমিদারী!" টুনু বুঝত আজ সুবিধে হবে না, সরে' পড়ত সুট করে। কোন কোন দিন সবে পড়বার মুখেও রামচরণবাবুর নূতন একটা মূর্তি চোখে পড়ত তার। রামচরণবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠতেন, "আবার অভিমান করে চলে যাওয়া হচ্ছে লবাবপুত্তুরের। যা, নিয়ে যা"—ঠক্ করে একটা আনিই হযতো এসে পডতো পায়ের গোডায়। কোনদিন টুনু হয়তো গিয়ে দেখত রামচরণবাবু গলার সামনের দিকটায় হাত বুলুতে বুলুতে কড়িকাঠ গুনছেন। টুনু সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত চুপ করে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না। তারপর হঠাৎ যখন রামচরণবাবুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যেত রামচরণবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পডতেন। যেন চুরি করে কিছু একটা করছিলেন, ধরা পড়ে গেছেন। অপ্রতিভ হাসি হেসে বলতেন, "ও তুই, কতক্ষণ এসেছিস"—তাড়াতাড়ি একটা পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। রামচরণবাবুর নানা মূর্তি দেখেছিল টুনু। মাঝে মাঝে দেখত রামচরণবাবু একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছেন। মেজাজ দিলদরিয়া। টুনুকে দেখবামাত্র বলে উঠতেন, "এস এস, বাবা এস। তোমার অপেক্ষাতেই বসে' আছি"—হয়তো একটা গোটা দু-আনিই পেয়ে যেত সেদিন টুনু। টুনু রামচরণবাবুর জীবনকথা কিছুই জানত না। জানত না যে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেডে পালিযে গেছে আর একজনের সঙ্গে প্রায় কুডি বছর আগে। জানত না যে শিশু পুত্রটিকে সে ফেলে গিয়েছিল এবং যাকে কেন্দ্র করে বামচরণবাবুর কল্পনা স্বপ্নের রঙীন প্রাসাদ সৃষ্টি করছিল সেই ছেলেটি যক্ষারোগে মারা গেছে কিছুদিন আগে। এসব সে কিছুই জানত না। সে রামচরণের টুকরো টুকরো নানা ছবি জুডে জুডে এক নূতন রামচরণ সৃজন করেছিল নিজের মনে। এবং তাকে ভালও বেসেছিল।

২

কিছুদিন থেকে টুনু লক্ষ্য করছিল রামচরণবাবু ক্রমশঃ বেশী তিরিক্ষি হয়ে উঠছেন। মাঝে মাঝে এক আধটা পয়সা দেন বটে কিন্তু প্রায়ই তাড়িয়ে দেন। বোতল গ্লাস নিয়েও বসেন না আজকাল। গুম হয়ে বসে গলার সামনের দিকটায় হাত বুলোতে বুলোতে কেবল কড়িকাঠ গোণেন।

তারপর একদিন সে কার মুখে যেন শুনলে যে, রামচরণবাবুর অবস্থা না কি খারাপ হয়ে গেছে খুব। ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন ভদ্রলোক। টুনুর মনে হল তাই বোধ হয় মদ কিনতে পারছেন না আজকাল, আর সেইজন্যেই মেজাজটা উগ্র হয়ে উঠছে বোধ হয়। রামচরণবাবুর দিলদরিয়া মেজাজের ছবিটা ফুটে উঠল তার মানসপটে। মনে হল তার যদি পয়সা থাকত তাহলে সে নিশ্চয়ই এক বোতল মদ কিনে দিয়ে আসত তাঁকে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও তার মনে খেলে গেল বিদ্যুদ্বেগে। তারা যেখানে থাকে তার ঠিক সামনেই থাকে বিনোদ সাহু। সে লোকটাও মদ খায়। অত্যন্ত পাজি লোক। টুনু তার কাছে গালাগালি ছাড়া আর কিছু পায়নি কোনদিন। মদ খেয়ে রামচরণবাবুর মতো দিলদরিয়া হতে পারে না সে। তার বাড়ির সামনের দরজাটা প্রায়ই খোলা থাকে। টুনু ইচ্ছে করলে তার বাইরের ঘর থেকে একটা বোতল অনায়াসেই সরিয়ে ফেলতে পারে। বাইরের ঘরের তাকের ওপর একটা বোতল তো থাকেই, রাস্তা থেকেই দেখতে পায় টুনু। অনায়াসেই তো বোতলটা পাচার করতে পারে সে। আহা, যদি পারে···রামচরণবাবুর জন্যে সত্যিই কষ্ট হয় টুনুর।

৩

রামচরণবাবু নিবিষ্টচিত্তে বসে বসে কড়িকাঠ গুণছিলেন, এমন সময় খুট করে শব্দ হল কপাটের কাছে।

"কে রে—"

চেঁচিয়ে উঠলেন রামচরণবাবু।

"আমি।"

বোতল হাতে এগিয়ে এল টুনু।

"ফের শালা তুই জ্বালাতে এসেছিস, বেরিয়ে যা এখান থেকে—"

টুনু যা কোনও দিন করেনি তাই করল সেদিন। ঘরের ভিতর ঢুকে টেবিলের উপর বোতলটা রেখে বলল, "এইটে আপনি খান—"

"খাব ? মানে ?"

বোতলটা তুলে দেখলেন রামচরণবাবু। মদের বোতল নয়, কালীর বোতল।

পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল টুনু। বোতলটা ছুড়ে মেরেছেন তাকে রামচরণবাবু। মাথা বোতল দুই-ই ফেটেছে। রক্তের লালের সঙ্গে কালীর কালো মিশে অদ্ভুত হয়েছে টুনুর মুখটা। রামচরণবাবু হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। ভীড় জমতে লাগল।

নির্বাকের দুঃখ

রাগের আসল হেতুটা অবশ্য অন্য ছিল। নরেন বেশী রোজগার করে, মোটর-কার কিনেছে, তার বউ বেশী সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, পণে অলঙ্কারে আসবাবে প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা এনেছে বাপের বাড়ি থেকে; এর প্রত্যেকটি অদৃশ্য কণ্টকরূপে বিঁধছিল হরেনের বুকে। কিন্তু বিঁধলে কি হবে, এর কোনটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তো ফল হবে না। অনেকদিন আগেই বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। নরেন তার ভাগের একতলা ঘরটার উপর উপর্যুপরি দুটো ঘর তুলে তিনতলা করেছে সেটাকে। ফলে হরেনের ভাগের উঠোনটা অন্ধকার হয়ে গেছে। নরেনের বউ তেতলার ঘরে বঁসে গাঁক গাঁক করে রেডিও বাজায়। হরেনের স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীর বুক জ্বলে তাতে। রাগের আসল কারণ এই সব। কিন্তু এ সব কথাতো আদালতে গিয়ে বলা যায় না। তাই মকোদ্দমাটা বাধল একটা কাঁঠাল গাছ নিয়ে। কাঁঠাল গাছটা নরেনের ভাগে পড়েছিল। তারপরই পাঁচিল এবং ঠিক পাঁচিলের ওপারে হরেনের একটা ঘর। সেই ঘরের জানলায় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল গিয়ে পড়েছিল। ডালটা যেন বলতে চাইছিল, "ও হরেন, কেন দুই ভায়ে ঝগড়া করছ তোমরা। কেন মন গুমরে আছ, যেমন ছিলে তেমনি থাক না—"

কিন্তু এ ভাষা শোনবার মতো কান হরেনের ছিল না। সে একটা কাটারি নিয়ে এসে ডালটাকে কেটে দিলে। তারপর নরেনকে বললে, "দেখ, তোমার ওই কাঁঠাল গাছ থাকাতে আমার ঘরটায় আলো হাওয়া কিছু ঢোকে না, আর ওইটি আমার একমাত্র শোবার ঘর, ও গাছ কেটে ফেল তুমি।"

নরেন রাজি হল না। হরেন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আদালতে এই মর্মে নালিশ করে দিলে যে ও গাছ কেটে না ফেললে আমি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হ'য়ে মারা যাব। আমার রোজ সন্ধ্যায় জ্বর হয়, ডাক্তার সন্দেহ করছেন যে আমার বুকের দোষ হয়েছে। তিনি যে সব দামী ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন তা কেনবার সামর্থ নেই আমার। ভগবানের দান আলো-হাওয়াটুকু যাতে আমি নির্বিঘ্নে পাই তার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি ওই কাঁঠাল গাছটি কেটে ফেলবার হুকুম যেন আদালত দেন। গাছের যা ন্যায্য মুল্য তা আমি দেব।

বলা বাহুল্য, হরেনের যক্ষ্মা হয় নি, হয়েছিল রাগ। কিন্তু উকিলের পরামর্শ অনুসারে এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেটের জোরে নিজেকে সে যক্ষ্মাগ্রস্ত বলে প্রমাণ

করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ উকিল বললেন তা না করলে ওই কাঁঠাল গাছ সরানো যাবে না।

আদালতে উকিল যক্ষ্মা সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করে মহামান্য বিচারকের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করতে লাগলেন।

পাড়ার লোকেরা কেউ হরেনের কেউ নরেনের পক্ষ অবলম্বন করে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করলেন। তাঁদের সময় বেশ কাটতে লাগল। আদালতেও ধাওয়া করতে লাগলেন কেউ কেউ টাটকা খবর সংগ্রহ করবার জন্যে। যাঁরা নিরপেক্ষ রইলেন তাঁরা বললেন—ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া, কি ট্র্যাজেডি। আসল ট্র্যাজেডির খবর কিন্তু রাখলে না কেউ। একটি নয়, তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল এর ফলে। হরেনবাবুর প্রথম পক্ষের একটি কুৎসিত মেয়ে ছিল। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ। কিছুতেই কোথাও তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল না। টাকারও জোর নেই, রূপেরও জোর নেই। তার মামারা অবশেষে একটি দোজবরে ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে প্রায় ঠিক করে এনেছিলেন এবং তাকে ঘিরেই মানুতির কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল গোপনে গোপনে। কিন্তু যেই পাত্রপক্ষ শুনলেন হরেন যক্ষ্মাগ্রস্ত অমনি তাঁরা পিছিয়ে গেলেন। মানুতির রঙীন কল্পনা মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি ঘটল চাদনকে কেন্দ্র করে। নরেনের বাড়ির ঝি লক্ষ্মীর ছেলে চাঁদন ওই কাঁঠাল গাছটির তলায় যেন স্বর্গলোক আবিষ্কার করেছিল। তার মা তাকে যখন বস্তির অন্ধকার ঘুপচি ঘর থেকে বার করে এনে কাঁঠাল-ডালে ঝোলানো দোলনাটিতে শুইয়ে দিত তখন সে যেন স্বর্গসুখ উপভোগ করত।

আদালতের আদেশ অনুসারে কাঁঠাল গাছটি যখন কাটা পড়ল তখন বিনা দোষে স্বর্গচ্যুত হ'তে হল তাকে।

তৃতীয় ট্র্যাজেডি হ'ল এক শালিক দম্পতির। ওই কাঁঠাল গাছে নীড় বেঁধে ডিম পেড়েছিল তারা।

আদর্শ ও বাস্তব

ডাক্তার প্রিয়গোবিন্দ বসাক ছাত্র জীবনে আদর্শবাদী ছিলেন। যে সকল আদর্শ মনুষ্যত্বকে চিরকাল উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, সে সকল আদর্শ প্রিয়গোবিন্দকেও উদ্বুদ্ধ করিত। তিনি সত্যবাদী, পরোপকারী ও পরার্থপর ছিলেন। ছাত্রজীবনেই দেশপ্রেমে তাঁহার চিত্ত আলোকিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বিষয়ক রচনাবলী তাঁহার চরিত্রে যে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে তাঁহাকে বিবিধ সৎকার্যে প্রণোদিত করে। আমাদের দেশে সৎকার্য করিবার সুযোগ অনন্ত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, ঝঞ্ঝা লাগিয়াই আছে। বিপন্ন দেশবাসীর সেবা করা ছাত্রজীবনে প্রিয়গোবিন্দের প্রধান আনন্দ ছিল। সেই সময়ই প্রিয়গোবিন্দ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষ এবং আমাদের দেশের হিমালয় বা গঙ্গা পৃথিবীর মধ্যে যত শ্রেষ্ঠত্বই লাভ করুক না কেন, এদেশের অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত নিম্নস্তরের। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দল। এই পশুদের সেবা করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে,—ইহাই প্রিয়গোবিন্দ বসাকের স্বপ্ন ছিল একদিন। এই স্বপ্নই তাঁহার ছাত্রজীবনের সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহারই প্রেরণায় তিনি ক্ষুদিরামের চিতার ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিপ্লবী দলের আদর্শে ছোট একটি দল গঠন করিয়াছিলেন, ছোট একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, আরও কত কি করিয়াছিলেন।

এই স্বপ্নের ঘোরেই প্রিয়গোবিন্দ ডাক্তারি পাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবাহও হইয়া গেল এবং তাহার কিছুদিন পরেই বাবা মারা গেলেন। যে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন ও নিরক্ষর পশুর দলকে তিনি এতদিন দূরে স্বপ্নলোকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারই একটা অংশ সহসা বাস্তবলোকে মূর্ত হইয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ছোট ভাই, দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নী, দুইটি বিধবা পিসি, বিধবা মা এবং তরুণী ভার্যা তাহাদের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষুধা ও পিপাসার দাবী লইয়া তাঁহার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল।

চাকুরির জন্য প্রিয়গোবিন্দ নানাস্থানে ত্রিশটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও চাকুরি জুটিল না। তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ-রিপোর্ট এমনই কড়া ছিল যে কোনও কর্তৃপক্ষই তাঁহাকে নিয়োগ করা নিরাপদ মনে করিলেন না।

ইহার ঠিক পনর বৎসর পরে প্রিয়গোবিন্দ সহসা একদিন সচেতন হইলেন। মনে হইল, কোন এক অদৃশ্য হস্ত যেন ঠাস করিয়া তাঁহার গালে চড় মারিয়া গেল।...দামী মোটরকার নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। কিন্তু সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও প্রিয়গোবিন্দ যেন চাপা হাসির আওয়াজ শুনিতেছিলেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনী দত্ত, গান্ধীজী, কানাইলাল, বাঘা যতীন এবং আরও অনেকে যেন চুপি চুপি হাসিতেছেন। প্রিয়গোবিন্দের মনে হইল, তাঁহারা অনেকদিন হইতেই হাসিতেছিলেন, আজ তিনি সহসা সেটা শুনিতে পাইয়াছেন। অদৃশ্য হস্ত তাঁহার গালে আর একটি চড় মারিল। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা অকালবৃদ্ধা

মেয়েটার অশ্রুসিক্ত মুখখানা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একবার। তাহার মিনতিপূর্ণ কথাগুলিও আবার তিনি শুনিতে পাইলেন :

"আমি বড় গরীব বাবু, আপনার ফী দেবার সামর্থ্য আমার নেই—"

"ওষুধের দাম দিতে পারবে তো ?"

"কত লাগবে বাবু ?"

"ইন্‌জেকশন দিতে হবে। টাকা পাঁচেক করে লাগবে প্রতি ইন্‌জেকশনে—"

"আমি বড গরীব বাবু—"

ঠিক এই সময়েই যজ্ঞেশ্বরবাবুর মোটরখানা তাঁহার ডিসপেন্সারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহনাদ করিয়াছিল। যজ্ঞেশ্বরবাবুর মোটরের হর্নের শব্দ যেন তাঁহার অহঙ্কারেরই বাঙ্ময় রূপ। প্রিয়গোবিন্দ আর কালবিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। শতচ্ছিন্ন, ময়লা কাপড়-পরা মেয়েটার কথা সম্পূর্ণরূপে শুনিবারও ধৈর্য তাঁহার আর থাকে নাই। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে গিয়া ইন্‌জেকশন দিলেই ষোল টাকা ফী এবং যজ্ঞেশ্বরবাবু যদি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আরও বহু ষোল টাকা…না, নিত্য অভাবগ্রস্ত প্রিয়গোবিন্দ ধৈর্যরক্ষা করিতে পারেন নাই।

মোটর নিঃশব্দ দ্রুতবেগে চলিতেছিল। প্রিয়গোবিন্দ ফিস ফিস হাসি শুনিতে শুনিতে চলিযাছিলেন। তাঁহার মনে হইল সেই চাপা হাসি ক্রমশ যেন ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। তিনি শুনিতে পাইলেন : "তুমি যাহাকে ইন্‌জেকশন দিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছ, সে লোকটি দুরাচার চরিত্রহীন, পাষণ্ড কালোবাজারী। তাহার সিফিলিস হইয়াছে। ইহা তোমার অবিদিত নাই যে, ব্যাধিটি তাহার স্বোপার্জিত এবং অকথ্য চরিত্রহীনতার পরিচায়ক। লোকটির টাকা আছে, তাই তুমি লালায়িত হইয়া পুলকিত কলেবরে তাহার চিকিৎসা করিতে ছুটিয়া চলিয়াছ। আর যে দীনদরিদ্র অভাগিনীকে তুমি তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিলে, যাহার কথা শেষ পর্যন্ত শুনিবার ধৈর্য পর্যন্ত তোমার রহিল না, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। সে বেচারী গরীব, তাই তাহার চিকিৎসা করিতে তুমি উৎসাহ পাইলে না! একটা কথা কি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ প্রিয়গোবিন্দ ? যজ্ঞেশ্বরের সিফিলিস এবং ওই মেয়েটির যক্ষ্মা কি একই অবস্থার দুই দিক নয়। যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অব্যবস্থার ফলে যজ্ঞেশ্বর অত্যধিক টাকা রোজগার করিয়া মাথা ঠিক রাখিতে পারে নাই, সেই সামাজিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থাই ওই অভাগিনী মেয়েটিকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, যক্ষ্মাগ্রস্ত করিয়াছে। চতুর যজ্ঞেশ্বর আইনের সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়া টাকা লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ওই মেয়েটির ভাগে

কিছুই থাকে নাই। আদর্শবাদী প্রিয়গোবিন্দ, ভাবিয়া দেখ, কাহাকে চিকিৎসা করা তোমার উচিত ছিল ?..."

মোটর সিংহগর্জন করিতে করিতে ছুটিতেছিল। প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩

আরও পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। প্রিয়গোবিন্দের তিনটি পুত্র মানুষ হইয়াছে। সংসারের চাপ আর ততটা বেশী নাই। প্রিয়গোবিন্দ ঠিক করিলেন, এইবার তিনি তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবেন। দেশে দরিদ্র রোগীর অভাব নাই। এইবার তাহাদের সেবা করিতে হইবে। বিশেষত সদ্যআগত বিলাতী ডিগ্রীধারি ডি. পি. গোহা নামক যে ডাক্তারটি বিজ্ঞাপন, দালাল ও ভাঁওতার জোরে বহু রোগীকে ধনে প্রাণে নাশ করিতেছে, তাহার কবল হইতে যতগুলিকে পারেন, তিনি রক্ষা করিবেন। চিকিৎসা করা মানে যে রোগীকে বিবিধ প্রকার খরচের ঘূর্ণাবর্তে ফেলিয়া সর্বস্বান্ত করা নয়, তাহা হাতে কলমে তিনি দেখাইয়া দিবেন। নিজের যদি লাভের লোভ না থাকে, তাহা হইলে স্বল্প ব্যয়ে সুচিকিৎসা করা যে সম্ভবপর, তাহা প্রমাণ করিবার সুযোগ ভগবান এতদিন পরে যখন তাঁহাকে দিয়াছেন, তখন সে সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিবেন না।

এই মনোভাব লইয়া প্রিয়গোবিন্দ প্রথম যেদিন নিজের ডিস্‌পেন্সারিতে গেলেন, সেইদিনই একটি মনোমত রোগী জুটিয়া গেল। লোকটি বহুকাল পূর্বে তাঁহারই ভৃত্য ছিল। চুরি করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে তিনি তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রামরতন সাশ্রুনেত্রে তাহার জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া গেল। অনেক ঘাটের জল খাইয়াছে সে। উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব—কোথাও বাকী নাই। একবার নাকি তাহার জেলও হইয়াছিল।

সমস্ত বর্ণনা করিয়া রামরতন অবশেষে প্রিয়গোবিন্দের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল : "আমার দেশে মাত্র দু বিঘে জমি আছে বাবু, আর আমার কিছু নেই। পেটে অন্ন নেই, পরণে বস্ত্র নেই। খেটে খাবারও সামর্থ্য নেই আমার আর। যে কালরোগে ধরেছে বাবু, একটু কিছু করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ি। রিকশ টানার কাজ নিয়েছিলাম একটা, কিন্তু পারলাম না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। ঝলকে ঝলকে রক্ত। তাছাড়া জ্বর সর্বদা লেগেই আছে। অনেক জায়গায় ওষুধ খেয়েছি

ডাক্তারবাবু, কোথাও কিছু হয়নি। শেষকালে ভাবলাম, পুরোনো মনিবের কাছেই যাই, তিনি রাখতে চান রাখবেন, মারতে চান মারবেন—"

পা জড়াইয়া রামরতন হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রিয়গোবিন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এ অবস্থায় আমাদের দেশের শতকরা আশীজনের যাহা হয়, রামরতনের তাহাই হইয়াছে। সে যক্ষ্মাগ্রস্ত ; তাহার দুইটি ফুসফুসই আক্রান্ত।

প্রিয়গোবিন্দ বলিলেন : "বেশ। তোর চিকিৎসা আমি করব। অসুখটি অবশ্য সাংঘাতিক হয়েছে—"

"এ অসুখের কি একটা ইন্‌জেকশন বেরিয়েছে না কি বাবু ?"

প্রিয়গোবিন্দ বুঝিলেন, রামরতন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কথা শুনিয়াছে।

বলিলেন : "বেরিয়েছে বটে, কিন্তু তাতে অনেক খরচ, তুই পেরে উঠবি না। আর সে ইন্‌জেকশন নিলে যে সারবেই এমনও কোন কথা নেই—"

"কত খরচ—"

"আড়াই শ'—তিন শ' টাকা ওষুধেরই দাম লেগে যাবে।"

"আমার যে জমিটা আছে, সেটা বিক্রী করে দিলে শ' তিনেক টাকা আমি পেতে পারি।"

"না, না, সে দরকার নেই। কম খরচে তোর সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দেখ্ না। ভাল খেতে হবে, সেইটেই হল প্রথম কথা। দুধ, ডিম, মাংস—এই সব খাওয়া চাই। তারপর আসল কথা হল বিশ্রাম। তুই ওবেলা আসিস, সব ব্যবস্থা করে দেব।"

"ইন্‌জেকশন দেবেন না ?"

"এখন ইন্‌জেকশন দরকার নেই।"

রামরতন চুপ করিয়া রহিল।

"তুই ওবেলা আসিস, তোর কখন কি খেতে হবে, আমি একটা কাগজে ফর্দ করে দেব, আর হজমের ওষুধও দেব একটা, তার দামও দিতে হবে না তোকে, বুঝলি—"

"আচ্ছা—"

রামরতন চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ খবর পাইলেন যে, সে নিজেই দুই বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে এবং ডাক্তার ডি. পি. গোহার নিকট গিয়া ইন্‌জেকশন লইতেছে।

প্রিয়গোবিন্দ নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে প্রিয়গোবিন্দ নিজেই সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলেন। যে স্টেথোস্কোপটি বহু লোকের বুকে বসাইয়া তিনি সারাজীবন অর্থোপার্জন করিয়াছেন, সেইটি তাঁহার চোখের সামনে দেওয়ালে ঝুলিতেছিল। সেইটির দিকেই তিনি নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। মনে হইল, স্টেথোস্কোপটিও রূপ পরিবর্তন করিয়াছে। তাহা আর স্টেথোস্কোপ বলিয়া মনে হইতেছে না, মনে হইতেছে যেন একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন শূন্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

দুইদিন পরে তাহার মৃত্যু হইল।

অলক্ষ্যে

১

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু কি করে ঘটেছিল তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, বৈজ্ঞানিকেরা এ রহস্যের হদিস পাবেন না, রসিকেরা হয়তো পেলেও পেতে পারেন।

পলাশ গাছের তলায় এক বুড়ি কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল একদিন। সঙ্গে ছিল তার কিশোরী নাতনী সুখীয়া। সুখেরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন সে। সে কাঠ কুড়োচ্ছিল না। মনের আনন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুধু। কখনও ফুলগাছের ডালে নাড়া দিয়ে, কখনও নামহীন বন্যলতার ফুল পেড়ে, কখনও এক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল তার। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সে এসে পলাশ গাছটার তলায় ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। অনেক উঁচুতে ফুল ফুটে আছে। গাছে না উঠলে পাড়া যাবে না। নাগালের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কুঁড়ি। গাছেই উঠতে যাচ্ছিল সে কিন্তু বুড়ি মানা করলে।

"কি করছিস ?"

"ওই ফুলগুলো পাড়ি।"

"না, গাছে উঠতে হবে না। পনর দিন পরে বিয়ে, মেয়ে গাছে উঠতে যাচ্ছেন।"

"উঠলেই বা।"

"পড়ে গিয়ে হাত পা যদি ভাঙে তাহলে ভিকুর সঙ্গে আর বিয়ে হবে না তোমার। মুংলির বাপ মা ওৎ পেতে আছে।"

বলিষ্ঠ গঠন ভিকুর চেহারাটা ফুটে উঠল সুখীয়ার মানস-পটে। গাছে ওঠবার চেষ্টা সে আর করলে না।

"তুমি আবার কবে এদিকে আসবে দিদিমা।"

"দিন সাতেক পরে।"

"আমি তখন কিন্তু আসব তোমার সঙ্গে।"

"আসতেই হবে, অত বড় বোঝা আমি বইতে পারব না।"

"আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বোঝা বইবে কে।"

"তুমি আর ভিকু দু'জনে।"

হেসে উঠল সুখীয়া।

সমস্ত কথাগুলি মন দিয়ে শুনলে তারা।

২

দখিন হাওয়া এসে খোসামোদ করে গেল অনেক। আমোলই দিলে না তারা। তারপর এল একদল ভ্রমর।

"ঘোমটা খুলবে না নাকি তোমরা।"

তারা নিরুত্তর। অনেকক্ষণ ধরে গুঞ্জন করলে ভোমরারা। কিচ্ছু ফল হলো না। এক ঝলক রোদ এসে পড়ল তাদের মুখে। সূর্যকিরণের আতপ্ত আহ্বানে আকুল হয়ে উঠল তাদের অন্তর, কিন্তু তবু তারা টলল না। মুখ টিপে চুপ করে বসে রইল জেদ করে যেন। প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, "তোদের মতলব কি বল দিকি। বসন্ত যে বয়ে গেল—"

সাড়াই দিলে না তারা।

একবার নয়, বারবার চেষ্টা করলে সবাই। আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।

কিন্তু তবু তারা মুখ টিপে বসে রইল চুপ করে।

সাতদিন পরে।

সুখীয়া ভিকুর দিকে চেয়ে বললে, "দিদিমা আসে নি ভালই হয়েছে, না ?"

"দিদিমা এলে কি আমি আসতে পারতাম।"

"দিদিমার জন্যে কিন্তু বড এক বোঝা কাঠ নিয়ে যেতে হবে—"

"ওই গাছটায় উঠে কিছু কাঠ ভাঙি তাহলে।"

"সাবধানে উঠো।"

ভিকু চলে গেল।

সুখীয়া পলাশ গাছটার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"ওমা, এ কুঁড়িগুলো ফোটেনি এখনও।"

তবু কি মনে করে সেইগুলোকেই তুলে খোঁপায় সে পরে নিল।

সুখীয়া কাঠের বোঝা মাথায় দিয়ে চলেছিল। তার পিছু পিছু ভিকু চলেছিল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ ভিকু বলে উঠল—"তোমার খোঁপায় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে কিন্তু!"

"কি।"

"পলাশফুলের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠেছে।"

"তোমার বাঁশীর সুর শুনে বোধ হয়।"

মুচকি হেসে ভিকু ফুঁ দিল আবার বাঁশীতে। ফুল ফোটার আসল কারণটা কিন্তু কেউ জানল না।

অদ্ভুত বার্তা

আপনারা কেহ শুনিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু কল্পনাবেতার-যোগে আমি একটি অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়াছি। বার্তাটি এই :

দেবী বীণাপাণি সম্প্রতি নিয়ম করিয়াছেন যে, তিনিও ভোট লইয়া ঠিক করিবেন, কোন্ পাঁচটি অক্ষর বা যুক্তাক্ষর কাব্য-রচনায় প্রাধান্য লাভ করিবে। যাহারা ভোটে জয় লাভ করিবে, কবিদের চেতনায় তাহাদেরই রূপ এবং ধ্বনি বারংবার প্রতিফলিত করিয়া দেবী কবিগণকে প্ররোচিত করিবেন, যাহাতে উক্ত অক্ষর বা যুক্তাক্ষরগুলি তাঁহার নিজ নিজ কাব্যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করেন।

পঞ্চাননকে তুষ্ট করিবার জন্যই নাকি পাঁচের প্রতি দেবীর এই পক্ষপাত। অধিকাংশ অক্ষরই রুষ্ট হইয়া ভোট-যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মাত্র আটজন এই দ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন। ভোটদাতা দেবগণের নিকট প্রত্যেকে স্বকীয় যোগ্যতার

প্রমাণ-স্বরূপ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত কল্পনা বেতার যোগে আমি শ্রবণ করিয়াছি।

প্রার্থী 'ন্দ' বলিতেছিলেন : "হে দেবগণ, আমি মকরন্দে আছি, চন্দ্রে আছি, ইন্দ্রে আছি, ছন্দে আছি। মন্দের মধ্যেও আমাকে থাকিতে হইয়াছে, কারণ, আমি জানি, মন্দের মধ্যেও ভাল আছে। দ্বন্দ্ব মানে যাঁহারা কেবলমাত্র কলহ বোঝেন, আমি তাঁহাদের দলে নই। যে দ্বন্দ্ব অর্থে যুগল-মিলন, আমি সেই দ্বন্দ্বের নির্মাতা। একজন ভোটপ্রার্থী 'খন্দ' নামক প্রাকৃত কথার উল্লেখ করিয়া আমাকে এবং প্রিয়বন্ধু 'খ'কে ব্যঙ্গ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। আমি 'খন্দ' রূপে যে প্রতি পথিককে সাবধানতা শিক্ষা দিতেছি, তাহা উক্ত সমালোচক মহাশয়ের মাথায় আসে নাই। এ বিষয়ে আমি তর্ক করিতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, নন্দনে, চন্দনে, আনন্দে, বন্দনায় আমি চিরকাল আপনাদেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি। আপনারা যদি আমাকে নির্বাচন নাও করেন, তাহা হইলেও করিব। বিশাল শব্দ-সাম্রাজ্যের বহু স্থানে কুন্দেন্দুবরণ্যে বাগ্‌দেবী আমাকে বহুভাবে নিয়োজিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদ-মানসে আমি আজ এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া আপনাদের সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইহার বেশী আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

অঃ, অঃ, অঃ, অঃ—বিসর্গের দল হাসিয়া উঠিল।

তাহার পর সুরু করিলেন প্রার্থী 'গ' : "হে অমরবৃন্দ, বহুস্থানেই আমার সাক্ষাৎ আপনারা নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। আমার বহুবিস্তৃত আভিধানিক রূপ বিস্ফারিত করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাই না। শুধু বলিতে চাই, আমি গণেশে আছি, গগনে আছি, গতিতে আছি, গহনে আছি, গজে আছি—"

কে একজন বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "তুমি গর্দভে আছ, গোঁজামিলে আছ, গাঁটকাটায় আছ, গাঁজাতে আছ, গাফিলতিতে আছ, গাড্ডায় আছ,—তোমার কীর্তি অনেক।"

প্রার্থী 'গ' থতমত খাইয়া থামিয়া গেলেন মনে হইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন : "গল্পে, গীতে গঙ্গায়, গোবিন্দে, সাগরে, গিরিতে, গুরুতে, গরিষ্ঠে, গুণপনায় গৌরবে আমার পরিচয় যাঁহারা পান না—"

বিরুদ্ধবাদী সেই লোকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "তোমার আসল পরিচয় পাই গোক্ষুরে, গলগণ্ডে, গলগ্রহে—"

প্রার্থী 'গ' চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন : "গরুড়, ভগবান, ভগবতী গান্ধারী, গন্ধর্বতে কি আমি নাই?"

"গাবা, গোবর এবং গয়াতেও আছ—"

"মহাত্মা গান্ধী গার্গী, গ্যালিলিও'র কীর্তির সহিত কি আমি জড়িত নই ?"

"ছাগল, পাগল এবং বগলের সহিতও তুমি জড়িত—"

তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। তাহার পর সব থামিয়া গেল হঠাৎ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর শোনা গেল, ক্ষীণকণ্ঠে কে যেন বলিতেছেন : "হে অন্তর্যামিগণ আপনারা তো সব জানেন। আপনাদের নিকট বাগ্‌বিস্তার করা ধৃষ্টতা মাত্র। একটি কথা শুধু আপনাদের মনে রাখিতে অনুরোধ করিতেছি, আমি 'ধ' নই, আমি 'ধী'। যতদিন 'ধ' ছিলাম, ততদিন আমাকে 'ধর ধর' 'ধড় ফড়' 'ধক ধক' 'ধড়িবাজ' 'ধকল' ইত্যাদি অভব্য কথাগুলি সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারি নাই। 'উ' ও 'ঊ'—ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াও শান্তি পাইলাম না। ধূর্ত, ধূসর, ধূম, ধূলি, ধুয়াতেই নিবদ্ধ থাকিয়া আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেদনায় ধুক ধুক করিতে লাগিল। এখন আমি 'ঈ' কে বরণ করিয়া 'ধী' হইয়াছি। শান্তি পাইয়াছি। ধন্য হইয়াছি। হে সুধীবর্গ, এই কথাটিই শুধু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আমি 'ধ' নয় 'ধী'—"

বিপক্ষ দলের একজন বলিল : "সাধু, সাধু। আপনি যে বহুবার বিভিন্ন বিভিন্ন স্বরবর্ণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অবশেষে তাহাদের ত্যাগ করিয়াছেন, এ সংবাদে আপনার প্রণয়-নিষ্ঠার পরিচয় পাইলাম। যাঁহাকে স্বয়ং বীণাপাণি ধৈবত স্থান দিয়াছেন, ধামরে উদাত্ত করিয়াছেন, ধেনুরূপে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিয়া যিনি গোকুলে আজও অমর হইয়া আছেন, তাঁহার 'ঈ'-প্রীতি সত্যই বিস্ময়কর। হে ধৃষ্ঠ ধুরন্ধর, তোমাকে ধিক।"

'ধী' ইহার কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

চতুর্দিকে পুনরায় নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

তাহার পর শুনিলাম, কে একজন বলিয়া উঠিলেন : "চুপ চুপ। প্রার্থী 'জ' উঠিয়াছেন।"

প্রার্থী 'জ'য়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "আমার কোনও স্বরবর্ণের প্রতি পক্ষপাত নাই। আমি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে ভালবাসি। তাই জগৎ জুড়িয়া আমি আছি। জন্মে, জীবনে, জয়ে পরাজয়ে, জলদে জরদে, জনতায় জঙ্গলে, জপে, জঙ্গমে, জনকে, জননীতে, জনার্দনে—সর্বত্র আমি। কাহারও প্রতি আমার পক্ষপাত নাই। জমদগ্নি, জাহাঙ্গীর, জরাসন্ধ, জয়চন্দ্র, জয়পাল, জয়ন্ত, জয়দেব, জটায়ু, জাহ্নবী, জুলিয়াস্‌-সিজার, জর্জ—"

প্রার্থী 'জ' হয়তো আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু বিপক্ষ দল সে সুযোগ

তাঁহাকে দিল না। একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল: "বাকী তালিকাটা আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছি, আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না। আপনি জটিলায়, জটিলতায়, জঞ্জালে, জতুগৃহে, জড়তায়, জরায়, জারজে, জয়দ্রথে, জালায়, জড়ুলে, জঘনে, জল-পড়ায়, জাঁকজমকে—কোথায় নাই? আপনি সর্বত্র গজগজ করিতেছেন, জাহান্নামকেও আপনি ত্যাগ করেন নাই। হে সুবিধাবাদী, আপনাকে নমস্কার।"

সুরবৃন্দের হাস্য-কলরবে সভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর আর একজন প্রার্থী উঠিলেন। তিনি বলিলেন: "আমি 'বৃ'। আমি 'ব' নই, 'ঋ'-ও নই। উভয়ের সংযোগে আমি বৃ। আমার আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ। বৃহস্পতি, বৃকোদর, বৃষভানু, বৃন্দাবন, বৃষাঙ্ক সৃষ্টি করিয়াই আমি চরিতার্থ। আমার আর কিছু বলিবার নাই।"

বিপক্ষ দলের একটি ছোকরা বলিল: "আপনার বৃহন্নলা-রূপটিও চমৎকার।"

সভায় বিশেষ গোলমাল হইল না।

তাহার পর উঠিলেন প্রার্থী 'র': "হে সুরকুল, আমি আপনাদেরই অঙ্গ—"

বিপক্ষ দল বলিয়া উঠিল: "আপনি অসুরেরও অঙ্গ—"

"আমি রবিতে আছি, রাকায় আছি—"

"রাহুতেও আছেন—"

"আমি রাগ-রাগিণীতে—"

"রাসভই তাহার প্রমাণ—"

"রাম শব্দ নির্মাণ করিয়া আমি ধন্য—"

"রাবণ নির্মাণ করিযাও তো আপনি ধন্য—"

"এমনভাবে বাধা দেওয়াটা কি ভদ্রতা-সঙ্গত?"

"ভোট চাহিতে আসিয়াছেন, ন্যায্য সমালোচনা শুনিতে হইবে বৈকি—"

"আমি আব কিছু বলিব না, আপনারা যাহা খুশী করুন্।"

প্রার্থী 'র' ক্রোধভরে বসিয়া পডিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী 'ব' শুরু করিয়া দিলেন: "আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। হে দেবতাগণ, আমার স্বরূপ আপনাদের অবিদিত নাই। অর্বাচীন-মহলে আত্মপ্রশংসা করিয়া আমি নিজেকে অবনমিত করিতে চাই না—"

প্রার্থী 'ব' বসিয়া পড়িলেন।

সভায় তুমুল কোলাহল, হাস্যকলরব, তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। তাহার পর সমস্ত নীরব হইয়া গেল।

কল্পনা-বেতার-যোগে কিছুক্ষণ পরে ঘোষিত হইল : "জ য় দ গ ব নির্বাচিত হন নাই। শুধু তাই নয়, ইঁহাদের কেহই একটি ভোটও পান নাই।"

কল্পনা-বেতার কিছুক্ষণ পরে আর একটি সংবাদ ঘোষণা করিল : "বলরামের অনুরোধে 'ব' এবং রতি দেবীর অনুরোধে 'র' বীণাপাণির নমিনেশন পাইয়াছেন। সুতরাং ধী ব র র ন্দ অবশেষে নির্বাচিত হইলেন।"

কপাল

মাছ মাংসের স্বাদ প্রায় ভুলে গেছি। কিনে খাবার সামর্থ্য নেই। হঠাৎ নজরে পড়ল পাশের বাড়ির আঁস্তাকুড়ে অনেক পাখীর পালক প'ড়ে রয়েছে। মনে হল দাস মশায় মুর্গি খাচ্ছেন না কি? মুর্গির যা দাম আজকাল আমার তো দর করতে পর্যন্ত সাহস হয় না। দাস মহাশয়ও তো আমারই মতন ছাঁপোষা গৃহস্থ, হঠাৎ মুর্গি খাবার শখ হল কেন? এদিকে তো দেনায় ডুবে আছেন শুনতে পাই। জামাই এসেছিল না কি? প্রলুব্ধ নয়নে পালকগুলির দিকে চেয়ে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলাম এমন সময় দাস মশায় স্বয়ং বেরিয়ে এলেন।

"কি দাস মশায়, একা একাই মুর্গি খাচ্ছেন না কি?"

"মুর্গি! মন্তর নেওয়ার পর থেকে আমি তো আর মুর্গি খাই না।"

"ওগুলো কি তাহলে—"

পালকগুলো দেখালাম।

"ওগুলো পায়রার পালক—"

"পায়রার দাম আজকাল কত করে?"

"আমি তো কিনে খাই নি।"

"তবে—"

"আমার ওই খোলার ঘরটার পরলে এক জোড়া গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছিল। কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। কিছুদিন পরে চিঁ চিঁ শব্দ শুনে বুঝলাম বাচ্চা পেড়েছে। মনে হল ওদের যদি বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে তাহলে তো টেকা যাবে না। গিন্নির ছুঁচি বাই, একটি ঠিকে ঝি মাত্র সম্বল। ভাবলাম সাবড়ে দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। মাছ মাংস কিনে খাবার তো আর সামর্থ নেই। রাত্রে অফিস থেকে ফিরে এসে চেয়ারের উপর টুল চড়িয়ে ধরলাম পায়রাগুলোকে। একটা পালিয়ে গেল। তিনটেকে ধরতে পারলাম। চমৎকার লাগল অনেক দিন

পরে। একটা পালিয়ে গেল বলে আফশোষ হতে লাগল খুব। কিন্তু দিন দুই পরেই আনন্দিত হলাম আবার। মাদি পায়রাটা পালিয়েছিল, বুঝলেন, দেখি সে আর একটি পুরুষ জুটিয়ে এনে ঠিক ওইখানটিতেই আবার ঘর বেঁধেছে। আবার কিছুদিন পরে বাচ্চা হল, আবার সেই বাচ্চা দুটিকে এবং পুরুষ পায়রাটিকে খেলাম আমরা। মাদিটাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলাম। কয়েক দিন পরে দেখি আবার সে একটি সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে। আবার তাদের বাচ্চা হল, আবার খেলাম। এই ভাবেই চলছে।"

"আমিও এক জোড়া পুষব না কি।"

"পুষুন না। যা দিনকাল পড়েছে, চারিদিকে নানাভাবে টোপ না ফেললে বাঁচা যাবে না—"

কথাটা মনে লাগল। সেই দিনই নগদ পৌনে তিন টাকা খরচ করে কিনে আনলাম এক জোড়া পায়রা। আরও টাকা চারেক খরচ করে তাদের থাকবার টং তৈরি করলাম। যথাসময়ে বাচ্চাও হল। দাস মশায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে যথারীতি সেগুলির সৎকারও করলাম।…

…পরের দিন টং খুলে দেখি মাদি পায়রাট চুপ করে বসে আছে। তাড়া দিলাম, তবু সে খোপ থেকে বেরুল না। গিন্নি বললেন, "ওকে বিরক্ত করছ কেন, খানিকক্ষণ পরে আপনিই বেরুবে।" পায়রাটা কিন্তু বেরুলই না। দু'দিন না খেয়ে চুপ করে বসে রইল। তৃতীয় দিনে মরে গেল। দাস মশায়কে গিয়ে বললাম—"একি হল মশায়, পায়রাটা যে মরে গেল—"

"কি রকম।"

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বললাম। শুনে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দাস মশাই। বললেন, "ও সতী পায়রা। খুব রেয়ার জিনিস। আপনি ভাগ্যবান লোক তাই আপনি পেয়েছিলেন, গঙ্গায় দিয়ে আসুন। চলুন দেখে আসি, দর্শনেও পুণ্য—"

দাস মশায় মরা পায়রাটাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। আমরাও করলাম। তারপর তাকে ফুল চন্দন দিয়ে নতুন কাপড় জড়িয়ে গঙ্গার ঘাটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। সতী পায়রার সৎকারের জন্যও প্রায় টাকা খানেক খরচ হয়ে গেল। সমস্ত পথটা নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতেই গেলাম। আশ্চর্য কপাল।

ঘুঁটে

সেদিন বিশুদের সান্ধ্য আড্ডায় একটি গোল প্যাকেট হাতে করে ভাদুড়ি মশাই ঢুকলেন।

"পাঁপর কিনলেন না কি ভাদুড়ি মশাই। বেশ জমিয়ে বড়দিন করবেন বলুন।"

সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

"না ভাই পাঁপর নয়।"

"তবে কি কেক?"

"কেক বলতে পার, কিন্তু তোমরা যে কেকের কথা ভাবছ তা নয়। এই দেখ।"

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে ভাদুড়ি মশাই যা দেখালেন তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। ঘুঁটে একখানা।

"অমন যত্ন করে কাগজে মুড়ে ঘুঁটে নিয়ে যাচ্ছেন মানে?"

"রাস্তায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিলাম। হাতে একখানা কাগজ ছিল, মুড়ে নিলাম তা দিয়ে। এতে দোষটা কি হয়েছে! হয় তো এর থেকেই আমার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে, কিছু বলা যায় কি।"

হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

"হাসছ হাস, হাসতে মানা নেই। কিন্তু এটা জেনে রেখ গোবর থেকে এই ঘুঁটে হয়েছে এবং মনে রেখ কংগ্রেসের বাক্সে গরুর ছবি আছে।"

"ঠিক বলেছেন ভাদুড়ি দা, ঘুঁটেকেই সম্বল করতে হবে এবার।"

নবীন অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস বললেন, 'ভাদুড়ি মশাই ঘুঁটে খেয়ে এসেছেন না কি কিছু?"

ভাদুড়ি জবাব দিলেন না তার কথায়। স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললেন—"ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় তখন কোথা দিয়ে কি করে যে যোগাযোগ হয়ে যায় হিসেব করে আগে থাকতে তা কেউ বলতে পারে না। মিষ্টার ভৌমিকের গল্পটা জান না তোমরা নিশ্চয়, জানবার কথাও নয়—"

বিশু বললে, "বলুন না শুনি—"

"শুনলে বিশ্বাস করবে না।"

"তবু বলুন।"

"আজ যিনি মিষ্টার ভৌমিক নামে সুপরিচিত, যাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করবার জন্যে বহু বেকার লোক আজ উদ্‌গ্রীব, ক্রাইসলার গাড়ি ছাড়া যিনি চড়েন না, কোলকাতা শহরে আট দশখানা বাড়ির মালিক হয়ে, লোহালক্কড়ের কারবারে ফেঁপে উঠে, কোলিয়ারি জমিদারি মিল কিনে যিনি আজ বহুলোকের ঈর্ষা-মিশ্রিত শ্রদ্ধা সম্ভ্রম অর্জন করেছেন তার আসল নাম কি জান ? গজু। অনেকে গজাও বলত। উপাধি যে ভৌমিক এ খবর তো কেউ রাখতই না, গজু বা গজা যে কিসের অপভ্রংশ এও জানত না অনেকে। আমি এখনও জানি না। গজেন্দ্র, গজানন, গজেশ বা গজপতি ওই রকম কিছু একটা হবে। সব কিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল গজু বা গজার আড়ালে। মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিল গজু। মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ ছিল না তার। মামার বাড়িতে সে সকলের উপদেশ শুনত আর সকলের বকুনি খেত। এরই ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়াও সে করেছিল কিছুটা অবশ্য। আই. এ. না বি. এ. কি একটা পাশও যেন করেছিল মনে হচ্ছে। আর একটি বিশেষত্ব ছিল গজুর। গজু ডিটেকটিভ নভেলের ভক্ত ছিল খুব। কপাটটা বন্ধ করে দাও তো হে, বেশ শীত পড়েছে আজ। চা টা খাওয়াবে না কি কেউ—?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়—"

ভাদুড়ি মশাই বিশুদের ক্লাবের অনারারি মেম্বার। চাঁদা দেন না, নিয়মিত আসেনও না। মাঝে মাঝে এসে আড্ডা জমিয়ে যান কেবল।

চা এসে পড়ল। ভাদুড়ি মশাই ছিন্ন লুইটি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে চায়ে চুমুক দিলেন। অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন আবার।

"মিষ্টার ভৌমিক ? কোথাকার মিষ্টার ভৌমিক ? কখনও নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না তো ?"

ভাদুড়ি মশাই হাসিভরা চোখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ। তাঁর মনে যে উষ্মা জেগেছে তা বোঝা গেল তাঁর কথা থেকে।

"তুমি দুনিয়ার ক'টা লোকেরই বা নাম শুনেছ ? মিষ্টার ভৌমিকের নাম তোমার তো শোনবার কথাও নয়। একটা ওঁছা কলেজে প্রফেসারি কর তুমি, তিনজনের সঙ্গে শেয়ার করে বাস কর গলির গলি তস্য গলিতে একটা ঘুপচি ফ্ল্যাটে। তুমি মিষ্টার ভৌমিকের নাম শুনবে কি করে ? যা বলছি শুনে যাও, ফ্যাচাং তুলো না—"

চাটি শেষ করে ভাদুড়ি মশাই জামার হাতা দিয়েই মুখটি মুছে ফেললেন। তারপর শুরু করলেন।

"এ হেন গজুর যে কোনকালে কিছু হবে এ আশা কেউ করে নি। আমি কিন্তু

একটা জিনিস মার্ক করেছিলুম ছোকরা ডিটেকটিভ নভেলগুলো বেশ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। তার সঙ্গে আলোচনা করে প্রত্যেক বারই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হত—বাঃ ছোকরা ঠিক পয়েন্টগুলি ধরেছে তো—। ওই ডিটেকটিভ নভেলই ওর উন্নতির কারণ হল শেষকালে—"

পকেট থেকে একটি অর্ধ-দগ্ধ বিড়ি বার করে ধরালেন সেটি ভাদুড়ি মশাই।

"ডিটেকটিভ নভেল উন্নতির কারণ হল? বলেন কি।"

"হ্যাঁ। একদিন সকালে রহমনপুরের জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে গজুর চোখে পড়ল মরা কাক পড়ে রয়েছে একটা। মরা কাক তো এমন কতই পড়ে থাকে, প্রথম দিন তেমন গ্রাহ্য করে নি সে। কিন্তু উপর্যুপরি তিন চারদিন যখন সে জমিদার বাড়ির আশেপাশে মরা কাক দেখতে পেলে তখন তার মনে হল নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ডিটেকটিভ নভেল-পড়া তীক্ষ্ণ মন নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাড়ির চারিদিকে। হঠাৎ নজরে পড়ল একটা কাক গাছের ডালে বসে মরা ইঁদুর খাচ্ছে একটা। তাড়া দিতেই কাকটা উড়ে গেল, ইঁদুরটা পড়ে গেল তার মুখ থেকে। ইঁদুরটি তুলে নিলে গজু। এক ডাক্তারের সঙ্গে ভাব ছিল তার। ইঁদুরটি তাকে পরীক্ষা করতে দিল। ইঁদুরের ভেতর থেকে কি বেরুল জান? আর্সেনিক। খোঁজ খবর নিয়ে অনেকে ব্যাপার বেরুল তার পর। জমিদারের এক চাকর জমিদারকে পয়জন করবার জন্যে সন্দেশের সঙ্গে আর্সেনিকের বিষ মিশিয়েছিল। কিন্তু একটি জরুরি কাজে জমিদারকে বাইরে চলে যেতে হয়েছিল বলে সে সন্দেশ তাঁর আর খাওয়া হয়নি। চাকরটা সন্দেশগুলো ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল জমিদার ফিরে এলে তাকে খাওয়াবে আবার। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে। জমিদার সাতদিন ফিরলেনই না। ইঁদুরেরা সেই সন্দেশ খেতে লাগল আর মরতে লাগল। মরা ইঁদুর খেলে কাকরা, তারাও মল এবং তা পড়ল গজুর চোখে। কোথা থেকে কি হল দেখ।"

"তারপর।"

"সব শুনে জমিদার এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে গজুর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েই দিয়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর বিশাল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ওই মেয়ে…"

"সত্যি?"

ভাদুড়ি মশাইয়ের যা স্বভাব হাসিভরা চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সত্যি। গজু তারপর থেকে ক্রমশ উন্নতি করেছে। বিষয় অনেক বাড়িয়েছে। এখন সে মিষ্টার ভৌমিক। ফেমাস মিষ্টার ভৌমিক—"

"কোথায় থাকেন তিনি বলুন তো—"

অধ্যাপক তরুণ বিশ্বাস প্রশ্ন করলেন।

"কেন? তার সঙ্গে দেখা করবে যা-তে একটা হিল্লে হয়ে যায়? তার নাগাল পাওয়া অত সহজ নয় ভায়া। আচ্ছা উঠি—"

মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন ভাদুড়ি। মিষ্টার ভৌমিক কোথায় থাকেন তা বলে গেলেন না, কারণ তা বলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। গল্প বলবার সময় যদিও তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন মিষ্টার ভৌমিক তাঁর বহুকালের বন্ধু, কিন্তু আসলে তিনিও ভৌমিককে চিনতেন না। আর গল্পটা শুনেছিলেন বন্ধু গণেশের কাছে। গণেশ শুনেছিল ট্রেনে এক যাত্রীর মুখে।

অন্ধকার গলি দিয়ে যেতে যেতে ভাদুড়ি ভাবতে লাগলেন—ঘুঁটে থেকে কি ক্লু পাওয়া যেতে পারে।

দুই রকম স্বাধীনতা

কিছুই ভাল লাগছিল না, তাই বাগানটায় গিয়ে বসলাম। অভাবগ্রস্ত হয়েছি তাই আর বাগানের সে শ্রী নেই। তবু গিয়ে বসলাম একটু। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার লেডি হিলিংডনে ছোট একটি ফুল ফুটেছে। আশ্চর্য হলাম। মালিকে অনেক দিন আগেই বিদায় দিতে হয়েছে! গাছের একটুও যত্ন হয় নি, সার তো দূরের কথা—জল পর্যন্ত পড়ে নি। আগাছা গজিয়েছে চারদিকে, তবু ফুল ফুটেছে একটি। আরও আশ্চর্য হলাম ফুলটি কথা কইল।

"নমস্কার, অনেকদিন পরে দেখা হল—"

নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

"আপনার শরীর খারাপ না কি? চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।"

বিস্ময় কেটে গেল। মনের কথা বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে।

"চেহারা ভাল থাকবে কি করে বল, খেতে পাই না।"

"কেন?"

"স্বাধীনতা পেয়েছি।"

লেডি হিলিংডন সবিস্ময়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"আপনার কাপড় চোপড়ের অবস্থাও শোচনীয় দেখছি।"

"হ্যাঁ, তারও ওই কারণ—স্বাধীনতা।"

"স্বাধীনতা ? কি আশ্চর্য। আমিও তো স্বাধীন, কিন্তু আমার তো এমন দুর্দশা হয় নি। আপনার মালি যখন তদারক করত তখন একটু বেশি আরামে থাকতাম বটে, কিন্তু এখনও খুব যে খারাপ আছি তা নয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন ফুল ফুটিয়েছি। হয়তো একটু ছোট কিন্তু তবু ফুল তো—"

চুপ করে রইলাম।

লেডি হিলিংডন আবার বললে—"সত্যি আপনাকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কি করছেন ?"

"মিটিং করছি, কাগজে লেখালেখি করছি—" আমার কথা লেডি হিলিংডন বোধ হয় বুঝতে পারলে না ঠিক। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—

"স্বাধীনতা আপনার কষ্টের কারণ কি করে হল ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো স্বাধীন, আমার কোনও কষ্টই নেই।"

বললাম—"তুমি ফুল, আমি মানুষ। আমার স্বাধীনতা মানে—"

কেমন যেন গুলিয়ে ফেললাম। ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে যে সব বড় বড় বই পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করেছিলাম তার একটি বর্ণ মনে পড়ল না। অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে বললাম—"আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না। আমার যে কি অসহ্য কষ্ট—"

"আমি বুঝেছি।"

পাশের টব থেকে কথা কয়ে উঠল মৃতপ্রায় ক্রিসানথিমাম।

"লেডি হিলিংডন মাটিকে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মালি জল না দিলেও ওর শিকড় মাটির রস আহরণ করে নিতে পারে। আমি আছি টবে, তোমার মালি জল না দিলে আমি বাঁচতে পারি না। আমার শিকড় টবের গায়ে আটকে যায়, মাটি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তোমারও বন্ধু সেই অবস্থা। এক অদৃশ্য টবের উপর তুমি রয়েছ, বাইরে থেকে খাবার আসবে তবে তুমি বাঁচবে। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। আমরা উভয়েই সগোত্র। বাইরে থেকে রস এলে তবে আমরা ফুল ফোটাতে পারি। না এলে মরণ ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। লেডি হিলিংডনের স্বাধীনতা আর তোমার আমার স্বাধীনতা এক নয়।"

চুপ করে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। তারপর ক্রিসানথিমামের টবটা ভেঙে তাকে মাটিতেই পুঁতে দিলাম।

লেডি হিলিংডন হেসে বললে—"এবার আপনার টবটা ভাঙবে কবে ?"

"কি জানি !"

বহিরঙ্গ

১

বহুকালপূর্বে হিমালয় গুহাবাসী একজন লামা একটি টিয়াপাখীর বাচ্চা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। পাখীটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনি লালন পালন করেন। পাখীটি যখন বড় হ'ল তখন লামা তাকে সম্বোধন করে বললেন, "বৎস শুক, এবার তুমি বড় হয়েছ, এবার চরে' খাও গিয়ে। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, তোমাকে নিয়ে আর কত দিন বিব্রত হব?"

শুক জুলজুল করে লামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লামা বললেন, "তোমাকে মানুষের ভাষায় কথা বলবার শক্তি দিচ্ছি, তুমি মনোভাব ব্যক্ত কর।"

শুক তখন বললে, "প্রভু, কি করে চরে' খেতে হয় তা তো জানি না। আপনি খাবার দিয়েছেন আমি খেয়েছি। এখন—"

বৃদ্ধ লামা শুকপক্ষীর অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম করে বললেন, "তুমি তাহলে মনুষ্য সমাজে যাও। সেখানে অনেকে শুককে পিঞ্জরাবদ্ধ করে আনন্দলাভ করেন শুনেছি। যদি তাঁদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পার তোমার আহারের অভাব হবে না।"

শুক বললে, "আমার কি এমন গুণ আছে প্রভু যে আমি এমন মহানুভব ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারব।"

বৃদ্ধ লামা দেখলেন সত্যই বেচারা বিপন্ন। সত্যই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো বিশেষ কোনও গুণ তো ওর নেই। অনেকক্ষণ ভেবে তিনি তখন বললেন "আচ্ছা, তোমাকে তাহলে গোটা দুই বুলি শিখিয়ে দিচ্ছি। সম্ভবত এতেই তোমার কাজ হবে—"

"কি বুলি প্রভু।"

"এস, কানে কানে বলে দি।"

বুলি দুটি প্রথমে কর্ণস্থ এবং পরে কণ্ঠস্থ করে শুকপক্ষী লামাকে বললে, "বুলি দুটি কোথায় কখন আওড়াব—" লামা বললেন, "সমস্ত বলে দিচ্ছি। এই হিমালয়ের পাদদেশে ভারতবর্ষ নামে এক বিশাল দেশ আছে। খুব ছেলেবেলায় সে দেশে আমি একবার গিয়েছিলাম। প্রধানত দু'রকম জাতের লোক সে দেশে বাস করে। প্রথম বুলিটি বললে এক জাতের লোকেরা তোমাকে সমাদর করবে, দ্বিতীয় বুলিটি তোমাকে প্রিয় করবে আর এক জাতের লোকের কাছে। যখন যে রকম সুবিধা বুঝবে আওড়াবে।"

শুক বললে, "কে কোন্ জাতের লোক আমি চিনব কি করে।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। মন দিয়ে শোন।"

লামা তাঁর বাল্যকালের ধারণা অনুযায়ী বলতে লাগলেন। শুক নিবিষ্টচিত্তে শুনতে লাগল।

কিছুকাল পরে শুক পক্ষীটি উড়তে উড়তে ভারতভূমিতে হাজির হল এসে।

অনেক ঘুরে ঘুরেও কে কোন্ জাতের লোক তা সে নির্ণয় করতে পারল না কিন্তু। অধিকাংশ লোকই হাফপ্যান্ট বা প্যান্ট পরা, মাথায় শোলার হ্যাট বা গান্ধি টুপি, কিংবা ফেজ কিংবা পাগড়ি...লামার বর্ণনার সঙ্গে একটা মেলে তো আর একটা মেলে না।

অনেক ঘুরে ঘুরে সে শেষে মনঃস্থির করে ফেললে। বাড়ির চারদিকে মুরগী চরছে, পেঁয়াজের গন্ধ উঠছে রান্নাঘর থেকে, দাড়িওলা গৃহস্বামী চেক চেক লুঙ্গী পরে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন, বাড়ীর মেয়েরা সালোয়ার পরে ঘুরছে। শুকপাখী নেমে পড়ল চালের উপর এবং ছেলেরা যেখানে খেলছিল সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

"ওমা কি সুন্দর একটা টিয়া দেখ দেখ।"

রোমাঞ্চিত কলেবরে বসে রইল শুক। ছেলেরা হাততালি দিলে, ঢিল ছুঁড়লে, নানারকম শব্দ করলে, কিন্তু শুক নড়ল না।

"কারও পোষা টিয়া বোধ হয় তাহলে রে। ধরবি?"

"আমাদের একটা খাঁচাও তো আছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরতে পারলে পোষা যাবে।"

শুক ধরা দিলে। মহানন্দে ছেলে-মেয়েরা তাকে খাঁচায় পুরে খাবার খেতে দিতে লাগল। শুকেরও আনন্দ হল খুব। সে গদগদ কণ্ঠে লামার শেখানো বুলিটি আউড়ে দিলে—"আল্লা হো আকবর।"

"আ মোলো, এটা মোচরমানের বাড়ির পোষা পাখী নিশ্চয়। দূর কর দূর কর দূর কর—"

সত্যিই দূর করে দিলে তারা শুককে।

৩

অনেক ঘুরে ঘুরে শুক দ্বিতীয় আর একটি বাড়ি নির্বাচন করলে কিছুদিন পরে। গৃহস্বামীর গোঁফ দাড়ি কিছু নেই, গাই দুটিকে খুব যত্ন করেন, নিরামিষাশী, মাথায় সরু একটি টিকি, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি। বাড়ীতে ছেলে পিলেও নেই বাঁজা বাঁজি। শুকপক্ষী চালে বসতেই বউটি বললে—"ওগো, কার টিয়া পালিয়ে এসেছে বোধ হয়। আহা, ওকে দেখে আমাদের টিয়াটার কথা মনে পড়ছে। আসবার সময় সেটাকেও যদি আনতাম—"

"চুপ।"

তর্জন করে উঠলেন স্বামী।

"ধরব ওকে—"

শুকপক্ষী আব একটু নেমে এল।

"ওমা, নেমে আসছে।"

আর একটু নেমে এল সে।

"ওগো, হাতের কাছে এসে পড়ল যে। ধরব? একটা খাঁচা চাই যে—"

শুকের কাণ্ড দেখে গৃহস্বামীও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, "এতো আজব চিড়িযা দেখছি। ধরে ফেল। খাঁচার ব্যবস্থা একটা হবেই..."

শুকপক্ষী পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ হল। পুনরায় ছোলা ছাতু লঙ্কা পেঁপে দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করলে তাকে বউটি। পুনরায় গদগদ কণ্ঠে রোমাঞ্চিত কলেবরে শুকপক্ষী দ্বিতীয় বুলিটি আউড়ে দিলে, "রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—"

বুলি শুনে স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে। কি কাণ্ড।

স্বামী বললে, "থাক, এখন কিছু বোলো না।"

গভীর রাত্রে খাঁচার দ্বার খুলে গৃহস্বামী শুক পক্ষীকে বার করলেন এবং বললেন, "কাফের আমাকে রাধাকৃষ্ণ নাম শোনাতে এসেছ? ছদ্মবেশে না হয় হিন্দুস্থানে থাকতেই হয়েছে, তা বলে পাখীর স্পর্দ্ধা সহ্য করব ভেবেছ—"

এই বলে গলাটি মুচড়ে দিলেন।

৪

অশরীরী শুক লামার কাছে এসে হাজির হল আবার। সমস্ত বর্ণনা করে বললে—

"একি করলে প্রভু—"

"কি করলাম !"

"আপনার সেকেলে ধারণার প্যাঁচে পড়ে প্রাণটি যে গেল—"

লামা তাঁর মুণ্ডিত মস্তকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "আরে ভালই তো হল, আর পেটের চিন্তা থাকবে না। এইবার ক্রমশ নির্বাণ লাভ করবে।"

"নির্বাণ ? সে আবার কি।"

লামা কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি হাসলেন একটু।

শ্রীহনুমান সিং

১

গল্পটি পড়িবার পর যে লোকটিকে আপনারা হেয় মনে করিবেন তাহার স্বপক্ষে প্রথমেই কিছু ওকালতি করিতেছি। লোকটি প্রকৃতই ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি। প্রতিদিন দুই ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করেন। কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি দালাল, ডাক্তার, উকিল বা রাজনৈতিক নহেন, সুতরাং মিথ্যা কথা বলিবার প্রয়োজনও তাঁহার হয় না। তিনি সুদূর পল্লীগ্রামে চাষবাস লইয়া থাকেন। বেশ বড় গৃহস্থ। কোনপ্রকার বিলাসের ধার ধারেন না। নগ্ন পদ, নগ্ন গাত্র। বুক-পিঠ-ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঢাকিয়া রাখিবার কোন প্রয়াসই তিনি করেন নাই। শোনা যায় জীবনে কোনও অন্যায় কার্যও তিনি করেন নাই, কাহারও অন্যায় সহ্যও করেন নাই। কথিত আছে—একবার একটি তস্কর তাঁহার গাছের বেল পাড়িয়াছিল, তিনি নাকি দুই ক্রোশ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরেন এবং এমন মার মারেন যে লোকটা সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। কোনপ্রকার অনাচার তিনি সহ্য করেন না।

লক্ষ্মণপুর গ্রামে হনুমান সিংয়ের বাস। সে গ্রামে তাড়ি বা গাঁজার দোকান তো নাই-ই, প্রকাশ্যে বিড়ি সিগারেটও বিক্রয় হয় না। নানারকম লোক লক্ষ্মণপুর গ্রামে নানারকম নেশার ব্যবসা চালু করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। কারণ হনুমান সিং নিজে বলিষ্ঠ ব্যক্তি এবং গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তাঁহার মতের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণপুর গ্রামে কোনও কিছু করা অসম্ভব। এই নিরক্ষর গ্রাম্য হনুমান সিংকে আমিও শ্রদ্ধা করিতাম। এই খর্বাকৃতি লোকটির এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যে স্বতঃই সে সকলের মনে শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিত।

তাহাকে একদিন বলিয়াছিলাম, "সিংজি! অগর আপ ইংরেজি জানতে তো মিনিস্টর বন্ যাতে—"

"আরে রাম রাম। অংরেজি ম্লেচ্ছ-ভাষা হ্যায়, কোন দুখসে ম্লেচ্ছ-ভাষা শিখেঙ্গে। তুলসীদাসজীকি ভাষা জানতে হে', ওহি কাফি হ্যায় মেরে লিয়ে—"

'কাফি' এবং 'লিয়ে'ও যে ম্লেচ্ছ শব্দ তাহা আর সিংজিকে বলিলাম না। সিংজিকে চটাইয়া লাভ নাই। তাহার দৌলতেই আমার লক্ষণপুরের প্র্যাকটিস একচেটে।

সিংজির একটি মাত্র দোষ ছিল তিনি পট করিয়া চটিয়া যাইতেন এবং চটিয়া গেলে তাঁহার জ্ঞান থাকিত না।

২

সেদিন ডিসপেন্সারিতে আসিয়াই দেখিলাম সিংজি পরম আরামে আমার ডিসপেন্সারির বারান্দায় বসিয়া আছেন। অর্থাৎ একটি গামছাকে বেড় দিয়া কোমর এবং জানুদ্বয়কে একসঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছেন। সিংজি চেয়ারে বসা পছন্দ করেন না। আমরা চেয়ারে বসিয়া যে সুখ পাই সিংজি কোমর এবং হাঁটুকে গামছা-বন্ধনে কায়দা করিয়া লইয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ পাইয়া থাকেন। সিংজির পাশেই একটি শীর্ণকান্তি বালক বসিয়াছিল।

"মেরা বেটা হ্যায় ডাকটার সাহেব, দিন দিন শুখ্ যাতা হ্যায়, তবিয়ৎ লাগা কর দেখিয়ে তো ক্যা হুয়া—"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। প্রধান লক্ষণই দেখিলাম রক্তহীনতা। বালকের চোখ-মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। মনে হইল ইহার মলটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। কৃমির জন্য অনেক সময় এরূপ হয়। সিংজিকে সে কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "হাঁ হাঁ মলমূত্র খুন সব কুছ যাঁচ কর লিজিয়ে—"

প্রথমে মল পরীক্ষা করাই স্থির করিলাম।

৩

হুক্ ওয়ার্ম পাওয়া গেল।

হুক্ ওয়ার্মের জন্যই যে ছেলেটির ওই দুর্দশা তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

"কেয়া মিলা ডাকটার সাহেব"—সিংজি সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন।

"হুক্ ওয়ার্ম। রোগকা আসল্ কারণ ওহি হ্যায়। আব থোড়া ঠহর যাইয়ে,

মার খোড়িদের কে লিয়ে বাহার যাতা হুঁ'। ঘুরকে আ কর দাবাকা বন্দোবস্ত. কর দেঙ্গে।"

হনুমান সিং সবিস্ময়ে একবার আমার দিকে, একবার আমার মাইক্রোস্‌কোপের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটি কথা বলিলেন না। পরমুহূর্তেই তাঁহার ঝাঁকড়া ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং রোমাচ্ছন্ন নাসারন্ধ্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া গেল। আমার আর দাঁড়াইবার সময় ছিল না, একটি কলেরা রোগী আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম।

ফিরিয়াই অবিলম্বে বালকটির চিকিৎসা সুরু করিতে হইল। তাহার মাথা কাটিয়া গিয়াছিল, নাক দিয়া রক্তও পড়িতেছিল। সিংজি গর্জন করিতেছিলেন, "হুক্কা পি কর বেমারি বানাযে হে', শালা। মানা করতে করতে হায়রান হো গিয়া। কেত্‌না দফে তুমকো কহা থা—আরে শালা, হুক্কা মৎ পিও। হুক্কা মৎ পিও। ডাক্‌টার সাহেব যন্তর দেকে পকড লিহিন হুক্কা বেমারি হুয়া হ্যায়, তব্‌ ভি চালাকি? উল্লু কাঁহিকা—"

বুঝিলাম সিংজির ভুল ভাঙাইতে বেশ কিছু সময় লাগিবে, অগ্রে বালকটিকে রক্ষা করা দরকার।

তাহাই করিলাম।

হৃদয়রাজ্যের বিচার

১

হৃদয়রাজ্যে এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে এখনও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র চলিতেছে। বিবেক নামক যে রাজ্যটিকে আমরা সে রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়াছি তাঁহার চাল-চলন আচার-বিচার কোনও আধুনিক পদ্ধতি মানিয়া চলে না। অথচ তিনি আধুনিক সকল কথাই বেশ মন দিয়া শোনেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন। স্তালিনের স্বল্প-ভাষণের স্বপক্ষে মাথা নাড়েন, জনবুল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি চার্চিলকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না বরং তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা তাঁহার অন্তরে পুলকই সঞ্চার করে—কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় তিনি নিজের মতে নিজের পথে চলিতেছেন। জওহরলাল, স্তালিন বা চার্চিল তাঁহাকে স্বপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

...একবার ট্রেনে যাইতেছিলাম। একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। খদ্দরি স্যুট পরিহিত এক হোটেলওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। সসম্ভ্রমে বলিল,

ভারতীয় কৃষ্টি সর্বসমন্বয়-মূলক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে ইটালিয়ান পাচকের সাহায্যে মোচা দিয়া এক রকম অভিনব ফ্রেঞ্চ কাটলেট প্রস্তুত করাইয়াছে। দেশ-প্রেমিক মাত্রেরই উচিত তাহা একবার আস্বাদন করিয়া দেখা। হৃদয়রাজ্যের অধিপতি কথাগুলি স্মিতমুখে শুনিলেন, কিছু বলিলেন না। হোটেলওয়ালা চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল একজন নিখুঁত স্বদেশী মিষ্টান্ন-বিক্রেতা। মাথায় খদ্দরের পাগড়ি, গায়ে খদ্দরের আল্‌খাল্লা, পায়ে অনলঙ্কৃত মহিষ চর্মের পাদুকা। রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে সে যাহা নিবেদন করিল তাহার বাংলা সারমর্ম এই : স্বদেশী ইক্ষু হইতে প্রস্তুত স্বদেশী গুড় এবং স্বদেশী চাউল হইতে প্রস্তুত চৌরাট্টা (চাউল-চূর্ণ)—এই উভয়বস্তু'ক একত্রিত করিয়া সে নিখুঁত স্বদেশী সন্দেশ প্রস্তুত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিরই উচিত—ইত্যাদি। বিবেক হাসিমু.খ মাথা নাড়িলেন, কিন্তু সন্দেশ কিনিবার আদেশ দিলেন না। একটু পরে ক্ষুধা আসিয়া আবেদন জানাইল—কি খাইব ? বিবেক বলিলেন, কিছু কলা এবং পেয়ারা কিনিয়া ফেল। ক্ষুধা হাসিমুখে তাহাই করিল। ইহাও এক আশ্চর্য ব্যাপার। কাগজে দেখি আজ অমুক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'নো কনফিডেন্স', তমুক নেতাব বিরুদ্ধে ধমঘট, হৃদযবাজ্যে কিন্তু ওসবেব নাম-গন্ধও নাই। সকলেই হাসিমুখে ওই স্বেচ্ছাচারীটার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিয়া কৃতার্থ হয়।

ভূমিকায় আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলাম, আসল গল্পটা এখনও আরম্ভ করি নাই। গল্পটা এবার শুনুন।

আমি ডাক্তার। আমাদের ক্ষুধার সুযোগ লইয়া খাদ্য-বিক্রেতারা যেমন নিজেদের বহুবিধ ক্ষুধা তৃপ্ত করে, আমাদের লজ্জার সুযোগ লইয়া বস্ত্র-বিক্রেতারা যেমন লাল হইয়া যায় আমিও তেমনি মানুষের অসুস্থতার সুযোগ লইয়া নিজেকে প্রায় অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছি। আধুনিক শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে অথবা অর্ধ-আলোকিত রাত্রির অন্ধকারে যে স্থানে স্বর্গ এবং নরক পাশাপাশি প্রকট হইয়া ওঠে রাজপথ নামক আধুনিক সেই তীর্থের একপাশে বহুদিন যাবৎ আমিও আমার 'সুলভ ক্লিনিক' নামক ঔষধালয়টি খুলিয়া বসিয়া আছি। বাত এবং ডায়াবিটিস এই উভয় প্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি বহুদিন হইতে আমাকে পাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। এখনও তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই। এখনও উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি। ডাক্তারী জীবনের আনন্দ-বিষাদের কাহিনী শুনাইয়া আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিব না, শুধু ডাক্তারি অভিজ্ঞতা হইতে একটি গল্প বলিব।

একবার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিয়া ছিলাম। তিনি শুধু

বৈজ্ঞানিক নন, তিনি স্থায়নিষ্ঠ, সহৃদয় এবং আধুনিক। পরিধানে প্যান্ট এবং বুশসার্ট, চোখে রঙীন চশমা। অর্থনৈতিক চাপের জন্যই তিনি যে বাধ্য হইয়া এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করিয়াছেন তাহা দেখিলেই বোঝা যায় এবং বুঝিলেই কষ্ট হয়।

সেদিন সকাল হইতে একটিও রোগী আসে নাই। বহমান পথ-নদী-স্রোতে দৃষ্টির ছিপ ফেলিয়া চিন্তা করিতেছিলাম আমাদের নব-নির্বাচিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কর্মনিপুণতাই কি ইহার কারণ? ঘর্ঘরশব্দে বিমান পথে উড়িয়া উড়িয়া দেশের স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরাইয়া দিয়া তিনি কি ডাক্তারদের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন? তাহা যদি হয় আগামীবারে চেষ্টা করিতে হইবে লোকটা যাহাতে ভোট না পায়। লোকটা…। চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া উক্ত ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।

"আপনিই কি ডাক্তারবাবু—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নমস্কার, আপনার কাছেই এলাম।"

"নমস্কার। বসুন—"

ভদ্রলোকের দৃষ্টি হইতে এক ঝলক সহৃদয়তা যেন চলকাইয়া পড়িল। আমার দিকে আর একবার হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এখানকার সিভিল সার্জনের সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। ডাক্তার সরকারও খুব অন্তরঙ্গ লোক আমার কিন্তু আপনার কাছেই এলাম আমি। আপনার খুব নাম শুনেছি—"

আর এক ঝলক সহৃদয় দৃষ্টি চলকাইয়া পড়িল এবং এবার সেটা যেন সূক্ষ্মমূর্তি ধারণ করিয়া আলতো আলতো ভাবে আমার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

বিগলিত হইয়া বলিলাম, "বলুন আমাকে কি করতে হবে—"

"আমার 'ওয়াইফ'কে দেখতে হবে একবার। আপনার সময় আছে কি এখন, যেতে পারবেন?"

"সময় আছে। কি হয়েছে আপনার স্ত্রীর—"

"কাসি আর জ্বর।"

"ও। কখন জ্বর হয়?"

"সন্ধ্যার দিকে।"

"কতদিন থেকে ভুগছেন?"

"তা প্রায় তিন মাস।"

"বেশ চলুন, দেখে আসি।"

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম গিয়া তাহাই দেখিলাম; কিন্তু আর একটা জিনিস দেখিলাম যাহা অপ্রত্যাশিত। ইতিপূর্বে যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের স্বামীদের আচরণ লক্ষ্য করিবার সুযোগও একাধিকবার মিলিয়াছে, কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন স্বামী কখনও দেখি নাই। দেখিলাম ছাতে চিলে কোঠার ঘরটিতে স্ত্রীকে রাখিয়াছেন। সেখানে তিনি বিশুদ্ধ বাতাস এবং নিঃশব্দ নির্জনতা উপভোগ করেন। তাঁহার বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় সমস্ত আলাদা। স্ত্রীকে তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পর্যন্ত দেন না। নীচে দেখিলাম একটি কমবয়সী চাকরানী গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম সামলাইতেছে। ঘরে ঢুকিবার পূর্বে ভদ্রলোক বুশ সার্টের পকেট হইতে রুমাল ও ছোট শিশি বাহির করিলেন। শিশির ছিপি খুলিয়া রুমালে ইউক্যালিপ্‌টাস্ অয়েল ঢালিলেন, গন্ধ হইতেই তাহা বুঝিলাম। যতক্ষণ ঘরের ভিতর রহিলেন, রুমালটা নাকের সামনে ধরিয়া রাখিলেন।

যথারীতি আমি বলিলাম, "স্পিউটাম্‌টা পরীক্ষা করতে হবে—এক্সরে করালেও ভাল হয়।"

"দুই-ই করানো হয়েছে।"

"দেখি।"

দেখিলাম কফে যক্ষ্মার বীজাণু পাওয়া যায় নাই। এক্সরের ছবিতে এক জায়গায় সন্দেহজনক একটু কালো দাগ আছে।

পুনরায় বলিলাম, "স্পিউটামটা আর একবার পরীক্ষা করতে চাই।"

"বেশ। স্পিউটাম রাখাই আছে। ওই যে—"

দেখিলাম একটি মুখবন্ধ শিশিতে খানিকটা কফ রহিয়াছে।

ভদ্রলোক বলিলেন, "ওকে বাইরে থুতু ফেলতে মানা করেছি, ওই শিশিতে ফেলে মুখ বন্ধ করে রেখে দেয়, আগে শিশিটায় 'লাইসল' দিয়ে রাখতাম, কিন্তু একদিন ঠোঁটে লেগে গিয়েছিল, তাই এখন এমনিই রাখে। শিশিটা ভরে গেলে ওটা পুড়িয়ে ফেলি—।"

মুগ্ধ হইলাম।

"আপনি ওটা নিয়ে আসুন তাহলে—"

"আচ্ছা।"

চলিয়া আসিলাম। একটু পরে ভদ্রলোক স্পিউটাম লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম চার পাঁচ পুরু ন্যাকড়া দিয়া বাঁধা শিশিটাকে বাইকের হাতলে ঝুলাইয়া আনিয়াছেন। অতি সন্তর্পণে সেটা বাইকের হাতল হইতে খুলিয়া বাম হস্তে দুইটি অঙ্গুলিতে ঝুলাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন।

"কোথা রাখব বলুন—"

"ওই টেবিলে।"

টেবিলে রাখিয়া হাতটা তুলিয়া রহিলেন।

"সাবান আছে—"

"আছে। জলও ওই বালতিতে আছে—"

প্রায় এক বালতি জল এবং কার্বলিক সাবানটার প্রায় অর্ধেক শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"একটু স্পিরিট আছে?"

"আছে—"

"দিন তো—"

বেশ খানিকটা স্পিরিটা লইয়া নিজের হাতে এবং বাইকের হাতলে অনেকক্ষণ ধরিয়া লাগাইলেন।

"সাবধানে থাকাই ভাল, কি বলেন—"

"নিশ্চয়।'

"কখন আসব?"

"ঘন্ট দুই পরে।"

আমিও অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করিতে পারিলাম না।

ঘন্টা দুই পরে ভদ্রলোক আসিলেন।

"পেলেন কিছু।"

"না, পেলাম না।"

"কি করা যায় তাহলে বলুন। এক্সরে দেখে কিন্তু সন্দেহ হয়, দেখলেন তো। আচ্ছা, স্যানাটোরিয়ামে পাঠিযে দিলে কেমন হয়?"

"খুব ভাল হয়—"

"যাদবপুরে আপনাব পরিচিত কেউ আছেন?"

"আছেন একজন।"

"একটা চিঠি লিখে দেবেন স্যার দয়া করে।"

"দেব। কাল আসবেন।"

"আপনার 'ফি'ট এখনও দেওয়া হয় নি। কত দেব?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা? আমি শুনেছিলাম পাঁচ। বেশ, দশ টাকাই নিন। আপনার ন্যায্য পাওনা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছে নেই।"

পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলেন এবং গণিয়া গণিয়া দশখানি এক টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। মুখভাব দেখিয়া মনে হইল যেন কোনও মহৎ কর্ম করিলেন।

"টাকাটা গুণে নিন। কাল সকালে আসব কি ?"

"আসবেন।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। আমার ডিসপেন্সারির সম্মুখে পথের ধারে মিউনিসিপালিটির যে বর্তিকাটি প্রতিদিন প্রজ্বলিত হইয়া যৎসামান্য আলোক বিতরণ করে সেদিন কেন জানি না সেটি জ্বলে নাই। তাই বারান্দার এক কোণে উপবিষ্ট কুসুমিকে দেখিতে পাই নাই। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে কুসুমি সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

কম্পাউণ্ডার বাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে। খানিকটা কফ এনেছে পরীক্ষা করার জন্যে—"

কুসুমির স্বামীর চিকিৎসা করিয়াছিলাম, তাহাকে চিনিতাম। এবার যেন তাহার আরও দুরবস্থা লক্ষ্য করিলাম। পরনে চিটচিটে ময়লা কাপড, মাথার চুল রুক্ষ, চক্ষু দুইটি লাল। আমার সামনে আসিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সম্ভবত চক্ষু দুইটি লাল হইয়াছিল।

বলিল, তাহার এক সৎ বোনকে সে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছিল। সর্বস্বান্ত হইয়া কিছুদিন পূর্বে তাহার বিবাহও দিয়াছিল। কিন্তু এমনি তাহার পোড়াকপাল তিন দিন পূর্বে হঠাৎ কাসিতে কাসিতে তাহার দুলালীর মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না। জ্বরও হইতেছে। আমি যদি দয়া করিয়া কফটা পরীক্ষা করিয়া দেখি—।

দেখিলাম সে একটি মাটির সরায় এক সরা রক্তাক্ত কফ নিজের কাপড দিয়া ঢাকিয়া আনিয়াছে। কাপড়েও খানিকটা কফ লাগিয়া গিয়াছে।

আমি তাহাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইয়া সতর্ক করিলাম।

সে বলিল, "ডাক্তারবাবু, আমার দুলালীই যদি না বাঁচে আমার বেঁচে কি হবে।"

পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যক্ষার জীবাণুতে ভরা। কুসুমি বলিল, "ডাক্তারবাবু, আপনাকে আর একটি অনুরোধ করছি। ওর স্বামী যদি আসে তাকে বলবেন না যেন ওর এই কাল ব্যাধি হয়েছে। তাহলে ও একে ছেড়ে দিয়ে ঠিক আর একটা বিয়ে করবে। সে আপনার কথা খুব মানে, দোহাই আপনার তাকে সত্যি কথাটা বলবেন না।"

পা জড়াইয়া ধরিল।

নিরুপায় হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম।

মেয়েটি আঁচলে আমার 'ফি' বাঁধিয়া আনিয়াছিল। একগাদা রেজকি। পয়সা, ডবল-পয়সা, আনি দুয়ানি, আর সিকি। দেখিলেই মনে হয় সে অনেক দিনের সঞ্চিত এই পয়সাগুলি সৎ বোনটির জন্য খরচ করিতেছে।

বলিলাম, "তোকে আর ফি দিতে হবে না—"

"সে কি হয ডাক্তারবাবু, আপনাকে ফি দেবার সামর্থ কি আছে আমার!"

রেজকিগুলি টেবিলের উপর ঢালিয়া দিল।

"আপনার পুরো ফি আনতে পারি নি বাবু—"

"ওগুলো নিয়ে যা না—"

"না বাবু, কিছু না নিলে আমার তৃপ্তি হবে না।"

ঔষধ লইয়া ও ঔষধের পুরা দাম দিয়া কুসুমি চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইয়া আছি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শুনিতে পাইলাম হৃদয়রাজ্যের অধিপতি বিবেক শ্রদ্ধাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিতেছে—"আজ কাকে তোমার পুজোর ঘরে বেদীতে বসিয়েছ—"

"কাউকে বসাই নি এখনও—"

"কাকে বসাবে?"

"আপনি যাকে বলবেন।"

"ওই কুসুমিকে বসাও।"

"সেই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোককে?"

"না।"

কাণ্ড দেখুন!

চতুরীলাল

চতুরীলালের নাম আপনারা নিশ্চয় শোনেন নাই। আমিও শুনি নাই। সে নিজেই আসিয়া সেদিন নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিল। বলিল, তাহার দূরসম্পর্কের কোন এক আত্মীয় নাকি আমার চিকিৎসায় দুই বৎসর পূর্বে ভাল হইয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে আমার নিকট আসিয়াছে নিজের চিকিৎসা করাইবার জন্য।

বলিলাম, "আপনার হয়েছে কি—"

চতুরীলাল সহসা হাত দুটি জোড় করিয়া ফেলিল।

"সব কথা বলবার আগে একটা কথা জানতে চাই হুজুর। আপনার 'ফিস্' কত?"

"দশ টাকা।"

"দশ টাকা দিতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে ডাক্তারবাবু। কিছু কম করুন।"

"আপনি সত্যিই যদি দশ টাকা দিতে না পারেন, কম করব বইকি। খুব গরীব যদি হন একেবারেই কিছু নেব না- "

এই কথায় চতুরীলালের চোখে-মুখে যে ভাব পরিস্ফুট হইল, তাহা অপূর্ব। তাহা শ্রদ্ধা, যাহা-ভাবিয়াছিলাম-তাই-ব্যঞ্জক একটা ভাব এবং চতুরতার এক অবর্ণনীয় সমন্বয়। ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে সে বামগুম্ফ-প্রান্তে ধীরে ধীরে তা দিতে লাগিল। অর্থাৎ ভাবিতে লাগিল অতঃপর কি বলা যায়।

আমি আর একটি রোগী লইয়া পড়িলাম। তাহাকে বিদায় করিয়া চতুরীলালের দিকে চাহিলাম আবার। চতুরীলাল বলিল, "আমার বাড়ির কাছেই একজন ভাল ডাক্তার আছেন। তিনিও এম-বি-বি-এস। কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাইনি, আপনার কাছেই এসেছি। আসতে আমার খরচ লেগেছে তিন টাকা বারো আনা। ট্রেন ভাড়া আড়াই টাকা, জলখাবার এক টাকা, রিক্সা ভাড়া চার আনা। ফিরে যেতেও প্রায় ওই খরচই লাগবে। আপনি ফিস কিছু কম করুন ডাক্তারবাবু। দুটি টাকা আপনাকে দেব আমি।"

"আমি তো বলছি সত্যি যদি আপনার দেবার ক্ষমতা না থাকে, ও দু'টাকাও দিতে হবে না। আপনার বিবেক যা বলে তাই করুন। আমি আর কি বলব আপনার মতো ভদ্রলোককে।"

চতুরীলাল এই কথায় নীচের ঠোঁটটি উপরের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বারান্দায় গিয়া নাকটা ঝাড়িয়া আসিল। তাহার পর স্মিতমুখে

বলিল, "রাজেন্দর সিং আমাকে বলেছিল, আপনি দয়ার সাগর। যে যা দেয় নিয়ে নেন।"

"আগে হয়তো দয়ার সাগর ছিলাম। কিন্তু ক্রমশই জিনিসপত্রের দাম যে-রকম বেড়ে যাচ্ছে, তাতে সাগর আর থাকতে পাচ্ছি কই, ডোবা হয়ে যাচ্ছি—।" চতুরীলাল উচ্ছ্বসিত আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছেন, সকলেরই অবস্থা সমান। আমার কিছু জমি আছে, ধান মন্দ হয়নি, দামও পেয়েছি খারাপ নয়, কিন্তু খরচ—"

চতুরীলালের খরচের বর্ণনা শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। পরিচিত এক ভদ্রলোক মোটরযোগে হন্তদন্ত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শালীর নাকি নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ভদ্রলোক চাকুরি করেন। ভাল চাকুরি। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু তাঁহার স্কন্ধে ডালপালাসমেত গোটা শ্বশুরবাড়িটাই আসিয়া ভর করিয়াছে। তাহারা পাকিস্তানী এবং বাস্তুহারা, বলিবার কিছু নাই। শালীটি আসিয়াই টাইফয়েডে পড়িয়াছে।

চতুরীলালকে বলিলাম, "আপনি একটু বসুন। আমি আসচি এখনি—"

চলিয়া গেলাম। একটা ইন্‌জেকশন দেওয়ার পর ভাগ্যক্রমে শালী সামলাইয়া গেল। ফিরিলাম প্রায় ঘন্টাখানেক পরে। দেখিলাম চতুরীলাল তখনও বসিয়া আছে। বারান্দায় আর একটি রোগিনীও আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার নাকটা ফোলা, চোখ দুইটি লাল, মুখময় অসংখ্য ছোট ছোট গুটি। মেয়েটি আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া সরিয়া বসিল।

চতুরীলাল বলিল, "আপনাকে পাঁচ টাকা দেব ডাক্তারবাবু। নিন, এবার আমার কথা শুনুন—।" রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কিন্তু রাগ প্রকাশ করাটা শোভন নয়।

হাসিয়া বলিলাম—"পাঁচ টাকার বেশি দেবার আপনার ক্ষমতা নেই নাকি, সত্যি ?"

চতুরীলাল মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি রাজেন্দর সিংয়ের আত্মীয়। আমাকে কিছু খাতির করবেন না ?"

আমিও উত্তরে মুচকি হাসিলাম। আমার হাসি দেখিয়া মরীয়া হইয়া চতুরীলাল বলিল—"বেশ, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। ছ'টাকা—" গণিয়া গণিয়া ছ'টি টাকা সে আমার সম্মুখে রাখিয়া হাত জোড় করিল।

"বেশ কি হয়েছে বলুন—"

চতুরীলাল তাহার রোগের বিবিধ বর্ণনা শুরু করিল। বর্ণনা শুনিয়া বুঝিলাম

চতুরীলাল সম্ভবত বহুমূত্র ব্যাধিতে কাবু হইয়াছেন। প্রস্রাব পরীক্ষা করিলাম, প্রচুর চিনি।

"খুব খান নাকি ?"

"খুব। ছেলেবেলায় খেতে পাই নি। এখন ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আপনার আশীর্বাদে খাবার অভাব নেই এখন। খুব খাই—"

চতুরীলালের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কিন্তু আপনার যা অসুখ হয়েছে, তাতে বেশি খাওয়া তো চলবে না। খাওয়া কমাতে হবে।"

"সেটি পারব না হুজুর। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলেন, ধারে তাঁর মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল। একবেলা খাওয়া, তাই জুটত না সব দিন। এখন আপনার আশীর্বাদে সামলে উঠেছি অনেকটা। ঘরে গাই আছে, ধান হয়, আলু হয়, আখ হয়—এখন যদি আবার আপনি খাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে—"

হাত উল্টাইয়া এবং মুচকি হাসিয়া চতুরীলাল বক্তব্য শেষ করিল।

"কিছুদিন সংযম করুন। চিনি, ভাত, আলু এই তিনটে অন্তত ছেড়ে দিন—"

"ওই তিনটেই তো প্রিয় খাদ্য আমার। ও তিনটে ছেড়ে দিলে খাব কি—"

"তাহলে ইন্‌জেকশন নিন। কিন্তু তার আগে আপনার রক্তটা দেখা দরকার, রক্তে চিনির পরিমাণ কত আছে।"

"রক্তেও চিনি থাকে না কি ?"

"থাকে বইকি। রক্তে চিনির পরিমাণ বেশী হলেই তো সেটা পেচ্ছাপ দিয়ে বেরোয়—"

"ও—"

চতুরীলাল পুনরায় কিছুক্ষণ গুম্ফপ্রান্ত পাকাইয়া অবশেষে বলিল—"তার মানে খরচ—"

"অনেক খরচ। রক্ত পরীক্ষা করতেই ষোল টাকা লাগবে। তারপর ইন্‌জেকশন পিছু খরচ আছে। রোজ অন্তত একটা করে ইন্‌জেকশন দিতে হবে। বেশ খরচ এতে। তার চেয়ে কিছুদিন সংযম করেই দেখুন না—"

চতুরীলাল নীরবে গোঁফে তা দিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "রক্ত পরীক্ষার জন্যে আমি আট টাকার বেশি দিতে পারব না। দয়া করুন একটু—করতেই হবে—"

করিতেই হইল। বুঝিলাম শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছি।

চতুরীলালের রক্ত লইলাম। বলিলাম, "আপনি বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। রক্তটা পরীক্ষা করে তারপর আপনার ব্যবস্থা করব।"

বারান্দায় যে মেয়েটি এতক্ষণ আধ-ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে একেবারে আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান বাবু আমাকে—"

"কি হয়েছে বল আগে, পা ছাড়, পা ছাড়—"

পা ছাড়িয়া সে নতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঘোমটা সরাও, দেখি কি হয়েছে—"

দেখিলাম। সংশয় রহিল না, কি হইয়াছে। সিফিলিস। চতুরীলালও ব্যায়ত্ত আননে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। মেয়েটিকে বলিলাম, "তোমার যা হয়েছে, তা সারাতে গেলে অনেক খরচ করতে হবে। পারবে?"

মেয়েটি দুইটি রূপার বালা আঁচলের তলা হইতে বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিল।

"এই আমার যথাসর্বস্ব। এই নিয়ে আমার অসুখটা সারিয়ে দিন আপনি ডাক্তারবাবু।"

"বালা নিয়ে কি করব। আমাকে কিছু দিতে হবে না তোমার। ওষুধের যা ন্যায্য দাম—তাই জোগাড় কর—"

"কত দাম—"

"ভাল করে চিকিৎসা করলে প্রায় পঞ্চাশ টাকা পড়বে। তোমার রক্তটাও পরীক্ষা করতে হবে—"

"তার কত লাগবে?"

"দশ টাকা। তা-ও না হয় আমি ছেড়ে দেব। ওষুধের দাম কিন্তু লাগবেই..."

মেয়েটি নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল।

"বালা দুটোর দাম কত?—"

"আমি তিরিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম অনেকদিন আগে। এখন বেচতে গেলে কি দাম পাব জানি না।"

চতুরীলাল বলিল—"দশ টাকার বেশি কেউ দেবে না—ভিতরে গালা আছে—"

মেয়েটি আবার আমার পা জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলাম—"তুমি বাইরে বস। দেখি আমি কি করতে পারি। হাসপাতালে

একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, দেখ সেখানে যদি বিনাপয়সায় কোনও ব্যবস্থা হয়—"

"সেখানে গিয়েছিলাম। তারাও টাকা চায়—"

"তবে আর কি হবে—"

মেয়েটি চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি হবে, আচ্ছা বাইরে গিয়ে বস, দেখি কি করতে পারি।"

কিছুদিন পূর্বে এক বিলাতী কম্পানি কিছু ঔষধ বিনামূল্যে নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম তাহাই কাজে লাগাইব।

সহসা চতুরীলাল বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ডাক্তারবাবু, পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ও সেরে যাবে ?"

"যাবে—'

চতুরীলাল পুনরায় বামগুম্ফ-প্রান্ত ধরিয়া টানিতে শুরু করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "দিন ওকে ওষুধ। দাম আমি দেব—"

"আপনি ?"

চতুরীলাল কিছু না বলিয়া কোমর হইতে একটি গেঁজে বাহির করিয়া পাঁচ-খানি দশ টাকার নোট আমার হাতে দিল।

হাসিয়া বলিল, "মায়া জিনিসটা বড় খারাপ ডাক্তারবাবু। মায়াই ডুবিয়েছে আমাদের—'

চতুরীলালের মুখে এ প্রকার জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিব প্রত্যাশা করি নাই। একটা সন্দেহ হইল।

"আপনার, কেউ হয় না কি ?"

"না। তবে—"

চতুরীলাল ইতস্তত করিতে লাগিল।

"খুলেই বলুন না, ব্যাপারটা কি—"

"ব্যাপার কিছুই নয়। ওর মুখটা আমার মায়ের মুখের মতো অনেকটা—"

তাহার পর গলা-খাঁকারি দিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার মাসখানেক পরে মা-ও মারা যান। তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ, মায়ের কোন চিকিৎসাই করাতে পারি নি—"

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, চতুরীলালের চোখের কোণে অশ্রু টলমল করিতেছে।

বাল্মীকি

অনেক দূর হাঁটিয়া আসিয়া দেখিতেছি কপাট বন্ধ। সস্তায় হইবে বলিয়াই এত কষ্ট করিয়া এতদূর হাঁটিয়া আসিয়াছি। ইলেকট্রিক বেলের বোতামটি টিপিয়া দাঁড়াইয়া আছি। বিজন যদি থাকে নিশ্চয়ই নামিয়া আসিবে। ইতিমধ্যে আমার গল্পটি শুনুন।

আমি মশায় একটু মিতব্যয়ী লোক। বাজে খরচ করিবার আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি যখন লোক খাওয়াই ঠিক নিক্তির ওজনেই আয়োজন করি। যিনি মিষ্টান্ন খাইবেন না তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার পাতে সন্দেশ-রসগোল্লা ঢালিয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছা আমার হয় না। যে দরজি কম কাপড় লইয়া জামা করিতে পারে আমি তাহার কাছেই যাই। দুই গিরা কাপড় বাঁচাইবার জন্য দুই ক্রোশ হাঁটিতেও আমার আপত্তি নাই। একটি ব্লেডে আমি তিন মাস চালাই। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলেই চালানো যায়। ছেঁড়া কাগজের টুকরা আমি ফেলি না, তাহার যতটুকু অংশ শাদা আমি তাহা সানন্দে কাজে লাগাই। খামে চিঠি আসিলে খামগুলিও আমি সযত্নে রক্ষা করি এবং সুযোগ পাইলেই কাজে লাগাই। যে সব দোকান দোকানরূপী যূপকাষ্ঠ সে সব দোকানে আমি কখনও গলা বাড়াইয়া দিই না। অথচ আমি যে বেরসিক তাহাও নয়। মাঝে মাঝে এক আধটা সৌখীন জিনিস কিনি বই কি। সেদিন যেমন একটা মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধানো ছোট হিসাবের খাতাই কিনিয়া ফেলিলাম। সাধারণ একটা খাতা হইলেও চলিত, কিন্তু জানেনই তো লোভেই পা হড়কাইয়া যায়। পা হড়কাইবার মুখেও কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গালটি বাঁচাইয়াছি। বিশুর দোকানে কিনিলে সে ঠিক গালে চড় মারিত। চিরনূজিলালের দোকানে গিয়া নগদ চার আনা বাঁচাইয়াছি। কোথায় কোন্ জিনিস শস্তায় পাওয়া যায় তাহা আমার নখদর্পণে। একটা ভুল ধারণা হয়তো ইতিমধ্যে আপনাদের মনে শিকড় গাড়িয়াছে। আপনারা হয়ত অনুকম্পাভরে ভাবিতেছেন ছয় পুত্র—আট কন্যা—খাণ্ডার গৃহিণীর মালিক আমি, ন্যুব্জপৃষ্ঠ হইয়া নতগুম্ফে মিতব্যয়ের সঙ্কীর্ণ পথে কোনক্রমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি। মোটেই তাহা নয়। আমার তিনকূলে কেহ নাই। এই সেদিন পর্যন্ত ব্যাচিলর ছিলাম। সম্প্রতি, মানে মাস দুই আগে, বিবাহ করিয়াছি।

বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। না, না, আপনারা যাহা ভাবিতেছেন তাহা নয়। বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি অন্য কোন কারণে নয় আমার চাকর গোবর্ধনের

জালায়। ব্যাটা ভয়ানক চোর। চাল, ডাল, নুন, তেল, আলু, পটল এমনকি পানের ভিতর হইতে সুপারী পর্যন্ত সরায়। আর কিছু না পারুক দুই চারিটা দেশলাইয়ের কাঠি তো পার করিবেই। একা তাহাকে সামলাইতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নাই। দালালি করি, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়। ভাবিলাম ঘরে একটা লোক থাকা দরকার।

আমার সদ্য-পরিণীতা পত্নীর নাম শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। আজকাল নারীমাত্রেই দেবী, মনোমোহিনীকে আমার সম্রাজ্ঞী পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করে। মনোমোহিনী রূপসী, কিন্তু রূপের জন্যই তাহাকে ধর্মপত্নীত্বে বরণ করি নাই। অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছে বলিয়া।

প্রথম সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইবার পর তাহার সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হয়।

"তোমার শাড়ীটা তো বেশ চমৎকার। দাম কত ?"

"সাতাশ টাকা—"

"সাতাশ টাকা। বল কি। কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলে—"

"ধনেখালি শাড়ীর তো এইরকমই দাম। পিসিমা দিয়েছেন এটা। কোন্ দোকান থেকে কিনেছিলেন জানি না।"

"ঠকিয়েছে। এসেন্স মেখেছ নাকি। ভারি সুন্দর গন্ধ তো।"

"হ্যাঁ, আমার মামাতো বোন টুকু দিয়েছিল একটা 'ইভনিং ইন প্যারিস'।"

"ও।"

দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তবে সভয়ে লক্ষ্য করিলাম অলঙ্কারে কাপড়ে তিনি যাহা পরিধান করিয়া আছেন, তাহা কিনিয়া দিতে হইলে আমার দম ফুরাইয়া যাইত। জানাশোনা শস্তা দোকানে গেলেও নাভিশ্বাস অনিবার্য হইত। সুতরাং ঠিক করিলাম কাঁচা নগদ পয়সা এখন, উহার হাতে দিব না। আগে কিছুদিন লক্ষ্য করিয়া দেখি। গোবর্ধনের আমলে যেমন নিজেই সব জিনিস কিনিয়া দিতাম, তেমনই দিতে লাগিলাম। গোবর্ধনের বিষয়েও তাহাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলাম।

বলিলাম, "খুব কড়া নজর রাখবে ওর উপর। বাজার থেকে যা জিনিসপত্র আসবে তা ওজন করে গুণে নেবে, এমন কি আলু, পটল পর্যন্ত। ভাঁড়ার ঘরের চাবি যেখানে সেখানে ফেলে রেখ না। দেশলাইটি খুব সাবধানে রাখবে। তা নাহলে একদিনেই ফাঁকা করে দেবে। রোজ এক বাণ্ডিল করে বিড়ি ফোঁকে। খুব কড়া নজর রেখো—"

মধুর হাসি হাসিয়া মনোমোহিনী বলিল, "রাখব—"

গালে টোল পড়িল। হাসিটি সত্যই বড় সুন্দর। ওই হাসিই আমাকে শেষ পর্যন্ত ডুবাইল।

একদিন কি খেয়াল হইল গোপনে দেশলাইয়ের কাঠিগুলি গণিয়া দেখিলাম। ইতিপূর্বেও গোবর্ধনকে 'চেক' করিবার জন্য মাঝে মাঝে গণিয়া দেখিতাম। দেখিলাম যত খরচ হওয়া উচিত ছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়াছে। এক আধটি নয়, দশটি কাঠি অন্তর্ধান করিয়াছে। বুঝিলাম মনু গোবর্ধনকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু মনুর আত্মসম্মানে পাছে আঘাত লাগে, এই ভয়ে ইহা লইয়া আর হৈ-চৈ করিলাম না।

ইহার দিন দুই পরে হঠাৎ একদিন বেলা দেড়টার সময় বাসায় ফিরিতে হইল। সাধারণতঃ আমি পাঁচটার আগে ফিরি না। ঢুকিয়াই দেখি গোবর্ধন মনের আনন্দে বিড়ি ফুঁকিতেছে—। আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না, সেদিনকার অবরুদ্ধ ক্রোধ বোমার মতো ফাটিয়া পড়িল। গোবর্ধনের গালে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিলাম।

গোবর্ধন মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর হেঁট হইয়া আমার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। জুতা দুইটি খুলিয়া লইয়া স-সম্ভ্রমে বলিল, "বৌমা এই সবে শুয়েছেন, একটু পা টিপে টিপে ওপরে যাবেন বাবু—"

"পা টিপে টিপে ? তার মানে—"

"আমাকে তাই তো হুকুম দিয়েছেন, বলেছেন, দেখো সিঁড়িতে যেন কোনও শব্দ না হয়—"

পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা, মানে—অচিন্তনীয়—। মনু নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। আমাকে দেখিয়া মুচকি হাসিল। গালে টোল পড়িল। বইটি দেখিলাম একটি ইকনমিক্স্ বিষয়ক বই।

দ্বিতীয়বার বোতাম টিপিবার পর কপাট খুলিল। বিজন ডাক্তার চোখ কচলাইতে কচলাইতে নামিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"কে মহীতোষ ? কি ব্যাপার, এত রাত্রে।"

"একবার গলাটা দেখতো ভাই, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি—"

গলা দেখিয়া বিজন মন্তব্য করিল, "সিগারেট ধরেছ নাকি—"

"ধরেছি সম্প্রতি।"

"তাই না কি। সেই জন্তই হয়েছে—"

বিরঞ্চন একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখিয়া আমার হাতে দিল। আমি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"ফর মহীতোষ না লিখে, লিখে দাও ফর বাল্মীকি—"

দুইটি ছবি

১

মিস্টার মাজিয়ার আমন্ত্রণে তাঁহার কলিকাতার বাসায় সন্ধ্যাবেলা গিয়াছিলাম। দেখিলাম ভদ্রলোক আহারাদির প্রচুর আয়োজন করিয়াছেন। দেশী-বিদেশী বহুবিধ খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। আমি স্বল্পাহারী লোক, সেই বিপুল আযোজনের মর্যাদা রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। বলিলাম, "রাত্রে আমি কিছু খাই না। নিতান্তই যদি দুঃখিত হন সামান্ত কিছু খাইব।" কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-কুলোদ্ভবা মিসেস মাজিয়ার আন্তরিক আগ্রহ, অসামান্ত রূপ, চটুল চাহনি এবং সুমিষ্ট হাসির তোড়ে আমার এ মনোভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। তিনি বলিলেন, "আপনার জন্তই এত সব আয়োজন। দ্বিতীয় কোন লোককে আমরা নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনি না খাইলে কি চলে। আপনি যা পারেন, যতটা পারেন খান। না, আমি কোনও কথা শুনিব না। আসুন—"

মাথা ঝাঁকাইয়া চোখে-মুখে হাসিমাখা অভিমানের ঝিলিক তুলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া একেবারে খাইবার টেবিলে লইয়া গেলেন।

মিস্টার মাজিয়া গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন, লুসির বিশ্বাস আপনাকে খাওয়াইয়া সে-ঋণ হইতে অন্তত খানিকটা সে মুক্ত হইবে। আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্তরূপ। আমি ভারতবর্ষের আদিবাসী তো—"

আমাদের কথাবার্তা ইংরেজীতেই হইতেছিল। মিস্টার মাজিয়ার সহিত আমার সম্পর্ক রোগী ডাক্তারের সম্পর্ক। মিস্টার মাজিয়া অথবা লুসি কাহার পা প্রথমে হড়কাইয়াছিল তাহা জানি না। আমার নিকট তাঁহারা যখন আসিয়াছিলেন তখন দেখিয়াছিলাম উভয়েরই গনোরিয়া হইয়াছে। যথারীতি চিকিৎসার পর এখন তাঁহারা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। লুসি একটি সুস্থ শিশু প্রসব করিয়াছেন কয়েক মাস পূর্বে।

আহারাদির কায়দা সম্পূর্ণ বিলাতী। কোর্সের পর কোর্স আসিতেছে, প্লেটের পর প্লেট বদল হইতেছে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধোপদস্ত পোশাক-পরা খানসামারা যাতায়াত করিতেছে। লুসি হাসিয়া হাসিয়া কখনও একটু 'সস্' কখনও একটু 'রাই' আগাইয়া দিতেছেন। পাশের ঘরে রেডিওতে একটা বিলাতী নাচের বাজনা বাজিতেছে।

"আপনি আদিবাসী না কি ?"

মিস্টার মাজিয়া বলিলেন, "হাঁ সাহেবগঞ্জের পাহাড়ের উপর আমাদের বাড়ি ছিল।"

"ও, সাহেবগঞ্জ ?"

"হাঁ। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। একজন সহৃদয় মিশনারি সাহেব আসিয়া আমাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি লেখাপড়া শিখি। তিনিই আমাকে এই চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন।"

"ও। আপনার বাবা কি করিতেন ?"

"চাষ-বাস। বাবা খুব পপুলার লোক ছিলেন। মুলুক মাঝিকে এখনও পাহাড়ী সাঁওতালরা মনে করিয়া রাখিযাছে।"

"মুলুক মাঝি আপনার বাবার নাম ?"

"হাঁ—। মাঝি উপাধিকেই আমি 'মাজিয়া' করিয়াছি।"

২

সাহেবগঞ্জ পাহাড়ের উপরে একটি দশ বৎসরের বালক অসহাযভাবে একটি পাথরের উপর বসিয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিল। বেচারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ বাহিয়া সে উপরে উঠিতেছিল তখন খেযাল ছিল না যে, একটু পরেই সূর্য অস্ত যাইবে, অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে। বালকটি স্থানীয় স্কুলের ছাত্র, বোর্ডিং-এ থাকে। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল দেরিতে বোর্ডিংয়ে ফিরিলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয় না জানি কি করিবেন। বড় কড়া লোক। তা ছাড়া আর একটা জনশ্রুতিও সে শুনিয়াছিল। পাহাড়ে নাকি বড় বড় বাঘ আছে, রাত্রিকালে তাহারা বাহির হয়। বালক আর একবার উঠিয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা। যেদিকে পা বাড়ায় সেদিকেই হড়কাইয়া যায়। কয়েকবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় গিয়া পাথরটির উপর বসিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল, একটি

কালো মূর্তি নীচে হইতে উপরের দিকে উঠিতেছে। সাহস সংগ্রহ করিয়া সে ডাক দিল—"কে—"

"আমি মুলুক মাঝি। তু কে বটিস্‌ ?"

"আমি স্কুলের ছেলে একজন। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি—"

"দাঁড়া আসি।"

মুলুক মাঝি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আসিয়া হাজির হইল। সব শুনিয়া বলিল, "তু আজ আমাদের গাঁয়ে চল। কাল ভোরে তুকে নামাই দিব।"

"আমাকে মাস্টাররা বকে যদি—"

"বকবে কেনে ? আমি মুলুক মাঝি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব, বকবে না। তোর হেড মাস্টার আমাকে খুব মানে।"

গত্যন্তর ছিল না। মুলুক মাঝির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম।

"তু খোঁড়াছিস্‌ কেন রে।"

"ডান পা-টা পাথরে কেটে গেছে।"

মুলুক মাঝি বসিয়া পড়িল।

"আমার পিঠে চড়।……"

বালকটির প্রথমে লজ্জা করিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চড়িতেই হইল।

কিছুক্ষণ পরে মুলুক মাঝি তাহাকে লইয়া যখন নিজেদের গ্রামে প্রবেশ করিল তখন আকাশে চাঁদ উঠিযাছে।

উঠানের মাঝখানে বালককে বসাইয়া মুলুক হাঁক দিল—"ও মেঝেন, দেখ কে এসেছে—"

দল বাঁধিয়া সকলে আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল খানিকক্ষণ, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহার পর।

"ওকে খেতে দে আগে।"

ঘরে গাই ছিল। সে দিল এক ঘটি সফেন দুগ্ধ। মেঝেন বাহির করিল চিঁড়া আর গুড়। আহারাদির পর শুরু হইল-নাচ-গান ; মাদল আর বাঁশি জ্যোৎস্নাকে আকুল করিয়া তুলিল।

চল্লিশ বৎসরের যবনিকা সরিয়া গিয়াছে। মুগ্ধ নেত্রে সেই দৃশ্য আবার প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মধ্যে সে বালক কি এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ? মিস্টার মাজিয়ার দৃষ্টির ভিতর দিয়া মুলুক মাঝি কি আমাকে আবার দেখিতেছে ? সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। পাশের ঘরে রেডিওতে বাজনাটা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে।

"আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো। কিছুই তো খেলেন না—"

লুসির কথায় চমক ভাঙিল। তাহার হাসিমাখা চোখ দেখিয়া মনে পড়িল ঝুমরীকে। কিশোরী একটি। মুলুক মাঝির উঠানেই সেদিন সে ছিল। আর আমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছিল আর একটু খাওয়ার জন্য।

"ডাক্তার, আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন তো।" মিস্টার মাজিয়া প্রশ্ন করিলেন।

"কিছুই না। নাথিং—"

উঠিয়া পড়িলাম।

অজ-প্রসঙ্গ

রেসে জিতে ননীগোপাল খাইয়েছিল প্রচুর।

কোলকাতা থেকে রিসড়া গিয়ে আবার রাত্রের ট্রেনে ফিরে আসা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু ননী না-ছোড়, যেতেই হলো। বিনয়, সুরেশ আর আমি, তিনজনেই গেলাম। না গেলে ঠকতুম। পাকা মাছ, মুর্গ মসল্লম আর পাঁঠার মাংসের মোগলাই কারিব সঙ্গে ছিল বিরিয়ানি পোলাও—শাক, চচ্চড়ি এসব বাজে ভেজাল ছিল না। আর একটি অসাধারণ তরকারি খাইয়েছিল ননী সেদিন। অপূর্ব লেগেছিল। বুঝতেই পারিনি কি খাচ্ছি। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি মেটে চচ্চড়ি, কিন্তু দু' এক টুকরো চিবিয়েই বুঝেছিলাম মেটে চচ্চড়ি নয়, অন্য কিছু। এত ভাল লাগল যে দু'বার চেয়ে নিলাম। খেয়ে উঠে ননীগোপালের কাছে শুনলাম ওটা জিব-কাবাব। অর্থাৎ পাঁঠার জিব কুঁচিয়ে কাবাব করা হয়েছে। আসল মালটির কিন্তু সেদিন দর্শন পেয়েছিলাম সর্ব শেষে। ট্রেনে। খাবার নয়, মানুষ।

খাদ্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই আমরা ষ্টেশনে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও এল। খালি ভেবে যে কামরাটিতে উঠলাম সেটি একেবারে খালি ছিল না। কোণের দিকে একটি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর দিকে একবার চেয়েই পিতৃনাম উচ্চারণ করতে হল। মনে হল আমরা যদি আদা হই উনি কাঁচকলা। নাকের উপর রস-কলি, মাথায় স-ফুল টিকি, গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, হাতে জয়-দেব, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। দেখবামাত্র কেমন যেন আক্রোশ হ'ল

লোকটার উপর। পরের পয়সায় মাছ মুরগী পাঁঠা পোলাও গিলে কোথায় বেশ ফুর্তি করতে করতে যাব, তা না কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। এই মূর্তিমান বেরসিকের সামনে কখনও মুখ খোলা যায়। ঠিক করলাম জ্বালাতে হবে ব্যাটাকে। মানে, বাক্য দিয়ে যতটা সম্ভব।

তিনজনের মধ্যে চোখোচোখি হয়ে গেল। তিনজনেরই মনের ভাব এক।

সবিনয়ে নমস্কার করে আমিই প্রশ্ন করলাম, 'ভটচাজ্‌মশায়ের কতদূর যাওয়া হবে—'

প্রতিনমস্কার করে শান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'উত্তরপাড়া।'

হঠাৎ সুরেশ বিনয়কে ধাক্কা মেরে বললে, 'একটু সরে বস, মাইরি। মুখে তোর এখনও পেঁয়াজের গন্ধ ছাড়ছে।' বিনয় উঠে ভট্টাচার্যের পাশে গিয়ে বসল। ভট্টাচার্য নির্বিকার। ফিরে চেয়েও দেখলেন না।

আমি তখন ফুট কাটলাম আবার। 'পাঁঠার জিব-কাবাবট বেড়ে হয়েছিল মাইরি। কাঁচা পেঁয়াজের রস দিয়েছিল নিশ্চয় নামাবার আগে, তাই বিনেটার মুখে গন্ধ ছাড়ছে। মুখ ধুসনি নাকি ভাল করে?'

বিনয়টা হাসতে লাগল ফ্যাক ফ্যাক করে। ভটচাজের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম আবার। কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না।

সুরেশ দিনকতক কোন এক মেডিকেল স্কুলে পড়েছিল নাকি, তাই সুযোগ পেলেই ডাক্তারি বুকনি ছাড়ে।

সে বললে, 'আমরা পাঁঠার ডাইজেস্‌টিভ ক্যানালটা বোকার মতো বাদ দি। কিন্তু রাঁধতে পারলে ওর তুল্য জিনিস নেই। যাদের আমরা ছোটলোক বলি তারা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। তাই তারা সস্তায় নাড়িভুঁড়িগুলো কিনে নিয়ে যায়। ঝুনকির বাড়িতে এসা ভুঁড়ি-চচ্চড়ি খেয়েছিলাম একবার মাইরি। মদের ওরকম চাট আর হয় না।'

বিনয় বললে, 'ছোটলোক কেন, পুরুলিয়াতে ভদ্রলোকেরাও নাড়িভুঁড়ি খায়। নাড়িগুলো প্রথমে ধুয়ে পরিষ্কার করে, তারপর সেগুলো দিয়ে পাঁজরার হাড়ে ফাঁস লাগিয়ে লাগিয়ে হাড়-জোড়া তৈরী করে তারা। তারপর সেগুলো মাংসের সঙ্গে রান্না করে। দিব্যি খেতে। খাসনি কখনও?'

আমি বললাম, 'হাড়-জোড়া খাইনি, কিন্তু কামা-পাঁঠা খেয়েছি।'

'সে আবার কি রে?'

'এ-ও মানভূমে হয়। পাঁঠাটাকে জবাই বা বলিদান করবার পর একটা নাপিত এসে গোটা পাঁঠাটাকে পরিষ্কার করে কামিয়ে দেয়। ক্লীন শেভড্‌, গায়ে একটি

লোম থাকবে না। তারপর গোটা পাঁঠাটাকে ভাল করে ধুয়ে চামড়া সুদ্ধ টুক্‌রো করতে হয়। মানে, চামড়াটা ওরা নষ্ট করে না। ওরা বলে চামড়া ছাড়িয়ে নিলে চামড়ার নীচে যে চর্বি থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে মুরগীরও চামড়া ছাড়ায় না। কামা-পাঁঠার মোগলাই কারি যা খেয়েছি তা দুর্দান্ত—'

আবার আড়চোখে চাইলাম ভট্‌চাজের দিকে। আমাদের কথা যে তার কানে ঢুকছে তা মনেই হল না। নিবিষ্টচিত্তে পড়ে চলেছেন।

সুশীল হঠবার পাত্র নয়।

সে বলে চলল—'কামা-পাঁঠা খাইনি অবশ্য কিন্তু পোঁতা-পাঁঠা খেয়েছি।'

'কি রকম! পাঁঠা পুঁতে পচিয়ে?'

'আরে না, না, টাটকা। শোন তবে। ধানবাদে কতকগুলি আমুদে কাবুলীওলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার একবার। তারা একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল আমাকে। যখন গেলাম তখন রাত আটটা হবে। কিন্তু গিয়ে দেখি খাসি তখনও ব্যা ব্যা করছে, একটু দূরে এক বলিষ্ঠ কাবুলী কোদাল চালিয়ে গর্ত খুঁড়ছে একটা। জিগ্যেস করলাম ব্যাপার কি। কাবুলী বন্ধু হেসে জবাব দিলে, বাংগালী বাবু, শবর্ শবর্। অর্থাৎ বাঙালীবাবু, সবুর করুন। একটু দূরে একটি জলন্ত কয়লার স্তূপ গন্‌গন্ করছিল। গর্তটি যখন বেশ গভীর হ'ল—মানে হাঁটু ভর, তখন একটি কাবুলী কোদাল নিয়ে টেনে টেনে সেই গন্‌গনে কয়লাগুলোকে গর্তে এনে ফেলতে লাগল। গর্তটি ভরে গেল একেবারে। তারপর জবাই করা হলো খাসিটাকে। চামড়াটি ভাল করে ছাড়িয়ে আলাদা রেখে দিলে। তারপর আমরা যেমন মাংস কাটি তেমনি করে কাটলে, তবে টুকরোগুলো বেশ বড় বড়। আমরা যেমন মশলাটশলা মাখাই কসবার আগে, ঠিক তেমনি মশলাও মাখালে, কিন্তু কসলে না। সমস্ত মাংসটা পুরে ফেললে সেই চামড়ার ভিতর। পুরে সেলাই করে দিলে গুণ ছুঁচ দিয়ে। একটা বড় পুঁটুলির মতো হল। তারপর সেই গর্তের ভিতর থেকে জলন্ত কয়লাগুলো বার করে ফেলে পুঁটুলিটা ঢুকিয়ে দিলে তার ভিতরে। তার ওপর মাটি দিলে, মাটির উপর আবার সেই জলন্ত কয়লাগুলো দিলে চাপিয়ে। বিনয় হেসে বললে, ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছিলাম কোন এক রাণীকে নাকি হেঁটে-কাঁটা, উপরে-কাঁটা দিয়ে পোঁতা হয়েছিল, এ যে অনেকটা সেই রকম দেখছি।'

সুশীল চটে উঠল।

'কি রকম বেরসিক রে তুই। রাণীর সঙ্গে পাঁঠার উপমা দিচ্ছিস—'

বিনয় চটে কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল আমি থামিয়ে দিলাম।

'গল্পটা আগে শেষ কর। তারপর উপমা নিয়ে ঝগড়া করিস। তারপর কি হল বল—'

'তারপর কাবুলীরা সেই গর্ত ঘিরে বসে নাচ-গান শুরু করে দিলে। দু' ঘণ্টা নাচ-গান চলল।'

'কাবুলী নাচ দেখেছিস কখনও? তাণ্ডব তার কাছে ছেলে মানুষ—'

'আবার বাজে বকছিস তুই। মাংসটা কেমন হয়েছিল তাই বল না।'

'অমৃত।'

ভট্টাচার্যের দিকে এক নজর চেয়ে আমি বললাম, 'এমন অশাস্ত্রীয় ভাবে মাংস খাওয়া কি উচিত? আপনিই বলুন তো ভট্চাজ মশায়।'

ভট্টাচার্য বই থেকে চোখ তুলে আমার মুখের দিকে স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, পাঁঠার কোন কোন অংশ খাওয়া উচিত, কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত বলুন তো। আপনার মত একজন বিজ্ঞ লোককে কাছে যখন পেয়েছি জেনেই নি ব্যাপারটা।'

ট্রেন এসে উত্তরপাড়ায় থামল।

ভট্টাচার্য আরও কিছুক্ষণ স্মিতমুখে চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন, 'দড়ি গাছটা ছাড়া আর কিছুই তো ফেলবার নেই।'

বলেই উঠে পড়লেন এবং নেবে গেলেন ট্রেন থেকে।

চঞ্চলা

১

অনিমেষ ঘোষাল নির্নিমেষ নয়নে পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে চাহিয়াছিল। যে স্থানে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা চঞ্চলাদের বাড়ির সীমানার বাহিরে একটা উঁচু টিলার উপর। ওই স্থানে দাঁড়াইলে ত্রিতলের একটা বাতায়ন দেখা যায়। সেই বাতায়নপথে চঞ্চলাকে সে মাঝে মাঝে দেখিয়াছে। সেই আশাতেই সে আসিয়াছিল। পাত্র-হিসাবে অনিমেষ ঘোষাল মন্দ নয়। এম. এ. পাস, ভাল কলেজে চাকুরি পাইয়াছে, পিতামাতা ভাইভগ্নীর ঝামেলা নাই, বলিষ্ঠ দেহ। তথাপি কিন্তু চঞ্চলার পিতা শক্তিধরবাবু তাহার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। চঞ্চলাও করিয়াছে। একজন সামান্য প্রফেসারের ঘরণী হইয়া

সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধনের বাসনা তাহার নাই। সে রূপসী, সে ধনীর দুলালী, জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মত সে ভাসিয়া বেড়াইবে, একটা অধ্যাপকের ঘরণী হইতে যাইবে কেন। অনিমেষ তাহাকে ভালবাসে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বিনিময়েই জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা কি বলিদান দেওয়া যায়?

অনিমেষ চঞ্চলাকে একটি কথা শুধু জানাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বলিতে আসিয়াছিল, চঞ্চলা যাহাকে খুশি বিবাহ করুক, তাহার কথা সে যেন স্মরণে রাখে, বিবাহ নামক দুর্নিবার ঘটনাটা যেন তাহাদের মধ্যে কারা-প্রাচীরের দুর্লঙ্ঘ্যতা সৃজন না করে। অনিমেষের দ্বারা চঞ্চলার কখনও যদি কোনও উপকার হয় তাহা করিতে অনিমেষ সর্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। এই সব কথাই সে বলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু বলিবার সুযোগ পাইল না। দারোয়ান তাহাকে দেখা করিতে দিল না, বলিল, দিদিমণির শরীর ভাল নেই, কাহারও সহিত তিনি দেখা করিবেন না। অথচ অনিমেষ খবর পাইয়াছে, আজই বৈকালে অর্থাৎ আর একটু পরেই চঞ্চলাদের বৈঠকখানায় নবাগত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটটি আসিবেন এবং সম্ভবত আজই তাঁহার সহিত চঞ্চলার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া যাইবে।

অনিমেষ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। বাতায়নপথে একবার যেন চঞ্চলাকে দেখা গেল। একটি সুসজ্জিতা প্রতিমা যেন স্বপ্ন-প্রাসাদের বাতায়নে দেখা দিয়াই বাস্তবের রূঢ়তায় বিলীন হইল। পুরাতন ত্রিতল বাড়িটার দিকে চাহিয়া অনিমেষের অধরে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। চঞ্চলা কিছুদিন পূর্বে কমিউনিজম লইয়া খুব মাতিয়াছিল। সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল, অপেক্ষা করিবে। এই মাঠেই অপেক্ষা করিবে। চঞ্চলাকে শেষ কথাটা বলিয়া না গেলে সে শান্তি পাইবে না। আর আজ না বলিলে হয়তো বলাই হইবে না। সহসা তাহার নজরে পড়িল, অপরাহ্ণের আকাশে মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে, কত বিভিন্ন বর্ণের মেঘমালা কত বিভিন্ন ভঙ্গীতেই না একত্রিত হইয়াছে। নীরবে বহুবর্ণের ঐকতান বাজিতেছে যেন। তাহার সমস্ত চিত্তও ধীরে ধীরে বর্ণাপ্লুত হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে সেই টিলার উপরে বসিয়া পড়িল। যে স্বপ্ন তাহার সমস্ত চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল আকাশে তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

চঞ্চলাও মর্তলোকে ছিল না। এক অপূর্ব আবেশে তাহার সমস্ত শরীর বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। একটা সেতারে কে যেন সুর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অঙ্গুলিস্পর্শে কোনও রাগিণী এখনও বাজিয়া উঠে নাই, কিন্তু সেতারের প্রতিটি তার যেন তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

মনে হইতেছিল, আজ তাহাকে এমন একটা বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে যাহা যুগান্তকারী। আজিকার নির্মল নীল আকাশ, সুরভিত মন্দ সমীরণ, বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলী যে রঙ্গমঞ্চের পরিবেশ সৃষ্টি করিযাছে, সে রঙ্গমঞ্চে চঞ্চলাই যেন আজ প্রধান অভিনেত্রী, পটোত্তোলনের অপেক্ষায় আশা-আকাঙ্ক্ষা-আন্দোলিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে। অনিমেষের কথা একবার তাহার মনে হইল। এই যুগান্তকারী নাটকে তাহার কি কোন ভূমিকা আছে? মনে হইল, নাই। থাকিতে পারে না। সে নিজেই থাকিতে দেয় নাই।

...তিনতলায় নিজের ঘরটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সে। দূরে নদী বহিয়া গিয়াছে। শীতের নদী—স্বল্প-তোয়া, কিন্তু সুন্দর। স্বচ্ছ জলের ধারা জ্যোতির রেখার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তসীমার ওপারে কোথায় চলিয়া গিয়াছে?...সবিস্ময়ে চঞ্চলা ভাবিতে লাগিল। নদী কোথায় শেষ হইয়াছে, ভৌগোলিক তাহা হয়তো বলিতে পারিবেন, কিন্তু ওই জ্যোতির রেখাটা? যখনই তেতলার এই জানালাটার ধারে সে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার এ কথাটা মনে হয়। সেদিনও তাহার মনে হইতেছিল চারিদিকে এই যে জীবনের বিচিত্র প্রকাশ, এ কিসের উৎসব। দৃষ্টির বাহিরে, যুক্তিরও বাহিরে কি যেন একটা ঘটিতেছে যাহা দেখা যায় না, ধরা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়, যাহা কেবল অনুভূতির পরদায় সূক্ষ্ম শিহরণ তুলিয়া সমস্ত চিত্তকে আকুল করিয়া দেয়। সেই অন্তরালবর্তিনীর অবগুণ্ঠিত সত্তাই যেন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে রূপে রসে রঙে নানা ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। পুষ্পের বিকাশে, ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে, অরণ্যের জটিলতায়, অঙ্কুরের উদ্গমে, প্রণয়ীর আলিঙ্গনে, ক্ষুধিতের আহারে, বর্ষার মুষলধারায়, শরতের স্নিগ্ধতায়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায়, মৃত্যুর অন্ধকারে, জীবনের স্পন্দনে, প্রকৃতির লক্ষ ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যলীলায় অহরহ উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, এ কে। চঞ্চলা মাঝে মাঝে কবিতা লেখে, এই লীলাময়ী প্রকৃতি সত্যই তাহাকে মাঝে মাঝে উতলা করে তোলে। তখন তাহার মনে হয়, তাহার মধ্যেও এই লীলাময়ী গোপনে গোপনে কিসের যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে, সহসা একদিন সে সচকিত হইয়া এক

অভিনব মায়ালোকে জাগিয়া উঠিবে। অদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ তখন আর দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবে না। অপরিচিত অসংখ্য জনতার উৎসুক দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে একদা স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু কিসের সে ভূমিকা? কি সে হইতে চায়? জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা কি? সে কলেজের যে কোন হুজুগে মাতিয়া হাসিতে গানে উৎসাহে উল্লাসে সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিতে চায়। বিকাশ দাদার বক্তৃতা শুনিয়া, শ্রমিক মজদুরদের দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া তাহাদের জন্ত আত্মবিসর্জন করিতে চায়, প্রফেসার অনিমেষ ঘোষালের ইতিহাসের গবেষণা দেখিয়া ঐতিহাসিক-অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করিতে চায়, আবার কবি শ্বেতকমলের কবিতা শুনিয়া কাব্যলোকের স্বপ্ন-কুহেলীতে পথ হারাইয়া ফেলিতে চায়। সে সব চায়। গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চরকা ধরে আবার রবীন্দ্রনাথের সিল্কের জোব্বা দেখিয়া খদ্দরের সম্বন্ধে বীতরাগ হয়, তাহার গভর্নেস্ মিস গ্রীনের মৌন মহিমা তাহাকে মুগ্ধ করে, আবার সরোজিনী নাইডুর প্রেরণায় সে বক্তৃতা দিতেও উদ্বুদ্ধ হয়। গরীব শ্রমিকদের দুঃখ সত্যই তাহার চিত্তকে বিগলিত করে, কিন্তু ধনী পিতার অগাধ ঐশ্বর্যকে সে তুচ্ছ করিতে পারে না।

···সহসা ঘাড় ফিরাইয়া সে চাহিয়া দেখিল, বিরাট দর্পণে তাহার সমস্ত দেহটা প্রতিফলিত হইয়াছে। বাতায়নটাও প্রতিফলিত হইয়াছে, আকাশেরও খানিকটা। সে কিন্তু নিজের প্রতিবিম্বের দিকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নূতন ঢাকাই শাড়িখানায় তাহাকে চমৎকার মানাইয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল চূড়ামণিবাবুকে। তিনিই তাহাকে জন্মদিনে শাড়িখানা উপহার দিয়াছিলেন। চমৎকার লোক এই চূড়ামণি চৌধুরী। যেমন বিদ্বান, তেমনি রূপ। এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন। বাবার বাল্যবন্ধুর একমাত্র ছেলে। সে-ও তো বাবার একমাত্র মেয়ে। একটা স-মিল ছন্দ যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। চঞ্চলার কর্ণের অগ্রভাগে রক্তিমা দেখা দিল। উষ্ণ রক্তস্রোত ধীরে ধীরে সমস্ত মুখে সঞ্চারিত হইয়া সর্বাঙ্গে প্রসারিত হইয়া গেল। কিন্তু না, না, সহসা আবার মনে হইল, কি না! নির্বাক হইয়া নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া রহিল সে। চোখের দৃষ্টিতে, উন্মুখ অধরে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের রক্তিমায় যাহা সূচিত হইতেছে তাহা তো প্রত্যাখ্যান নয়, আবাহন। তাহার অন্তরের গোপনতম বাসনাই কি তবে এই? জ্ঞাতসারে এতদিন সে যাহা ভাবিয়া আসিয়াছে তাহা অন্য রকম, তাহা আদর্শ জীবনের কথা। সে লেখাপড়া করিবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিবে, দেশের কাজ করিবে, দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিবে, মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় অসংখ্য শ্রোতার প্রাণমন উদ্বুদ্ধ করিবে। এই তো তাহার

অন্তরের কথা। দর্পণের প্রতিবিম্বিত মূর্তিতে তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া আজ এ কোন্ নূতন কথার আভা বিচ্ছুরিত হইতেছে? সে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। অনিমেষের কথা মনে পড়িল আর একবার। তাহাকে প্রত্যাখ্যান না করিলে হয়তো··· । সহসা মৃদু সমীরণ-স্পর্শে সে শিহরিয়া উঠিল। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল, নির্মল নীল আকাশ, দিগন্তে অপস্রিয়মান জ্যোতির রেখা, বাগানে অসংখ্য ফুলের অসংখ্য ভঙ্গিমা, সকলেই যেন তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সকলেই যেন সমস্বরে বলিয়া উঠিল—আমরা তো প্রস্তুত আছি, তুমি এস এইবার।···সকলেরই আহ্বান সে শুনিতে পাইল, কিন্তু যাহা অমোঘ, যাহা সত্যের নিকটে যাচাই করিয়া তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিবে তাহার কোন আভাস সে পাইল না। সে কিন্তু নিঃশব্দচরণে আসিয়া অতি নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল। চঞ্চলা ফিরিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ভৃত্য রামকান্ত দাঁড়াইয়া আছে।

"কি রামকু?"

"ওনারা সব নীচে এসেছেন, কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন।"

"আচ্ছা, যাচ্ছি আমি।"

রামকান্ত চলিয়া গেল। চঞ্চলা প্রস্তর-মূর্তিবৎ অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে চাহিয়া রহিল। পুঞ্জীভূত যৌবনের অবরুদ্ধ আকুতি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় যেন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। "কর্তাবাবু খবর দিতে বললেন"—রামকুর কথাগুলা তাহার কানের আশেপাশে যেন গুঞ্জন করিতে লাগিল, সে গুঞ্জন ক্রমশ ব্যঙ্গে পরিণত হইল। বাবা কি চান? সাধারণ পিতার মতো তিনি তো তাহার যথেচ্ছাচারে বাধা দেন না। বরং মনে হয়, কামনার নান ইন্ধন জোগাইয়া দিয়া আকারে ইঙ্গিতে তিনি যেন বলেন—উপবাস করিও না, ভোগ কর। অথচ মুখে কিছু বলেন না। চূড়ামণি চৌধুরীকে যেদিন প্রথম তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন সেদিন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন সকৌতুক-হাসি জলজল করিতেছিল। একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে জামাই করিতে পারিলে বৈষয়িক নানারূপ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা. তাই কি তিনি চূড়ামণি চৌধুরীকে প্রশ্রয় দিতেছেন? হয়তো তাই। চূড়ামণি চৌধুরীকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যহ নীচের ঘরে যে আড্ডা বসে তাহা ভদ্র হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে নিতান্তই অশোভন। কিন্তু এই অশোভন ব্যাপারকেই শক্তিধরবাবুর মতো দোর্দণ্ড-প্রতাপ সেকেলে জমিদার সহ্য করিতেছেন কেন? চঞ্চলা একটা গুজব শুনিয়াছিল। শক্তিধরবাবুর

জমিদারিতে সম্প্রতি যে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার সহিত শক্তিধরবাবু নাকি জড়িত। তাই কি তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট-জামাইরূপ সহকারী পর্বতের অন্তরালে থাকিতে চান? এই জন্যই কি তাহাদের বাড়িতে প্রত্যহ আড্ডা বসিতেছে? শক্তিধরবাবু নিজে কিন্তু কোনদিন আড্ডায় যোগ দেন না। তিনি বাগানের পশ্চিম দিকের বাড়িটায় একা থাকেন। বন্ধু নিত্যনবীন ছাড়া অন্য কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। চঞ্চলার মা মারা যাইবার পর হইতেই তিনি যেন আত্মসংহরণ করিয়াছেন। একটা দুর্দান্ত ঘোড়া উপল-বন্ধুর পথে ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে এ ধরনের উপমা শক্তিধরবাবুর সম্বন্ধে খাটে না। তিনি মুখ থুবড়াইয়া পড়েন নাই, স্বেচ্ছায় থামিয়া গিয়াছেন। সহস্রবিধ উৎসাহের যিনি একদিন প্রধান নায়ক ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় আত্মসম্বরণ করিয়াছেন। বাবার অতীত জীবন সম্বন্ধে চঞ্চলারও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই। সে ছেলেবেলা হইতেই বোর্ডিঙে বোর্ডিঙে মানুষ হইয়াছে। চঞ্চলার মা-ও সমস্ত জীবনটাই প্রায় বাপের বাড়িতে কাটাইয়াছেন। স্বামীর নিরতিশয় বস্তুতান্ত্রিক সান্নিধ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। শক্তিধরও ইহা লইয়া কোনও দিন জবরদস্তি করেন নাই। স্ত্রীর অভাবে তাঁহার জীবনও অচল হয় নাই কোনদিন। তিনি নিজের সৃষ্ট অলকাপুরীতে নিজের খেয়ালে বিবিধ উৎসবে মত্ত হইয়া রঙের নেশায় রসের সমুদ্রে জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। অলকাপুরী এখনও ঠিক তেমনি আছে, তিনিই কেবল সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ছুটির সময় চঞ্চলা মায়ের কাছে মামার বাড়িতে যাইত। বাবার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথা শুনিত সে। শুনিয়াছিল, তিনি নাকি তান্ত্রিক হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে এখনও সে কথা মনে হয়। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিকা, গলায় রুদ্রাক্ষ স্কন্ধবিলম্বিত কৃষ্ণ কুঞ্চিত বাবরি, জ্বলন্তদৃষ্টি, খাঁড়ার মত নাক···চঞ্চলার কেমন যেন ভয় হয়। সহসা তাহার মনে হইল, এই পিতার চক্রান্তে কোথায় চলিয়াছে সে? একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বিবাহ করিলেই কি তাহার জীবন কৃতার্থ হইবে? তাহার শিক্ষা-দীক্ষা আশা-আকাঙ্ক্ষা কি ওই জন্যই? অনিমেষকে যাহা বলিয়া সেদিন সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাই কি তাহার মনের কথা! ময়ুর-পঙ্খীর মত ভাসিয়া বেড়ানোই কি তাহার জীবনের-আদর্শ?···কবি শ্বেত-কমলের কথা মনে পড়িল। সেও হয়তো আজ আসিয়াছে। কি যে তাহার মনোভাব, চঞ্চলা বুঝিতে পারে না। দুর্বোধ্য কবিতা পড়িয়া শোনায় মাঝে মাঝে। কি তাহার অর্থ? আবার অনিমেষকে মনে পড়ল। মনে পড়িল, অভিমানী অনিমেষ আর আসিবে না। কলকণ্ঠের একটা উচ্চ হাস্য-রোল ভাসিয়া আসিল সহসা।

নীচে তাহা হইলে আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা ফাঁদে সে পা বাড়াইতেছে। ক্ষণকাল ইতস্তত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

৬

কলকণ্ঠের হাসিটা শিখিনী চৌধুরীর। চূড়ামণি চৌধুরীর ভগিনী শিখিনী চৌধুরী ছুটিতে দাদার নিকট বেড়াইতে আসিয়াছেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি কোথায় নাকি শিক্ষয়িত্রীগিরি করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে এমন কোনও কাজ নাই যাহা তিনি জানেন না। এখানে দোলের সময় প্রতিবৎসর একটা সভা হয়। এবার সেই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শিখিনী চৌধুরী স্থানীয় মেয়েদের তালিম দিয়া একটা নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। কমিশনার সাহেবকে বিদায়-অভিনন্দন দিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোকেরা—বিশেষ করিয়া অফিসার মহল, যে ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে দেশী বিদেশী সমস্ত প্রকার ভোজ্য বস্তু শিখিনী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থানীয় পাঠাগারটিরও সংস্কার-সাধন তিনিই করিয়াছেন, নিজে গিয়া পুস্তকগুলির বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করিয়া বইগুলি নিজের হাতে গুছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ফোটো তুলিবার শখ আছে, টিকিট সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, সাহিত্য-চর্চা করেন এবং এত সব করিবার পরও আড্ডা দিবার সময় পান। পিকনিকে অথবা শিকার পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইলে কখনও নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন না, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সিনেমায় যাওয়া চাই-ই। গুজব, পিতামাতা তাঁহার নাম শিখণ্ডিনী রাখিয়াছিলেন, তিনি সে নাম বদলাইয়া শিখিনী হইয়াছেন। রূপসী নন, কিন্তু মনোহারিণী। এমন সর্বগুণান্বিতা শিখিনী চৌধুরীকে চঞ্চলার কিন্তু ভাল লাগে না। চঞ্চলা প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল, শিখিনী শ্বেতকমলের পাশের চেয়ারে বসিয়া আছেন। চঞ্চলাকে দেখিতে পাইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "শোন চঞ্চলা, শ্বেতকমলবাবু ভারি অদ্ভুত কথা বলেছেন একটা—"

"কি কথা ?"

সকলের সান্নিধ্য এড়াইয়া চঞ্চলা একটু দূরে গিয়া বসিল।

"উনি বলছেন, ভাবের বাহন হিসেবে প্রচলিত কথাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে

এসেছে। শুধু একঘেয়ে নয়—অযোগ্য, অপটু। ওঁর মতে ভাবের উপযোগী নূতন নূতন কথা সৃষ্টি করা উচিত। যেমন, মনিরো আহাহু, ইয়াবিলা—”

শিখিনী চৌধুরী হাসিয়া ফেলিলেন। কবি শ্বেতকমলের মুখটা লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া পড়িলেন, চঞ্চলার সম্মুখে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল তাঁহার পক্ষে। উঠিয়া তিনি হলের পূর্বপ্রান্তের খোলা জানালাটার সম্মুখে গিয়া সকলের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শিখিনী চৌধুরী চঞ্চলার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিলেন একবার। তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, “কবির রাগ হ'ল। আর একটা উচ্চাঙ্গের কবিতা পাব বোধ হয় আমরা—”

চঞ্চলা মুচকি হাসিল একটু। কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা অদৃশ্য কারাগার যেন ধীরে ধীরে তাহার চারিদিকে মূর্ত হইতেছে।

“তোমাকে আজ গান গাইতে হবে একটা।”

“গলাটা আজ ভাল নেই—”

“সে সব শুনছি না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত একখানা, গজল একখানা, আর আধুনিক সঙ্গীত একখানা। এই তিনটে গেয়েই তোমার ছুটি আজ।”

একবার গলা-খাঁকারি দিয়া চঞ্চলা পুনরায় বলিল, “গলাটা কেমন যেন ব্যথা ব্যথা করছে কাল থেকে।”

“গান গাইলেই সেরে যায় ওসব ব্যথা। গান-প্রসবের ব্যথা ওসব।”

শিখিনী চৌধুরীর নয়নে অপূর্ব একটা বিদ্যুৎ-ঝিলিক মূর্ত হইয়া উঠিল।

চূড়ামণি চৌধুরী এক কোণে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া সেদিনকার কাগজখানা পড়িতেছিলেন। তিনি আড়চোখে একবার শ্বেতকমলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই অতর্কিতে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—“বাই জোভ।” তাহার পর হাসিভরা চোখে তিনি চঞ্চলার দিকে চাহিলেন একবার। প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটিতেছে না, চোখের পলক পর্যন্ত পড়িতেছে না। হঠাৎ চূড়ামণি চৌধুরীর নজরে পড়িল, চঞ্চলা তাঁহার দেওয়া ঢাকাই শাড়িখানাই পরিয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন কেমন যেন অনবদ্য অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইল, ওই তুচ্ছ শাড়িখানার মাধ্যমে সে যেন চঞ্চলার অন্তরলোকের অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল, চঞ্চলা কতদূরে···শাড়িখানা যেন তাহাকে আড়ালই করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তিনি খবরের কাগজে মন দিলেন। ঠিক কাগজে মন দিলেন না, কাগজটা মুখের

সামনে ধরিয়া নিজের চিত্ত-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সম্বন্ধে চঞ্চলার কোনও উল্লাস বা উচ্ছ্বাস লক্ষ্য না করিয়া তিনি যেন একটু অপমানিতই বোধ করিতেছিলেন। চঞ্চলাকে দেখিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, চঞ্চলাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু চঞ্চলার ব্যবহার বড় বিচিত্র। তাঁহাকে যেন আমলই দিতেছে না। আশ্চর্য, কিন্তু কেন···

অনেক দিন আগে চঞ্চলা ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস্' পড়িয়াছিল—অন্যমনস্ক হইয়া সেই কথাই সে ভাবিতেছিল।

"নমস্কার—নমস্কার—"

হাস্য বিকিরণ করিতে করিতে মিসেস মৈত্র—মিসেস ললি মৈত্র প্রবেশ করিলেন। চোখে কাজল, মুখে গলায় পাউডারের পালিশ, গালে ঠোঁটে লাল রঙ, কুচকুচে কালো রঙের ব্লাউসে চুমকির ঝিকিমিকি, মাথার সামনের দিকের চুল ফাঁপানো, কানে সবুজ পাথর-বসানো টাপ—কে বলিবে ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। পরণে যে সাদা সিল্কের শাড়ি রহিয়াছে তাহা পাড়হীন, সীমন্তে সিঁদুর নাই। অথচ তিনি হিন্দু এবং মিস্টার মৈত্র প্রবলভাবে জীবিত। মিস্টার বিজয়কুমার মৈত্র শুধু জীবিত নন, শহরের বেশ গণ্যমান্য ভদ্রলোক, নাম-করা উকিল একজন। তিনি তাঁহার পত্নীর এই সব বিসদৃশ আচরণের কোনও প্রতিবাদ কখনও করিয়াছেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ্যে বরং দেখা যায় পত্নীর সম্বন্ধে যখনই তিনি কোন উল্লেখ করেন, তখন বেশ সম্ভ্রমসূচক বাক্যাবলীই ব্যবহার করেন। 'উনি অমুক কাজটা করতে ভালবাসেন', 'ওঁর এই মত'—এই ধরনের কথা শুনিয়া মনে হয় যে, পত্নীকে উনি সম্ভবত শ্রদ্ধাই করেন। বলা বাহুল্য, ললি মৈত্রকে কেন্দ্র করিয়া নানাবিধ গুজব নানা কণ্ঠে নানা সুরে সর্বদাই পল্লবিত হয়। তিনি এসব গ্রাহ্য করেন না—এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে। তাহার প্রত্যেক খবরটি তিনি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার পর বাড়াবাড়ির মাত্রাটা আরও বাড়াইয়া দেন। গালের এবং ঠোঁটের রঙ আরও প্রকট হইয়া উঠে, ব্লাউসের গলাটা আরও খুলিয়া যায়, অবগুণ্ঠন সরাইয়া মাথার চুলটা আরও বে-পরোয়াভাবে আলুলায়িত করিয়া দেন। অর্থাৎ গুজবপরায়ণ সমালোচকদের নাকের সম্মুখে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া যেন বলিয়া দেন—বেশ করিতেছি আরও করিব। মিসেস ললি মৈত্রের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহার আধুনিকতম পুরুষ বন্ধু, মিস্টার পুরী। তিনিও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুদক্ষ

তবলা-বাদকও। মিস্টার পুরী স্মিতমুখে সকলকে নমস্কার করিয়া একটি আসন গ্রহণ করিলেন।

"চঞ্চলা তোমাকে আজ সেই কথ্থক নাচটা নাচতে হবে, মিস্টার পুরী বাজাবেন। মিস্টার চৌধুরীর নিশ্চয় আপত্তি নেই এতে—"

"না না, আমার আপত্তি থাকবে কেন—"

"বাস, তাহ'লে আর তোমার ভয় কি চঞ্চলা!"

চঞ্চলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শরীরটা ভাল নেই আজ।"

"তাই না কি, কি হয়েছে?"

চূড়ামণি চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে একটা আকুলতার সুর বাজিয়া উঠিল। চোখ তুলিয়া চাহিতেই পিতার সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল চঞ্চলার। পশ্চিম দিকের বারান্দায় স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে একটা মৌন ভৎ'সনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—এ তোমার কেমন ব্যবহার! চঞ্চলা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শিখিনী চৌধুরী বলিলেন, "আগে গান হয়ে যাক একটা। তার পর নাচ হবে।"

"বেশ। অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা নাচের উপযোগী হয়ে উঠবে বরং তাতে।"

রামকান্ত চা ও খাবারের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

"রামকান্ত, তুমি ডুগি তবলা আর তানপুরাটা পাঠিয়ে দাও তো। হার্মোনিয়ামটাও।"—শিখিনী বলিলেন।

মিস্টার পুরী হাতুড়ি ঠুকিয়া তবলা বাঁধিতেছিলেন। ললি মৈত্র হার্মোনিয়মে সুর দিতেছিলেন। চূড়ামণি চৌধুরী খবরের কাগজ ছাড়িয়া চঞ্চলার খুব কাছে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। শ্বেতকমলও আর বাতায়নে দাঁড়াইয়াছিলেন না। বাতায়ন-পথে বাগানের পুষ্করিণীটার যে রূপ তিনি দেখিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত চঞ্চলার যে সম্পর্ক তাঁহার কবিমানসে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহাই অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল তাঁহাকে। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া নির্নিমেষে চঞ্চলার মুখের দিকেই চাহিয়াছিলেন। শক্তিধরবাবু পশ্চিমের বারান্দায় প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিটা চঞ্চলার হৃদয়ে শায়কের মত বিঁধিয়া ছিল।

নতনেত্রে বসিয়াছিল চঞ্চলা। জীবন-সাগরের তরঙ্গশীর্ষে ময়ূরপঙ্খীর মত ভাসিয়া বেড়াইবার যে কল্পনাটা তাহার মনে কিছুক্ষণ আগেও নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার বর্ণচ্ছটা সহসা যেন মশালের আলোকে রূপান্তরিত হইয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিল তাহাকে। তাহার মনে হইতেছিল, শিকারীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, উদ্ধারের আর উপায় নাই, বাবাও উহাদের দলে।

"চঞ্চু, আরম্ভ ক'রে দাও, আর দেরি করছ কেন? আমাকে নটার সময় প্রিন্সিপালের বাড়ি যেতে হবে আবার—"

শিখিনী চৌধুরী তাঁহার সুদৃশ্য সোনার হাতঘড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। মিস্টার পুরীর অঙ্গুলিগুলি তবলার উপরে অধীর আগ্রহে বোল তুলিতে লাগিল।

"আর দেরি নয়, আরম্ভ কর, আরম্ভ কর—"

চঞ্চলা নতনেত্রে বসিয়াছিল। ভাবিতেছিল, যে পাপ সে করিয়াছে তাহার শাস্তি আসন্ন, নরককুণ্ডে লাফাইয়া পড়িতেই হইবে, কিন্তু—

"চঞ্চলা এখানে আছে—?"

সকলে চাহিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে অধ্যাপক অনিমেষ ঘোষাল দাঁড়াইয়া আছেন। চঞ্চলা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল।

"আমাকে ডাকছেন?"

"হ্যাঁ। শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—"

চঞ্চলা বাহির হইয়া গেল। আর ফিরিল না।

না ট ক

বন্ধন-মোচন

আমার প্রথম সন্তান

শ্রীমতী কেয়া মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু-

[নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির আপিস। আপিস বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায় ইহা ঠিক তাহা নহে। সমিতির সভ্যগণ সমিতি-সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই আলোচনা এখানে করেন। ছোটো-খাটো সভা এখানে হয়, বহিরাগত কোনও সভ্য আসিলে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থাও এখানে হয়, কোনও বৃহত্তর সভার জন্য গান বা বক্তৃতার মহলাও এখানে হয়। চলিত ভাষায় 'আড্ডাঘর' অথবা অধিকতর ভদ্রভাষায় 'বৈঠকখানা' বলিলে অশোভন হইত না, কিন্তু নারী-সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত মনে হইতেছে। 'কক্ষ' কথাটা সেকেলে নাটকে প্রচলিত আছে। কিন্তু ঘটনাটা আধুনিক বলিয়া 'কক্ষ'ও পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীমতী সুষমা পালিত ঘরের একধারে অর্গ্যান-সহযোগে গান করিতেছে। সুষমা নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির অধিনায়িকা শ্রীমতী উজ্জ্বলা নন্দীর বান্ধবী ও সহকারিণী। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।]

গান

ভরা নদীর
চল চঞ্চল ঢেউ অধীর
ছাপায় তীর।
নূতন যুগের বেজেছে শাঁখ
গগন বিদারি' এসেছে ডাক
কও কথা কও; হে নির্বাক,
ওগো বধির।
ভেঙেছে কঠিন গিরি দুর্গম
হয়েছে পথ
আকাশ হইতে এসেছে বারতা
এসেছে রথ।

এসেছে চলার শুভক্ষণ
এসেছে প্রভাত জেগেছে মন
এসেছে রঙীন নিমন্ত্রণ
প্রজাপতির
কও কথা কও; হে নির্বাক,
ওগো বধির।

[গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলা নন্দী প্রবেশ করিল। হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। বেশ প্রখর চেহারা। সুন্দরী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ।]

উজ্জ্বলা। জগনলালবাবু কি কোনও খবর পাঠিয়েছেন ?

সুষমা। হ্যাঁ, তিনি আসবেন একটু পরেই। মিস্টার ঘোষালও আসবেন খবর পাঠিয়েছেন।

উজ্জ্বলা। যে গানটা সভায় গাইবি সেইটে ঠিক করছিলি বুঝি ?

সুষমা। হ্যাঁ। তোর বক্তৃতাটা লেখা হয়ে গেছে তো ?

উজ্জ্বলা। লিখে তো ফেলেছি। শুনবি কেমন হয়েছে ?

সুষমা। বেশ তো—

[উজ্জ্বলা একটি চেয়ার টানিয়া বসিল এবং ভ্যানিটি-ব্যাগ হইতে লিখিত বক্তৃতাটি বাহির করিয়া সুষমাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।]

"প্রিয় ভগিনিগণ, আমাদের দুর্দশা যে কত চরমে পৌঁছিয়াছে তাহা আশা করি আপনাদের অবিদিত নাই, বাঙালীর ঘরে কন্যার স্থান যে কি তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কন্যার জন্ম হইলে শুভ শঙ্খধ্বনি হয় না, মাতার চোখে জল আসে, পিতার মুখ শুকাইয়া যায়। কন্যা বড় হইলে তাহাকে মনুষ্যত্বমর্যাদা দিবার ব্যবস্থা কয়জন করেন ? যতদিন তাহার বিবাহ না হয় ততদিন বাপের বাড়িতে সে পেট-ভাতায় চাকরানি বৃত্তি করে। যাঁহারা অর্থাভাবে কন্যাকে শিক্ষা দিতে পারেন না তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এমন লোকও আমাদের সমাজে বিরল নহেন যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, যাঁহারা মনে করেন স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে হিন্দু-সমাজ অধঃপাতে যাইবে, যাঁহারা মনে করেন যে রাঁধুনী, চাকরানি, শয্যাসঙ্গিনী এবং জননী হওয়াই নারীত্বের চরম বিকাশ এবং তাই তাঁহারা যেন-তেন-প্রকারেণ কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চান। আমাদের সমাজে কন্যাকে পাত্রস্থ করার মধ্যেও যে জঘন্য অপমান প্রকট হইয়া আছে তাহা আমরা জানিয়া বুঝিয়াও যুগ যুগ ধরিয়া সহ্য করিতেছি। এখনও, এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশের মেয়ের বাপেরা টাকার থলি লইয়া ছেলের বাপেদের খোশামোদ করে, এখনও শিক্ষিত আলোক-প্রাপ্ত সমাজেও বর-পক্ষীয়েরা সেই মনোভাব লইয়া বধূনির্বাচন করিতে যায় যে মনোভাব লইয়া তাহারা হাটে গরু-ভেড়া কেনে। এই বর্বর নিয়ম আমাদের সমাজে এখনও প্রচলিত আছে কারণ আমরা ইহা সহ্য করিতেছি। ঘরে ঘরে শিক্ষিত মেয়েরাও মুখে রং মাখিয়া চোখে কাজল পরিয়া একদল পুরুষের সম্মুখে আজও রূপ-যৌবনের পরীক্ষা দিতেছে। যতদিন আমরা ইহা সহ্য করিব ততদিন এ বর্বর নিয়ম সমাজে থাকিবে। এই নিয়মের চাপে যাহারা অসাড় হইয়া

গিয়াছে, যাঁহাদের কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ আর অবশিষ্ট নাই তাঁহাদের প্রবুদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যাঁহাদের আত্মসম্মান বোধ জাগিয়াছে কিন্তু প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য যাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছেন না তাঁহাদেরও আমরা রক্ষা করিব। মহামতি জগনলাল টিকাওয়ালার অর্থানুকূল্যে আমরা এই নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি স্থাপন করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করা। আমরা নিজেদের অত্যন্ত সস্তা করিয়া ফেলিযাছি বলিয়া পুরুষেরা ভুলিয়া গিয়াছে যে বিবাহ করা শুধু আমাদেরই প্রযোজন নয়, পুরুষদেরও প্রয়োজন। আমরা যে কত প্রয়োজনীয় তাহা এই সমিতির সহায়তায় আমরা প্রমাণ করিব। ধর্মঘট করিয়া এ দেশের মেথর মুচি ধোপা নাপিত কুলি কেরানী সকলেই নিজেদের মূল্য বাড়াইয়া লইয়াছে, কিন্তু আমরা, যাহারা ভবিষ্যৎ সমাজের জননী, আমরা আজও অসম্মানের আঁস্তাকুড়ে বসিয়া নকল সতী-সাবিত্রীর ব্যর্থ অনুকরণ করিতেছি। এই শোচনীয় অবস্থাব পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মানব সমাজ অতি দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে—আমরাই কি কেবল পিছাইয়া থাকিব? পুরুষদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের দুরবস্থা কখনও ঘুচিবে না, আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন,

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
কেন তুমি সংকোচের মোহজাল পাত
হে বিধাত:
চিত্ত ঘিরে। পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে
শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গা পাশে—

দৈবাগত দিনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিলে আর চলিবে না। দুর্গম দুর্গ হইতে সাধনার ধন নিজেদেরই আহরণ করিতে হইবে।

প্রথমেই আমরা দেশের কুমারীদের আহ্বান করিতেছি। বিবাহ ব্যাপারে কোনরূপ অসম্মান যেন তাঁহারা সহ্য না করেন। তাঁহারা বিদ্রোহ করুন। তাঁহারা

স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে গরু ছাগলের মতো বিবাহের বাজারে আর তাঁহারা আত্ম-বিক্রয় করিবেন না। আমাদের নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি তাঁহাদের সে বিদ্রোহ সমর্থন করিবে। বিদ্রোহ করিয়া তাঁহারা যদি পিতা-মাতার আশ্রয়-চ্যুতা হন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিব, তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিব, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব, উপার্জনের ব্যবস্থা করিব, প্রয়োজন হইলে বিবাহেরও ব্যবস্থা করিব। মহামতি জগনলাল টিকাওয়ালার মহানুভবতায় আজ আমরা যে সমিতি স্থাপন করিতে সমর্থ হইযাছি তাহা নির্যাতিতা কুমারীগণের আত্মসম্মান রক্ষা করিবে। অসম্মানের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে সকল কুমারী আমাদের আশ্রয় লইবেন তাহাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াইবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই আমরা করিব। বিনিময়ে এই সমিতি শুধু এইটুকুই আশা করিবে যে যখন তাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবেন তখন তাঁহারা যেন আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। রাষ্ট্র, সমাজ কেহই আমাদের ন্যায্য মূল্য দিবে না যদি না আমরা আত্মবলে বলীয়সী হইয়া স্পষ্টভাষায় নিজেদের দাবী ঘোষণা করি। আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আত্মসম্মানই মনুষ্যত্ব। আসুন, নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতিতে যোগ দিন।

[নেপথ্য হইতে] বাঃ চমৎকার হয়েছে।

[উজ্জ্বলা ও সুষমা উভয়েই খোলা জানালার দিকে চাহিল।]

উজ্জ্বলা। [সবিস্ময়ে] কে কথা বললে ?

সুষমা। জানি না তো।

[আপিসের ভৃত্য পশুপতি প্রবেশ করিল।]

পশুপতি। [উজ্জ্বলাকে] একটি বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

উজ্জ্বলা। কে বাবু ?

পশুপতি। চিনি না।

সুষমা। উনিই কি এখনি কথা কইলেন ?

পশুপতি। হ্যাঁ।

সুষমা। অদ্ভুত লোক তো !

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, ডেকে নিয়ে আয়।

[পশুপতি চলিয়া গেল।]

উজ্জ্বলা। কোনও মেয়ের বাবা বোধ হয়।

সুষমা। রেবা, মনীষা আর কমলার বাবা তোর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ৬টার পর তাঁদের আসতে বলেছি। তুই তা'হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল, আমি উঠি !

উজ্জ্বলা। মিটিং কটায় সময় আজ ?

সুষমা। পাঁচটায় সময়। আমার অনেক কাজ বাকী এখনও। মাইক ঠিক হয়নি। তোর বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছে। ওটা ভাল ক'রে যাতে সবাই শুনতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। সামিয়ানা কি জগনলালবাবু দেবেন বলেছিলেন ?

উজ্জ্বলা। হ্যাঁ। তাঁর ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠালেই হবে।

সুষমা। আমি যাই তাহলে।

[সুষমা কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।]

সুষমা। আচ্ছা, যে মেয়েটিকে আমাদের 'বন্ধন-মোচন' নাটকে নাচতে বলেছিস তার নাচটা একবার দেখবি তুই ?

উজ্জ্বলা। সে কি নাচ দেখাবে আগে থাকতে ?

সুষমা। [হাসিয়া] নাচ দেখাবার জন্যে সে পা বাড়িয়েই আছে। ভালই নাচে। তবু তুই একবার দেখে নে।

উজ্জ্বলা। তুই তাহলে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিস আমার বাড়িতে কোন সময়।

সুষমা। ওদের বাড়ির দিকেই যেতে হবে এখন আমাকে মাইকের চেষ্টায়। ফেরবার পথে মেয়েটিকে রেখে যাব তোদের বাসায়।

[সুষমা চলিয়া গেল। অন্য একটি দরজা দিয়া অনুক্ষণ গুপ্ত প্রবেশ করিল। সৌম্য বলিষ্ঠ যুবক। বয়স আসলে ত্রিশ, কিন্তু মনে হয় ছাব্বিশ সাতাশ।]

অনুক্ষণ। [সহাস্যে] আমি আবার ফিরে এলাম উজ্জ্বলা।

[উজ্জ্বলা সবিস্ময়ে এই নবাগত ভদ্রলোকটির দিকে চাহিয়া রহিল।]

উজ্জ্বলা। ঠিক মনে পড়ছে না তো কোথায় দেখেছি।

অনুক্ষণ। ছ' বছর খুব বেশী সময় কি ? এর মধ্যেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বি. এ. ক্লাসে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তোমার অবশ্য আমাকে মনে থাকবার কথা নয়, আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি এখনও।

উজ্জ্বলা। ও, অনুদা। শুনেছিলাম তুমি জাহাজের খালাসী হয়ে বিলেত চলে গিয়েছিলে।

অনুক্ষণ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিলে। বহু ঘাটের জল খেয়ে আবার ফিরে এলাম।

উজ্জ্বলা। [শশব্যস্ত] বস, বস, ফিরেছ কবে ?

[অনুক্ষণ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল।]

অনুক্ষণ। দিন তিনেক আগে।

উজ্জ্বলা। ও। এতদিন ওদেশে ছিলে ? কি করছিলে ?

অনুক্ষণ। বলবার মতো তেমন কিছুই করিনি। একটা ডিগ্রি পর্যন্ত আনতে পারিনি, অথচ করেছি অনেক কিছু।

[উজ্জ্বলাও যেন অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, এই উত্তর শুনিয়া একটু হতাশ হইয়া গেল।]

উজ্জ্বলা। অনেক কিছু মানে ?

অনুক্ষণ। জীবনধারণের জন্য ওদেশের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কিছু করেছি, যখন যেটা জুটেছে।

উজ্জ্বলা। বরাবর লণ্ডনেই ছিলে ?

অনুক্ষণ। না, সারা ইয়োরোপেই ঘুরেছি টো-টো ক'রে।

উজ্জ্বলা। অথচ কিছু শিখে এলে না !

অনুক্ষণ। একটি জিনিস শিখেছি।

উজ্জ্বলা। সেটা কি ?

অনুক্ষণ। শান্তিই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য জিনিস। আর তা পেতে হ'লে আমাদের মতো সাধারণ লোকের বিয়ে করা উচিত। কাল তুমি মাঠে যখন বক্তৃতা করছিলে আমি তখন ছিলাম সেখানে। সেখানেই আমি ঠিক করেছিলাম—

[ঈষৎ ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেল।]

উজ্জ্বলা। কি ঠিক করছিলে ?

অনুক্ষণ। [হাসিয়া] যে পুরাতন প্রস্তাবটা আবার উত্থাপন করব।

উজ্জ্বলা। [আলজ্জিত] মানে ?

অনুক্ষণ। তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব।

উজ্জ্বলা। [বুঝিতে না পারার ভান করিয়া] কার বিয়ের ?

অনুক্ষণ। আমার সঙ্গে তোমার। তোমাকে আমি এখনও বিয়ে করতে চাই যদি তোমার তাতে আপত্তি না থাকে।

উজ্জ্বলা। কি যে বল !

অনুক্ষণ। কেন, ক্ষতি কি ?

উজ্জ্বলা। আমায় কতটুকু জান তুমি ?

অনুক্ষণ। যতটুকু জানি তাই যথেষ্ট। প্রথম যখন কলেজে তোমায় প্রেমপত্র লিখেছিলাম তখন যতটুকু জানতাম এখনও তার বেশী জানি না। সত্যিকার জানাজানিটা বিয়ের পরই হওয়া সম্ভব। তাছাড়া যারা বেশী জানতে চেষ্টা করেছে দাম্পত্য জীবনে তারা যে খুব নিখুঁতরকম সুখী হয়েছে তাও তো বলা যায় না। তোমার সঙ্গে পড়েছিলাম, তোমাকে ভাল লাগত। এতদিন ছাড়াছাড়ির পরও সে

দিন সভায় তোমার বক্তৃতা শুনে ভাল লাগল। দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হলাম। বক্তৃতায় তুমি যে মত প্রকাশ করলে তার সঙ্গে আমারও মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। আমিও মনে করি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাই মনুষ্যত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও আমি বলব যে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বিয়ে করাটাও প্রয়োজন।

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] বিয়ে করতে চাইছ তা বুঝলাম, কিন্তু যুক্তিটা ঠিক বুঝলাম না।

অনুক্ষণ। ঋণী থাকা নিশ্চয় আত্মসম্মানজনক নয়। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে একটা খুব দামী কথা আছে। আমরা জন্মগ্রহণ করা মাত্র তিন রকম ঋণে আবদ্ধ হই। ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ আর পিতৃ-ঋণ। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞ কর্মের দ্বারা দেব-ঋণ আর পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ মুক্ত হতে হয়। সেকালে ব্রহ্মচর্য মানে ছিল গুরুগৃহে গিয়ে লেখা-পড়া করা। যজ্ঞকর্ম মানে ধর্মকর্ম। এ দুটো আমরা কিছু কিছু করি যার যেমন সাধ্য, কিন্তু বিয়ে না করলে পিতৃ-ঋণ মুক্ত হওয়া যায় না এবং আমার মতে তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। সমাজে বাস করব, সমাজের সব সুখ-সুবিধা ভোগ করব অথচ বিনিময়ে সমাজকে কিছু দেব না এটা কি ঠিক? তাছাড়া বিয়ে না করলে সর্বদা এমন একটা ক্ষুধার্ত ভাব মনে জেগে থাকে যে মনের সাম্য নষ্ট হয়ে যায়, আত্মসম্মান নষ্ট হবারও সম্ভাবনা তাতে। তুমি মেয়েদের আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছ সেইজন্যেই বিশেষ করে তোমাকে বলছি বিয়ে করা উচিত তোমার। আমিও দেশের আত্মসম্মান উদ্বোধনের কাজে লাগব ভাবছি, সুতরাং আমাকেও বিয়ে করতে হবে। দুজনকেই যখন বিয়ে করতে হবে তখন—

উজ্জ্বলা। [গম্ভীর ভাবে] তোমার সঙ্গে আলাপ না থাকলে তোমাকে পাগল মনে করতুম।

অনুক্ষণ। আমি পাগলই। ডাক্তারি শাস্ত্রের মতে সবাই একটু আধটু পাগল। তুমি নিজেও কি খুব স্বাভাবিক? তাহলে এতদিন সাত ছেলের মা হয়ে কোনও সৌভাগ্যবানের ঘর আলো করতে, এ সব উদ্ভট ব্যাপারে মাততে না। ওসব কথা ছেড়ে দাও, আমার আসল প্রস্তাবটার উত্তর দাও। তুমি কি ঠিক করেছ কখনও বিয়ে করবে না?

উজ্জ্বলা। আমি যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছি তাতে বিয়ে করা চলে কি?

অনুক্ষণ। তুমি এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছ বলেই তোমার বিয়ে করা উচিত। মিলের কাপড় বা বিলিতি কাপড় প'রে খদ্দর প্রচারের কাজ হয় না। নারীদের আত্মসম্মান জাগ্রত করতে চাও অথচ নিজে তুমি বিয়ে করবে না এ

আমি ভাবতেই পারি না। ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে যে নারীদের আত্মসম্মান রক্ষা করবার একমাত্র ভদ্র উপায় বিয়ে করা।

উজ্জ্বলা। যাকে তাকে বিয়ে করা নয়, ভদ্রলোককে বিয়ে করা।

অনুক্ষণ। নিশ্চয়ই। কিন্তু ভদ্রলোক মানে যদি ধনী বোঝ তাহলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভদ্রলোক মানে—

উজ্জ্বলা। ভদ্রলোক মানে ধনী নয় তা জানি, কিন্তু যিনি বিয়ে করে ভদ্রভাবে স্ত্রী পুত্র কন্যার ভরণ-পোষণ করতে পারেন না তিনিও নিশ্চয় ভদ্রলোক নন।

অনুক্ষণ। তিনি যদি অলস বা কর্মবিমুখ হন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ভদ্রলোক নন। কিন্তু কাজ করবার উৎসাহ যদি তাঁর থাকে তাহলে মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদন নিশ্চয়ই তিনি জোটাতে পারবেন। স্ত্রী পুরুষে মিলে কাজ করলে ভরণ-পোষণের অভাব হবে না কখনও। মোটর রেডিও দামী গয়না কাপড় না জুটতে পারে কিন্তু মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটবেই। [সানুনয়ে] তুমি আপত্তি কোরো না উজ্জ্বলা. তোমার গ্রাসাচ্ছাদন আমি জোটাতে পারবই। হেন কাজ নেই যা আমি জানি না। হোটেলের ওয়েটার হ'তে পারি, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে পারি, রিক্সা টানতে পারি, মোটর চালাতে পারি, ভাল রাঁধতে জানি, ঘড়ি সাইকেল মেরামত করতে জানি, শর্ট-হ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানি, নানারকম বাজনা বাজাতে পারি, বক্তৃতাও নেহাৎ মন্দ করি না, কেরানী হতে পারি, ছবি আঁকতে শিখেছি, এমন কি, ফেরিও করতে পারি। আমার আদর্শকে রূপ দিতে সাহায্য কর তুমি উজ্জ্বলা, আপত্তি কোরো না, দোহাই তোমার।

উজ্জ্বলা। তোমার আদর্শটা কি তাই তো বুঝতে পারছি না।

অনুক্ষণ। শান্তি। অনাড়ম্বর শান্তি। ছোটখাটো একটি নীড় বাঁধতে চাই মনোমত একটি সঙ্গিনী নিয়ে। তুমি তো জান আমার আপনার বলতে কেউ নেই। আমি আদর্শ সংসার পাততে চাই। আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার উপায় কি, দেখিয়ে দিতে চাই যে তার জন্যে খুব বেশী টাকা-কড়ির দরকার হয় না। তোমার জীবনেরও যখন ওই ব্রত তখন এস দু'জনে একসঙ্গে মিলে—

উজ্জ্বলা। মনে হচ্ছে ঘোড়ায় লাগাম দিয়ে এসেছ একেবারে! কিম্বা রসিকতা করছ—

অনুক্ষণ। না, রসিকতা নয়, সত্যি।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, ভেবে দেখব তাহলে। এখন বড় ব্যস্ত আছি। অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। তাছাড়া আমার দাদু আছেন তাঁকেও বলতে হবে তো।

অনুক্ষণ। দাদু, মানে ঠাকুর্দা ?

উজ্জ্বলা। না, মায়ের বাবা। তিনিই আমাদের মানুষ করেছেন।

অনুক্ষণ। তোমার মা বাবা কি ছেলেবেলাতেই—

উজ্জ্বলা। মা ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন। আর বাবা—থাক সে সব কথা পরে হবে এখন। বিয়ে করব কি না সেইটেই ঠিক করি আগে। তুমি উঠেছ কোথায় ?

অনুক্ষণ। কোথাও না। এসে একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম। চার দিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম কেউ চেনা-শোনা আছে কি না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কাল দেখলাম একজায়গায় খুব ভীড়, কাছে গিয়ে দেখি তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ। দাঁড়িয়ে শুনলাম বক্তৃতাটা, খুব ভাল লাগল। তুমি যে এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পার তা ধারণারই অতীত ছিল। সভায় যে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছিল তাতেই এখানকার ঠিকানা লেখা ছিল। তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় পরিচিত লোকের যখন নাগাল পেলাম না তখন ঠিক করলাম তোমার কাছেই উঠব আপাতত। তুমি কি এইখানেই থাক ? স্যুটকেসটা বাইরে রেখে এসেছি, নিয়ে আসব সেটা ?

উজ্জ্বলা। না, না, এখানে আমি থাকি না। এটা আপিস।

অনুক্ষণ। তোমার বাড়ির ঠিকানাটা কি বল তাহলে, সেইখানেই যাই।

উজ্জ্বলা। [ইতস্তত করিয়া] সেখানে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? মানে কোনও হোটেলে টোটেলে যদি—

অনুক্ষণ। হোটেলে থাকবার পয়সা নেই। যা ছিল তিন দিনে তা ফুরিয়ে গেছে। চার আনা পয়সা ছিল তা তোমাদের আপিসের চাকরটাকে দিলাম এইমাত্র—

উজ্জ্বলা। পশুপতিকে ? কেন !

অনুক্ষণ। এসেই বাইরে থেকে তোমার গলা শুনতে পেলাম। মনে হল আর একটা বক্তৃতার মহলা চলছে। বারান্দায় উঠে শুনতে গেলুম, শ্রীমান বাধা দিলে। সিকিটি বার করতে হল তখন। সিকিটি পেয়ে সেলাম করে সরে গেল [হাসিয়া] কিছু বোলো না যেন ওকে—

[পশুপতির প্রবেশ।]

পশুপতি। জগনলালবাবু এসেছেন।

উজ্জ্বলা। ও, আচ্ছা ডেকে আন [অনুক্ষণকে] তুমি তাহলে—

অনুক্ষণ। [শান্তভাবে] আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। তুমি কথাবার্তা শেষ করে নাও।

[উজ্জ্বলাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া অনুক্ষণ বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করিল। জগনলাল টিকাওয়ালাকে সহসা মাড়োয়ারী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কথা-বার্তা পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই বাঙালীর মতো। গায়ে দামী গরদের পাঞ্জাবি, পরনে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, পায়ে চকচকে কালো পাম্‌শু। বাঁ হাতের অনামিকায় একটি দামী হীরকের আংটি ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। কব্জীতে নবতম সংস্করণের একটি মূল্যবান হাতঘড়ি। হাতে একটি সুগন্ধি রুমাল। এই সব হইতে এবং তাঁহার কথা-বার্তার ধরন হইতে চতুর সন্ধানী হয়তো আন্দাজ করিতে পারিবেন যে তিনি মাড়োয়ারী কিম্বা মাড়োয়ারী-মনোভাবাপন্ন। আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু চিনিবার উপায় নাই। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।]

জগনলাল। [সহাস্যে] নমস্কার উজ্জ্বলা দেবী, আপনার মিটিং আজ ক'টায় সময় ?

উজ্জ্বলা। পাঁচটায়।

জগনলাল। [হাতঘড়ি দেখিয়া] তাহলে দেরি আছে এখনও। একটা জিনিস আলোচনা করবার ছিল।

উজ্জ্বলা। বলুন।

জগনলাল। আর নূতন কোন বিদ্রোহিনী কি আপনার খাতায় নাম লিখিয়েছে ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। কিছুদিন এখন আর ভরতি করবেন না।

উজ্জ্বলা। [সবিস্ময়ে] কেন ?

জগনলাল। যে দশজনের ভার আমরা নিয়েছি, তারই ধাক্কাটা সামলে নিই আগে দাঁড়ান। দশজন মেয়েকে হস্টেলে রেখে পড়ার খরচ দিচ্ছি, তাতেই মাসে প্রায় সাত শ' সাড়ে সাত শ' করে খরচ পড়ছে। তিনটি মেয়ের বাবা আমার নামে উকিলের চিঠি দিয়েছে। মেয়ে তিনটির নাম হচ্ছে—[পকেট হইতে মরক্কো চামড়া দিয়া বাঁধানো সুদৃশ্য একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া দেখিলেন] রেবা, মনীষা আর কমলা। এদের সঙ্গে মকোদ্দমা লড়তে হবে, তারও খরচ আছে। আচ্ছা, যে মেয়েগুলি এসেছে তাদের মধ্যে নাবালিকা কেউ নেই তো ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। সকলেই ফর্মে সই করে দিয়েছে যে তারা স্বেচ্ছায় বাপের আশ্রয় ত্যাগ করে আমাদের অর্থসাহায্য নিচ্ছে?

উজ্জ্বলা। নিশ্চয়। দু'জন উকিলের সামনে সই করেছে প্রত্যেকে।

জগনলাল। তবে তো ঠিক আছে। আর একটা কথা—

উজ্জ্বলা। কি বলুন।

জগনলাল। [প্রত্যেকটি কথা ওজন করিয়া] ধরুন, এই সব মেয়েদের যদি বিয়ের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে সেটা কি রকম ভাবে হবে?

উজ্জ্বলা। অসম্মানজনক কিছু হতে পারবে না। মেয়েটির তাতে সম্পূর্ণ মত থাকা চাই।

জগনলাল। জাতটাতের কোনরকম বিচার—

উজ্জ্বলা। আমরা কোনওরকম জবরদস্তি করব না। মেয়েটি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলেই আমরা রাজি হব।

জগনলাল। ও, আচ্ছা। স্বেচ্ছায় এবং স্বাধীনভাবে—আচ্ছা। ধরুন কোনও পাত্র স্বেচ্ছায় যদি কিছু যৌতুক দিতে চায়, কোন পাত্র চাইতেও পারে, তাহলে সে টাকাটা কে পাবে?

উজ্জ্বলা। মেয়েই পাবে। আমরা মেয়েটির জন্য যত টাকা খরচ করেছি তা কেটে নিতে পারি।

জগনলাল। ও, আচ্ছা আচ্ছা—বুঝেছি বুঝেছি—ঠিক।

উজ্জ্বলা। দেখুন, জগনলালবাবু, একটা কথা। কোনও মেয়ে যদি আমাদের আশ্রয়ে আসতে চায় আমি 'না' বলতে পারব না। জোর গলায় এত বক্তৃতা করার পর তা অসম্ভব। আপনার সঙ্গে যখন আমার কথা হয়েছিল তখন কিন্তু আপনি বলেন নি যে মাত্র দশটি মেয়েকে আমরা নিতে পারব।

জগনলাল। আহা হা, তা বলিনি বটে—কিন্তু সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো। বাংলা দেশের সমস্ত মেয়ের ভার নেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।

[উজ্জ্বলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল।]

উজ্জ্বলা। আমার চেষ্টার ফলে আপনি যে কনট্রাক্টটা পেয়েছেন তাতে আপনার অন্তত একলক্ষ টাকা লাভ থাকবে। আপনি লাভের অর্ধেক দিতে রাজি ছিলেন, এখন আবার পেছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

জগনলাল। পেছিয়ে যাইনি তো। লাভের অর্ধেক মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা। দশটি মেয়ের জন্যই বছরে লাগবে প্রায় দশ হাজার টাকা। [হাজারটাকে হাজ্জার বলিলেন] শুধু তাদের পড়াশোনার জন্যে। তাদের বাপেরা যদি

মকোদ্দমা করে তার খরচ আছে, কোন কোনও মকোদ্দমায় হেরে গিয়ে খেসারতও দিতে হতে পারে, কিছু বলা যায় না। সব রকম কথাই তো হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। সেই-জন্যে বলছি বেশী মেয়ে নেবেন না এখন।

উজ্জ্বলা। কিন্তু আপনার সঙ্গে যখন কথা হয়েছিল তখন এসব কথা আপনি বলেন নি, তখনই ভেবেচিন্তে বলা উচিত ছিল [ঈষৎ বাঁকা হাসি হাসিয়া] দেখুন জগনলালবাবু, টাকার জন্যে আটকাবে না কিছু, কখনও আটকায় না। মিস্টার ঘোষালকে বলে' আপনাকে চালের কনট্র্যাক্টটাও পাইয়ে দেব আমি।

জগনলাল। [সহসা গদগদভাবে হাত কচলাইয়া] বেশ তো, বেশ তো! আপনি একটু ইসারা করলেই হয়ে যাবে। বেশ, তাহলে মেয়ে নিন আপনি, কিন্তু ওরই মধ্যে একটু—মানে একটু—হিসাব করে নেন যদি,—আচ্ছা বেশ সে আপনার খুশি—

[বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।]

উজ্জ্বলা। [শশব্যস্ত] মিস্টার ঘোষাল এলেন বোধ হয়।

[পশুপতির প্রবেশ।]

পশুপতি। ডেপুটি সাহেব এসেছেন।

উজ্জ্বলা। বেশ তো, ডেকে নিয়ে আয়।

জগনলাল। [হঠাৎ উত্তেজিত] এই দেখো, আচ্ছা থাক আমি নিজেই যাচ্ছি।

[শশব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলেন।]

উজ্জ্বলা। কোথা যাচ্ছেন?

জগনলাল। আসছি। [প্রস্থান]

[নেপথ্যে মিস্টার ঘোষাল]। আসতে পারি?

উজ্জ্বলা। [স্মিতমুখে] নিশ্চয়!

[মিস্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বর্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট সাপ্লাই অফিসার। সমস্ত জেলার অন্নবস্ত্রের মালিক হওয়াতে যে কোনও লোককে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে পারেন। মুখে একটা সবজান্তা ভাব। পরিধানে খাকি হাফ প্যান্ট, হাফ শার্ট। এম. এ. ক্লাসে উজ্জ্বলার সহপাঠী ছিলেন।]

ঘোষাল। হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল তোমার সেই মাড়োয়ারী মক্কেল বুঝি! অত বড় কনট্র্যাক্টটা তো ওকে পাইয়ে দিলে, তোমার সমিতির সুবিধে হচ্ছে তো?

উজ্জ্বলা। দশজন মেয়ের খরচ দিচ্ছে। আরও দেবে বলেছে।

ঘোষাল। ওদের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস কোরো না। যা দিতে চায় নগদ নিয়ে নাও। কত দেবে বলেছে ?

উজ্জ্বলা। যা লাভ হবে তার অর্ধেক।

ঘোষাল। [বিস্মিত] লাভের অর্ধেক ? ঠিক মতো যদি ব্ল্যাকমার্কেট করতে পারে অন্তত লাখখানেক টাকা কামাবে। তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দেবে বলেছে ?

উজ্জ্বলা। বলেছে তো !

ঘোষাল। আদায় করে নাও, আদায় করে নাও।

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] আর একটা কনট্রাক্ট চাইছে—

ঘোষাল। এ টাকাটা আগে আদায় করে নাও তো। [সহসা] হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছিলুম। একটা ভাল বই আছে আজ সিনেমায়। আসছ তো ?

উজ্জ্বলা। আমার মিটিং আছে পাঁচটায়।

ঘোষাল। যেতে চাও তো 'কার' পাঠিয়ে দিতে পারি। সোজা মিটিং থেকেই যেও।

উজ্জ্বলা। থাক, দরকার নেই।

ঘোষাল। [চোখ মটকাইয়া] ঈষৎ দৃষ্টিকটু, না ? হা হা হা—বিদ্রোহ করতে নেবেছ, তখন ওসবের আর তোয়াক্কা কেন ?

উজ্জ্বলা। [অপ্রতিভ] না, না, সে জন্য নয়। আমার একটু কাজ আছে মিটিংয়ের পর।

ঘোষাল। পরশু দিনের পিকনিকে আসছ তো ?

উজ্জ্বলা। আসব। মিসেস ঘোষালও আসবেন আশা করি।

ঘোষাল। তা বলতে পারি না। তিনি তাঁর জ্যাম জেলি কুকুর উলবোনা পার্টি প্রভৃতি এত হরেক রকম কাজে ব্যাপৃত যে সময় করে উঠতে পারবেন কি না জানি না। তবে তাঁকে আসতে বলেছি। তুমি কিন্তু এসো নিশ্চয়।

উজ্জ্বলা। চেষ্টা করব।

ঘোষাল। চেষ্টা নয়, এসো নিশ্চয়। দেখি আমি যদি পারি তোমার মিটিংয়ে আসব [হাতঘড়ি দেখিলেন] হ্যাঁ, আর একটা কথা, জগনলাল সত্যিই যদি টাকাটা দেয়, আর কারও নাম করে দেয় যেন। যেন ওর মা দিচ্ছে বা বোন দিচ্ছে, বোন হলে আরও ভাল হয়।

উজ্জ্বলা। এ রকম করতে বলছ কেন ?

ঘোষাল। [হাসিয়া] দুই আর দুই যোগ করে চার করতে পারে এরকম লোকের অভাব নেই। যে জগনলাল আমার হাত দিয়ে অত টাকা লাভ করবার

সুযোগ পাচ্ছে সেই জগনলাল আমার বান্ধবী উজ্জ্বলা নন্দীর নারী সমিতিতে অত টাকা দিচ্ছে, ব্যাপারটা একটু বুঝলে না, চাকরি বাঁচাতে হবে তো—

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, বলব। এখনই বললে হ'ত, কোথা যে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শশব্যস্ত জগনলাল প্রবেশ করিলেন। তাহার পিছনে একটি বেয়ারা, বেয়ারার হস্তে একটি ট্রে, ট্রের উপর কয়েক গ্লাশ রঙীন শরবৎ।]

ঘোষাল। [যেন কিছুই জানেন না] এই যে জগনলালবাবু, কি খবর, এখানে কি মনে করে?

জগনলাল। [নমস্কারান্তে বিকশিত দন্ত] উজ্জ্বলা দেবীর সমিতির সঙ্গে কিছু যোগ আছে আমার। শরবৎ খান।

ঘোষাল। না, শরবৎ খাব না এখন। আচ্ছা চলি [উজ্জ্বলাকে] চললুম।

[ঘোষাল চলিয়া গেলেন।]

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] আপনি নেবেন শরবৎ?

উজ্জ্বলা। না।

জগনলাল। [বেয়ারাকে] নিয়ে যাও তাহলে। তোমরাই খাও গে। দাম আমি দিয়ে দিয়েছি।

[বেয়ারা চলিয়া গেল।]

জগনলাল। ডেপুটি সাহেব রাগ টাগ করলেন নাকি?

উজ্জ্বলা। না, রাগ করবেন কেন?

জগনলাল। ওই কন্‌ট্র্যাক্টটার কথা বললেন?

উজ্জ্বলা। বললাম।

জগনলাল। কি বললেন তাতে?

উজ্জ্বলা। হয়তো হয়ে যাবে।

জগনলাল। [উল্লসিত] হয়ে যাবে? সত্যি? তাহলে তো কোনও ভাবনা নেই!

উজ্জ্বলা। একটা কথা আপনাকে বলতে চাই জগনলালবাবু, কিছু মনে করবেন না।

জগনলাল। কি বলুন?

উজ্জ্বলা। আপনি যে টাকাটা আমাদের দিতে চাইছেন সেটা যদি আমাদের সমিতিকে দিয়ে দেন তাহলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

জগনলাল। অগ্রিম দিতে বলছেন? অগ্রিম কেন? আমি তো আপনাদের খরচ চালিয়ে যাচ্ছি, যাবোও বরাবর—

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] কিন্তু ধরুন কোনও কারণে যদি আপনি টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন তাহলে কি মুশকিলে পড়ব আমি।

জগনলাল। না, না, তা কি কখনও বন্ধ করতে পারি?

উজ্জ্বলা। কিন্তু দেখুন, অগ্রিম দিয়ে দেওয়াই ভাল। ভেবে দেখবেন কথাটা।

জগনলাল। [তৎক্ষণাৎ সম্মত] আচ্ছা, বেশ ভেবে দেখব।

উজ্জ্বলা। আর একটা কথা বলছিলেন মিস্টার ঘোষাল।

জগনলাল। [সাগ্রহে] কি?

উজ্জ্বলা। বলছিলেন যে, আপনি যে টাকাটা সমিতিকে দেবেন সেটা যদি আপনার মা কিম্বা বোনের নাম করে দেন ভাল হয়।

জগনলাল। কেন?

উজ্জ্বলা। আপনার নাম থাকলে একটু ইযে, মানে,—পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে, মানে আপনাকে কনট্রাক্ট দেওযার সঙ্গে মিস্টার ঘোষাল আর আমার নাম জড়িয়ে কুৎসা রটাবার স্থযোগ পাবে লোকে। সমিতির শত্রুর তো অভাব নেই।

জগনলাল। ঠিক। ঠিক বলেছেন, শত্রুর অভাব নেই। আচ্ছা ভেবে দেখব। আচ্ছা, আমি তবে যাই এখন। আপনার সঙ্গে মিটিংয়ে হয়তো দেখা হবে। মিটিংয়ে যদি না যেতে পারি খবর পাঠাব আপনাকে। আচ্ছা নমস্কার।

[জগনলাল চলিয়া গেলেন। উজ্জ্বলা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্যানিটি ব্যাগটি একবার খুলিয়া পুনরায বন্ধ করিল।]

উজ্জ্বলা। পশুপতি—

[পশুপতির প্রবেশ।]

পশুপতি। কি মা?

উজ্জ্বলা। আপিস বন্ধ করে দাও, আমি চললাম।

পশুপতি। আচ্ছা। সেই বাবুটি বাইরে ব'সে আছেন।

উজ্জ্বলা। ও, আচ্ছা পাঠিয়ে দাও তাঁকে।

[পশুপতি চলিয়া গেল। অনুক্ষণ গুপ্ত প্রবেশ করিল।]

অনুক্ষণ। অবসর হল তোমার?

উজ্জ্বলা। তুমি ব'সে আছ এখনও?

অনুক্ষণ। অন্য কোথাও যাবার তো জায়গা নেই। তোমার বাড়িতেই উঠব বললাম যে।

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] আমার বাড়িতে ? আমার বাড়িতে কিন্তু—

অনুক্ষণ। অসুবিধে আছে বলছ ? [হাসিয়া] পৃথিবীতে কোথায় আজকাল সুবিধে আছে বল। চল যাওয়া যাক, নিতান্তই অসুবিধা যদি হয়, ফুটপাথ তো আছে। সবেতেই অভ্যস্ত আমি। আমি আর কিছু চাই না, একটু শোওয়ার জায়গা চাই কেবল, বারান্দাতে হলেও চলবে। এখনই বসে বসেই কাজ জোগাড় করে ফেলেছি একটা।

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] এখনই ব'সে ব'সে কি কাজ জোগাড় করে ফেললে ?

অনুক্ষণ। ফেরির কাজ। তোমাদের আপিসের সামনে ওই যে শরবতের দোকানটা রয়েছে তার সঙ্গেই বন্দোবস্ত করে ফেললুম। গ্লাশ পিছু এক পয়সা করে দেবে [হাসিয়া] Any port in the storm। আচ্ছা, যে দুটি ভদ্রলোক এসেছিলেন এখন, তাঁরাও কি সমিতির সভ্য না কি ?

উজ্জ্বলা। চল রাস্তায় যেতে যেতে সব বলছি।

[উভয়ে যাইবার জন্য উদ্যত এমন সময় প্রায় ছুটিয়া উজ্জ্বলার ছোট ভাই উৎসাহ প্রবেশ করিল। উৎসাহের বয়স বাইশ তেইশ।]

উৎসাহ। [উত্তেজিত] দিদি, টেলিগ্রাম এসেছে বাবা আসছেন আজ। দাদু তোমায় ডাকছে।

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] বাবা আসছেন ! সে কি ?

উৎসাহ। হ্যাঁ, টেলিগ্রাম এসেছে, আমি নিজে দেখে এসেছি। সত্যি দিদি আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা, দিদি তোমার বাবাকে মনে আছে ?

[সহসা অনুক্ষণকে দেখিয়া সে অনুভব করিল যে বাহিরের লোকের সাক্ষাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ আলোচনা করাটা অশোভন হইতেছে।]

উৎসাহ। চল, বাড়ি চল। দাদু ডাকছে তোমায়।

[উজ্জ্বলা গম্ভীর ও বিমর্ষ হইয়া পড়িল।]

উজ্জ্বলা। চল।

[সকলে চলিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করিলেন। অপর দিক দিয়া পশুপতিও ঢুকিল।]

জগনলাল। উজ্জ্বলা দেবী কি চলে গেছেন ?

পশুপতি। এখুনি গেলেন।

জগনলাল। বাইরে যে ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন তাকে ডেকে দাও তাহলে।

[পশুপতি চলিয়া গেল। অনৈক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।]

জগনলাল। আপ বাংগালি লড়কি সে সাদী করনে চাহ্তে হেঁ ?

পাঞ্জাবী। হাঁ বাবু।

জগনলাল। আপ কৌন সা কাম করতে হেঁ ?

পাঞ্জাবী। বিজনেস্। কন্ট্রাক্টর।

জগনলাল। মেরে খরচে সে হস্টেল মে যো লড়কিঁয়া পঢ়তী হ্যায় উনমেসে আপ নে কিসি কো দেখা ?

পাঞ্জাবী। দূর সে দেখা।

জগনলাল। আপ কো কোই পশন্দ হ্যায় ?

পাঞ্জাবী। হাঁ।

জগনলাল। ক্যা আপ পরিচয় করনা চাহ্তে হেঁ ?

পাঞ্জাবী। [সাগ্রহে] হাঁ বাবু।

জগনলাল। আচ্ছা, তো ফির আপ সিন্মামে আইয়ে। উন্ লোগোঁ কি ভি ম্যয় পাশ ভেজ দুংগা। পরন্তু এক লেড়কিকে লিয়ে দশ হাজ্জার রুপিয়া লাগেঙ্গে ইসে তো হাম্ নে পহলেই কহ দিয়া হ্যায় মেরে এজেন্টকে মারফৎ [হাসিয়া] লেকিন রসিদ পাঁচ হাজ্জার কা দুংগা।

পাঞ্জাবী। দেংগে।

জগনলাল। [হাসিয়া] কোই সে দোস্তি জমাইয়ে, ট্যাক্সি মে চঢ়াইয়ে, সিন্মা দেখলাইয়ে। হো জায়েগা ঠিক।

পাঞ্জাবী। আচ্ছা।

জগনলাল। আর তো কোই কাম নেহি ?

পাঞ্জাবী। নেহি।

জগনলাল। আচ্ছা তব চলিয়ে।

প্রথম বিরতি

২

[উজ্জ্বলার বাড়ি। উজ্জ্বলার বোন উৎপলা গ্রামোফোনে তিলক কামোদের একটি রেকর্ড বাজাইয়া বাজাইয়া সেতারে সেটি তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। উৎপলা উজ্জ্বলা অপেক্ষা বছর দেড়েকের ছোট। সুশ্রী। বাজারের থলি হস্তে শিবু সেন প্রবেশ করিল। শিবুর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। মাঝারি দোহারা চেহারা। স্বাস্থ্যবান। শিবু উৎপলার পাণি-প্রার্থী। শিবু প্রবেশ করিতেই উৎপলা গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া দিল এবং সেতার সরাইয়া রাখিল।]

উৎপলা। [সাগ্রহে] শিবুদা, মাখন এনেছ ?

শিবু। এনেছি। কিন্তু উৎপলা, আমার ধৈর্যও এবার সীমা অতিক্রম করছে—

[বাজারের থলি নামাইয়া রাখিল।]

উৎপলা। মাখন খুঁজতে খুব ঘুরতে হল বুঝি ? মাখন না হলে কেক হবে কি করে ? কেক খেতে চাইছ অথচ—

শিবু। না, না, মাখনের কথা হচ্ছে না। তোমার দাদু আমার পেছনে স্পাই লাগিয়েছেন।

উৎপলা। স্পাই ! কেন ?

শিবু। আমার আর কোথাও বিয়ে হয়েছে কি না জানবার জন্যে। মানে উনি সন্দেহ করছেন, যে-আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই সেই-আমি লুকিয়ে আরও গোটা কয়েক বিয়ে করে ব'সে আছি। উফ্, মানুষের আত্মসম্মান এতে বজায় থাকে কখনও ? এরকম সন্দিগ্ধচেতা লোক !

উৎপলা। [লীলাভরে] দাদুর চাকরি তুমি ছেড়ে দাও না।

শিবু। তা যে পারি না [আবেগভরে] তোমাকে না দেখে যে একদণ্ড থাকতে পারি না।

উৎপলা। না, কাল থেকে তুমি আর এসো না। যখন আত্মসম্মানেই আঘাত লাগছে তখন আসবার দরকার কি [হঠাৎ উষ্মাভরে] দাদুর ফাইফরমাস খাটবার জন্যে তুমি এখানে এসে রোজ ধর্ণা দাও তাতে আমারও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

[রোষভরে সবেগে চলিয়া গেল। পিছনের দ্বার দিয়া নিঃশব্দ-চরণে দুর্গাপদ প্রবেশ করিলেন এবং শিবুর দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। দুর্গাপদ বৃদ্ধ। বয়স সত্তরের উপর। দেহটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মুখ বলি-রেখা-অঙ্কিত। মাথার চুল সাদা। টাক নাই। চোখের পলক কম পড়ে। বাঁধানো দাঁত। গোঁফদাড়ি কামানো। শিবু তাঁহাকে প্রথমে দেখিতে পাইল না।]

শিবু। যা ব্বাবা। বড় প্যাঁচে পড়া গেল দেখছি। ভেস্তে গেল না কি সব। উৎপলা, ও উৎপলা—

[ঘাড় ফিরাইতেই দুর্গাপদর সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। দুর্গাপদ নীরবে তাঁহার চক্‌চকে বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন এবং আর একটু আগাইয়া আসিলেন।]

দুর্গাপদ। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি শিবু।

শিবু। কিসে?

দুর্গাপদ। তোমার অভিনয়ে। পছন্দ হয়েছে তোমাকে আমার। উৎপলাকে তোমার হাতেই সম্প্রদান করব।

শিবু। [নিম্নকণ্ঠে] টাকাটা জোগাড় করতে পেরেছেন? আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি [এদিক ওদিক চাহিয়া] টাকার ভয়ানক দরকার আমার।

দুর্গাপদ। টাকাও দেব। বলেছি যখন দেব। পাঁচ হাজার টাকা তো? দেব। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? দেব।

শিবু। কেন ব্যস্ত হচ্ছি তাও তো আগেই বলেছি। আগামী মাসের মধ্যে পিতৃঋণ শোধ করতে না পারলে বিষয়টা বিকিয়ে যাবে। আর ওই আমার যথা-সর্বস্ব। বিষয়টা বাঁচাবার জন্যে আমি বিয়ে করতে চাইছি।

দুর্গাপদ। বিষয় বাঁচবে [চক্‌চকে বাঁধানো দাঁতগুলি আবার বিকশিত করিলেন] তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। কুল, গণ, গোত্র, কুষ্ঠি সব মিলেছে। বংশও ভাল, আত্মীয়-স্বজনদের কোনও ঝামেলা নেই, লেখাপড়া শিখেছ, যেমনটি চাইছিলুম। তাছাড়া সবচেয়ে বড় বখেড়া ছিল যেটা সেটাও মিটে গেছে। উৎপলা পছন্দ করেছে তোমাকে। তার কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির অভিনয় ভাল করেছ তুমি, বেশ ভাল করেছ।

শিবু। আমি আর বিয়ে করেছি কি না সে খোঁজও তো নিয়েছেন শুনলুম।

দুর্গাপদ। [চকিতে শিবুর মুখের দিকে চাহিয়া] তা নিয়েছি। সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি।

শিবু। তাহলে আর দেরী করছেন কেন ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলার জন্যেও সম্বন্ধ করেছি একটি। পাত্র নিজেই তাকে দেখতে আসবে, হয়তো আজই আসবে। উজ্জ্বলা বড় তো, তাকে পাত্রস্থ না করে উৎপলার বিয়ে দিই কি করে। [হাসিলেন।]

শিবু। ও বাবা। তাহলে তো বিশ বাঁও জল। আপনি কি ভেবেছেন পাত্র আসলেই উজ্জ্বলাদি বিয়ে করবেন ? এন-এস্-আর-এসের প্রেসিডেন্ট উনি—

[দুর্গাপদ খানিকক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা এক পা আগাইয়া আসিলেন।]

দুর্গাপদ। করবে, করতে হবে। তা নাহ'লে আমার বাড়ি থেকে দূর করে তাড়িয়ে দেব আমি।

শিবু। পারবেন ? আপনি তো উজ্জ্বলাদির সামনে কথাই বলতে পারেন না।

দুর্গাপদ। পারিনি বটে এতদিন, কিন্তু আজ যিনি আসছেন তাঁর সাহায্যে পারব।

শিবু। তিনি আবার কে ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলার বাবা।

শিবু। সে কি। এদের বাবা আছে না কি। শুনিনি তো এতদিন ?

[দুর্গাপদ নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন ক্ষণকাল। তাহার পর উত্তর দিলেন।]

দুর্গাপদ। আছে, বাবা আছে।

শিবু। কোথা থাকেন তিনি ?

দুর্গাপদ। কোথা থাকেন তা—[ইতস্তত করিয়া] সম্প্রতি আসছেন মীরাট থেকে।

শিবু। তাহলে তিনিও তো এসে বাগড়া লাগাতে পারেন [সহসা সক্ষোভে] উঃ, কি কুক্ষণেই যে ট্রামে সেদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বেশ ভাল একটা সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল আপনার জন্যে, তারাও পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি ছিল, মেয়েটিও সুশ্রী শুনেছিলাম।

দুর্গাপদ। তা আফশোষ করার দরকার কি, এখনও তো ফিরে যেতে পার। তোমার মতো পাত্রকে পাঁচ হাজার টাকা দেবার মতো ঢের লোক আছে দেশে। তা আছে।

শিবু। তা আছে জানি। কিন্তু উৎপলার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর এবং তার সঙ্গে এতদিন ধরে এমন মাখামাখি করে—মানে—

[দুর্গাপদ আবার নীরবে চক্চকে দাঁতের পাটি বাহির করিয়া হাসিলেন।]

দুর্গাপদ। তাহলে ছটফট কোরো না। টাকার জন্তে ভাবনা নেই। আমার জামাইটি টাকার কুমীর। সংসার খরচের জন্তে সাতশ' টাকা করে পাঠায় প্রতিমাসে, চাট্টিখানি কথা নয়।

শিবু। কি করেন তিনি ?

দুর্গাপদ। [নির্বিকার ভাবে] আগে বিবাহ করতেন, এখন ব্যবসা করেন।

শিবু। [বিস্মিত] বিবাহ করতেন ? মানে।

দুর্গাপদ। প্রথম বিয়ে করে শৈলকে, আমার একমাত্র মেয়ে শৈলকে। নগদ পণই দিয়েছিলাম তিন হাজার টাকা, সে যুগে তিন হাজার টাকা, চাট্টিখানি কথা নয়। ঘরজামাই করেছিলাম, তখন ওর বয়সই বা কত, বড় জোর বাইশ। উজ্জলার দিদিমা আগেই গত হযেছিলেন। মেয়ে-জামাই নিয়ে নতুন সংসার পাতলুম, ভাবলুম শান্তিতে জীবনটা কাটবে। বছর চারেক বেশ রইল ; তারপর উৎসাহ যেবার হল, ও যখন আঁতুড়ে, তখন হঠাৎ উধাও হল একদিন। কথা নেই বার্তা নেই, উধাও। কিছুদিন কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম, কত জায়গায় চিঠি লিখলুম, কোনও পাত্তা পেলাম না। মাস ছয়েক পরে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেলুম, আবার বিয়ে করেছে কাশীতে। সেই দুঃখে আমার মেয়ে আত্মহত্যা করলে [ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ] হ্যাঁ, আত্মহত্যা করলে। ঠিকানা জোগাড় করে চিঠি লিখলুম। এল না। টাকা পাঠিয়ে দিলে। টাকা, হ্যাঁ টাকা। তারপর থেকে বরাবর টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে, আর আসেনি। শুনেছি লুকিয়ে লুকিয়ে আরও বিয়ে করেছে গুটি কয়েক।

শিবু। বলেন কি। নাম কি ভদ্রলোকের ?

দুর্গাপদ। সিদ্ধার্থ নন্দী।

শিবু। সিদ্ধার্থ নন্দী ? যার রঞ্জন আলতা ?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ সেই। শুধু রঞ্জন আলতা নয়, অনেক কিছু আছে ওর। ওষ্ঠ-রঞ্জিনী লিপষ্টিক্, ভ্রূ-শোভা টিপ, পরাগ পাউডার, চিন্ময় চুড়ি, তুহিন স্নো, বেণী-বিনোদিনী তেল। এসেন্সও আছে কয়েক রকম। তাছাড়া 'যৌবন-বিলাস' বলে সচিত্র বই লিখিয়েছে একখানা কোন ভাল লেখককে দিয়ে, সেটার খুব বিক্রি। কালিদাসের শৃঙ্গার-তিলক, ঋতুসংহার, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, জয়দেবের

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ, এগুলোও সব অনুবাদ করিয়ে ছবি দিয়ে ছাপিয়েছে। কয়েকখানা ইংরেজি বইও না কি তরজমা করাচ্ছে—

[শিবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ ব্যাদৃত আননে শুনিতেছিল। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।]

শিবু। আচ্ছা, ইনিই কি প্রত্যেক কাগজে নারী-শক্তি-রক্ষা-সংসদের বিজ্ঞাপন দেন ?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ, ইনিই। প্রচুর টাকা কামিয়েছে।

শিবু। উজ্জ্বলাদি, উৎপলা এসব জানে ?

দুর্গাপদ। উজ্জ্বলা উৎপলা জানে, কিন্তু উৎসাহকে বলিনি। সে জানে তার বাবা বার্মায় থাকে।

শিবু। বাবার আসল নাম পর্যন্ত জানে না ?

দুর্গাপদ। না। সে জানে তার বাবার নাম সুবোধ নন্দী। এস. নন্দী সই করা চিঠিপত্র আসে মাঝে মাঝে, কচিৎ অবশ্য, তার থেকেই সুবোধ নন্দী নামটা বানিয়ে দিয়েছি। সেদিনই ও বলছিল এবার ছুটিতে বার্মা যাবে।

শিবু। চিঠিতে কোনও ঠিকানা দেন না ?

দুর্গাপদ। আগে আগে কোনও ঠিকনা থাকত না। শেষ চিঠিতে মৌরাটের ঠিকানা ছিল, সে চিঠি উৎসাহকে দেখাই নি।

শিবু। সে পোস্টমার্কও দেখেনি ?

দুর্গাপদ। সন্দেহ হলেই লোকে ওসব করে। ওর তো কোনও সন্দেহ হয়নি। আল ব্যাপারটা জানতে পারলে ও যে কি করবে সেইটেই হয়েছে আমার প্রধান চিন্তা। উজ্জ্বলার কাছে পাঠিয়েছি তাকে, উজ্জ্বলা যদি কায়দা করে খবরটা ভাঙতে পারে। বড় একরোখা গোছের ছেলে—আজকালকার ছেলে তো—বড্ড ভয় করে [অসহায় ভাবে] বড্ড ভয় করে—অথচ—

শিবু। আপনারা টাকা পান কি করে ?

দুর্গাপদ। ব্যাঙ্কের মারফত পাই। তাতে কোনও অসুবিধা হয় না।

শিবু। এরকম লোকের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রেখেছেন কেন তাই তো বুঝতে পারছি না।

দুর্গাপদ। টাকার জন্যে। আমি টাকা কোথায় পাব ? সে টাকা না দিলে কি তার ছেলেমেয়েদের এমনভাবে মানুষ করতে পারতুম ! এই যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব বলছি, সেই দেবে। উজ্জ্বলার সঙ্গে যে ছেলেটির সম্বন্ধ করছি সে-ও টাকা না হলে বিয়ে করবে না।

শিবু। কিন্তু সে রকম লোককে উজ্জ্বলাদি বিয়ে করতে রাজী হবেন কী? উনি হলেন এন. এস্. আর. এসের প্রেসিডেন্ট—

দুর্গাপদ। উৎপলা তোমাকে বিয়ে করছে কি করে? সেও তো ওই দলের। তোমাকে যেমন লুকিয়ে পণ দিচ্ছি তাকেও তেমনি দিতে হবে। বুঝলে না, পণ না দিলে কি বিয়ে হয়—কিন্তু ওরা তা বুঝবে না—

শিবু। উৎপলা কি জানে যে তার বাবা আসছে?

দুর্গাপদ। এখনও শোনাই নি। টেলিগ্রামটা রাস্তায় পেলুম, উৎসাহকে দেখিয়েছি কেবল। তুমি পারো তো কায়দা করে ভাঙ না খবরটা ওর কাছে। খবরটা, বুঝলে না,—চুপ, উৎপলা আসছে—

[গুণ গুণ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে উৎপলা প্রবেশ করিল।]

উৎপলা। মাখনটা দাও শিবুদা, কেকটা করে ফেলি।

শিবু। এই যে।

[বাজারের থলি হইতে মাখনের টিন বাহির করিয়া দিল।]

উৎপলা। তোমার কি এখন কোনও কাজ আছে শিবুদা?

শিবু। না, কেন?

উৎপলা। তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করবে এস না লক্ষ্মীটি। বেকিং পাউডারটা ভাল করে মিশিয়ে দাও না ময়দার সঙ্গে, সেদিন যেমন দিয়েছিলে।

শিবু। চল।

[যাইবার পূর্বে শিবু দুর্গাপদর দিকে চাহিল। চোখে চোখে উভয়ের কি একটা কথা যেন হইয়া গেল। উৎপলা ও শিবু চলিয়া যাইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুষমা পালিত ও বীথিকা প্রবেশ করিল। বীথিকার বয়স বছর দশ বারো। বেশ সুশ্রী চেহারা।]

সুষমা। উজ্জ্বলা ফেরেনি এখনও?

দুর্গাপদ। না।

সুষমা। [বীথিকাকে] তোমার বাড়ি তো চেনা হয়ে গেল, তুমি না হয় পরে কোনও সময় এসে নাচটা তোমায় দেখিয়ে যেও। আমি এখন যাচ্ছি। উজ্জ্বলা এখনই আসবে, তুমি অপেক্ষা করতে চাও তো, তাই কর।

বীথিকা। বেশ, অপেক্ষাই করছি।

দুর্গাপদ। [বিব্রত ও বিস্মিত] নাচ! কিসের নাচ?

সুষমা। আমাদের সমিতিতে একটা অভিনয় হবে। তাতেই নাচবে মেয়েটি [বীথিকাকে] আমি যাই তাহলে, তুমি বস।

[সুষমা চলিয়া গেল।]

দুর্গাপদ। [বীথিকাকে] তোমার নাম কি ?

বীথিকা। বীথিকা।

দুর্গাপদ। কাদের বাড়ির মেয়ে তুমি ?

বীথিকা। আমার বাবার নাম কালীকান্ত বিশ্বাস। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। ইভাকুই।

দুর্গাপদ। বটে ! তুমি নাচতে পার ? বাঃ।

বীথিকা। [উৎসাহিত] দেখবেন ?

[দুর্গাপদ কিছু বলিবার পূর্বেই বীথিকা মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া নাচ শুরু করিয়া দিল। দুর্গাপদ মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে একটা স্মিত ভণ্ড হাসি ফুটাইয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। নাচ কিন্তু বেশিক্ষণ চলিতে পাইল না। ক্রুদ্ধ উৎসাহ প্রবেশ করাতে সব নষ্ট হইয়া গেল।]

উৎসাহ। দাদু, এতদিন মিছে কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিলে কেন তুমি ?

দুর্গাপদ। [শশব্যস্ত হইয়া বীথিকাকে] তুমি পাশের ঘরে গিয়ে বস একটু, উজ্জ্বলা এলে ডাকব তোমায়। ওই—ওই ঘরটায়।

[বীথিকা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।]

উৎসাহ। জবাব দাও, আমার বাবার সত্য পরিচয় গোপন করে রেখেছিলে কেন ?

[দুর্গাপদ অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন। একবার কেবল ঘাড় ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন। তাহার পর উৎসাহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

উৎসাহ। জবাব দিচ্ছ না যে ?

দুর্গাপদ। আমার দুঃখ কি কেউ তোরা বুঝবি না ? কত দুঃখে যে ছেলের কাছ থেকে তার বাপের পরিচয় গোপন রাখতে হয় তা [ঢোঁক গিলিয়া] লেখাপড়া শিখেও তুই বুঝতে পারলি না ?

উৎসাহ। না, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জেনেশুনে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও হেতু আমি বুঝতে পারছি না।

দুর্গাপদ। তোর বাপের পরিচয় কি দেবার মতন ?

উৎসাহ। আমার বাপের পরিচয় যেমনই হোক তা জানবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

দুর্গাপদ। তাহলে কি তুই সমাজে মাথা উঁচু করে বেড়াতে পারতিস? এই যে তুই কলেজের একজন নামকরা ছেলে হয়েছিস, তা কি হতে পারতিস তোর বাবার আসল পরিচয় পেলে? মাথা হেঁট হয়ে যেত, মন দুমড়ে যেত, বুদ্ধি মরে যেত—

উৎসাহ। গেলেই ব। রাস্তায় ফুটপাতে শুয়ে সসম্মানে দরিদ্রের জীবন যাপন করতেও আমাব আপত্তি ছিল না। তুমি কেন ওই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমাদেব এই ঐশ্বর্যেব মধ্যে মানুষ করেছ, যার মধ্যে লজ্জা আর গ্লানি ছাড়া আর কিছু নেই?

দুর্গাপদ। [সহসা এক পা আগাইয়া] তোমার বাবা তোমার খরচ দিতে বাধ্য।

উৎসাহ। তিনি দিতে বাধ্য হলেও আমি নিতে বাধ্য নই, যদি সেটা অসম্মানজনক হয়।

দুর্গাপদ। বাপ ছেলেকে মানুষ করছে এর মধ্যে সম্মান-অসম্মানের কথা আসছে কি করে—

উৎসাহ। যে বাবার অত্যাচারে আমার মা আত্মহত্যা করেছেন, যিনি ক্রমাগত ঠকিয়ে বিয়ে করে বেড়িয়েছেন সারা-জীবন—

দুর্গাপদ। সারাজীবন নয়, চারটি।

উৎসাহ। নাবী-শক্তি-রক্ষা-সংসদ নাম দিয়ে যিনি [সহসা] উঃ কি করেছ তুমি—চাই না—কিছু চাই না এসব—

[হঠাৎ গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা ও পায়ের দামী পাম-শু জোড়া খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।]

এই নাও। কাপড় আর গেঞ্জিটাও পরে পাঠিয়ে দেব। সম্ভব হলে তাঁর টাকা দিয়ে যে বিদ্যাটা লাভ করেছি সেটাও উপড়ে ফেলে দিতাম মন থেকে। চললুম।

[দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।]

দুর্গাপদ। ওরে, শোন, শোন, কোথা চললি—

[উৎসাহের পিছু পিছু যাইতেছিলেন, উজ্জ্বলা ও অনুক্ষণ প্রবেশ করাতে থামিয়া গেলেন। অনুক্ষণের হাতে একটি মলিন স্যুটকেস।]

উজ্জ্বলা। উৎসাহ এখান থেকেও বেরিয়ে গেল?

দুর্গাপদ। হ্যাঁ, রেগে মেগে চলে গেল। ওকে কি বলেছিস?

উজ্জ্বলা। সব বলেছি। পার্কে বসে সমস্ত কথা খুলে বললাম। বলাই ভাল, গোপন তো আর রাখা যাবে না।

দুর্গাপদ। সমস্ত বলেছিস?

উজ্জ্বলা। সমস্ত। রেখে ঢেকে কতক্ষণ আর চলবে?

দুর্গাপদ। ও যে চলে গেল [অসহায় ভাবে] কি করি এখন?

উজ্জ্বলা। যাবে আর কোথায়। তুমি ডাকলেই আসবে এক্ষুনি। দেখ না কোথায় গেল। শোনামাত্রই পার্ক থেকেও উঠে হনহন করে চলে এল, আমি ডাকলাম ফিরে চাইলে না। দেখ না, তোমার কথায় ঠিক আসবে।

দুর্গাপদ। দেখব? আমার কথায় আর আসবে কি ও?

[দুর্গাপদ আড়চোখে একবার অনুক্ষণের দিকে চাহিলেন। চাহিতেই অনুক্ষণ স্যুটকেসটি নামাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

দুর্গাপদ। ইনি কে?

উজ্জ্বলা। আমার বন্ধু একজন!

দুর্গাপদ। ও [দ্বারের দিকে চাহিয়া] দেখব না কি উৎসাহকে?

উজ্জ্বলা। দেখ না। তুমি গায়ে একটু হাত টাত বুলিয়ে ডাকলেই আসবে। দেখ ওর বন্ধু যোগেনের দোকানে বসে আছে হয়তো।

[দুর্গাপদ চলিয়া গেলেন।]

অনুক্ষণ। [উজ্জ্বলাকে] আমার স্যুটকেসটা রাখি কোথায় বল তো। [চারিদিকে চাহিয়া] ওই কোণটাতেই ভাল হবে।

[ঘরের একটি কোণে স্যুটকেসটি রাখিয়া দিল।]

উজ্জ্বলা। আমার বাবার সমস্ত পরিচয় শোনার পরও তোমার মত বদলাল না?

অনুক্ষণ। কিছুমাত্র না। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে [সানুনয়ে] সত্যি কি আপত্তি করবে উজ্জ্বলা? কোরো না, বুঝলে?

উজ্জ্বলা। [টেবিলে ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখিয়া] কিন্তু পাত্র হিসাবে তুমি কি খুব সৎ পাত্র? [হাসিয়া] বেছেই যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে—

অনুক্ষণ। [প্রায় সঙ্গে সঙ্গে] তাহলে আমি হেরে যাব। রাগ যদি না কর তাহলে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে, উত্তর যদি দিতে চাও সত্য উত্তরটা দিও।

উজ্জ্বলা। কি? বল।

অনুক্ষণ। বেছে রেখেছ কি কাউকে?

উজ্জ্বলা। না।

অনুক্ষণ। তবে আর কবে বাছবে, বয়স তো ত্রিশ হল, না ?

উজ্জ্বলা। বৎসরের মাপকাঠি দিয়ে বয়স ঠিক হয় না [সহসা উদ্দীপ্ত চক্ষে] আমার বয়স ষোল বছরের বেশী হয়নি।

অনুক্ষণ। শুনে সুখী হলাম। বেশ, তোমার কাছে আমার দরখাস্তটা পেশ করা রইল। তোমার হিসেবে আমার বয়সও তেইশ চব্বিশের বেশী নয়। যে দিন ডাক দেবে আসব। আমার স্যুটকেশটা থাক তোমার কাছে আপাতত। একটা আস্তানা ঠিক হলেই নিয়ে যাব এসে। আচ্ছা, চলি তাহলে।

উজ্জ্বলা। এলেই যদি এর মধ্যেই যাচ্ছ কেন, বস না একটু। চা খাও, দেখি উৎপলা কি করছে।

অনুক্ষণ। আমি চা খাই না।

উজ্জ্বলা। বিলেত-ফেরত লোক চা খাও না কি রকম ?

অনুক্ষণ। চা কেন মদ পর্যন্ত খেতাম। সব ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর পোষায় না। আমি যাই বুঝলে, আমাকে সেই শরবৎ ফেরির ব্যবস্থাটা করতে হবে, যদি সময় পাই তোমাদের মিটিংয়েও যাব।

উজ্জ্বলা। একটু ব'স তবু [সহসা] আমার বড় ভয় করছে অনুদা।

অনুক্ষণ। ভয় ? কেন ?

[উভয়ে চেয়ার টানিয়া টেবিলের দুইপাশে বসিল।]

উজ্জ্বলা। বাবা যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন। তাঁর চেহারাও ভাল মনে নেই আমার। তাঁর দুষ্কৃতির কথা সব শুনেছি, সব শুনেও টাকা নিয়েছি। প্রতিদিন ঘৃণা করেছি মনে মনে অথচ প্রতি মাসে দৌড়ে গেছি ব্যাংকে টাকা আনতে। নিষ্ঠুর নিয়তির মতো ভেবে এসেছি যাঁকে এতকাল, তিনি আজ সশরীরে আসছেন। কি যে করব [সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িল] উঃ ম'রে যেতে ইচ্ছে করছে, কি অসহায় আমরা। মানুষ নই পোকা। পোকারও স্বাধীনতা আছে আমাদের নেই।

অনুক্ষণ। আলবৎ আছে। যে মুহূর্তে তুমি ঠিক করবে আমি এখন থেকে স্বাধীন সেই মুহূর্তেই স্বাধীন তুমি। নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির নেত্রী তুমি—তোমার মুখে এসব কথা সাজে না। তোমার বাবার সঙ্গে যদি দেখা না করতে চাও এখনই চল আমার সঙ্গে।

উজ্জ্বলা। কোথায় ?

অনুক্ষণ। যেখানে হোক, আর একটা ধর্মশালাতেই উঠি চল আপাতত। তারপর ঠিক করে নেওয়া যাবে ভদ্র জায়গা একটা [সহসা সোৎসাহে] তোমার আপিস ঘরটা তো আছে।

উজ্জ্বলা। সেটা আমার নয়, জগনলালবাবুর।

অনুক্ষণ। ও। তা তিনি থাকতে দেবেন না দু'একদিনের জন্য?

উজ্জ্বলা। আমি পালাতে চাই না। আমি দেখা করতে চাই বাবার সঙ্গে।

অনুক্ষণ। বেশ তো, ক্ষতি কি। যতদূর শুনলাম তাতে তিনি লোক যে খুব খারাপ তা তো মনে হয় না। যাই করে থাকুন তিনি তোমাদের দায়িত্ব তো বহন করেছেন বরাবর।

[উজ্জ্বলা চুপ করিয়া রহিল। পাশের ঘরের দরজা দিয়া বীথিকা উঁকি দিল।]

বীথিকা। উজ্জ্বলাদি, আমি আপনার জন্য অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছি।

উজ্জ্বলা। [সম্বিত ফিরিয়া পাইল] ও, তুমি এসেছ? আচ্ছা বস আর একটু লক্ষ্মীটি।

[বীথিকা ভিতরে চলিয়া গেল।]

অনুক্ষণ। এ আবার কে?

উজ্জ্বলা। অমোদের সমিতিতে একটা থিয়েটার হবে, তাতে ওই মেয়েটির নাচবার কথা, আমাকে নাচ দেখাতে এসেছে।

অনুক্ষণ। ও। আচ্ছা, তোমাদের সমিতির সঙ্গে জগনলালবাবুর আর ওই মিস্টার ঘোষালের সম্পর্কটা কি তা তো বললে না?

উজ্জ্বলা। ওঁরা পেট্রন।

অনুক্ষণ। ও।

[একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিল। বেশ ঘুঘু চেহারা।]

প্রৌঢ়। এইটি কি দুর্গাপদবাবুর বাড়ি?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কি চান আপনি?

প্রৌঢ়। [উজ্জ্বলার দিকে একবার চাহিয়া] তাঁর সঙ্গে দরকার ছিল একটু।

অনুক্ষণ। তিনি তো বেরিয়ে গেছেন—

প্রৌঢ়। কতক্ষণে ফিরবেন বলতে পারেন?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে না, তা তো বলতে পারি না।

উজ্জ্বলা। পাড়াতেই বেরিয়েছেন। একটু অপেক্ষা করুন না হয়, যদি বেশী দরকার থাকে।

প্রৌঢ়। বেশ।

[একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের দিক হইতে উৎপলা প্রবেশ করিল।]

উৎপলা। [সোৎসাহে] দিদি তুমি এসে গেছ, বাবা আসছেন শুনেছ ?

উজ্জ্বলা। শুনেছি।

উৎপলা। কেকটাও আজ চমৎকার হবে মনে হচ্ছে, সেদিন বেকিং পাউডার ভাল করে মেশান হয়নি বলেই ফোলেনি—

[এই পর্যন্ত বলিয়া সে সচেতন হইল যে বাহিরের দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। উজ্জ্বলার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।]

উৎপলা। এঁরা কে দিদি, চিনতে পারছি না তো ?

উজ্জ্বলা। ইনি আমার একজন বন্ধু, অনুক্ষণ গুপ্ত—বি. এ. পাশ করে বিলেত গিয়েছিলেন, পরশু ফিরেছেন। আর এঁকে আমিও চিনি না। দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

[অনুক্ষণ উৎপলাকে নমস্কার করিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলা-খাঁকারি দিয়া পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন এবং একবার উজ্জ্বলা ও একবার উৎপলার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। উভয়েই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।]

উৎপলা। [উজ্জ্বলাকে] দাদু কোথা ?

উজ্জ্বলা। পাড়ায় বেরিয়েছেন একটু।

উৎপলা। [প্রৌঢ়কে] দাদুর সঙ্গে কি দরকার আপনার ?

প্রৌঢ়। [পুনরায় গলা-খাঁকারি দিয়া] আমি উজ্জ্বলাকে দেখতে এসেছি।

উজ্জ্বলা। আমাকে ! কেন ?

প্রৌঢ়। ও তুমিই, মানে আপনিই, না না তুমিই বুঝি উজ্জ্বলা ? দুর্গাপদবাবু তোমার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন কি না, তাই আমি—মানে, দেখতে এসেছি—

উৎপলা। ও। আপনি পাত্র, না পাত্রের বাবা ?

প্রৌঢ়। [সলজ্জ] আমিই পাত্র—মানে নিজের চোখেই—

[উজ্জ্বলা ক্রোধভরে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। অনুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সবিস্ময়ে ভদ্রলোককে দেখিতে লাগিল। উৎপলার অধরে ফুটিয়া উঠিল ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ মুচকি হাসি।]

উৎপলা। [প্রৌঢ়কে] দিদি বোধ হয় মুখে রং টং মেখে সেজে আসতে গেল, আপনি যাবেন না, বসুন। আমার কেকটাও প্রায় হয়ে এল, খেয়ে যাবেন। জানেন, দিদি গান গাইতে পারে না, বক্তৃতা দিতে পারে। তাতে চলবে আপনার ? তবে দুধের স্বাদ যদি ঘোলে মেটাতে চান আমার গান শুনিয়ে দিতে পারি একটু।

[কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই উৎপলা সেতারটা তুলিয়া গান ধরিয়া দিল—এস, এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস— ।]

প্রৌঢ় । থাক ! থাক !

[উৎপলা সেতার রাখিয়া দিল ।]

উৎপলা । আচ্ছা, চোখের চামড়া ব'লে কি কোনও পদার্থ নেই আপনাদের ? এই বয়সে মেয়ে দেখে বিয়ে করতে চান !

প্রৌঢ় । [সহসা ক্ষিপ্ত] চাই বই কি, তবে তোমাদের মতো অসভ্য মেয়েকে চাই না । দুর্গাপদবাবু অনেক করে ধরেছিলেন তাই এসেছিলাম । একটা বিজ্ঞাপন দিতেই পঞ্চাশখানা চিঠি, ত্রিশটা ঠিকুজি, দশটা ফোটো এসে গেছে । এদেশে মেয়ের আবার ভাবনা । হ্যাঃ !

[ক্রোধভরে উঠিয়া যাইতেছিলেন ।]

অনুক্ষণ । [হাসিমুখে ভদ্রভাবে] না, রাগ করে যাবেন না । একটু মিষ্টিমুখ করে যান [উৎপলার দিকে চাহিয়া] একটু মিষ্টি আন ।

[উৎপলা ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল । অনুক্ষণ পথরোধ করিল ।]

প্রৌঢ় । ফাজলামি করবেন না, সরে যান ।

[অনুক্ষণ আরও ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল ।]

অনুক্ষণ । ফাজলামি নয়, ভদ্রতা । মেয়ে দেখতে এলে মিষ্টি খেতে হয় ।

প্রৌঢ় । স'রে যান বলছি ।

অনুক্ষণ । কেন রাগ করছেন ? খেয়ে যান একটু মিষ্টি, সামান্য নিয়মরক্ষে গোছ—

প্রৌঢ় । সরুন, সরুন বলছি ।

অনুক্ষণ । [হাসিয়া] স্বেচ্ছায় আমি সরব না, পারেন তো ধাক্কা মেরে চলে যান সরিয়ে দিয়ে ।

[উৎপলা একটি রেকাবিতে সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিল ।]

প্রৌঢ় । সরবেন না ?

অনুক্ষণ । রাগ করছেন কেন, নিন খান ।

[উৎপলা রেকাবিটি আগাইয়া ধরিল ।]

প্রৌঢ় । কপাট ছাড়ুন বলছি ।

অনুক্ষণ । বলেছি তো মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়ব না—

[প্রৌঢ় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া অনুক্ষণকে ধাক্কা মারিলেন । কিন্তু বলিষ্ঠদেহ অনুক্ষণ তাহাতে বিচলিত হইল না । বরং সে রেকাবি হইতে

একটি সন্দেশ তুলিয়া লইয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ঘাড় ধরিয়া তাঁহার মুখে সেটা ঠাসিয়া দিল।]

অনুক্ষণ। এইবার আপনি যেতে পারেন।

[সরিয়া দাঁড়াইল।]

প্রৌঢ়। নচ্ছার, বদমায়েস, বেল্লিক, পাজি কোথাকার। এ অপমানের শোধ যদি না তুলি আমার নাম বেচু মিত্তিরই নয়। বেচু মিত্তিরকে চটিয়ে আজ পর্যন্ত নিস্তার পায়নি কেউ। আমি মোক্তার মনে রেখো সেটা।

উৎপলা। [চোখ বড় বড় করিয়া] ও বাবা।

[প্রৌঢ় বেচু মিত্র চলিয়া গেলেন।]

উৎপলা। যাই, দিদিকে খবরটা দিয়ে আসি—

[ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। নেপথ্যে এক কলি গানও শোনা গেল —জাইল্যে আগুন পাইল্যে গেল নিবিয়ে গেল না রে কালা। পরমুহূর্তেই সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করিলেন। যদিও বয়স প্রায় ৫৫ কিন্তু দেখিলে মনে হয় পঞ্চাশের নীচেই। পরিধানে সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবী। গোঁফ দাড়ি কামানো ভারী মুখ। চুল কানের কাছে দু'একটা পাকিয়াছে। দাঁত পড়ে নাই। চেহারায় গাম্ভীর্য, কমনীয়তা ও বুদ্ধির দীপ্তি আছে।]

সিদ্ধার্থ। আপনি কি এ বাড়ির লোক ?

অনুক্ষণ। আজ্ঞে না। আমি উজ্জ্বলার বন্ধু।

সিদ্ধার্থ। ও, বেশ বেশ। দুর্গাপদবাবু কোথা ?

অনুক্ষণ। তিনি বেরিয়েছেন একটু। আপনি—

সিদ্ধার্থ। আমার নাম সিদ্ধার্থ নন্দী। উজ্জ্বলার বাবা আমি—

অনুক্ষণ। [শ্রদ্ধাবিষ্ট] ও।

[প্রণাম করিল।]

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] উজ্জ্বলার বাবা বটে, কিন্তু উজ্জ্বলাকে চিনি না। কাউকেই চিনি না। ঘটনাচক্রে এতদিন আমাকে বাইরে থাকতে হয়েছিল যে—

অনুক্ষণ। আমি সব জানি।

সিদ্ধার্থ। জান ? সব জান ? বাঃ ভালই হল, জবাবদিহির দায় থেকে বাঁচলুম। তাহলে একটি উপকার কর আমার। এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। এরা সব—

অনুক্ষণ। আপনি বসুন। আমি দেখছি—

সিদ্ধার্থ। শোন, একটা কথা। তোমার সঙ্গে এ বাড়ির সম্বন্ধটা ঠিক কি রকম

তা আগে থাকতে জানলে আমার কথা-বার্তা কইবার সুবিধে হবে একটু। উজ্জ্বলার সঙ্গে কত দিনের বন্ধুত্ব তোমার ?

অনুক্ষণ। আমরা আই. এ. বি. এ. একসঙ্গে পড়েছিলাম। তারপর আমি বিলেত চ'লে যাই। পরশু ফিরেছি—

সিদ্ধার্থ। বিলেত থেকে কি হয়ে এসেছ ?

অনুক্ষণ। বিশেষ কিছুই না। [হাসিয়া] সকলে বিলেত যায় ডিগ্রি আনতে, আমি গিয়েছিলাম দেশটা দেখতে। সেখানে বাস করেছি কিছু কাল। কাজও করেছি। কাজ না করলে সে দেশে থাকা অসম্ভব তো—

সিদ্ধার্থ। [মুগ্ধ] বাঃ, এ তো নতুন রকম শুনলাম। বিলেতে কি কাজ করতে ?

অনুক্ষণ। সব রকম করেছি, যখন যেটা জুটেছে।

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা, আলতা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে তোমার ?

অনুক্ষণ। ওখানে এক রঙের ফ্যাকটারিতে কাজ করেছিলুম কিছুদিন। ফুকসিন থেকে খুব ভাল আলতা হতে পারে।

সিদ্ধার্থ। ওখানকার ফ্যাকটারিতে ? কি কাজ করতে ?

অনুক্ষণ। শুরু করেছিলাম শিশি ধোয়া থেকে। তারপর দিন-কতক লেবেল সাঁটা। তারপর ওরা যখন দেখলে আমি আঁকতেও পারি তখন লেবেলও আঁকতে দিয়েছিল কয়েকটা। একটা সেক্‌সনের অ্যাসিট্যান্ট ম্যানেজারিও করেছি কিছুদিন।

সিদ্ধার্থ। বাঃ, তোমার মতো লোকই তো আমি খুঁজছি। আমার আলতা-ফ্যাকটারির ম্যানেজারটি মারা গেছে হঠাৎ। বিজ্ঞাপন দেওয়াতে দরখাস্ত এসেছে অনেকগুলি কিন্তু মনোমত লোক জোটেনি এখনও। তুমি কি কোনও কাজ আরম্ভ করেছ ?

অনুক্ষণ। না, তেমন কিছু আরম্ভ করিনি, তবে—

সিদ্ধার্থ। তবে আবার কি ?

অনুক্ষণ। একটা শরবৎ ফেরির কাজ গছেছিলাম।

সিদ্ধার্থ। শরবৎ ফেরির ?

অনুক্ষণ। চুপ করে বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করা ভাল নয় কি ? তাছাড়া কাজ না করলে খাব কি, [হাসিয়া] জমানো পয়সা তো নেই যে বসে বসে খাব।

সিদ্ধার্থ। বিয়ে করেছ ?

অনুক্ষণ। না।

সিদ্ধার্থ। দাঁও মাফিক বিয়ে করে ফেল একটা। পণের টাকাটা ক্যাপিটাল করে ব্যবসা শুরু করে দাও। অবশ্য চাকরি যদি করতে চাও আমার আলতা-ফ্যাকটারির ম্যানেজারিটা তোমায় দিতে পারি। মাইনে দু'শো টাকা, তাছাড়া লাভের অংশও পাবে, টাকায় এক আনা হিসেবে। কিন্তু তোমার মতো ছেলেকে এই ছোট গণ্ডীতে আটকে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুমি ব্যবসা করলে খুব উন্নতি করবে। বিয়ে করে ক্যাপিটালটা জোগাড় করে ফেল কোথাও থেকে। বল তো সম্বন্ধ করি, সম্বন্ধ হয়েছে না কি কোথাও ?

অনুক্ষণ। না [হাসিয়া] সব কথা খুলেই বলি তাহলে আপনাকে। উজ্জ্বলাকে আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু উজ্জ্বলা রাজি হচ্ছে না কিছুতে।

সিদ্ধার্থ। হচ্ছে না ? রাজি না হওয়ার কারণ ?

অনুক্ষণ। খুলে বলে না কিছু। তবে মনে হয় আমার মতো চাল-চুলো-হীন লোককে পছন্দ হচ্ছে না।

সিদ্ধার্থ। চাল-চুলো হতে কতক্ষণ লাগে—একটা চেকের ওয়াস্তা—

[শিবু সেন প্রবেশ করিল এবং দুইজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া একটু মুশকিলে পড়িয়া গেল। সে আশা করিয়াছিল একজনকে দেখিবে।]

শিবু। উজ্জ্বলাদি অনুক্ষণবাবুকে ভেতরে ডাকছেন।

অনুক্ষণ। তাঁকে বলুন গিয়ে যে তাঁর বাবা এসেছেন।

সিদ্ধার্থ। [অনুক্ষণকে] তুমিই যাও।

অনুক্ষণ। ও, আচ্ছা [শিবুকে] এই দরজা দিয়ে সোজা চলে যাব তো ?

শিবু। সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি দোতলার সিঁড়ি। ওরা সব দোতলায় আছে।

[অনুক্ষণ চলিয়া গেল।]

শিবু। আপনিই নারী-শক্তি-রক্ষা-সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থবাবু ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ।

[শিবু সেন একটু ইতস্তত করিয়া প্রণাম করিল।]

সিদ্ধার্থ। থাক থাক। আপনাকে চিনতে পারছি না।

শিবু। আমার নাম শিবু সেন। আমি—

সিদ্ধার্থ। বুঝেছি। তোমার কথা শ্বশুর মশাই লিখেছিলেন। উৎপলার সঙ্গে তোমারই কি সম্বন্ধ হয়েছে ?

শিবু। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। বেশ, বেশ!

শিবু। [একটু ইতস্তত করিয়া] আপনার কথা এই একটু আগে শুনলাম। যা শুনলাম তা এতই অবিশ্বাস্য যে—

[ইতস্তত করিয়া থামিয়া গেল।]

সিদ্ধার্থ। বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ তা খবর হিসেবে হয়তো ঠিক। কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে আমার প্রতি সুবিচার করতে পারতে সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখনি হয়তো।

[হাসিলেন।]

শিবু। আপনি চারবার বিয়ে করেছেন?

সিদ্ধার্থ। এ বিষয়ে ভাল করে আলোচনা করতে চাও যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবে না। বস আগে। ওই চেয়ারটা টেনে নাও।

[নিজে একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। শিবুও বসিল।]

সিদ্ধার্থ। দেখ, চারবার বিয়ে করে আমি নতুন কিছু করিনি। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা নিয়মিতভাবে এ কাজ করতেন। চারবারের চেয়ে বেশীবারও করতেন। এখনও সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যাঁরা হয়তো লোক-দেখানো বিয়ে করেন একটি, কিন্তু সংশ্রব রাখেন একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে। তোমরা তো তাদের বয়কট্ কর নি। বরং তাঁরা বড়লোক হলে তাঁদের সেলামই করছ রোজ। এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী, সামাজিক ভাবে এইটেই চালু নিয়ম। যেখানেই সমাজ এ বিষয়ে বাধা দিয়েছে সেইখানেই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, কন্যাদায় সমস্যা, পতিতা-সমস্যা, আরও নানারকম সমস্যা। বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও যদি বিচার কর তাহলেও দেখবে—পলিগ্যামি—অর্থাৎ বহু-পত্নীত্বই প্রকৃতির নিয়ম। কোন কোন ক্ষেত্রে বহু-পতিত্বও। মানব সমাজ উভয় প্রকার নিয়মই বহুকাল ধরে অনুসরণ করে এসেছে, এখনও করছে, ভোলটা যদিও বদলেছে। আমি নতুন কিছু করিনি [একটু থামিয়া ও হাসিয়া] অন্যায়ও কিছু করিনি—

শিবু। তবে লুকিয়ে করতে গেলেন কেন?

সিদ্ধার্থ। ভালো কাজও অনেক সময় লুকিয়ে করতে হয়। এই যে দেশপূজ্য নেতারা লুকিয়ে লুকিয়ে যা করতেন তা কি মন্দ কাজ?

শিবু। এটা তাহলে আপনার মতে অন্যায় নয়?

সিদ্ধার্থ। কিছুমাত্র না। আমি পুরুষ—সহস্র সন্তানের জনক হবার শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন—সেই সহস্র সন্তানের সহস্রবিধ সম্ভাবনা আছে জগতে

—ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখাটা সব সময়ে খুব যে গৌরবজনক তা আমার মনে হয় না। ওতে কোনও মহত্ত্ব আমি দেখতে পাই না।

শিবু। [ঈষৎ হাসিয়া] শুধু সহস্র সন্তানের জনক হলেই তো হবে না, তাদের পালকও হতে হবে। তাদের লালন পালন না করতে পারলে—

সিদ্ধার্থ। নিশ্চয়, লালন পালন করতে হবে বই কি। পশুরাও তা করে। মানুষ আর একটু ভাল ভাবে করে। তাহলে তোমার মতে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যিনি যতগুলি পরিবার লালন পালন করতে পারবেন তিনি ততগুলি বিয়ে করতে পারেন। তাতে নিন্দার বা লজ্জার কিছু নেই [সহসা সক্ষোভে] কেউ চারটে মোটরকার রাখলে তোমরা তো তাকে ঘিরে বাহবা বাহবা কর। চারটে বিয়ে করলেই ছুয়ো দাও কেন! এ কি কুসংস্কার তোমাদের!

শিবু। আপনি চারটি পরিবারই পালন করছেন?

সিদ্ধার্থ। করছি বই কি!

শিবু। সবসুদ্ধ ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার?

সিদ্ধার্থ। কুড়িটি। বারোটি ছেলে, আটটি মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ এম. এস. সি. পড়ছে, দুটি ছেলে এম. বি. পড়ছে, ইনজিনিয়ার হচ্ছে একজন। বাকীগুলির মধ্যে কেউ স্কুলে, কেউ কলেজে পড়ছে। মেয়েরাও পড়ছে। একটি মেয়ে গান, অভিনয় খুব ভাল করতে পারে, হয়তো তাকে সিনেমায় দেখতে পাবে একদিন। বিয়ে দিয়েছি গুটি চারেকের, আর দু'জন তো এখানেই আছে। আর একটি খুব ছোট, তাকে মন্টেসরি স্কুলে দিয়েছি দিল্লীতে।

শিবু। এত খরচ আপনি পেরে ওঠেন কি করে?

সিদ্ধার্থ। ব্যবসা থেকে। বছরে প্রায় লাখ খানেক লাখ দেড়েক টাকা রোজগার করি। [হাসিয়া] মূলধন সংগ্রহ করেছিলাম বিয়ের পণ থেকে। তবে ব্যবসাতে টাকাটাই সব নয়, চরিত্রই আসল মূলধন।

শিবু। কিন্তু যে ব্যবসা আপনি করেন সেটা কি খুব ভালো ব্যবসা? মানে, খুব কি রেস্‌পেক্‌টেবল?

সিদ্ধার্থ। কোন্ ব্যবসাটা আজকাল রেস্‌পেক্‌টেবল? ডাক্তার, মাস্টার, লেখক, দোকানী—কার ব্যবসা রেস্‌পেক্‌টেবল বল?

শিবু। কিন্তু ওসব ব্যবসার উচ্চ আদর্শ আছে একটা, সবাই আজকাল সেটা মানছে না হয়তো, কিন্তু আদর্শটা তো বড়।

সিদ্ধার্থ। আমার ব্যবসার আদর্শও ছোট নয় নেহাত। যে মেয়েদের সমাজে রোজ দু'পায়ে থ্যাঁতলাচ্ছে সেই মেয়েদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন

করছি আমি। ভগবান তাদের যে শক্তি দিয়েছেন সে শক্তিকে তারা যদি রীতিমত কাজে লাগাতে পারে আগুন ধরে যাবে সমাজে, পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সব—

শিবু। [বিস্মিত] এই সমাজকে আপনি পুড়িয়ে দিতে চান !

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, এই এঁদো সমাজ পুড়ে গেলে তবে ভালো সমাজ গড়ে উঠবে। এ পচা জিনিসে তাপ্‌পি দিয়ে আর বেশী দিন চালানো যাবে না। একে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আমি তারই ইন্ধনের ব্যবসা করি।

শিবু। কিন্তু উজ্জ্বলাদি যে নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি করেছেন, আপনি জানেন নিশ্চয়, তাতে কিছু কি হবে না ?

সিদ্ধার্থ। ওদের বক্তৃতা কাগজে পড়েছি [দুই হাত উল্টাইয়া] জানি না। যত মত তত পথ। হয়তো ওরাও ঠিক, বলতে পারি না।

[অনুক্ষণ ও উজ্জ্বলা প্রবেশ করিল।]

অনুক্ষণ। এই যে উজ্জ্বলা !

শিবু। উৎপলা এল না ? হয়তো লজ্জা পাচ্ছে, যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

[শিবুর প্রস্থান।

উজ্জ্বলা ও সিদ্ধার্থ উভয়ে উভয়ের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বলা সহসা আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।]

সিদ্ধার্থ। [বিচলিত] কতদিন পরে তোমাদের দেখলুম।

[হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া অনুক্ষণকে কি একটা যেন বলিতে গেলেন, বলিতে গিয়া কিন্তু চোখে পড়িয়া গেল দেওয়ালে-টাঙানো একখানা ছবি। উজ্জ্বলার মায়ের বড় ফোটোটা। সিদ্ধার্থ নন্দী দ্রুতপদে সেদিকে আগাইয়া গেলেন।]

শৈল, এতদিন পরে ফিরে এলুম, কিন্তু তুমি নেই। এমন করে কেন চলে গেলে তুমি ! আমি ঘরজামাই হয়ে আর থাকতে পারছিলাম না যে, তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ভদ্রভাবে রোজগার করব। কিন্তু এমন পোড়া দেশে জন্মেছি যে, ভদ্রভাবে রোজগার কববার কোনও পথ নেই, গরীবকে কেউ ক্যাপিটাল দিলে না এক মেয়ের বাপ ছাড়া। বিয়ে করে করেই তাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু তুমি চলে গেছ। [একটু থামিয়া পুনরায় অস্ফুট কণ্ঠে] তুমি চলে গেছ [সহসা উজ্জ্বলার দিকে ফিরিয়া] ফিরে এসেছি আবার তোমাদের কাছে অনেক দিন পরে। আমার ওপর তোমরা রাগ করে আছ জানি, রাগের কারণও হয়তো আছে, আমাকে যা বলতে চাও অকপটে বল, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

উজ্জ্বলা। আপনাকে কিছু বলার উপায় আমাদের নেই। টাকা দিয়ে সে মুখ অনেকদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। একটা কথা ভেবে শুধু অবাক লাগছে, এতদিন পরে এলেন কেন!

সিদ্ধার্থ। শ্বশুরমশায় আসবার জন্য লিখেছিলেন। নিজের দিক থেকে আসবার তাগিদ বরাবরই আছে কিন্তু আসতে পারিনি। শ্বশুরমশায় স্পষ্ট লিখে দিয়েছিলেন যে আমার মুখদর্শন করতে চান না তিনি। তাই দূর থেকেই তোমাদের খবর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম।

উজ্জ্বলা। এখন তবে দাদু আপনাকে আসতে লিখলেন কেন?

সিদ্ধার্থ। তা তো জানি না। সম্ভবতঃ তোমাদের বিয়ের ব্যাপারের জন্যে।

উজ্জ্বলা। [তিক্ত হাসি হাসিয়া] তার জন্যে আপনার সাহায্যের তো দরকার নেই। আপনাকে আমরা টাকার উৎস বলেই জানি। আমাদের বিয়েতে টাকার দরকার হবে না। যে পাত্র পণ চাইবে তাকে আমরা কেউ বিয়ে করব না—

[শিবু ও উৎপলার প্রবেশ।]

শিবু। এই উৎপলা।

[উৎপলা সিদ্ধার্থকে প্রণাম করিল। উৎপলার মুখ খুশীতে ঝলমল করিতেছে।]

সিদ্ধার্থ। [উৎপলাকে] তোমারও তাই মত নাকি?

উৎপলা। কি বিষয়ে?

সিদ্ধার্থ। যে পাত্র পণ চাইবে তাকে বিয়ে করবে না।

উৎপলা। নিশ্চয় করব না। ও সব সেকেলে নিয়ম আমরা উঠিয়ে দিতে চাই।

[শিবুর মুখ শুকাইয়া গেল। সে মুখ তুলিয়া চিবুকের তলা চুলকাইতে লাগিল।]

সিদ্ধার্থ। উঠিয়ে দিতে পারবে কি? কোনও একটা নিয়ম সমাজে যখন চালু থাকে তখন তার ন্যায্য কারণও থাকে একটা। বাপের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয় ছেলে, মেয়ে কিছু পায় না। তাই বিয়ের সময় তাকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়।

উজ্জ্বলা। আমরা সে অনুগ্রহ চাই না। আমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চাই। আমরা যে সমাজ আদর্শ বলে মনে করি, সে সমাজে ছেলেরাও বাপের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে না, কারণ কোনও বাপেরই বিষয় থাকবে না সে সমাজে।

সিদ্ধার্থ। [সহসা মত পরিবর্তন করিয়া] ভালোই তো, এ রকম সমাজ যদি সত্যি সত্যি গড়ে ওঠে তাহলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে—

উজ্জ্বলা। ততক্ষণ আমাদের চেষ্টা করতে হবে কি করে সেটা হয়।

সিদ্ধার্থ। [একমুখ হাসিয়া] তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে চেষ্টার চেহারাটা কি রকম হবে, মত-বিরোধ তাই নিয়ে। তোমরা যে পথে চলেছ তা সর্বজনস্বীকৃত সম্মানের পথ। আমি যে পথে চলেছি তা হয়তো সম্মানের পথ নয় কিন্তু তা সুনিশ্চিত পথ।

উজ্জ্বলা। আপনি তো একজন ক্যাপিটালিস্ট। আপনার সুনিশ্চিত পথ যে কি তা আমরা জানি!

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] না, জানো না। তোমরা ছাঁচ নিয়ে, ফরম্যুলা নিয়ে, মুখস্থ করা বুলি নিয়ে মত্ত থাক, আসল সত্য তোমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে মানুষমাত্রেই ক্যাপিটালিস্ট, কোন-না-কোন একটা ক্যাপিটাল নিয়ে প্রত্যেক মানুষই জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে, আর তাই ভাঙিয়েই সারা জীবনটা চালায়। তুমি নিজেই যে একজন বড় ক্যাপিটালিস্ট একথা হয়তো তুমি জান না—

[পিতাপুত্রীতে যখন তর্ক চলিতেছিল অনুক্ষণ, শিবু ও উৎপলা তখন একটু তফাতে থাকিয়া নিম্নকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের আলাপ দর্শকবৃন্দেরা শুনিতে পাইবেন না, মুখভঙ্গী দেখা যাইবে। সহসা উৎপলা উজ্জ্বলার দিকে ফিরিয়া চাহিল।]

উৎপলা। দিদি, তুমি তর্কই করবে না কি কেবল বাবার সঙ্গে? চলুন আপনি ওপরে, চা টা খাবেন।

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] এইমাত্র চা খেয়ে এলাম যে—

উৎপলা। তা হোক, তবু খেতে হবে এখানে, বাঃ তা কি হয়! আপনি এসেছেন শুনে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি আমি। এতক্ষণে ফুটল বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। এইখানেই নিয়ে এস তাহলে। এক কাপ চা খালি।

উৎপলা। [শিবুকে] বিজনবাবু আপিস থেকে এসেছেন বোধ হয়। তুমি তাঁর কাছে যাও না একটু। বললেই আসবেন।

[শিবু ও উৎপলা চলিয়া গেল। একজন বাহিরের দিকে, আর একজন ভিতরের দিকে।]

অনুক্ষণ। আমিও এবার যাই তাহলে—

উজ্জ্বলা। তুমি একটু দেখ না অনুক্ষণদা, দাদু কোথায় গেলেন।

[অনুক্ষণ চলিয়া গেল।]

সিদ্ধার্থ। ব'স না।

[উজ্জ্বলা একটি চেয়ারে বসিল।]

উজ্জ্বলা। এক হিসেবে অবশ্য আপনি আমাকে ক্যাপিটালিস্ট বলতে পারেন। কারণ আপনার দেওয়া টাকার ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছি আমি। কিন্তু—

সিদ্ধার্থ। না, না, সে ক্যাপিটালের কথা আমি বলিনি। তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার ব্যক্তিত্বই তোমার ক্যাপিটাল। এ না থাকলে তুমি তোমার নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি গড়তেই পারতে না। কোনও সাধারণ মেয়ের দ্বারা এ সম্ভব হ'ত না।

[উজ্জ্বলা ঈষৎ লজ্জিত এবং নিজের অজ্ঞাতসারে সিদ্ধার্থের প্রতি ঈষৎ আকৃষ্ট হইল।]

উজ্জ্বলা। তা যদি বলেন তাহলে অবশ্য তর্ক চলে না। কিন্তু আপনার সুনিশ্চিত পথটা কি তা একটু শুনতে পাই না?

সিদ্ধার্থ। যে আগুন প্রতি ঘরের চালে চালে ধরেছে তাতেই হাওয়া যোগাচ্ছি আমি। সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাক। তারপর নূতন সৃষ্টি হবে। সৃষ্টির নাট্যলীলায় শয়তানের ভূমিকাও কম প্রয়োজনীয় নয়, যদিও শয়তানের প্রশংসা কেউ করে না।

[তাহার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা আগুন ধক্‌ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উজ্জ্বলা ভীত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাশের ঘর হইতে বীথিকা আবার মুখ বাড়াইল।]

বীথিকা। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব উজ্জ্বলাদি? আমার বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] ও—

সিদ্ধার্থ। মেয়েটি কে?

উজ্জ্বলা। আমাদের সমিতিতে 'বন্ধন-মোচন' বলে একটা রূপক নাটক করব আমরা। এ মেয়েটি তাতে নাচবে। আমাকে নাচ দেখাতে এসেছে।

সিদ্ধার্থ। [সহসা উল্লসিত] বাঃ, নাচ খুব ভালো জিনিস। ও জিনিসটার খুব প্রচার হওয়া উচিত। এখানেই নাচবে?

উজ্জ্বলা। তা নাচতে পারে [বীথিকাকে] তুমি নূপুর এনেছ?

বীথিকা। এনেছি।

উজ্জ্বলা। কোনটা নাচবে ঠিক করে এসেছ?

বীথিকা। সুষমাদি সমিতির জন্য যে গানটা বেঁধেছিলেন—'আর কতকাল কারাগারে থাকবি হয়ে বন্দিনী'—সেইটের সঙ্গে নাচবো। উৎপলাদি সেতার বাজিয়ে গানটা গাইবেন নাচের সঙ্গে সঙ্গে। উৎপলাদিকে ডাকব?

উজ্জ্বলা। ডাক।

[বীথিকা প্রায় ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

সিদ্ধার্থ। [কোমল কণ্ঠে] উজ্জ্বলা, ভারী আনন্দ হচ্ছে আমার আজ।

উজ্জ্বলা। কেন ?

সিদ্ধার্থ। তোমাদের দেখে। এখন যদি তোমরা আমাকে তাড়িয়েও দাও তাহলেও আমার দুঃখ থাকবে না। তোমার মতো, উৎপলার মতো মেয়ের বাবা আমি, এই গর্বেই বুকটা ভরে থাকবে আমার। আচ্ছা, উৎসাহ কোথায়, তাকে দেখছি না ?

উজ্জ্বলা। সে আপনার সত্য পরিচয় জানত না। আজই শুনেছে। শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। তাকেই ফিরিয়ে আনতে গেছেন দাদু।

সিদ্ধার্থ। ও।

[গম্ভীর হইয়া গেলেন।]

উজ্জ্বলা। [নিজের হাতঘড়ি দেখিয়া] আমার আবার মিটিং আছে আজ সমিতির। ওরা দেরী করছে কেন এত। দেখি একটু—

[উজ্জ্বলা ভিতরে চলিয়া গেল। একটু পরেই উৎপলা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলে সেগুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।]

সিদ্ধার্থ। এত সব কেন, শুধু চা খাব একটু।

উৎপলা। কেক আমি নিজে করেছি, ওটা খেতেই হবে।

সিদ্ধার্থ। ও, তোমার রান্নার সখ আছে বুঝি ?

উৎপলা। আমার সব জিনিসের সখ আছে। রান্নার সখ আছে, গয়নার সখ আছে, শাড়ির সখ আছে, গান-বাজনার সখ আছে। দিদির মতো অমন কাঠখোট্টা আমি নই।

সিদ্ধার্থ। উজ্জ্বলা বুঝি খুব কড়া মেজাজের লোক ?

উৎপলা। খুব। সবাই অস্থির ওর ভয়ে।

সিদ্ধার্থ। তাই দেখছি। আসবামাত্র আমাকেও এক ধমক লাগিয়েছে। সে গেল কোথায় ?

উৎপলা। যে মেয়েটি নাচবে তাকেই কাপড় পরাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ। শিবু কোথায় গেল ?

উৎপলা। পাশের বাড়ির বিজনবাবুকে ডাকতে গেছে। তিনি তবলা বাজাবেন নাচের সঙ্গে। চমৎকার তবলা বাজান ভদ্রলোক, এমন মিষ্টি হাত !

সিদ্ধার্থ। শিবু ছেলেটি খুব ভাল, নয় ?

উৎপলা। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। বেশ পছন্দ হয়েছে তো ওকে তোমার?

[উৎপলা মাথা হেঁট করিয়া চা ছাঁকিতে লাগিল। লজ্জা পাইয়াছে।]

সিদ্ধার্থ। উত্তর দিচ্ছ না যে?

উৎপলা। [প্রায়-অস্ফুট কণ্ঠে] হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। বিয়ের ঠিক করে ফেলি তাহলে? ও যদি পণ চায়—

উৎপলা। কক্‌খনো চাইবে না।

সিদ্ধার্থ। বলেছে তোমাকে সে কথা?

উৎপলা। বলেছে। পণ চাইলে বিয়ে করব না। কিন্তু জানেন—

[কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।]

সিদ্ধার্থ। কি? বল

উৎপলা। ওর অবস্থা খুব খারাপ। বাপের বিষয়-সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে না কি।

সিদ্ধার্থ। কি করে ও?

উৎপলা। আগে প্রাইভেট ট্যুশনি করত, এখন দাদুরই প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছে। দাদু মাসে পঁচাত্তর টাকা করে দেন ওকে। কিন্তু বিয়ে হওয়ার পর তো দাদুর চাকরি করাটা ভাল দেখাবে না।

সিদ্ধার্থ। সংসার চলবে তাহলে কি করে?

উৎপলা। তাই তো ভাবছি। আমাকেও একটা চাকরি নিতে হবে আর কি। দু'জনে মিলে রোজগার করলে চলে যাবে।

সিদ্ধার্থ। দু'জনে মিলে কত রোজগার করবে?

উৎপলা। একশ' দেড়শ' হলেই চলে যাবে আপাতত।

সিদ্ধার্থ। আপাতত চলতে পারে কিন্তু বরাবর কি চলবে? [একটু ইতস্তত করিয়া] আচ্ছা, আমি যদি কিছু টাকা দিই নেবে না?

উৎপলা। সে দিদি জানে। দিদির মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব না।

সিদ্ধার্থ। তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার নিজের মতটা কি শুনি না?

উৎপলা। আমার আপত্তি নেই। আপনি চা খান, কেকটা খেয়ে দেখুন তো, কেমন হয়েছে।

[সিদ্ধার্থ খাইয়া দেখিলেন।]

সিদ্ধার্থ। চমৎকার হয়েছে!

[শিবু ও বিজনবাবু প্রবেশ করিল। সঙ্গে ডুগি তবলা। অন্য দিক দিয়া উজ্জ্বলা ও বীথিকা প্রবেশ করিল। বীথিকা নর্তকীর বেশে সাজিয়া আসিয়াছে।]

উৎপলা। শিবুদা, চা খাবে?

শিবু। না।

উৎপলা। বিজনদা?

বিজন। না, আমিও খাব না।

উৎপলা। তুমি তাহলে হার্মোনিয়মটায় সুর দাও না শিবুদা, আমি সেতারটা বেঁধে নি।

[চৌকির উপর শিবু, বিজন ও উৎপলা বসিয়া যথাক্রমে হার্মোনিয়ম, তবলা ও সেতারে মনোযোগ দিল।]

উজ্জ্বলা। [সিদ্ধার্থকে] আপনি আমাদের সভায় যাবেন?

[ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একটা হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়া সিদ্ধার্থকে দিল।]

সিদ্ধার্থ। আপত্তি নেই। তবে আমারও একটা কাজ আছে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার জিনিস-পত্রগুলোর একটা প্রদর্শনী খুলছি, সেটা যাতে একটু ভালভাবে হয় চেষ্টা করতে হবে। তোমরা কি আসবে তাতে?

উজ্জ্বলা। সেটা উৎসাহের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারছি না।

সিদ্ধার্থ। ও আচ্ছা।

[পশুপতির প্রবেশ।]

পশুপতি। জগনলালবাবু ব'লে পাঠালেন যে, মিটিংয়ে তিনি আসতে পারবেন না। সাড়ে ছ'টা নাগাদ তিনি আপিসে আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনাকে সে সময় আপিসে থাকতে বলেছেন। আরও তিনজন ভদ্রলোক আসবেন সে সময়।

উজ্জ্বলা। আচ্ছা, ব'লে দিও আমি আপিসে থাকব সে সময়।

[পশুপতি নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।]

উৎপলা। এবার তাহলে শুরু হোক?

সিদ্ধার্থ। বেশ তো!

[উৎপলা সেতার বাজাইয়া গান ধরিল, বীথিকা নাচিতে লাগিল।]

গান

আর কতকাল কারাগারে থাকবি হয়ে বন্দিনী

ও আনমনা,

ও জননী, ও ভগিনী ও দুলালী নন্দিনী

ও আনমনা,

আকাশ থেকে বার্তা আসে বাতায়নের ফাঁক দিয়ে

সূর্য তারা জ্যোৎস্না ধারা যায় যে তোকে ডাক দিকে

ও আনমনা,

ও শোন্ অন্ধকারে হাঁক দিয়ে

উঁচল পথের পথিক হাঁকে কোথায় তুমি সঙ্গিনী।

ও আনমনা, ও আনমনা,

দাও সাড়া গো দাও সাড়া

টুকরো কর মিথ্যা শিকল

পাঁচিলটাকে দাও নাড়া

দেশের মাটি ডাকছে তোমায়

দশের দাবী ডাকছে যে

শিল্পী কবি ছন্দে রঙে

তোমার ছবি আঁকছে যে

ও আনমনা,

তোমার পথের ধুলা ঢাকছে যে

দুর্বাদলের শ্যামল গীতি সবুজ-সোহাগ-রঙ্গিনী।

[গানটি একবার শেষ হইয়া দ্বিতীয়বার আরম্ভ হইতেছে এমন সময় দুর্গাপদ ফিরিলেন একা।]

দুর্গাপদ। উৎসাহ এল না। কিছুতে এল না—

উজ্জ্বলা। কোথা গেল ?

দুর্গাপদ। তাদের কলেজ হস্টেলে।

উজ্জ্বলা। অরুণদা কোথায় গেলেন ?

দুর্গাপদ। সে-ও তারই সঙ্গে গেল।

[দুর্গাপদ তাহার পর সিদ্ধার্থের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। সিদ্ধার্থ উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন।]

সিদ্ধার্থ। আমি সিদ্ধার্থ।

দুর্গাপদ। ও সিদ্ধার্থ, তুমি এসেছ [একটু থামিয়া] তুমি এসেছ। ভাল। তোমার ছেলেমেয়েদের ভার নাও তুমি। আমি আর পারছি না, বুঝলে, এদের সঙ্গে আমি আর পেরে উঠছি না। কাশী চলে যাব, বড় ক্লান্ত, আর পারছি না, আমাকে এবার রেহাই দাও তোমরা।

[ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।]

দ্বিতীয় বিরতি

৩

[নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির আপিস। রেবার বাবা দেবেনবাবু একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভিজা-বিড়াল-গোছের চেহারা। ঝোলা গোঁফ, চোখে ভীত অথচ চতুর দৃষ্টি। প্রৌঢ়। পরনে আড়ময়লা জামা-কাপড়, পায়ে মলিন কেড্‌স্। মনীষার পিতা ইন্দ্রবাবুও একটু পরেই প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রনাথ মোটা, বেঁটে। পরিধানে বুক-খোলা কোট, পায়ে চামড়ার ফিতা-ওলা জুতা। ইহারও চোখে মুখে বেশ একটা চতুর সপ্রতিভতা পরিস্ফুট। উভয়েই এক আপিসের কেরানী।]

দেবেন। ইন্দিরদা, এসে গেছ, বাঁচা গেল। এসে তোমাকে দেখতে না পেয়ে চোখ কপালে উঠেছিল আমার। ভাবছিলুম স'রে পড়ব কিনা!

ইন্দ্র। ভয়টা কিসের?

দেবেন। ওই ছুঁড়ি দুটোকে আমি ভারী ভয় করি ভাই। মাইরি বলছি। উজ্জ্বলার চোখের চাউনিটা লক্ষ্য করেছ? উফ! চাউনি নয় তো যেন এক্স-রে। একবার চাইলে মনে হয় অন্তঃস্থলের ভিতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। আর ওই সুষমাটি হচ্ছেন মিছরির ছুরি, হেসে হেসে মিষ্টি কথা বলেন—কিন্তু সাংঘাতিক। কিন্তু বলিহারি তোমাকে, এদের ওপরও টেক্কা ঝেড়েছ তুমি।

ইন্দ্র। ও সব বাজে কথা ছেড়ে একটা বিড়ি দাও দিকি।

[দেবেন বিড়ি-দেশলাই দিল। ইন্দ্র বিড়িটা ধরাইয়া একটানেই প্রচুর ধোঁয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।]

দেবেন। আমার কিন্তু ভয় করছে ইন্দিরদা।

ইন্দ্র। ভয়টা কিসের?

[একটি চেয়ারে বসিলেন।]

দেবেন। [এদিক ওদিক চাহিয়া] ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়?

ইন্দ্র। ফাঁস হবে কি করে? তোমার মেয়ে ফাঁস করে দেবে বলছ?

দেবেন। দেওয়া তো উচিত নয়। তার ভালর জন্যেই এসব করা।

ইন্দ্র। আমি যেমন যেমন বলেছিলুম তেমনি ঠিক লিখেছিলে তো?

দেবেন। হ্যাঁ। এই যে দরখাস্তের কপি আমার কাছে রয়েছে। আমি আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি, বুঝলে না, কপি রেখে দিয়েছি একটা।

[পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।]

"নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তা উজ্জ্বলা দেবী এম. এ. মহাশয়া সমীপে। বহু সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিয়া আমি সাহস পাইয়াছি। আমার পিতা একজন গরীব কেরানী। আমি আমাদের পাড়ার স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছি। আমার বাবা আমাকে আর পড়াইতে চান না। তিনি একটি বুড়া বরের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন। লোকটি চতুর্থ পক্ষে আমাকে বিবাহ করিতে চান। সেদিন তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁহার সম্মুখে বাহির হই নাই। এ জন্য বাবা ও মায়ের নিকট আমি প্রত্যহ নির্যাতিত হইতেছি। লাঞ্ছনা গঞ্জনার আর সীমা নাই। হয়তো শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিতে হইবে। আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দেন সেই আশায় এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি। ইতি বিনীতা শ্রীরেবা দাসী।

ইন্দ্র। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] ঠিক আছে। আমার মেয়ে মনীষাকে দিয়েও ঠিক ওই রকমই লিখিয়েছি একটু অদলবদল করে। পরের খরচায় লেখাপড়াটা যদি হয়ে যায় মন্দ কি, আর কিছু না হোক খেতে তো পাবে দু'বেলা পেট ভরে। হস্টেলে খাওয়ায় ভাল, আমরা যা খাই তার চেয়ে ঢের ভাল। তার ওপর হুমকি দিয়ে যদি কিছু আদায় করতে পারা যায় আরও ভাল।

দেবেন। আমার কিন্তু ভয় করে দাদা। যদি ফাঁস হয়ে যায়? আমার গিন্নি ভারী হাঙ্গামা লাগিয়েছে—

ইন্দ্র। গিন্নিকেও বলেছ নাকি সব কথা?

দেবেন। সব না বললেও কিছুটা বলতে হয়েছে বই কি। মেয়েটা বোর্ডিংয়ে গিয়ে থাকবে, কারণ একটা দেখাতে হবে তো?

ইন্দ্র। কি কারণ দেখিয়েছ? এঃ, অতি বেকুব লোক দেখছি তুমি।

দেবেন। বলেছি একজন বড়লোক গরীব মেয়েদের পড়াবার জন্তে স্কলারশিপ দিচ্ছেন।

ইন্দ্র। তার চেয়ে আর এক কাজ করলেই পারতে। মেয়েদের সঙ্গে যখন বড় করতেই হয়েছে তখন মেয়েকে নকল বিদ্রোহিনী সাজালেই পারতে। সে যেন সংসারের দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করতে না পেরে সত্যি সত্যিই বেরিয়ে যাচ্ছে, আমার মেয়ে মনীষা যেমন করেছে। মেয়ের মা-ও জানতো মেয়ে সত্যি সত্যিই বিদ্রোহিনী।

দেবেন। আমার মেয়ে অত অ্যাকটিং করতে পারে না ভাই। একটু হাঁদা-গোছের, বুঝলে না—

ইন্দ্র। খুব বেকুবি করেছ।

দেবেন। কেন, ক্ষতিটা কি?

ইন্দ্র। দু'দুটো মেয়ে কথাটা জেনে ফেললে চাউর হতে কতক্ষণ! খুব কাঁচা কাজ করেছ।

দেবেন। তোমার মেয়ে বিদ্রোহিনী সেজে বেরিয়ে গেল?

ইন্দ্র। আলবৎ!

দেবেন। তোমার গিন্নি কিছু বললে না?

ইন্দ্র। বলছে বই কি। চেল্লাচেল্লির চরম চলছে। কিন্তু ওতে কান দিলে কি চলে! তাঁর মান রেখেই তো এদের এই হুমকিটা দিচ্ছি, অবশ্য নকল হুমকি।

দেবেন। নকল হুমকি মানে?

ইন্দ্র। মানে, সত্যি সত্যি আমি চাই না' যে মনীষা ওখান থেকে চ'লে আসুক। তুমিও নিশ্চয় চাও না। পরের পয়সায় খাচ্ছে-পরছে, পড়ছে, মজাসে হস্টেলে আছে থাক না। আমরা না হয় অত্যাচারী পিতার অভিনয় করে যাব, আর হুমকি দিয়ে ফাঁকতালে যদি কিছু মেরে দেওয়া যায় সেটা উপরি পাওনা হবে।

দেবেন। আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে।

ইন্দ্র। এঃ তুমিই ডোবাবে দেখছি। আমাকে শুদ্ধ ডোবাবে।

[একজন পুলিস কনেস্টবলের প্রবেশ।]

দেবেন। [সভয়ে] এ আবার কি চায়—

ইন্দ্র। [পুলিশকে] হিঁয়া আপ ক্যা মাংতে হেঁ?

পুলিশ। জমাদার সাহেব হিঁয়াই পর ডিউটি মে ভেঁজে হেঁ।

ইন্দ্র। কাহে?

পুলিশ। ন মালুম।

ইন্দ্র। বাহার যাকে বৈঠিয়ে।

[পুলিশ কনেস্টবলটি বাহিরে চলিয়া গেল।]

দেবেন। পুলিশ আসার মানে কি?

ইন্দ্র। কি জানি!

[কমলার বাবা রাজীবলোচন প্রবেশ করিলেন। টিকি আছে, দাড়ি আছে, কপালের মাঝখানে একটা লাল সিঁদুরের ফোঁটাও আছে। হাতে মোটা একটা লাঠি। সেমেটিক মনোভাবাপন্ন রক্ষণশীল হিন্দু একজন। চোখ মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে খুব চটিয়া আসিয়াছেন।]

রাজীব। উজ্জ্বলা নন্দীর আপিস এইটে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজীব। তিনি কোথায়?

ইন্দ্র। তা তো জানি না। আমরাও তাঁরি আশায় ব'সে আছি। আমাদের ছ'টায় টাইম দিয়েছিলেন। এইবার আসবেন বোধ হয়।

রাজীব। আপনাদেরও মেয়ে পালিয়েছে নাকি?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখুন দিকি কি কাণ্ড মশায়।

দেবেন। [ক্ষীণভাবে] কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না!

রাজীব। এ তো ভয়ানক কাণ্ড হয়ে উঠল দেখছি। পৃথিবী উলটে যাবে নাকি! যে মেয়েকে এ্যাদ্দিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম, সে মেয়ে হঠাৎ আজ ক'টা বক্তৃতা শুনে পালিয়ে যাবে!

ইন্দ্র। যাবে বলছেন কেন, গেছে বলুন। আসুন, বসুন।

[রাজীবলোচন একটি চেয়ারে বসিলেন।]

রাজীব। না, কিছুতেই এ সহ্য করব না।

ইন্দ্র। কি করবেন তাই বলুন।

দেবেন। [ক্ষীণভাবে] আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইটেই বলুন।

রাজীব। [আচমকা চেঁচাইয়া] চুরমার করে ফেলব সব—

[দুম করিয়া টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিতেই দেবেন হকচকাইয়া মাথাটি পিছনের দিকে একটু সরাইয়া লইলেন। ইন্দ্র কিন্তু সপ্রতিভ ভাব ত্যাগ করিলেন না।]

ইন্দ্র। ঠিক। চুরমার ক'রে ফেলাই উচিত, ও ছাড়া উপায় নেই। আমরা উকিলের চিঠি দিয়েছি।

রাজীব। উকিলের চিঠি আমিও দিয়েছি। কিন্তু কেবলমাত্র উকিলের চিঠিতেই শানাবে না। এসব দৈত্য নহে তেমন।

ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষ হলে কি হবে, ওই উজ্জ্বলাটি দৈত্যই—বাপস্!

রাজীব। উজ্জ্বলা নন্দী দৈত্য নয়, দৈত্য আছে নেপথ্যে। এরা হচ্ছে আড়-কাটি, রংরুট, টোপ ফেলে ফেলে আপনার আমার পুকুর থেকে মাছ ধ'রে ধ'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মাছের আসল আড়তদার বসে আছে অন্য জায়গায়। মাছগুলি জোগাড় করে সে চালান দেবে বাজারে ঝুড়িতে প্যাক করে।

দেবেন। [ভয় পাইয়া] বলেন কি!

রাজীব। নিশ্চয়। গেল বার যুদ্ধের সময় কি হয়েছিল, খবরের কাগজে পড়েন নি? ভদ্র ঘরের সোমত্ত সোমত্ত মেয়েরা সোলজারদের সেবা করবার ছুতোয় দলে দলে গিয়ে ক্যানটিন খুলে বসল, তার কেচ্ছা পড়েন নি কাগজে?

দেবেন। [সভয়ে] সর্বনাশ! ইন্দিরদা শুনছ?

ইন্দ্র। আমার মেয়েকে অবশ্য ওসব ভাঁওতায় ভোলানো শক্ত।

দেবেন। আমার মেয়েটা কিন্তু হাঁদা আছে ভাই।

রাজীব। দেখুন, প্রবল ঝড় যখন আসে তখন শুধু খড় কুটোই উড়ে যায় না, বড় বড় গাছপালা উড়ে যায়। সবারই চোখ ঝলসে যায় ফ্যাসানের চটকে। বুলির মোহ বড় ভয়ানক। প্রোপ্যাগাণ্ডার ঘূর্ণিপাকে বড় বড় বজ্‌রাকেও তলিয়ে যেতে দেখেছি।

ইন্দ্র। কি তাহলে করা যায় বলুন। একটা উপায় বাতলান।

রাজীব। মূলোচ্ছেদ করতে হবে।

[উচ্চনাদে এই উক্তি করিয়া তিনি টেবিলে আবার একটা ঘুসি মারিলেন।]

ইন্দ্র। কি করে?

রাজীব। [সহসা নিম্নস্বরে] গুণ্ডা লাগিয়েছি। ওদের মিটিং যাতে পণ্ড হয়ে যায় সে ব্যবস্থা করে এসেছি। দু'একটাকে ঘায়েল করতে হবে, তা না হলে হবে না।

দেবেন। [সভয়ে] গুণ্ডা লাগিয়েছেন! ও বাবা! শেষকালে আমরা শুদ্ধ না ক্রিমিনাল কেসে জড়িয়ে পড়ি। পুলিশতো এখানেও এসে গেছে। ইন্দিরদা—

রাজীব। দেখুন, সনাতন হিন্দুধর্মকে যদি রক্ষা করতে চান, ভয় পেলে চলবে না। জান কবুল করে এগিয়ে আসতে হবে। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। যেন তেন প্রকারেণ বাঁচাতে হবে সনাতন হিন্দুধর্মকে।

দেবেন। [সহসা চটিয়া] আরে রেখে দিন মশাই আপনার সনাতন হিন্দুধর্ম। ক্রিমিনাল কেসে প'ড়ে চাকরিটি যদি যায় তাহলে সনাতন হিন্দুধর্ম কি রক্ষে করবে এসে? একেবারে ভরাডুবি হব যে তখন। আমি ওসবের মধ্যে নেই, বুঝলে ইন্দিরদা, আমি চললুম।

[উঠিয়া পড়িলেন।]

ইন্দ্র। আরে বস বস, ঘাবড়াচ্ছ কেন?

দেবেন। না ভাই, ওসব পুলিশ টুলিশের মধ্যে আমি থাকতে চাই না।

রাজীব। এমন করে গা বাঁচিয়ে কতদিন চলবেন আর? সব যে গেল [সহসা] যদি চলেই যাবেন, এসেছিলেন কেন?

দেবেন। এসেছিলাম জগনলালবাবু ডেকেছিলেন ব'লে।

রাজীব। জগনলালবাবু ডেকেছিলেন কেন?

দেবেন। আমি তাঁকে উকিলের চিঠি দিয়েছিলাম।

রাজীব। উকিলের চিঠি দিয়েছিলেন কেন?

[উপর্যুপরি তিন তিনটি 'কেন'র সম্মুখীন হইয়া দেবেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন।]

দেবেন। আমার মেয়ের জন্যে।

রাজীব। কিন্তু আপনি এইভাবে যদি স'রে পড়েন মেয়ের কি কোনও হিল্লে হবে?

[কোণঠাসা হইয়া দেবেন বসিলেন।]

দেবেন। সেজন্যে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন মশাই?

রাজীব। মাথা থাকলেই মাথা ব্যথা হয়।

[ইহার উত্তরে দেবেন কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করাতে থামিয়া গেলেন। সিদ্ধার্থ আসিয়াই আঙুল দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নীরবে ইহাদের প্রত্যেককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবেন আরও ঘাবড়াইয়া গেলেন।]

রাজীব। আপনি কি উজ্জ্বলা নন্দীর খোঁজে এসেছেন না কি?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ। এখনও ফেরেনি?

রাজীব। না, আমরাও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

সিদ্ধার্থ। আমিও করি তাহলে—

[একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।]

রাজীব। আপনার মেয়েও বিদ্রোহিনী না কি?

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] আমার অনেকগুলি মেয়ে, গোটা দুই বিদ্রোহ করেছে।

রাজীব। আপনিও কি আমাদের মতো উকিলের চিঠি দিয়েছেন না কি?

সিদ্ধার্থ। [হাসিয়া] না।

রাজীব। তবে? কি করছেন আপনি?

সিদ্ধার্থ। কিছুই না।

ইন্দ্র। কিছুই না মানে?

[উত্তরে সিদ্ধার্থ নন্দী কিছুই বলিলেন না, কেবল হাসি মুখে চাহিয়া রহিলেন।]

রাজীব। ঠিক বুঝতে পারছি না মশাই আপনার কথাটা। আপনি আপাতত কিছু করেন নি, না বরাবরই কিছু করবেন না ঠিক করেছেন। দু'দুটো মেয়ে আপনার বিদ্রোহ করেছে বলছেন। একেবারে উদাসীন থাকাটা কি সম্ভব, না উচিত?

সিদ্ধার্থ। আমার মনে হয় বাধা দিলেই বিদ্রোহের শক্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রচণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধে কত বড় বাঁধ দেবেন আপনি?

রাজীব। তাহলে এসেছেন কি করতে?

সিদ্ধার্থ। এমনি দেখা করতে। গল্প-সল্প করব একটু।

রাজীব। মাপ করবেন, আপনাদের ব্যাপার বুঝতে পারছি না ঠিক। আপনার দু'টি মেয়ে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গেছে বলছেন, অথচ যারা এর জন্যে দায়ী, আপনার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি তাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এসেছেন [দেবেনকে দেখাইয়া] এই ভদ্রলোক যেমন, আসতে হয় এসেছিলেন, একটু বিপদের আভাস দেখেই স'রে পড়বার চেষ্টা করছেন।

দেবেন। আমি ছাঁপোষা লোক, সব দিক বাঁচিয়ে তো চলতে হবে আমাকে মশাই। যেদিকে বৃষ্টির ছাট সেদিকে ছাতা না ধরলে আমাদের চলে না যে। বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা আমাদের পক্ষে।

রাজীব। [ইন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া] শুনলেন? সনাতন হিন্দুধর্ম রসাতলে যাক্ সেটা ওঁর কাছে বড় কথা নয়, কোনক্রমে বেঁচে থাকাটাই ওঁর কাছে বড় কথা।

[ইন্দ্র মুখে এমন একটা হাসি ফুটাইলেন যাহার সব রকম অর্থ করা যায়। রাজীব সিদ্ধার্থের দিকে চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন তাঁহার এই উক্তি সিদ্ধার্থের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিল কি না।]

সিদ্ধার্থ। আমারও মনে হয় বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা। আত্মরক্ষার চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই। আমরা যে যা করেছি সবই বেঁচে থাকার জন্যে, নাম দিয়েছি যদিও নানারকম।

দেবেন। [পুলকিত] ঠিক বলেছেন।

রাজীব। [বিস্মিত] সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেও বেঁচে থাকতে হবে!

সিদ্ধার্থ। তা তো সম্ভব নয়। আমার মনে হয় জীবন্ত লোক সনাতন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করতে পারে না।

রাজীব। [আরও বিস্মিত] তার মানে!

সিদ্ধার্থ। যা পরিবর্তনশীল তাই জীবন, তাই সনাতন। তার যা ধর্ম তাই সনাতন ধর্ম। যুগে যুগে তা বদলেছে, যুগে যুগে তা বদলাবে এবং সেই জন্যেই যুগে যুগে তা বেঁচে থাকবে। আপনি সনাতন হিন্দুধর্ম ব'লে যেটা আঁকড়ে থাকতে চাইছেন সেটা একটা কঙ্কাল, জীবন্ত জিনিস নয়। আর যেভাবে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছেন তা-ও হিন্দু মনোভাব নয়।

রাজীব। কি মনোভাব তাহলে?

সিদ্ধার্থ। সেমিটিক মনোভাব। হিন্দুধর্মকে লাঠি শড়কি দিয়ে পাহারা দিতে হয় না। ও ধর্মের কোনও সীমান্ত নেই।

ইন্দ্র। বাঃ, এ কথাটা বেশ বলেছেন!

[রাজীব ঘাড় ফিরাইয়া একবার ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন ইন্দ্র তাঁহার স্বপক্ষে। এখন তাঁহার কণ্ঠেও উল্টা সুর শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহাকে একাই লড়িতে হইবে। দেবেনের মুখ উদ্ভাসিত।]

দেবেন। নিশ্চয়। চাচা আপন বাঁচা এ চিরকালই করে এসেছে সবাই। তেরিয়া মেজাজের হ'লে সব সময়ে চলে কি?

রাজীব। যে কোনও বেলেল্লাগিরি হিন্দুধর্মের নামে সইতে হবে তা বলে?

সিদ্ধার্থ। রামায়ণ মহাভারত শাস্ত্র পুরাণ উল্টে দেখুন, এর চেয়ে ঢের বেশী বেলেল্লাগিরি হিন্দুধর্ম সহ্য করেছে [হাসিয়া] এখনও করছে। বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি মনুর সব বিধান আপনি মেনে চলেন?

রাজীব। আমি চলি কি না সেটা প্রশ্ন নয়, চলা উচিত কি না সেইটেই বিচার্য।

সিদ্ধার্থ। যে বিধান কেউ মানে না সে বিধানের চরম বিচার হয়ে গেছে বলেই তো মনে হয়। আর ও নিয়ে সময় নষ্ট না করাই তো উচিত।

রাজীব। তাহলে আপনারা এখানে এসেছেন কেন ?

দেবেন। আগেই তো বললাম, জগনলালবাবু ডেকেছেন ব'লে এসেছি।

ইন্দ্র। এই যে উনি এসেও গেছেন—

[জগনলাল টিকাওয়ালা প্রবেশ করলেন। সিদ্ধার্থ ব্যতীত বাকি সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিলেন।]

জগনলাল। [সহাস্য নমস্কারান্তে] বসুন, বসুন, আপনারা বসুন।

[সকলে উপবেশন করিলে জগনলালও আসন গ্রহণ করিলেন এবং পকেট হইতে মরক্কো-বাঁধানো সেই খাতাখানি বাহির করিলেন।]

জগনলাল। ইন্দ্রবাবু, দেবেনবাবু এবং রাজীবলোচনবাবুর আসবার কথা ছিল।

ইন্দ্র। আমি ইন্দ্র।

দেবেন। আমি দেবেন।

রাজীব। আর আমি রাজীব।

[জগনলাল সপ্রশ্নদৃষ্টিতে সিদ্ধার্থের দিকে চাহিলেন।]

সিদ্ধার্থ। আমি উজ্জ্বলা দেবীর সঙ্গে এমনিই দেখা করতে এসেছি। তার সঙ্গে দরকার আছে আমার একটু।

জগনলাল। ও। তিনি মিটিং শেষ করে আসবেন এখনই। আমি মিটিংয়ে যেতে পারিনি। [হাত ঘড়ি দেখিয়া] এইবার শেষ হবে বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। আমারও মিটিংয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি তাই এখানেই এলাম।

জগনলাল। বেশ তো, বসুন। আপনি বরং পাশের ঘরে যান, ওখানে একটা ইজি-চেয়ারও আছে, আরাম করে বসুন।

[সিদ্ধার্থ পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।]

জগনলাল। [ইন্দ্র, দেবেন ও রাজীবের দিকে একে একে চাহিয়া] আপনারা যে উকিলের চিঠি দিয়েছেন তা পেয়েছি আমরা। দেখুন, কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মেয়েদের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্যে উজ্জ্বলা দেবী এই সমিতি স্থাপন করেছেন, আর তাঁর উদ্দেশ্য ভাল জেনেই আমরা যার যেমন সাধ্য তাঁকে সাহায্য করছি। এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদের কোনও কারণ নেই। আমরা আপনাদের মেয়েদের জবরদস্তি করেও আনিনি, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় এসেছেন আমাদের ফর্মে সই করে। বেশ তো, আপনারা বুঝিয়ে তাঁদের যদি নিয়ে যেতে পারেন নিয়ে যান, আমাদের তাতে বলবার কিছু নেই।

ইন্দ্র। কিন্তু তারা যেতে চাইছে না।

দেবেন। সেই হয়েছে মুশকিল কি না!

জগনলাল। কিন্তু সেজন্য আমাদের দায়ী করা কি উচিত?

রাজীব। [ক্ষেপিয়া] নিশ্চয় উচিত। আপনারা তাদের ভুলিয়ে এনেছেন। অল্প বুদ্ধি মেয়েমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে এনেছেন।

জগনলাল। এ কথা যদি বলেন তাহলে তো আমি নাচার। তর্ক করে এর মীমাংসাও হবে না। তাহলে আপনারা যা ঠিক করেছেন তাই হোক, আদালতই এর নিষ্পত্তি করুক।

রাজীব। দেখুন, টাকার জোরে আইনের প্যাঁচে আপনারা যদি মকোদ্দমা জেতেনও তবু জেনে রাখুন আমরা কিছুতেই আমাদের ন্যায্য অধিকার ছাড়ব না। আদালতে যদি সুবিচার পাই ভালই কিন্তু না যদি পাই তবু আমরা থামব না। আমাদের দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না। সনাতন হিন্দু-ধর্মের আদর্শকে রক্ষা করবার জন্যে দরকার হলে বীরের মতো যুদ্ধ করব আমরা—রক্তারক্তি করব—

[উজ্জ্বলা নন্দীর প্রবেশ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। সঙ্গে মিস্টার ঘোষাল। সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না।]

ঘোষাল। আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি, যে এরকম একটা কিছু হবে। এখানেও তাই দু'একটা পুলিশ রাখতে বলেছিলাম। আচ্ছা, আমি চললাম এখন। দেখি যদি বাকি গুণ্ডাগুলোকেও ধরতে পারি। তুমি সোজা বাড়ী গেলেই পারতে এখন। এঁরা সব কে?

উজ্জ্বলা। এঁরা বোধ হয় রেবা, মনীষা আর কমলার বাবা। এঁদের সঙ্গেই আমার দরকার আছে একটু। তুমি যাও, আমি কাজটা সেরে নি।

দেবেন। [ইন্দ্রকে, জনান্তিকে] ইন্দির দা, চল স'রে পড়ি। গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না।

[ইন্দ্রও উসখুস করিতে লাগিলেন।]

ঘোষাল। তুমি কতক্ষণ থাকবে এখানে? আমি আসব কি আবার 'কার' নিয়ে?

উজ্জ্বলা। তার দরকার নেই। তুমি বরং পার তো সুষমার খবরটা একটু নাও, জ্ঞান হল কি না। তার চোটটা বড্ড বেশী লেগেছে।

ঘোষাল। বেশ। এস. পি.-র বাড়ি হ'য়ে হাসপাতাল ঘুরে আসছি এখুনি তাহলে।

[ঘোষাল চলিয়া গেলেন।]

জগনলাল। কি ব্যাপার উজ্জ্বলা দেবী!

উজ্জ্বলা। মিটিংয়ে খুব মারপিট হয়েছে। আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন একটা ইঁট এসে আমার মাথায় লাগল। সুষমার মাথায় প্রকাণ্ড একটা থান ইঁট পড়েছে, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। বীণা বোসের হাত ভেঙে গেছে [হাসিয়া] এ সব তো হবেই [ইন্দ্রবাবুকে] তারপর, আপনাদের কি বলবার আছে বলুন। ইঁট পাটকেল পকেটে করে এনে থাকেন যদি ছুঁড়ুন সেগুলো। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখুন, আমাদের দমাতে পারবেন না।

জগনলাল। ওঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। ওঁরা মকোদ্দমা করবেন ঠিক করেছেন।

দেবেন। দেখুন, আমার কিন্তু মকোদ্দমা টকোদ্দমা করবার ইচ্ছে নেই। আমি কেবল—

[থামিয়া গেলেন।]

উজ্জ্বলা। কি বলুন?

দেবেন। মানে, আমাদের মত ছাঁপোষা লোকের সংসারে একটা মেয়ে যে কত বড় সাহায্য তা তো আপনারা জানেন। আমার ওই মেয়ে একহাতে গোটা সংসারটা সামলাতো। এখন তাকে বোর্ডিংয়ে নিয়ে গেছেন আপনারা—তার উন্নতির জন্যই অবশ্য—কিন্তু আমার সংসারটা খোঁড়া হয়ে গেছে। তাই বলছি—

[থামিয়া গেলেন।]

উজ্জ্বলা। বলুন।

দেবেন। মানে, আমার বলবার কথা এই যে আপনারা যখন এতই খরচ করছেন তখন আমাকেও যদি মাসে গোটা দশ পনেরো করে টাকা দিতেন, একটা ঝি রাখতে পারতুম। আমার স্ত্রীর রোজ ঘুসঘুসে জ্বর হয়, কোমরে লাম্বেগো, ওই রেবাই সংসার চালাতো—একটা ঝি হলে হয়তো সামলাতে পারবে—কিন্তু আমার তো ঝি রাখবার সামর্থ্য নেই।

ইন্দ্র। আমারও ওই কথা। মেয়েটা চলে যাওয়াতে সংসারটা ছারখার হবার জোগাড় হয়েছে। আপনারা যদি সাহায্য করেন কিছু—তবে দশ পনর টাকায় ঝি বা রাঁধুনি আজকাল হবে না দেবেন—টাকা তিরিশ পড়বে—

উজ্জ্বলা। মাপ করবেন, সে আমরা দিতে পারব না [রাজীবকে] আপনারও টাকা চাই না কি ?

রাজীব। লাথি মারি আমি আপনার টাকার মুখে। আমার মেয়ে ফিরিয়ে দিন।

উজ্জ্বলা। আমরা কি করে ফিরিয়ে দেব। সে নিজে ইচ্ছে করে এসেছে, ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে। আর আপনি অত রাগ না করে একটু ভেবে দেখলেও তো পারেন যে আপনার মেয়ের ভালোর জন্যেই আমরা এ সব করছি—

রাজীব। আমার মেয়ের ভালো আপনাদের করতে হবে না। আমার মেয়ের ভালোমন্দ ঠিক করবার শাস্ত্রসঙ্গত অধিকার একমাত্র আমারই আছে। আমি তার বাবা।

উজ্জ্বলা। সে অধিকারের মর্যাদা যদি আপনি রক্ষা করতেন তাহলে আপনার মেয়ে স্বতন্ত্র হতে চাইতো না।

রাজীব। [চীৎকার করিয়া] মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য আমি স্বীকার করি না। তাকে বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকতে হবে।

উজ্জ্বলা। বেশ, পারেন তো অধীন করে রাখুন। বোঝাপড়া করে দেখুন আপনার মেয়ের সঙ্গে। সে আর্ত হয়ে আমাদের কাছে এসেছিল আমরা আশ্রয় দিয়েছি, সে যদি চলে যেতে চায় বাধা দেব না।

জগনলাল। আমিও ঠিক ওই কথাই বলেছি। তবে দেবেনবাবু আর ইন্দ্রবাবু যে কথা বললেন তা-ও ভেবে দেখবার মতো। মেয়েরা চ'লে যাওয়াতে ওঁদের অসুবিধা হচ্ছে, হবারই কথা, ওঁদের বাড়িতে লোকাভাব—বেশ, মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে রাজি আছি আমি।

দেবেন। তাহলে তো বেঁচে যাই!

ইন্দ্র। গোল চুকেই যায় তাহলে।

উজ্জ্বলা। না, তা হতে পারে না। ঘুস দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে একটা জিনিস হতে পারে, আমাদের এই ফর্মে যদি আপনারা সই করে দেন তাহলে আমরা আপনাদের মেয়েদের বাড়ি ফিরে যেতে বলব।

[টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটা ফর্ম বাহির করিল ও পড়িয়া শুনাইল।]

"আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে ভবিষ্যতে আমার মেয়ের প্রতি এমন কোনও প্রকার ব্যবহার করিব না যাহাতে তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তাহাকে বাড়িতে অথবা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিবার সুযোগ দিব। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ পণ

দাবী করিলে পণ দিব না। মেয়ে দেখানোর নাম করিয়া তাহাকে একদল পর-পুরুষের সম্মুখে বাহির করিব না। তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কোথাও বিবাহ করিতে বাধ্য করিব না"—এই ফর্মে সই করে দিলে আমরা আপনাদের মেয়েদের বাড়ি ফিরে যেতে অনুরোধ করব, আর আমার বিশ্বাস সে অনুরোধ তারা রাখবে।

দেবেন। এ ফর্মে সই করি কি করে বলুন? এর সব সর্ত পালন করা যে আমার সাধ্যাতীত। মেয়ের বিয়ে দিতে গেলেই পণ চাইবে, পণ দিতেও হবে—

ইন্দ্র। তাছাড়া মেয়ের আত্মসম্মান কিসে ক্ষুণ্ণ হবে না-হবে তা ঠিকই বা করব কি করে। কোনও একটা দোষের জন্যে হয়তো তাকে বকলুম অমনি তার আত্মসম্মান হয়তো ক্ষুণ্ণ হল!

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] এক হিসেবে এঁরা ঠিকই বলেছেন। আপনি আপত্তি করছেন কেন? কিছু কিছু দিলেই যদি এঁরা সন্তুষ্ট থাকেন আপাততঃ তাই করা যাক্ না [রাজীবলোচনকে] আপনিও একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখুন মশাই, মেয়েদের উন্নতি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

রাজীব। না, মেয়েদের উন্নতি করা আপনাদের উদ্দেশ্য নয়, উচ্ছন্ন দেওয়াই আপনাদের উদ্দেশ্য। বিনা সর্তে যদি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে না দেন—

উজ্জ্বলা। দেব না। কাউকে টাকাও দেব না। আপনাদের যা খুশী করতে পারেন।

রাজীব। মিস্টার ঘোষালের পাশে ব'সে মোটরে ঘুরে ঘুরে আপনার মনে আগুন জ্বলছে বুঝতে পারছি, আর এই শেঠজির ব্ল্যাকমার্কেটে রোজগার করা টাকা ইন্ধন যোগাচ্ছে তাতে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন উজ্জ্বলা দেবী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেরও ওপর-ওলা আছেন আর সেখানে আমাদের পৈরবি করবার সুযোগও আছে কিঞ্চিৎ, আর এই জগনলাল টিকাওয়ালাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে এমন দু'একজন ধনীও আছেন আমাদের দলে। আমরাও নগণ্য নই নেহাৎ, সুতরাং ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারবেন না আমাদের। এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, ধর্মের জয় হবেই এ বিশ্বাস আমাদের আছে—

[শশব্যস্ত পশুপতি প্রবেশ করিল।]

পশুপতি। বাইরে দারোগা সাহেব এসেছেন, পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।

দেবেন। ইন্দিরদা, কি করছ তুমি, তোমার পাল্লায় প'ড়ে ভরাডুবি হলাম যে—অ্যাঁ—

উজ্জ্বলা। দারোগা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এস।

[পশুপতি চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিফর্ম-পরিহিত দারোগা প্রবেশ করিলেন।]

দারোগা। [উজ্জ্বলাকে] যে তিনজন মেয়ের বাবা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁরা কোথা ?

উজ্জ্বলা। এই যে তাঁরা।

দারোগা। আপনাদের অ্যারেষ্ট করে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। চলুন আপনারা।

ইন্দ্র। [মরীয়া] শুনুন, আমি সব সত্যি কথা খুলে বলছি।

দেবেন। [ব্যাকুল] কি করলে তুমি ইন্দিরদা, ছি ছি—

রাজীব। [উজ্জ্বলাকে] একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন, এর প্রতিশোধ আমরাও নেব।

দারোগা। চলুন, যা বলবার থানায় বলবেন।

[ইন্দ্র, দেবেন ও রাজীবকে লইয়া দারোগা চলিয়া গেলেন।]

জগনলাল। এ কাজটা কিন্তু খারাপ হল উজ্জ্বলা দেবী। থানা পুলিশ জিনিসটাই খারাপ। ওতে সমিতির বদনাম হয়ে যাবে।

উজ্জ্বলা। কি করা যাবে বলুন! পুলিশ তো আমরা ডাকতে যাইনি।

জগনলাল। আপনার মাথায় কি খুব বেশী লেগেছে ?

উজ্জ্বলা। [হাসিয়া] বিশেষ কিছু নয়। একটু কেটে গেছে।

জগনলাল। এরা যদি এরকম হুজ্জত করে তাহলে তো মুশকিল হবে দেখছি।

উজ্জ্বলা। মুশকিল হবে জেনেই তো কাজে নেবেছি।

জগনলাল। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বাপেদের কিছু কিছু টাকা যদি দেওয়া যায় ওরা থেমে যাবে। আপনি তাতে আপত্তি করলেন কেন বুঝলাম না।

উজ্জ্বলা। ওদের আমরা টাকা দিতে যাব কেন ?

জগনলাল। মেয়েগুলো তাহলে কব্জার মধ্যে থাকত।

[কথাটা বলিয়াই জগনলাল অনুভব করিলেন যে কথাটা বেফাঁস হইয়াছে।]

উজ্জ্বলা। তাতে আমাদের লাভ ? মেয়েদের কব্জার মধ্যে রাখা তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

জগনলাল। [সামলাইয়া] না, না, তা নয়—ঠিক। আমিই ভুল করছিলাম। তবে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে তো, ওদের যদি আবার বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়,

পড়াটা বন্ধ হয়ে যাবে। যাক্—আপনার যখন আপত্তি তখন—। আপনাদের থিয়েটার কবে? সুষমা দেবী ভাল না হলে তো—

উজ্জ্বলা। সুষমা ভাল হোক, তারপর হবে একদিন।

জগনলাল। আমার দু'জন পাঞ্জাবী বন্ধু আসতে চান।

উজ্জ্বলা। বেশ তো আসবেন।

জগনলাল। আপনি কি এখন থাকবেন এখানে? আমাকে যেতে হবে এখন [হাতঘড়ি দেখিয়া] এখানকার কাজ তো আর কিছু নেই? ওহো, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁকে বসিয়ে রেখেছি পিছনের ঘরে। ডেকে দি দাঁড়ান।

[পাশের ঘরের দরজায় গিয়া উঁকি দিলেন।]

ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখছি। ও মশাই, উঠুন, উঠুন, উজ্জ্বলা দেবী এসেছেন।

[সিদ্ধার্থ নন্দী বাহির হইয়া আসিলেন।]

জগনলাল। [উজ্জ্বলাকে] আমি তবে চলি এখন, নমস্কার।

[চলিয়া গেলেন।]

সিদ্ধার্থ। ওকি, মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

উজ্জ্বলা। মিটিংয়ে মারপিট হয়েছিল।

সিদ্ধার্থ। [সহজভাবে] তা তো হবেই। বীরের দেশ!

[একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।]

উজ্জ্বলা। আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সিদ্ধার্থ। এসেছি অনেকক্ষণ। তোমার মিটিংয়ে যেতে পারিনি। কাজ করতে অনেক দেরী হয়ে গেল। আমি যে প্রদর্শনীটা খুলব ঠিক করেছি তার জন্যে ঘুরতে হল অনেক। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ওঘরে ইজিচেয়ারে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি।, তুমি কখন এসেছ টেরও পাইনি।।

[ক্ষণকাল নির্নিমেষে উজ্জ্বলার রক্ত-সিক্ত ব্যাণ্ডেজটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

এই তাহলে হ'ল শেষ পর্যন্ত। এখনও তোমার বিশ্বাস আছে নীতিকথা ব'লে এদের সুপথে আনতে পারবে?

উজ্জ্বলা। পারি আর না পারি চেষ্টা তো করতে হবে।

সিদ্ধার্থ। সারাজীবন চেষ্টাই করে যাবে?

উজ্জ্বলা। আপনি তাহলে কি করতে বলেন?

সিদ্ধার্থ। আমি ব্যবসায়ী লোক, লাভ-লোকসান খতিয়ে চলি, অন্য ব্যবসায়ীদের অভিজ্ঞতার সুযোগ নি, আমার পরামর্শ তোমার পছন্দ হবে না। ওপথে যাঁরা চলেছেন; তাঁদের জীবনী আশা করি ভাল করে পড়েছ। বিদ্যাসাগর গান্ধিজি—

উজ্জ্বলা। পড়েছি বই কি। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ, অপমান আছে জানি। তবু এখন সমাজ-সংস্কারের কাজই একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ মনে করি।

সিদ্ধার্থ। কোনও কিছু সংস্কার করতে চাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেক মানুষই নিজের সাধ্য এবং সুযোগ অনুসারে কিছু না কিছু সংস্কার করছে। তুমি কি সত্যিই মনে কর এই পথে চলে' এই সমাজকে সংস্কার করতে পারবে?

উজ্জ্বলা। মনে করি।

সিদ্ধার্থ। ওই মাড়োয়ারী তোমাকে বরাবর টাকা দিয়ে যাবে?

উজ্জ্বলা। যাবে তো বলেছে।

সিদ্ধার্থ। ভাল। আমার একটা কথা শুধু জানবার ছিল। যে জন্য শ্বশুর মশায় আমাকে এখানে আসতে লিখেছিলেন সেটার সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতে চাই। তুমি বিয়ে কি করবে না ঠিক করেছ?

উজ্জ্বলা। না, তা ঠিক করিনি।

সিদ্ধার্থ। তবে—?

উজ্জ্বলা। ও বিষয়ে কিছুই ঠিক করিনি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজনও হয়নি এখনও আমার।

সিদ্ধার্থ। উৎপলার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি তাহলে? শিবু উৎপলা পরস্পরকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। শ্বশুর মশাই বললেন, তোমার জন্যে তাদের বিয়ে আটকে আছে নাকি?

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত] কই, দাদু আমাকে বলেন নি তো কিছু!

সিদ্ধার্থ। তোমাকে ভয় পান।

উজ্জ্বলা। এর মধ্যে আপনার ব্যবস্থা করবার কি আছে তা তো বুঝতে পারছি না ঠিক।

সিদ্ধার্থ। আমাকে টাকা দিতে হবে যে। পাঁচ হাজার টাকা—

উজ্জ্বলা। পণ? উৎপলা জানে এ কথা!

সিদ্ধার্থ। না, পণ হিসেবে দিচ্ছি না। শিবুর পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি পাঁচ হাজার টাকার জন্যে বিকিয়ে যাচ্ছে, সেইটে উদ্ধার করে দেব।

উজ্জ্বলা। কেন দেবেন তা আপনি! এ তো পণ দেওয়াই হল।

সিদ্ধার্থ। বিপন্ন জামাইকে উদ্ধার করা কর্তব্য ব'লে মনে করি। এটাকে ঠিক পণ হিসেবে নিও না। ছেলেটিকে ভাল লেগেছে। উৎপলার সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না-ও হ'ত তাহলেও হয়তো ওকে সাহায্য করতাম আমি।

উজ্জ্বলা। করতেন ?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, করতাম বই কি। অনেক ছেলেকে করেওছি। তারপর তার কাছ থেকে কাজও আদায় করে নিয়েছি। একটি দুঃস্থ এম. এস. সি. ছেলেকে তার অসময়ে সাহায্য করেছিলাম একবার এক হাজার টাকা দিয়ে। সে আমার পরাগ পাউডারের ফরম্যুলাটা বার করে দিয়েছে। অনেক হাজার কামিয়েছি তার থেকে। তোমার বন্ধুটিকেও বেশ লাগল। তাকে আমার আলতা ফ্যাক্টারির চাকরিটা অফার করেছিলাম, নিলে না। তাকে দেখছি না, কোথায় সে ?

উজ্জ্বলা। কি জানি, আমিও জানি না। তারপর আর আসেনি।

[উৎসাহ প্রবেশ করিল।]

উৎসাহ। দিদি, তোমাদের মিটিংয়ে—একি তোমার মাথায় লেগেছে না কি ?

উজ্জ্বলা। লেগেছে, একটু। বেশী কিছু নয়। তুই বাড়ি থেকে তখন চলে গেলি কোথায় ? এই যে বাবা, প্রণাম কর।

[উৎসাহ ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, আর একবার উজ্জ্বলার দিকে চাহিল, তাহার পর প্রণাম করিল।]

উৎসাহ। আমি তাহলে চললাম। তোমার খবরটা নিতে এসেছিলাম শুধু।

উজ্জ্বলা। কোথা যাচ্ছিস ?

উৎসাহ। হস্টেলে।

সিদ্ধার্থ। শুনলাম আমি এসেছি বলেই তুমি না কি হস্টেলে চলে গেছ। তার তো দরকার ছিল না কোনও। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সত্যের সম্মুখীন হতে তোমার তো ভয় পাওয়া উচিত নয়।

উৎসাহ। ভয় পাইনি, লজ্জা পেয়েছি।

সিদ্ধার্থ। তোমার লজ্জা কি, তুমি তো লজ্জাজনক কিছু করনি এখনও। লজ্জা পাওয়া উচিত বরং আমারই। কিন্তু আমার লজ্জা নেই। আমি জানি পারিপার্শ্বিকের চাপে প'ড়ে আর পাঁচজনে যা করছে আমিও তাই করতে বাধ্য হয়েছি। কেউ রুগী ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করছে, কেউ মক্কেল ঠকিয়ে, কেউ খদ্দের ঠকিয়ে, কেউ ছাত্র ঠকিয়ে। ঘরে বাইরে চতুর্দিকে ঠগ, তাই আমিও সাধু থাকতে পারিনি। প্রত্যেক ঠগেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা যুক্তি আছে, আমারও আছে।

উৎসাহ। শিবুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার একটু আগে। তাঁর মুখে আপনার যুক্তি আমি শুনেছি। সে মেকি যুক্তিতে আপনি শিবুদাকে ভোলাতে পারেন, আমাকে পারবেন না। আমি চললুম।

সিদ্ধার্থ। শোন একটা কথা—

[উৎসাহ সিদ্ধার্থের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উজ্জলাকে বলিল।]

উৎসাহ। দিদি, আমরা কলেজের ছেলেরা মিলে একটা সভা করব। অনেকের ইচ্ছে তুমি তার সভানেত্রী হও। হবে?

উজ্জলা। কিসের সভা?

উৎসাহ। আমাদের কলেজের সমিতির নাম 'শক্তি-সমিতি'। তারই সভা হবে। সেই সভায় আমরা ঘোষণা করতে চাই স্বাধীন ভারতে আমাদের আদর্শ কি।

উজ্জলা' বেশ তো। কিন্তু আমাকে এ ক'দিন আমাদের সমিতির কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হবে যে, আমি কথা দিতে পারছি না। তার ওপর পুলিশ কেস হয়ে গেছে, থানাতেও ছুটোছুটি করতে হবে। তোদের নিজেদের মধ্যেই সভাপতি কর কাউকে। আমি যদি সময় পাই নিশ্চয় যাব। কবে হবে?

উৎসাহ। সেটা তোমাকে পরে জানাব।

উজ্জলা। আচ্ছা, উৎপলা কোথায়? তাকে মিটিংয়ে দেখলুম না তো?

উৎসাহ। মেজদি গেছে একটা চাকরির খোঁজে। এখানকার মেয়ে স্কুলে চাকরি খালির খবর পেয়েছে একটা। শিবুদার সঙ্গে মেজদি সেখানেই গেছে। আচ্ছা, আমি চললুম।

সিদ্ধার্থ। শোন একটা কথা—

উৎসাহ। কি বলুন?

সিদ্ধার্থ। আমার যুক্তি তোমার কাছে মেকি মনে হয়েছে তার কারণটা কি জান?

উৎসাহ। আপনিই বলুন।

সিদ্ধার্থ। তার কারণ তুমি অহঙ্কারী।

উৎসাহ। ঠিক বলেছেন। একটু আধটু নয়, অত্যন্ত অহঙ্কারী। সূর্যতারা-ভেদ করে মাথা উঠেছে আমাদের আকাশে, চোখে আমাদের অসম্ভবের স্বপ্ন, বুকে মনুষ্যত্বের গর্ব। কারও অনুগ্রহ চাই না আমরা, চাই না কারও দয়া, হাত পাতব না কখনও কারো কাছে। নিজেদের শক্তিতেই অমিত তেজে পথ চলতে পারব আমরা স্বচ্ছন্দে, এ ভরসা আছে। আপনাকে ঘিরে মস্ত বড় স্বপ্ন ছিল

একটা, হঠাৎ সেটা চুরমার হয়ে গেল, হয়তো অহঙ্কারের সংঘর্ষেই। যাক্। যা মিথ্যা তা যাওয়াই ভাল। প্রথমটা একটু দুঃখ হয়েছিল, এখন আর তা নেই। চললুম।

[চলিয়া গেল।]

সিদ্ধার্থ। [মুগ্ধ] বাঃ, বড় আনন্দ হচ্ছে আমার উজ্জ্বলা। প্রথম যৌবনে বিদ্রোহের যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, তা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে তোমাদের মধ্যে নানারূপে। কিন্তু দুঃখ কি জান? আমার সেই স্বপ্নের পাল তোলা নৌকোটা যে চোরা-পাহাড়ের ধাক্কায় খান খান হয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করছ না তোমরা। বিশ্বাস করছ না যে নৌকো হয়ে গেছে তক্তা, স্বপ্ন হয়েছে অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাই ডিনামাইট্ নিয়ে আজ চোরা-পাহাড়গুলো ভাঙবার চেষ্টায় আছে, তোমরা ভাবছ একটা দৈত্য বুঝি। কিন্তু আমি দৈত্য নই, আমি সেই রূপান্তরিত স্বপ্ন, চেয়ে দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখ আমার দিকে—

উজ্জ্বলা। [বিব্রত] চলুন বাড়ি যাই। সুষমার খবর নিতে হবে একটু। সে যদি সামলে থাকে, থিয়েটারের ব্যবস্থাটা করতে হবে। [হাত ঘড়ি দেখিয়া] সময় নেই বেশী—

সিদ্ধার্থ। পাল-তোলা নৌকোদের সময় বেশী থাকে না জানি, কিন্তু চোরা-পাহাড় আছে, সাবধান।

[হন্তদন্ত হইয়া তিনটি মেয়ে প্রবেশ করিল।]

প্রথমা। উজ্জ্বলাদি, আমরা আর হস্টেলে থাকব না।

উজ্জ্বলা। কেন, কি হল?

দ্বিতীয়া। জগনলালবাবু আজ আমাদের সিনেমা দেখবার 'পাশ' দিয়েছিলেন, আর ব'লে পাঠিয়েছিলেন যে গাড়িও পাঠিয়ে দেবেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। গাড়ি এল, আমরা সিনেমায় চলে গেলাম। একটু পরে দেখি ড্রাইভারটাও পাশে এসে বসেছে আর চামেলীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলবার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক লাইট নিবে গেল, শুনলাম ফিউজ হয়ে গেছে। একটু পরে ওরা বললে কি যেন পুড়ে গেছে, সিনেমা আজ হবে না। আমরা বেরিয়ে এলাম। মোটরটা দাঁড়িয়েছিল। আমরা জানি জগনলালবাবুর মোটর এটা, আমাদের হস্টেলে পৌঁছে দেবে। উঠলাম সবাই। মোটর কিন্তু হস্টেলের দিকে না গিয়ে ছুটল সোজা মাঠের দিকে।

তৃতীয়া। আমরা যত বলি হস্টেলে চল, ড্রাইভারটা এক মুখ হেসে ততই বলে—চলিয়ে থোড়া টহলা যায়। উঃ কী ভীষণ দাড়ি লোকটার। বোঁ বোঁ করে হাজির হল মাঠে গিয়ে। মাঠের একধারে থামাতে আমরা নেবে পড়লুম।

প্রথমা। সামনেই অগ্রে ছিল একটা পুলিশ কনেস্টবল। তাকে আমি দৌড়ে গিয়ে সব বললুম খুলে। ড্রাইভারটা খুব হাসতে লাগল যেন কিছুই হয়নি, যেন খুব একটা মজা করেছে সে। তারপর সেই কিন্তু নিজে পুলিশটাকে সঙ্গে নিলে ডেকে, তারপর আমাদের হস্টেলে পৌঁছে দিলে।

তৃতীয়া। আমরা নেবে যাবার পর বলছে—ডরিয়ে নেহি। ম্যয় আপ লোগোঁ সে দোস্তি করনা চাহতা হুঁ।

প্রথমা। তারপর থেকে গাড়িটা সমানে দাঁড়িয়ে আছে হস্টেলের সামনে।

দ্বিতীয়া। তারপর আমরা খোঁজ নিয়ে জানলুম ওটা জগনলালবাবুর গাড়িই নয়। সেই পাঞ্জাবীটারই গাড়ি।

তৃতীয়া। ভারী ভয় করছে আমাদের। আমরা হস্টেলের খিড়কি দরজা দিয়ে তাই চলে এলুম আপনার কাছে।

প্রথমা। আপনার বাড়ি গেছলাম প্রথমে।

উজ্জ্বলা। সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে বললে না কেন ?

দ্বিতীয়া। আপনাকে না জিগ্যেস করে কিছু করতে সাহস হচ্ছে না আমাদের। শেষকালে যদি কেলেঙ্কারি হয়ে যায় কিছু।

উজ্জ্বলা। না, না কিছু হবে না। তোমরা হস্টেলে ফিরে যাও, আমি আসছি এক্ষুনি।

প্রথমা। আপনিও চলুন সঙ্গে, আমাদের বড় ভয় করছে।

দ্বিতীয়া। জানেন, রেবা, মনীষা আর কমলা হস্টেল থেকে বাড়ি চ'লে গেছে, তাদের বাবাদের পুলিশে ধরেছে না কি। কি যে কাণ্ড সব হচ্ছে!

তৃতীয়া। বড় ভয় করছে, কি যে হবে!

[মিস্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন।]

ঘোষাল। কই, যাবে না কি, চল। সুষমা ভাল আছে, তার লাগেনি বেশী, ভয়েই সে আচ্ছন্ন হয়েছিল। এরা সব কে ?

উজ্জ্বলা। এরা হস্টেলের মেয়ে। এদের হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে?

ঘোষাল। তা পারি। কিন্তু এরা এখানে কেন এ সময়ে ?

উজ্জ্বলা। সে পরে শুনো।

ঘোষাল। আরও গোটা তিনেক গুণ্ডা ধরা পড়েছে। কিন্তু তোমাদের সমিতিটা বোধ হয় Banned হয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার কাল পাবে।

উজ্জ্বলা। তার মানে!

ঘোষাল। মানে আবার কি! না-জুড়ি দাস না কে একজন আছে—গোটা

ছয়েক 'মিল' যায়—সে গিয়ে ধরেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে। রাজীব, দেবেন ইন্দ্রনাথ তিনজনই ছাড়া পেয়ে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ধারণা হয়েছে যে তোমার 'সমিতি' পাবলিক পীস নষ্ট করছে না কি।

উজ্জ্বলা। তাহলে কি হবে?

ঘোষাল। হবে আবার কি, সমিতি বন্ধ করে দিতে হবে আপাতত। তবে বাঙালী কমিশনার সাহেব এসেছেন একজন, তাঁকে গিয়ে ধরলে যদি কিছু হয়। চল, এখন তো যাওয়া যাক।

উজ্জ্বলা। তুমি এদের আগে পৌঁছে দিয়ে এস।

ঘোষাল। [মেয়ে তিনটিকে] এস তোমরা তাহলে।

[মিস্টার ঘোষাল ও মেয়েরা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থ হাত-তালি দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শয়তানের হাসি।]

তৃতীয় বিরতি

৪

['বন্ধন-মোচন' নাটকের অভিনয় হইবে। স্টেজের মাঝখানে রঙীন কাপড় দিয়া ছোট একটি স্থান ঘেরিযা দেওয়া হইয়াছে। সামনে একটি পরদা, দুই ভাগে ভাগ করা। দুইপাশ হইতে টানিয়া সরাইয়া দিলে ছোট রঙ্গমঞ্চটি দেখা যাইবে। ছোট রঙ্গমঞ্চটির পাশে ও সম্মুখে স্থান আছে। নাটক এখনও আরম্ভ হয় নাই। উজ্জ্বলা ও মিস্টার ঘোষাল প্রবেশ করিলেন।]

ঘোষাল। তুমি আর এ সবের মধ্যে থেকো না উজ্জ্বলা, বুঝলে?

উজ্জ্বলা। মিছে কেন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করছ? আমাকে থাকতেই হবে, এই আমার জীবনের ব্রত। এ আমি ছাড়তে পারব না।

[মিস্টার ঘোষাল ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উজ্জ্বলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বান্ধবীটির আপাত-কোমল অন্তঃকরণের অন্তরালে যে এমন একটি প্রস্তর-কঠিন স্তর আছে তাহা তিনি যেন প্রত্যাশা করেন নাই, আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হইলেন।]

ঘোষাল। এখন কি করবে ঠিক করেছ তাহলে? তোমার সমিতি তো উঠে গেল।

উজ্জ্বলা। নারী-সম্মান-রক্ষা-সমিতি উঠে গেল, অন্য নাম দিয়ে কাজ আরম্ভ করব। আমাদের সমিতির নাম 'বন্ধন-মোচন' সমিতি হবে আজ থেকে।

ঘোষাল। টাকা পাবে কোথায়? জগনলাল টিকাওয়ালার সঙ্গে বনবে কি এর পর?

উজ্জ্বলা। না বনবার কোনও কারণ দেখছি না। তাঁর মুখে যতটা শুনলাম মেয়েরা অকারণে ভয় পেয়েছিল। ওই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক গুণ্ডা নন। যতদূর শুনলাম তিনি জগনলালবাবুর বন্ধু এবং বন্ধু হিসেবেই তিনি মেয়েদের সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বন্ধুভাবেই আলাপ করতে চেয়েছিলেন। পাঞ্জাবী দেখে মেয়েরা ভয় পেয়ে গেছে। মেয়েদের এই ভয় ভাঙানোটাই একটা প্রধান কাজ। তাদের এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে তারা আঙুর নয় মানুষ, ওপরে তুলো নীচে তুলো দিয়ে তাদের সম্মান বাঁচানো যাবে না। নিজের আত্মসম্মান নিজের আচরণ দ্বারা রক্ষা করতে হয়, নিজের শক্তি দিয়ে এমন কি প্রাণ দিয়েও—এ বোধটা তাদের হওয়া চাই।

ঘোষাল। তাহলে জগনলালবাবু এখনও তোমাকে অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন?

উজ্জ্বলা। সে সম্বন্ধে কোনও কথা হয়নি এখনও। তবে আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।

ঘোষাল। তোমাদের এ 'বন্ধন-মোচন' সমিতিও যদি Banned হয়ে যায়?

উজ্জ্বলা। খুব সম্ভব হবে না, কারণ নূতন কমিশনার সাহেবের স্ত্রী 'বন্ধন-মোচন' সমিতির পেট্রন হতে রাজি হয়েছেন।

ঘোষাল। তুমি গিয়েছিলে না কি তাঁর কাছে?

উজ্জ্বলা। গিয়েছিলাম।

ঘোষাল। বাঃ, তাহলে তো কাজ গুছিয়ে ফেলেছ। সুষমার খবর কি?

উজ্জ্বলা। সে বেশ ভাল আছে। সেই তো সাজাচ্ছে মেয়েদের।

ঘোষাল। এইটুকে স্টেজে তোমাদের নাটক হবে? কি রকম নাটক?

উজ্জ্বলা। ছোট নাটক। ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের স্টুডিও নাটকের ধরণে লেখা।

ঘোষাল। ও! এস, বসা যাক তাহলে—

[নামিয়া আসিয়া প্রেক্ষাগৃহের একটি চেয়ারে বসিলেন। ইঁহাদের জন্য কয়েকটি খালি চেয়ার প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব হইতে রাখা থাকিবে। উজ্জ্বলাও ঘোষালের অনুগমন করিতেছিল কিন্তু সিদ্ধার্থ নন্দী প্রবেশ করাতে থামিয়া গেল। সিদ্ধার্থ নন্দীর হাতে এক গোছা কাগজ।]

সিদ্ধার্থ। তোমাদের থিয়েটার দেখতে এলুম।

উজ্জ্বলা। বেশ তো!

সিদ্ধার্থ। থিয়েটার হয়ে যাবার পর আমি কিন্তু একটা ঘোষণা করতে চাই।

উজ্জ্বলা। কি বিষয়ে?

সিদ্ধার্থ। আমি যে প্রদর্শনীটা খুলছি সেই বিষয়ে। অনেক লোক জমা হয়েছে এখানে। এঁদের সবাইকে সেখানে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করব। তারপর বিলি করব এইগুলো।

[উজ্জ্বলার হাতে একখানা হ্যাণ্ডবিল দিলেন।]

আশা করি তোমার আপত্তি নেই?

উজ্জ্বলা। [ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজটা দেখিতে দেখিতে] না, আপত্তি কিসের। জায়গাটা কি উৎসাহের কলেজের পাশেই?

সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ, অন্য জায়গা আর পেলাম না। ওই ফাঁকা মাঠটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেব।

উজ্জ্বলা। কবে হবে আপনার?

সিদ্ধার্থ। কাল সন্ধ্যা থেকে। আজই করব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমাদের থিয়েটারের জন্য স্থগিত রাখতে হল। ওই বীথিকা মেয়েটি আমার ওখানেও নাচবে কি না।

উজ্জ্বলা। কাল উৎসাহদের একটা মিটিং আছে।

সিদ্ধার্থ। কিন্তু আমার তো আর সময় নেই। তারিখ বদলাবারও উপায় নেই, পোষ্টার দেওয়া হয়ে গেছে চারদিকে।

উজ্জ্বলা। বেশ।

[উৎপলা ও শিবুর সহিত দুর্গাপদও প্রবেশ করিলেন।]

উজ্জ্বলা। [বিস্মিত ও হৃষ্ট] দাদু! তুমি এসেছ?

দুর্গাপদ। এলুম। উৎপলা ছাড়ে না যে। আসতে হল।

উৎপলা। একি, গলার বোতামটা লাগান নি! মুখ তুলুন।

[দুর্গাপদ মুখ তুলিলেন, উৎপলা বোতামটা লাগাইয়া দিল।]

শিবু। চাদরটাও ফেলে এসেছিলেন। নিন।

[দুর্গাপদর গলায় চাদর পরাইয়া দিল।]

সিদ্ধার্থ। চলুন, বসা যাক।

দুর্গাপদ। ও তুমিও এসেছ? চল। থিয়েটার দেখিনি অনেকদিন। চল। উৎসাহ কই? তাকে দেখছি না।

উজ্জ্বলা। সে-ও আসবে এখুনি।

দুর্গাপদ। আসবে? ও। আচ্ছা, চল, বসি গিয়ে।

উৎপলা। [সিদ্ধার্থকে] বাবা, আমার চাকরিটা হয়ে গেছে, জানেন?

সিদ্ধার্থ। তাই নাকি!

উৎপলা। নব্বই টাকা মাইনে।

[চোখের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যেন একটা সম্পদ পাইয়াছে।]

সিদ্ধার্থ। ও।

[সাইকেলের ঘন্টার মতো একটা ঘন্টা বাজিয়া উঠিল।]

উজ্জ্বলা। এইবার আরম্ভ হবে, চলুন আমরা বসি গিয়ে।

[সকলে নামিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী কমিশনার সাহেব, তাঁহার সুসজ্জিতা পত্নী এবং তাঁহাদের পিছু পিছু জগনলাল টিকাওয়ালা ও রাজীবলোচন প্রবেশ করাতে উজ্জ্বলাকে আবার উঠিয়া আসিয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে হইল। সকলে বসিলে দেখা গেল হাফশার্ট-পরিহিত মাল-কোঁচা-মারা অনুক্ষণ গুপ্ত দর্শকদের মধ্যে শরবৎ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সর্বশেষে উৎসাহ প্রবেশ করিয়া পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহুটি উত্তোলন করিয়া দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল।]

উৎসাহ। এখানে আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রী যাঁরা আছেন, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় কলেজে আমাদের শক্তি-সমিতির যে সভা হবে, তাতে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীযুক্ত অনুক্ষণ গুপ্ত, আমাদেরই কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

[নীচে নামিয়া আসিয়া একধারে বসিল। আবার ঘন্টা বাজিল। স্টেজের আলোটা সহসা জরদা রংয়ের হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটা সুর ফুটিয়া উঠিল। সুরবাহারে করুণ-গম্ভীর বাগেশ্রী রাগিণী বাজিতে লাগিল। রাগিণী শেষ হইলে আলোর রং পুনরায় পরিবর্তিত হইল এবং দুইপাশ হইতে দুইজন সূত্রধার প্রবেশ করিল। দুই জনই কমনীয় কান্তি যুবক। দুই জনেরই পরিচ্ছদ ভারতীয় এবং মনোরম। ছোট রঙ্গমঞ্চটির দুই পাশে দুই জন দণ্ডায়মান হইয়া আবৃত্তি শুরু করিল।]

১ম সূত্রধার। স্বাগত সজ্জনবৃন্দ; কাব্যকথার নকলে
যে কাহিনী বলব মোরা লাগিয়ে কিছু ছন্দ
অভিনব নয় তা' মোটে, জানেন সেটা সকলে
কারণ জানি আপনারা নন বধির এবং অন্ধ।

২য় সূত্রধার। হয়তো একটু বেশীই জানেন,—সেই জন্যেই হয়তো
অতি-জানার ঘর্ষণেতে জ্ঞান হয়েছে নষ্ট
কিম্বা কেহ লাগিয়ে চোখে ভুল চশমা নয়তো
স্পষ্টটাকে সোজাসুজি দেখছেন অস্পষ্ট।

১ম সূত্রধার। সেই ভরসায় ভাবছি হয়তো ঠেকতে পারে নূতন;
শুনতে শুনতে যদি কারও চাগায় অধৈর্য
অভিনয়ের শেষে যেন এসে মোদের গুঁতোন
সে পর্যন্ত দয়া করে ধরে থাকুন ধৈর্য।

২য় সূত্রধার। বলব আমরা নারীর কথা—জগদ্ধাত্রী নারীর
যাঁকে নিয়ে বস্তা বস্তা হচ্ছে লেখা পদ্য
যাঁহার মাথায় ঝরছে বারি নিত্যনূতন ঝারির
যাঁর পরশে ধন্য হল অন্ন এবং মদ্য।

১ম সূত্রধার। ইতিহাসের পাতায় পাতায়
সাবেক কালের জাবদা খাতায়
তাঁর যা ছবি দেখছি মোরা
নয় তা অনবদ্য।

[সামনের পরদা সরিয়া যাইতেই দেখা গেল একটি বর্বর বন্যমানব মাথা পাতিয়া বসিয়া আছে ও একটি বন্যমানবী তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার মাথার উকুন বাছিতেছে। পরদা ঢাকিয়া গেল।]

২য় সূত্রধার। সেকালেতে পান ছিল না খসত না চুন
কিন্তু যদি বাছতে গিয়ে মাথার উকুন
টান পড়ত চুলে
শক্ত-পেশী পুরুষ-প্রবর থাকত না তা ভুলে।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল মাথার চুলে সামান্য টান পড়াতে ভ্রূকুটি করিয়া পুরুষটা মেয়েটার দিকে চাহিয়া আছে। মেয়েটাও দন্তভঙ্গী করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। পুরুষ তাহাকে লাথি মারিয়া

সরাইয়া দিয়া লগুড় তুলিতেই মেয়েটা চীৎকার করিয়া পলাইয়া গেল। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। পালিয়ে গিয়ে বাঁচত তারা বনান্তরে
অভিমানের ঠাঁই ছিল না মনান্তরে।

২য় সূত্রধার। পলাতকার নাগাল পেলেও ক্ষুব্ধ প্রেমিক
শাঁখ বাজিয়ে বরণ তাকে করত না ঠিক।

[পরদা সরিলে দেখা গেল গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত লতা জড়াইয়া জড়াইয়া বন্য পুরুষ বন্য নারীকে বাঁধিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। এমনি করে কাটল কত লক্ষ বরষ
বর্বরেরা ক্রমে ক্রমে গর্ব করার দ্রব্য হল;

২য় সূত্রধার। লাগল মনে ভাবের গুঁতো রঙের পরশ
প্রাচীন খোলস নব্য হ'ল।

১ম সূত্রধার। তীক্ষ্ণ নখ-দন্তাবলী পড়ল ঢাকা খাপের তলায়
অসংযত চিত্ত ম'ল সংযমেরি চাপের তলায়
অমিত-হ'ল মিতান্বেষী মাল্য দিল মানের গলায়
সংক্ষেপে,—সে সভ্য হল।

২য় সূত্রধার। নারীর প্রতি তার আচরণ ভব্য হল।

১ম সূত্রধার। প্রহার তাকে করত না আর—

২য় সূত্রধার। চুলের মুঠি ধরত না আর—

১ম সূত্রধার। সভ্য জালে পড়ল ধরা এবার ইভা-নন্দিনী
মোহন নিগড় পরিয়ে তারে করলে মানুষ বন্দিনী।

[পরদা সরিলে দেখা গেল একটি সভ্য যুবক একটি যুবতীর গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে। পাশে আরও দুই জন যুবক দাঁড়াইয়া আছে।]

যুবতী। [লীলাভরে] আমার হাতে ফুলের গয়না পরাবে না?

[মৃণাল বাহু তুলিয়া ধরিল।]

২য় যুবক। [শশব্যস্ত] নিশ্চয়। হাতেও পরাব, পায়েও পরাব।

[হাতে ও পায়ে ফুলের হার পরাইয়া দিল।]

যুবতী। মাথায়? [ব্যঙ্গভরে ঘাড় হেঁট করিল।]

৩য় যুবক। এই যে—

[ফুল দিয়া কবরী সাজাইয়া দিল।]

[পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। তার পরেতে মানুষ যখন করল দখল পাহাড় নদী সাগর মরু
পুষল ঘোড়া, পুষল কুকুর, পুষল গরু

২য় সূত্রধার। ফাল চালিয়ে মাটির বুকে
আবাদ করে মনের সুখে
তুলল গড়ে নূতন জগৎ
কাটিয়ে পাথর, ফলিয়ে তরু।

১ম সূত্রধার। বন্ধনরের জীবনখাতে সৌভাগ্যের বন্যা এল।

২য় সূত্রধার। প্রচুর ধন ও ধান্য এল, পুত্র এল কন্যা এল।

[পরদা সরিলে দেখা গেল নারীকে ঘিরিয়া অনেক পুত্র কন্যা এবং তাহাদের পিছনে একাধিক পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। কৃষি সভ্যতার প্রতীক দুইটি কলাগাছও দুই দিকে রহিয়াছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। জয়যাত্রার দুন্দুভি তার সারাটা জীবন বাজল যদিও সগৌরবে
মৃত্যুঞ্জয়ী হ'ল না সে তবু,—বুঝল একদা মরতে হবে।

২য় সূত্রধার। ফেলে যেতে হবে পশ্চাতে সব
এত সম্পদ এত বৈভব
আসবে নূতন,—পুরাতনকে যে সরতে হবে।

[পরদা সরিলে দেখা গেল মৃত্যুশয্যায় এক বৃদ্ধ পুরুষ শায়িত। তাহার আশেপাশে কয়েকজন প্রৌঢ় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে অধোমুখে বসিয়া আছে একটি নারী।]

বৃদ্ধ পুরুষ। আমি চললাম, আমার সময় হয়ে এসেছে। আমার ছেলেরা রইল। তারাই ভোগ করবে সব। আমার ছেলেরা—

১ম প্রৌঢ়। তোমার ছেলেরা! কোনটা তোমার ছেলে তা কি তুমি বলতে পার না কি?

বৃদ্ধ পুরুষ। আমি না পারলেও, ও পারে।

[নারীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিল।]

২য় প্রৌঢ়। কেউ পারে না।

বৃদ্ধ পুরুষ। [উচ্চতর কণ্ঠে] ও পারে, ও নিশ্চয় পারে, ওকে জিগ্যেস কর। ও জানে, ও সব জানে—

৩য় প্রৌঢ়। [অধোমুখী নারীকে] তুমি জান না কি?

[নারী মাথা নাড়িয়া জানাইল সে জানে না।]

বৃদ্ধ পুরুষ। জান না! তুমিও জান না, তুমিও জান না, তুমিও জান না! ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ—

[উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল।]

[পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। পুরুষ নিজের শক্তি দিয়ে করল যাহা অর্জন
মৃত্যু এলে এক নিমিষে করতে হল বর্জন,

২য় সূত্রধার। ভোগ করল হয়তো তাহা অনাত্মীয় পরজন
চলবে না এ, চলবে না এ, উঠল মহা গর্জন।

১ম সূত্রধার। নূতন নিয়ম তাই হল জারি ফের
এবং ক্রমশ তাহা হইল মধুর
একপতি হতে হবে সব নারীদের
সমাজে সৃষ্টি হল বর ও বধূর।

২য় সূত্রধার। নারীর চরণ ঘেরি নূতন শিকল
পুরুষ পরালো যবে, জানি না তখন
হয়েছিল কি না তার চিত্ত বিকল
আর্তনাদেতে তার গিরি নদী বন
কেঁপে উঠেছিল কি না,—জানি না সে কথা
ইতিবৃত্ত সে বিষয়ে এখনও নির্বাক
নিঃসংশয়ে সকলেই জেনেছি যে কথা
তারি প্রতিধ্বনি তোলে ঘরে ঘরে শাঁখ।

[সহসা শঙ্খধ্বনি হইল এবং পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল বধূ-বরণ হইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। এই নিয়মই সব সমাজে চলছে আজও অবাধ গতি
এরই ফলে জন্ম নিল সীতা সতী অরুন্ধতী।

২য় সূত্রধার। স্বামীর ঘরে সাধ্বী বালা জ্বাললো আলো দুখের রাতে
সাবিত্রীরা করল লড়াই মহিষ-বাহন যমের সাথে।

১ম সূত্রধার। ভদ্র স্বামী আত্মহারা পত্নী-প্রেমে

২য় সূত্রধার। পত্নীটিকে বানিয়ে বিবি একলা খেটে উঠল ঘেমে

১ম সূত্রধার। বাঁধল গৃহ আনল রুটি খেটে কিম্বা ঋণ করি তা'
পত্নী হলেন লক্ষ্মী গৃহের, পক্ষী যেন পিঞ্জরিতা।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল নারী মশলা বাটিতেছে। পরদা আবার রঙ্গ-মঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। বন্দিনী মানবীর কর্ণে
সমাজ শোনাল কত মন্ত্র
সোহাগে অলঙ্কার স্বর্ণে
রচিল কত না কাম তন্ত্র।

২য় সূত্রধার। টোপ-গেলা কাৎলী ও রোহিতা
কেমনে হইল সম্মোহিতা
বিশদ করিয়া সব কহি তা'
নাহি তত বড় বাগ যন্ত্র।

১ম সূত্রধার। সংক্ষেপে,—ছিল যারা সবলা
ক্রমশ হইয়া গেল অবলা
চামড়া হইল ডুগি তবলা
বেহালার তাঁত হ'ল অন্ত্র।

[পরদা সরিলে দেখা গেল একটি তন্বী রূপসী নারী আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া কানে দুল পরিতেছে। তাহার পরিধানে বহুমূল্য সুদৃশ্য বসন-ভূষণ। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। কত না কাব্য কত না স্বপ্ন কত না ছন্দ কোমল করুণ
কত কুসুমের কত না গন্ধ উষা সন্ধ্যার কত না অরুণ।

২য় সূত্রধার। কত জ্যোৎস্নার নিবিড় সোহাগে
সুরে উচ্ছ্বাসে সঙ্গীতে রাগে
কত না স্বর্গ রচিল ধরায়
নারীরে ঘিরিয়া কত না তরুণ।

[পরদা সরিলে দেখা গেল সুসজ্জিতা একটি তরুণী বসিয়া আছে। একটি যুবক তাহার পায়ের কাছে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁশীতে সুর তুলিয়াছে। পরদা রঙ্গ-মঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। হায় শেষে ভেঙে গেল এ স্বপ্ন ভঙ্গুর
দুর্দশা সুরু হ'ল দুর্বলা পঙ্গুর।

২য় সূত্রধার। বিলাসের লালসার সমাজের বন্ধন
কণ্ঠ ধরিল চেপে; সুর হল ক্রন্দন।

১ম সূত্রধার। কোমল পেলব তনু অতি অক্ষম-কায় .
পর-নির্ভর-শীলা পরগাছা সম হায়
রমণীরা ছেড়ে দিল সমাজের দরবার
ভরে গেল অঙ্গন ছেয়ে গেল ঘর বা'র।

২য় সূত্রধার। পরগাছা-বিতাড়ন শুরু হ'ল শেষটায়
বিশেষত আমাদের এই পোড়া দেশটায়।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল চুলের ঝুঁটি ধরিয়া স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। তাহার পরেতে যে সব ঘটনা পরম্পরা
ঘটিতে লাগিল দিনের আলোকে অকুণ্ঠিত
ঠিক ঠিক মতো যায় না তাহার হিসাব করা
গোনা যায় না যে, কারণ তাহারা অগুনতি তো।

২য় সূত্রধার। মোহের গরবে মোহিনী রূপসী ভুলিয়াছিল
শক্তিহীনার টেকে না কখনও অহঙ্কার
তাই যে কণ্ঠে কুসুম-মালিকা দুলিয়াছিল
পরিতে হইল তাহাতে নূতন অলঙ্কার।

[পরদা সরিলে দেখা গেল একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। বক্ষে বেদনা চক্ষে অশ্রু ঘরে ও বাহিরে শঙ্কা
অপমান অশ্রদ্ধা
তবু সমাজেতে বাড়িয়া চলিল সস্তা মেয়ের সংখ্যা,
কিন্তু তারা অবধ্যা।

২য় সূত্রধার। হিড় হিড় করে টানিয়া তাদের গরু বাছুরের মতো
বাজারে আনিয়া বেচে দিল তাই সহস্র শত শত।

১ম সূত্রধার। মাথায় যাদের তুলেছিল হায় করি সমারোহ কত
শেষকালে দিল রদ্দা।

[পরদা সরিলে দেখা গেল কোমরে দড়ি দিয়া পর্তুগীজ বণিক কয়েকটি মেয়েকে কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

২য় সূত্রধার। ছিল বিবাহিতা যে সব রমণী তাদের তরে
নানা পণ্ডিত বিধান ঘোষিল সমস্বরে
নানা সংহিতা রচিত হইল দেবাক্ষরে
বাঁধিতে তাদের বিধান-পাকে।

১ম সূত্রধার। "স্বামী মরে গেলে বিধবারা হবে যে জঞ্জাল
আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দাও সে কঙ্কাল"
—আইন হাঁকে।

২য় সূত্রধার। যে সহমরণ ছিল এককালে স্বেচ্ছামরণ
সমাজ তাহার 'স্বেচ্ছা'-টুকুরে করিল হরণ
বক্ষে চাপিয়া মৃত ভর্তার রাতুল চরণ
চিতায় উঠিতে হইল তাকে।

[পরদা সরিলে দেখা গেল চিতা সাজানো হইয়াছে ও একটি রমণীকে হাত পা বাঁধিয়া তাহাতে উঠানো হইতেছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। জমে উঠেছিল খেলা নারীর ভাগ্য নিয়ে
সমাজের রাঙা সতরঞ্চে,
খেলোয়াড় নারী-ঘাতী ধর্ম
কিন্তু থামতে হল, চলল না বেশীদিন,
ইংরেজ দেখা দিল মঞ্চে,
রামমোহনের হল জন্ম।

২য় সূত্রধার। সতীদাহ উঠে গেল, বিদ্যাসাগর এল
বিবাহের অধিকার বিধবারা ফিরে পেল।
স্কুল আর কলেজেতে উঠিল তাহারা মেতে
পেয়ে নব শিক্ষার বর্ম।

১ম সূত্রধার। পায়েতে চড়িল জুতা মাথায় মোহন ছাতা
চশমা নয়নযুগে বগলেতে বই খাতা
ওষ্ঠে মাখিল রং অঙ্গে জাগিল ঢং
পাউডারে ঢেকে দিল চর্ম।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল জনৈকা হাল ফ্যাশন দুরন্ত আধুনিকা শোভন ঠামে সবুজ 'প্যারাসল' মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

২য় সূত্রধার। কিন্তু তবুও হায় হায় রে
ক্রন্দন আজও শোনা যায় রে।

১ম সূত্রধার। শৃঙ্খল-নিক্কণ আজও করে ঝন্‌ঝন্‌
শিক্ষিতা রমণীরও পায় রে।

২য় সূত্রধার। আজিও তাহার পরগাছা-মন
ফিরিছে ভিক্ষা মাগি
যাচাইয়া নিজ রূপ-যৌবন
পর আশ্রয় লাগি।

১ম সূত্রধার। পরাইছে মালা টাকার থলির গলায়
টাকার লাগিয়া নামে নরকের তলায়
হাসিতে গানেতে রঙ্গে বলায় ছলায়
আছে বিনিদ্র জাগি,

২য় সূত্রধার। কোন ধনী আসি প্রিয় সম্ভাষি
হবে তার অনুরাগী।

১ম সূত্রধার। সুতরাং—
মুখে রং মেখে গায়ে শাড়ি ঢেকে
সোনা রূপো সাজে ঝুটো রাং।

২য় সূত্রধার। কিন্তু যাহারা খরিদ্দার
নিবাস তাদের যেখানেই হোক
ফরিদপুর বা হরিদ্বার
বাজিয়ে তাহারা দেখবে মাল
চোখটা কেমন চুলটা কেমন
রংটা কালচে কিম্বা লাল।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল একদল পরীক্ষক পুরুষের সামনে একটি মেয়ে বসিয়া আছে। পরদা রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা এই
নারীদের আজও মুক্তি নেই।

২য় সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা এই
নারী বাঁধা শত বন্ধনেই।

১ম সূত্রধার। শোকাবহ সত্য কথা, যারে মোরা ভাবি আনন্দিতা
লক্ষ্মী-বাণী-শক্তি-রূপা শিল্পী-কবি-প্রেমিক-বন্দিতা,

২য় সূত্রধার। জননী প্রেয়সী ভগ্নী দুহিতার মুখচ্ছবি 'পরে
যে নারীর সুখ-স্বপ্ন মূর্ত দেখি থরে থরে থরে,
১ম সূত্রধার। যার তরে প্রাণ দেয় লক্ষ কোটি মানব-সন্তান
যারে ঘিরি কল্প-লোকে কবিতার মিলিল সন্ধান,
২য় সূত্রধার। স্তন-পান করি যার ঘরে ঘরে আজও বাঁচে শিশু
যার কোলে জন্ম নেয় রামকৃষ্ণ সিদ্ধার্থ যিশু
১ম সূত্রধার। রবি-গান্ধী-জগদীশ-শিবাজী-শঙ্কর
সে নারীর সত্য মূর্তি অতি ভয়ঙ্কর।

[দুম্ করিয়া একটা শব্দ হইতেই স্টেজের আলো নিভিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে একটু আলো ফুটিয়া উঠিল। সেই স্বপ্নালোকে দেখা গেল একটি কালো পটভূমিকায় এক বন্দিনী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুই হাত, দুই পা বাঁধা, মুখও বাঁধা। অনেকটা Crucified Christএর মতো দেখিতে। পরদা আবার রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল। একটা করুণ বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাও থামিয়া গেল।]

১ম সূত্রধার। বন্দিনী নারীর বুকে জমেছিল যেই গ্লানিভার
ধীরে ভাষা পায় সে বেদনা
তারই পুত্র কন্যা বুকে কলঙ্কিত এই কালিমার
জেগেছে চেতনা।
২য় সূত্রধার। বলে তারা জাগো মাগো, জাগো প্রিয়া, জাগো গো ভগিনি
হও সচেতন
তব লুপ্ত মহিমার ধ্বংস-স্তূপ 'পরে উড়াইয়া বিজয় কেতন।
১ম সূত্রধার। সচকিয়া নীলাকাশ উচ্ছ্বসিয়া উঠুক তব
মহিমার প্রদীপ্ত কাহিনী,
জগদ্ধাত্রি, হে সিংহবাহিনি,
২য় সূত্রধার। দুর্গম শিখর হতে এস নেমে পুণ্যধারা দুর্নিবার-গতি
ধূর্জটির পার্শ্বে আসি মূর্তিমতী হওগো পার্বতী
সান্ত্বনা দায়িনি।
১ম সূত্রধার। এই আবাহনী গান নানাকণ্ঠে নানাস্বরে জাগে ঘরে ঘরে
কবিতার ছন্দোবন্ধে, শিল্পীর তুলিকামুখে, সিংহনাদে,
গুঞ্জনে, মর্মরে।

২য় সূত্রধার। বলে জাগো জাগো

জাগো তুমি মা গো।

১ম সূত্রধার। ধীরে ধীরে জাগে সাড়া বন্দিনীর অসাড় বক্ষেতে,

ধীরে ধীরে আলো জ্বলে অশ্রুভরা বিষণ্ণ চক্ষেতে,

২য় সূত্রধার। ধীরে জাগে আশা

শোনে যেন মুক্তির ভাষা।

[পরদা সরিয়া গেল। দেখা গেল বন্দিনী নারীর পায়ের দুই পাশে করজোড়ে নতজানু হইয়া একদিকে ছেলের সারি ও অন্যদিকে মেয়ের সারি বসিয়া আছে। বন্দিনী নারীর মুখভাবে আর হতাশার ছায়া নাই। চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পরদা আবার রঙ্গমঞ্চকে ঢাকিয়া দিল।]

১ম সূত্রধার। আপন কল্যাণ বাণী মূর্ত যেন হয় ধীরে ধীরে,

২য় সূত্রধার। বাজে যেন ছন্দের মঞ্জীরে।

[পরদা সরিলে দেখা গেল একটি সুন্দরী বালিকা বন্দিনীর মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে। ধীরে ধীরে শোভন নৃত্য সহকারে সে একটি গান ধরিল। গান শুনিতে শুনিতে বন্দিনী ক্রমশ যেন অধীর হইয়া উঠিল। অধর স্ফুরিত হইল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরিল। হাতের বাঁধন পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল সে।]

গান

হে সত্য জাগ্রত হও

সুন্দর জাগ্রত হও

মঙ্গল জাগ্রত হও

কমলের মতো দল মেলিয়া

মিথ্যা বাঁধন দূরে ফেলিয়া

বিলাস লালসা অবহেলিয়া

আপন মহিমা লোকে

উজ্জ্বল হও,

হে সত্য জাগ্রত হও।

অনলের মতো ওঠ জ্বলিয়া

মরণ তুষার যাক গলিয়া

যথার্থভাবে ব্যক্ত হয়েছে—সেটা হচ্ছে যে নারীরা যতক্ষণ নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন না হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের বন্ধন ঘুচবে না। নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবার আগে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। তাঁদের নৈতিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করবার ভার নিয়েছেন শ্রীমতী উজ্জ্বলা। আমি তাঁদের দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে চাই। ভগবান তাঁদের যে রূপ দিয়েছেন, মাতৃত্ব অর্জনের যে যোগ্যতা ও দায়িত্ব দিয়েছেন, পুরুষদের ওপর আধিপত্য করবার যে মোহিনী শক্তি দিয়েছেন সেই সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করার ব্রত নিয়েছি আমি। কাল সন্ধ্যা ছ'য়টায় আমার প্রদর্শনী খুলবে। সেখানে আমি সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বিশেষ করে মেয়েরা যেন অনুগ্রহ করে সেখানে পায়ের ধূলো দেন। সেখানে আমি তাঁদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেছি। প্রদর্শনীর সমস্ত বিবরণ আপনারা হ্যাণ্ডবিলে দেখতে পাবেন। হ্যাণ্ডবিল এখনই বিলি হবে। চারিদিকে পোস্টারও দেওয়া হয়েছে। আর একটি কথা ব'লে আমি আমার বক্তব্য সমাপন করব। শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবী এই মাত্র যে 'বন্ধন-মোচন' সমিতির উদ্বোধন করলেন, সে সমিতির উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাননীয়া কমিশনার পত্নী এবং মাননীয় জগনলাল টিকাওয়ালা সে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক হয়েও শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারলেন না। তাঁদের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির আমি দোষ দিই না। আমার তরফ থেকে আমি এইটুকুই শুধু উজ্জ্বলা দেবীকে বলতে পারি যে, যদিও আমি সামান্য মানুষ, তবু তাঁকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য আমি করব। বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি যদি নিজের সমিতিকে খাড়া রাখতে পারেন অর্থের জন্যে তাঁকে ভাবতে হবে না। তাঁকে অন্য প্রকার সাহায্যও আমি করতে পারি হয়তো, কারণ যদিও আমি সামান্য মানুষ, তবু ব্যবসায় সূত্রে অনেক বড়লোকের সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়, অনেকে আমাকে স্নেহও করেন। এই সৎকার্যে ভারতের শাসন পরিষদের কয়েকজনের সহকারিতা পাব বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কোন কথা দিতে পারছি না, যদিও এ বিষয়ে চেষ্টা আমি করব।

শ্রীমতী উজ্জ্বলা দেবীকে আগামী কাল আমার প্রদর্শনীতে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি—তাঁর 'বন্ধন-মোচন' সমিতির আর্থিক প্রসঙ্গ সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমি আলোচনা করব। নমস্কার।

[সিদ্ধার্থ নন্দী মঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন।]

চতুর্থ বিরতি

[সিদ্ধার্থ নন্দীর প্রদর্শনী যতদূর সম্ভব মনোরম করিয়া সাজানো হইয়াছে। প্রদর্শনীর প্রবেশপথ বাঁ ধারে কোণের দিকে, সম্মুখ দিক জাল দিয়া আবৃত। জালের ভিতর দিয়া প্রদর্শনীর অভ্যন্তর-ভাগ দেখা যাইতেছে। বিবিধ সুদৃশ্য শো-কেসে বিলাস-প্রসাধনের নানাবিধ উপকরণ সুরুচিসঙ্গতভাবে সজ্জিত। বিবিধ ভঙ্গীতে প্রসাধনরতা বহু তরুণীর বড় বড় ছবি নানা-স্থানে টাঙানো আছে। বহু বর্ণের ইলেকট্রিক বালব্ জ্বলিতেছে। নেপথ্য হইতে চটুল সুরে একটা অর্কেষ্ট্রা বাজিতেছে। পিছন দিকে একধারে একটি বড় টেবিলের চারিদিকে চেয়ার সাজানো। সেখানে চা কফি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। কয়েকজন তরুণী সেখানে বসিয়া হাস্যপরিহাস সহকারে চা পান করিতেছেন। ইতস্তত ভ্রাম্যমান কয়েকটি 'লিভেরিড্' খানসামা দেখিয়া মনে হয় কোনও অভিজাত হোটেল 'খানা-পিনা'র ভার লইয়াছে। প্রতি শো-কেসের সামনেও তরুণ-তরুণীর ভীড়। সিদ্ধার্থ নন্দী নিখুঁত ভদ্রতার সহিত সকলকে আপ্যায়িত করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রত্যেককে একটা না একটা কিছু উপহার দিতেছেন, হয় তেল, না হয় আলতা, না হয় আর কিছু। কিছুক্ষণ বাজিয়া অর্কেষ্ট্রা থামিয়া গেল। সিদ্ধার্থ নন্দী প্রদর্শনীর প্রবেশ পথের দিকে আগাইয়া আসিলেন। প্রদর্শনীর সম্মুখ দিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর নামিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। পথ দিয়া পথিক চলিতেছে, কেহ থামিতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে। কয়েকজন তরুণী প্রবেশ-পথের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সিদ্ধার্থ নন্দী স-সম্ভ্রমে আগাইয়া গেলেন।]

সিদ্ধার্থ। আসুন, আসুন, নমস্কার।

[তরুণীরা প্রদর্শনীর ভিতর প্রবেশ করিল। সিদ্ধার্থ নন্দী ইঁহাদের অনুগমন করিতেছিলেন কিন্তু ভিতর দিক হইতে দুইটি তরুণী আসাতে থামিয়া গেলেন।]

১ম তরুণী। একটা কথা জিগ্যেস করব, যদি কিছু মনে না করেন।

সিদ্ধার্থ। কি বলুন।

১ম তরুণী। আপনি মাথায় যে তেলটা বার করেছেন, তার গন্ধ এত উগ্র কেন?

সিদ্ধার্থ। অনেকে উগ্র গন্ধ পছন্দ করেন যে। আমার আর একটা তেল আছে 'চিকুর-নন্দিনী' সেটা আপনার পছন্দ হবে হয়তো। আপনাকে এক শিশি দিচ্ছি মেখে দেখবেন।

২য় তরুণী। আচ্ছা, মুখের ব্রণ সারে এরকম কিছু কি আছে আপনার?

সিদ্ধার্থ। আছে বই কি—ওই যে ওদিককার শো-কেসটায় রয়েছে অব্রণা। দু'দিন লাগালেই সেরে যাবে। নিয়ে যান দু'কৌটো ব্যবহার করে দেখবেন। আপনারা চলে যাচ্ছেন না কি?

১ম তরুণী। হ্যাঁ।

সিদ্ধার্থ। চা খেলেন না?

২য় তরুণী। খেয়েছি বই কি, চা খেয়েছি, কেকও খেয়েছি, চমৎকার কেক!

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা এক মিনিট দাঁড়ান তাহলে, আমি এনে দিচ্ছি জিনিস দুটো।

[প্রদর্শনীর ভিতর ঢুকিয়া গেলেন।]

১ম তরুণী। চমৎকার ভদ্রলোক!

২য় তরুণী। সত্যিই চমৎকার।

১ম তরুণী। থেকে যেতে ইচ্ছে করছে, কাল বন্ধন-মোচন নাটকে যে মেয়েটি নেচেছিল সে এখানেও নাচবে না কি?

২য় তরুণী। হ্যাণ্ডবিলে তাই তো লেখা আছে। আমারও থাকতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু শক্তি সমিতির মিটিংয়ে একেবারে না যাওয়াটা কি ভাল দেখাবে? উৎসাহদা ভয়ানক রাগ করবেন শুনলে।

১ম তরুণী। মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে এতক্ষণ।

[হাতঘড়ি দেখিল।]

২য় তরুণী। তবু পেছন দিকে গিয়ে বসা যেতে পারে এখনও।

[সিদ্ধার্থ নন্দী এক শিশি 'চিকুর-নন্দিনী' ও দুই কৌটা 'অব্রণা' লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

সিদ্ধার্থ। এই নিন। ব্যবহার করে কেমন লাগল আমাকে জানাবেন কিন্তু। যদি দরকার হয় আরও স্যাম্পল্ আমি দেব।

১ম তরুণী }
২য় তরুণী } আচ্ছা, ধন্যবাদ। নমস্কার। চলি তাহলে আমরা।

সিদ্ধার্থ। বীথিকা সান্যালের নাচটা আরম্ভ হবে এখুনি, সেটা দেখে গেলেই পারতেন।

[১ম তরুণী একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।]

২য় তরুণী। না, আমাদের একটু কাজ আছে, যেতেই হবে, নমস্কার।

[তরুণীদ্বয় চলিয়া গেল। ভিতর হইতে আরও দুইজন তরুণী প্রবেশ পথে দেখা দিল। একজনের হাতে একটি তেলের শিশি, আর একজনের হাতে একটি কৌটা।]

১ম তরুণী। [সিদ্ধার্থকে] আমাকে তেল একশিশি দিলেন সেজন্য অবশ্য ধন্যবাদ [হাসিয়া] কিন্তু তেলের আমার দরকার ছিল না তত, ফুরিয়েছে বরং পাউডারটা।

সিদ্ধার্থ। বেশ তো পাউডারও নিয়ে যান। না, না, তেলের শিশিটাও থাক না।

২য় তরুণী। [হাসিয়া] আমাদের বাড়িতে কারও ব্রণ নেই। অব্রণা নিয়ে কি করব বলুন ?

সিদ্ধার্থ। আপনাকে কি দেব তাহলে ?

২য় তরুণী। আমার কিছু দরকার নেই, ধন্যবাদ।

সিদ্ধার্থ। না, না, তা কি হয়। আপনার তো দরকার নেই জানিই, দরকারটা আমার। আপনাদের দিয়েই আমি কৃতার্থ।

২য় তরুণী। [হাসিয়া] ছাড়বেন না যখন দিন এককৌটো মাজন। এটা দরকার নেই।

সিদ্ধার্থ। থাক না ওটা, আর কাউকে দিয়ে দেবেন। আসুন।

[তরুণীদ্বয়কে লইয়া সিদ্ধার্থ ভিতরে চলিয়া গেলেন। অর্কেষ্ট্রায় আর একটা চটুল গৎ শুরু হইল। অর্কেষ্ট্রা মিনিট কয়েক বাজিবে। ততক্ষণ দেখা যাইবে মেয়েদের দল আসিতেছে ও বাহির হইয়া যাইতেছে। সিদ্ধার্থ নন্দী নানাভাবে তাহাদের আপ্যায়িত করিতেছেন। আর্কেষ্ট্রা থামিয়া গেলে উৎপলা ও শিবু আসিল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া সিদ্ধার্থ নন্দী আগাইয়া আসিলেন।]

সিদ্ধার্থ। ও, তোমরা এসেছ ! উজ্জ্বলা কোথায় ?

শিবু। উজ্জ্বলাদি উৎসাহের মিটিংয়ে গেছেন।

সিদ্ধার্থ। তোমরা যাওনি ?

উৎপলা। [হাসিয়া] গিয়েছিলাম, কিন্তু লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সিদ্ধার্থ। তোমার দাদু এলেন না ?

উৎপলা। তিনিও উৎসাহের মিটিংয়ে বসে আছেন। সামনের সীটে গিয়ে বসেছেন একেবারে। হাঁ করে গিলছেন বক্তৃতাগুলো। উৎসাহকে বড্ড ভালবাসেন যে উনি।

শিবু। মিটিং শেষ হলেই আসবেন সবাই বোধ হয়।

সিদ্ধার্থ। আচ্ছা, এস তোমরা ভেতরে।

উৎপলা। বীথিকার নাচ হয়ে গেছে ?

সিদ্ধার্থ। না, এইবার হবে। এস।

[সকলকে লইয়া ভিতরে গেলেন। সিদ্ধার্থ নন্দীর জনৈক কর্মচারী চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া সরাইয়া নাচের আসর ঠিক করিতে লাগিল। সব ঠিক হইয়া গেলে সিদ্ধার্থ নন্দীর ইঙ্গিতে সে সকলকে সম্বোধন করিয়া নাচের কথা ঘোষণা করিল।]

কর্মচারী। শ্রীমতী বীথিকা সান্যাল এবার নৃত্যসহকারে একটি গান করবেন। আপনারা সকলে অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

[সকলে আসন গ্রহণ করিলে নর্তকীবেশে সজ্জিতা শ্রীমতী বীথিকা আসিয়া নৃত্য-গীত শুরু করিল।]

গান

চল্ এগিয়ে চল্
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।
সাহস করে চল্ না ধীরে
বাজিয়ে পায়ের নূপুরটিরে
আলতা রাঙা চরণ ঘিরে
মাতবে ধূলোর দল
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।
তোর হাসির সুরে বাজবে বাঁশী
থামবে অসম্বৃত
জাগবে কবি আঁকবে ছবি
বাঁচবে জীবন্মৃত,
তৃষিতকে জুড়িয়ে দিবি
বিঘ্ন বাধা পুড়িয়ে দিবি
দখিন বায়ে উড়িয়ে দিবি
চঞ্চল অঞ্চল
ওরে ভয় কিরে তোর বল্।

[নাচগান যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন পাশের কলেজ-কম্পাউণ্ড হইতে লাউড স্পীকারে উৎসাহের পরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

[লাউড স্পীকার] আমাদের শক্তি-সমিতির অধিবেশন শেষ হল। আজ এই অধিবেশনে যে শপথ আমরা গ্রহণ করলাম, তা আর একবার সকলকে শুনিয়ে দিচ্ছি। সেটি এই। "আজ আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করছি যে, কোনও কারণেই আমরা মনুষ্যত্বহীন হব না। হাত পাতব না ধনীর দুয়ারে, সহ্য করব না দাম্ভিকের অকারণ দম্ভ, প্রশ্রয় দেব না নীচতাকে, দগ্ধ হব না বিদ্বেষে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের শক্তিতে মানুষের মতো বাঁচব আমরা। আত্মশক্তিই হবে আমাদের একমাত্র মূলধন, বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পথই আমাদের একমাত্র পথ। বুদ্ধ, চৈতন্য, রবীন্দ্র, গান্ধির উত্তরাধিকারী আমরা, শুভ্র মানবতাই হবে আমাদের আদর্শ। যে কোনও সৎকর্মই হবে আমাদের ধর্ম, যে কোনও সৎচিন্তাই হবে আমাদের বিলাস, সুস্থ সুন্দর আনন্দময় জীবনের উদ্বোধন করব আমরা। যে কুৎসিৎ লোভ পঙ্গু করেছে আমাদের জাতিকে, যে বিলাস-লালসা ভগ্ন করেছে আমাদের মেরুদণ্ড, যে পরশ্রীকাতরতা কলঙ্কিত করেছে আমাদের স্বপ্ন, তা সযত্নে পরিহার করব আমরা, সবলে উৎপাটন করব সমাজদেহ থেকে। শক্তি হবে আমাদের মন্ত্র, সংযম হবে আমাদের সাধনা, সত্য হবে আমাদের আশ্রয়, আনন্দ হবে আমাদের লক্ষ্য।"

[লাউড-স্পীকার ক্ষণকালের জন্য থামিয়া আবার বলিতে শুরু করিল।]

এই আমাদের শপথ। বন্ধুগণ, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করবার দায়িত্ব আমাদেরই, সে কথা আমরা যেন বিস্মিত না হই। এখনই আমাদের শোভাযাত্রা রাজপথে বেরুবে গান গাইতে গাইতে। আমাদের সকলকে অনুরোধ করছি যোগদান করুন তাতে, উৎসাহিত করুন আদর্শ-তীর্থের পথিকবৃন্দকে—

[লাউড-স্পীকার থামিয়া গেল। সকলে বজ্রাহতবৎ চুপ করিয়া রহিল। প্রদর্শনীর আলোটাও হঠাৎ যেন কমিয়া গেল। সেই স্বল্পালোকে উজ্জ্বলা প্রদর্শনীর দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বলাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ নন্দী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন।]

সিদ্ধার্থ। তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে। তোমার 'বন্ধন-মোচন' সমিতির চেকটা আমি লিখেই রেখেছি। আপাতত হাজার দশেক হলে হবে না? তারপর যদি দরকার হয়—

উজ্জ্বলা। আমি আপনার সাহায্য নেব না ঠিক করেছি।

সিদ্ধার্থ। নেবে না? তাহলে তোমার সমিতি চলবে কি করে?

উজ্জ্বলা। তা এখনও ঠিক করিনি।

সিদ্ধার্থ। ও। তাহলে—

[ইতস্তত করিতে লাগিলেন। পরমুহূর্তেই ড্রামের আওয়াজ চতুর্দিক সচকিত করিয়া দিল।]

উজ্জ্বলা। শক্তি সমিতির শোভাযাত্রা বেরুচ্ছে।

[সকলে স্তব্ধ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরেই সমবেত কণ্ঠে গান শোনা গেল।]

গান

আগাইয়া চল চল বীর
ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধর বলিষ্ঠ দক্ষিণ বাহু
ছুটিয়া পালাবে দূরে রাক্ষস দৈত্য বা রাহু
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
পর্বত হবে নত-শির।
অম্বর বিদারিয়া গম্ভীর বাণী তব তীক্ষ্ণ
ঘোষণা করিয়া দিক মানিব না মানিব না বিঘ্ন
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ।
উচ্চকণ্ঠে কহ তুচ্ছ বিপদ ভয় বাধা
শক্তির সঙ্গীত মৃত্যুঞ্জয়-তালে সাধা
মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
আছে পার সব জলধির।
আগাইয়া চল চল বীর।

[শোভাযাত্রা প্রদর্শনীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেখা গেল অনুক্ষণ গুপ্ত শোভাযাত্রার শীর্ষদেশে রহিয়াছে, তাহার হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা। ছাত্র-ছাত্রী তরুণ-তরুণীর বিরাট মিছিল। কিন্তু কোনও বাচালতা নাই। সকলেই সংযত, গম্ভীর ও একাগ্র। প্রদর্শনীর ভিতর হইতে তরুণ-তরুণীর দল পিলপিল করিয়া বাহির হইয়া মিছিলে যোগ দিল। উৎপলা শিবুও চলিয়া গেল। দেখা গেল ভীড়ের মধ্যে বৃদ্ধ দুর্গাপদও রহিয়াছেন। ভীড় তাঁহাকে এই দুর্নিবার জনস্রোতে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। উজ্জ্বলাও মিছিলে যোগ দিল। বীথিকাও নাচের পোষাকে বাহির হইয়া আসিয়া শোভাযাত্রার অনুসরণ করিল। প্রদর্শনী খালি হইয়া গেল। নিস্পন্দ হইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিলেন কেবল সিদ্ধার্থ নন্দী। মিছিল যখন

চলিয়া গেল তখন দুই এক পা আগাইয়া তিনি তাহা অনুসরণ করিতে গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন।]

সিদ্ধার্থ। না, আমি যাব না। I shall stick to my gun—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ [নেপথ্যের দিকে চাহিয়া] ওহে, তোমরা থেমে গেলে কেন, অর্কেষ্ট্রা শুরু কর না আবার।

[ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।]

একি! কেউ নেই না কি? সবাই চলে গেছে!

[বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি জনশূন্য প্রদর্শনীটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন একটা মায়াবিনী যক্ষিনীকে দেখিতেছেন।]

যবনিকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই খণ্ডে সংযোজিত বনফুলের আলোকচিত্রখানি শ্রীমোনা চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁকে অশেষ [illegible]

—প্রকাশক

পরিশিষ্ট—ক

ভূমিকা

ভাই বলাই,

তোমার ছোটগল্প লেখার প্রথম দিনগুলির সঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ জড়িত আছি, তাই সম্ভবত আমি তোমাকে সহজে বুঝতে পারি। তার আরও কারণ আমি তোমার চরিত্রের সঙ্গেও পরিচিত। তোমার চালচলনে এমন একটি ঋজুতা এবং চিন্তায় এমন একটা স্বচ্ছতা আছে যা তোমার ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করেছে। তোমার এই চরিত্র তোমার লেখার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত। তোমার ছোটগল্পের মধ্যে তাই তোমার চরিত্রটিকেই আমি দেখতে পাই।

তোমার কল্পনাশক্তি বহুবিস্তারী। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ঘুরে আসা তোমার পক্ষে এক নিশ্বাসের ব্যাপার।

তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মিতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। এই বেঁধে ফেলার কাজটি তোমার এমন দ্রুত এবং পাকা যে পড়তে বসলে মনে হয় এর জন্য তোমাকে যেন কোনো পরিশ্রমই করতে হয় নি। যেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর তড়িৎগতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, সরল সহজ ছবি।

সবই সে প্রচলিত প্রথা মান্য ক'রে ছোটগল্প হয়েছে তা নয়. কিন্তু তারা প্রথা অমান্য ক'রেও ছোট গল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। একই উদ্দেশ্য, ছবি আঁকা। শিল্পসৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে আবদ্ধ থাকা তোমার ধাতে নেই।

মানুষের জীবনকে তুমি চলচ্চিত্রের মতো দেখেছ। জীবনের স্রোত, বিচিত্র মানুষের স্রোত, ভেসে চলেছে সম্মুখ দিয়ে, তুমি বসে আছ পাশে—তার এক একটি মুহূর্তকে টেনে তুলে এক একটি ছবি রচনা করবে ব'লে। মাছরাঙা মাছের আশায় যেমন জল থেকে একটু উঁচু জায়গায় বসে থাকে, তেমনি। তোমার গল্প ধরা আর তার মাছ ধরার মধ্যে কোনো তফাত নেই।

তোমার হাতের এই সব জীবন অথবা চরিত্র-চিত্রণ বিচিত্র, সংখ্যা অগণিত। নির্দিষ্ট পরিসরে এমন বহু বিচিত্র ছবি দেখা কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটে। শুধু তাই নয়, তোমার গল্পের একটি বড় গুণ এই যে তুমি যে-গল্পই লেখ, তারই প্রথম লাইন পড়লে শেষ লাইন পর্যন্ত না প'ড়ে উপায় থাকে না। তোমার ভাষার মধ্যে কোনো

খেলা নেই, অথচ তোমার প্রত্যেকটি বাক্য সরল। এবং তার প্রকাশ এমন তড়িৎগতি এবং প্রবল যে তা পাঠকমনকে তার মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে। সমস্তটাই যেন এক জাতীয় জাপানী চিত্রকরের মতো তুলির একটানে আঁকা। তোমার গল্পের এই ফর্ম তোমার গল্প থেকে পৃথক কোনো বস্তু নয়। রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত মানুষের 'ফর্ম' যেমন তার সত্তা থেকে পৃথক নয়।

তুমি বিজ্ঞানী এবং তুমি কবি—তোমার গল্পে এ দুয়ের অদ্ভুত মিলন ঘটেছে। তার ফলে শিল্পীর নিস্পৃহতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা মিলে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বতন্ত্র করেছে। গল্পের বৈচিত্র্যও এরই জন্য। এই বৈচিত্র্য মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে কতকগুলি গল্প বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু নির্মমতার পর্যায়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কশাই গল্পটি। এ রকম গল্প ইংরেজীতে অনেক লেখা হলেও বাংলায় এই বোধ হয় প্রথম। একটু বেশি নিষ্ঠুর। আর এক ভাগে পড়েছে কাব্যপ্রধান রচনা। সেগুলো গীতিকবিতার মতোই মধুর। রাত দুপুরে, মালাবদল, অধরা, প্রজাপতি প্রভৃতি।

তোমার তাজমহল, গণেশজননী, স্মৃতি প্রভৃতি গল্পে তোমার দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থরূপে মিলন ঘটেছে। এ গল্পগুলির তুলনা হয় না। আমার মতে এই গল্পগুলির ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় বা এশিয়ার নানা ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত। তাজমহলের মতো ছোট গল্প বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় আর লেখা হয় নি।

অলৌকিক বিষয় নিয়েও গল্প লিখেছ কয়েকটি। অবর্তমান, শেষ কিস্তি ইত্যাদি। জানা অজানা সকল জগতে তোমার আনাগোনা। অজানা বিষয় যে জানার সীমানায় আনোনি সেটি ভাল করেছ। অজানা, যে রহস্য রূপে মানুষের জীবনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেখা দেয়, সে বিষয়ে তুমি ইঙ্গিত দিয়েই ছেড়ে দিয়েছ। তোমার 'কেন' গল্প এই "কেন?" প্রশ্নটি নিয়েই এই সব অলৌকিক বিষয়ের গল্পের প্রতিনিধিত্ব করছে।

তোমার নিমগাছ একটি আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি। এত সামান্য আয়োজনে, ছোট ছোট বাক্যের মাত্র ২৮টি লাইনে এমন একটি নিটোল কল্পনা এতে রূপ পেয়েছে যা অবাক ক'রে দেয়। এটি যেমন ছোট তেমনি এটি গল্পও। এটি পড়লে আর ছোটগল্পের নীচের সীমা নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে না।

জীবনের একটুখানি অংশ মাত্র ছোট গল্পে দেখানো যায়—এই অংশটি ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত। তবু জীবনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেননা মানুষ—মানুষ,—যন্ত্র নয়। এবং প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর

বিষয়বস্তুকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেন ব'লেই তা আর্ট হয়। সবাই এক রকম দেখলে এবং এক রকম আঁকলে তা আর্ট হত না, অন্য কিছু হত। তাই তোমার গল্প যে পাঠকদের ভাল লাগে তা তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই। অত্যন্ত ছোট পরিসরে তুমি পাঠকমনে যে ব্যাপ্তির ধারণা জন্মাতে পার তা তোমার ঐ বিশেষ শিল্পরীতির জন্যই, এবং তারও মূলে চোরের মতো লুকিয়ে আছে একটি কবি—Lord, forgive him, for he knows not what he is doing! ছোট গল্পকে মিনিয়েচার এবং সাব-মিনিয়েচারে রূপান্তরিত ক'রে তুমিই ছোটগল্পকে পাঠকের চোখে আজ আরও বড় করে তুলেছ বলে আমার বিশ্বাস।

ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের কথা আগে বলেছি। উদ্দেশ্য—নিজের দেখা ছবি অন্যের সম্মুখে তুলে ধরা, যাতে পাঠক গল্পচিত্রটিকে লেখকের দৃষ্টিতে দেখতে পায়। লেখক শেষ পর্যন্ত যে কথাটি ব'লে গল্প শেষ করেন, সেই কথাটি জানা হ'লে গল্পের বর্ণিত সমস্ত কথা পাঠকের চোখে নতুন অর্থ বহন করে। এক কোণে মধু জমবে ব'লে যেমন সমস্ত মৌচাকখানি দরকার, তেমনি আসল দর্শনীয় বস্তুটি দেখাবার জন্য গল্পের একটা পরিসর দরকার। বিষয়বস্তুর প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিসরের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। গল্পের পরিণতিতে কখনো থাকে একটি ইঙ্গিত, কখনো থাকে সমস্ত কাহিনীটির ব্যাখ্যা। আবার কখনো ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু ছবিটি দেখিয়েই শেষ করা চলে—পাঠক নিজের ব্যাখ্যা নিজে খুঁজে নেয়। ছবিটি যথেষ্ট চিত্রাকর্ষক হলেই সেখানে যথেষ্ট মনে করা হয়। এ রকম গল্পও এ বইতে আছে দু' একটি।

তোমার কলমে সব রকম গল্পই এসেছে। এ এক চমকপ্রদ ব্যাপার। হাতী থেকে প্রজাপতি সব রকম গল্প সৃষ্টির ব্রহ্মা হয়ে ব'সে আছ তুমি, তাই তোমার লেখায় আমার বিস্ময় লাগে। চুম্বনান্তে—

পরিমল গোস্বামী

পরিশিষ্ট—খ

বনফুল রচনাবলীর প্রথম দশটি খণ্ডের গ্রন্থসূচী

	উপন্যাস	গল্প	কবিতা	নাটক	বিবিধ
প্রথম খণ্ড :	তৃণখণ্ড, বৈতরণী তীরে, দ্বৈরথ, কিছুক্ষণ	বনফুলের গল্প	বনফুলের কবিতা	×	×
দ্বিতীয় খণ্ড :	নির্মোক	বনফুলের আরও গল্প	×	মন্ত্রমুগ্ধ, রূপান্তর, শ্রীমধুসূদন	×
তৃতীয় খণ্ড :	মৃগয়া, রাত্রি	×	অঙ্গারপর্ণী, চতুর্দশী, আহবনীয়	বিদ্যাসাগর, ভূয়োদর্শন	
চতুর্থ খণ্ড :	সে ও আমি, জঙ্গম (১ম ও ২য়)	×	×	×	×
পঞ্চম খণ্ড :	জঙ্গম (৩য়) সপ্তর্ষি	×	×	মধ্যবিত্ত	×
ষষ্ঠ খণ্ড :	অগ্নি, নঞ-তৎপুরুষ	বিন্দু বিসর্গ বাহুল্য	×	কঞ্চি, দশভাণ	×
সপ্তম খণ্ড :	স্বপ্নসম্ভব, মানদণ্ড, ভীমপলশ্রী	আরও কয়েকটি	×	দশভাণ	×
অষ্টম খণ্ড :	ভানা (সম্পূর্ণ)	অদৃশ্যলোকে	করকমলেষু	সিনেমার গল্প	×
নবম খণ্ড :	নবদিগন্ত, স্থাবর	×	×	×	×
দশম খণ্ড :	কষ্টি পাথর, লক্ষ্মীর আগমন	তন্বী, নবমঞ্জরী	×	বন্ধন-মোচন	×